সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य अंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : IV, Issue : VIII, 31st July, 2018

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : IV, Issue : VIII, 31st July 2018

Chief Editor :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

© ***Dr. Jaygopal Mandal***

Type Setting :

Manik Kumar Sahu,

Kolkata - 152

Phone : 9830950380

Price : ₹ 300.00

Published by :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Phone : 09830633202/09570217070

E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com

Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :
Prof. (Dr.) Tapas Basu, Kalyani University and Guest Faculty of C.U., Kolkata
Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Dr. K. Bandyopadhyay, R. S. P. College, Jharia, Jharkhand
***Dr. Subrata Kumar Pal,* Dept. of Bengali, Ranchi University, Jharkhand**
Dr. Ira Ghoshal, Dept. of Bengali, T. M. University, Bhagalpur, Bihar,
Dr. J. N. Singh, Principal, R. S. P. College, Jharia
Dr. B. K. Sinha, Principal, P. R. M. College, Dhanbad

Members from the other Countries :
Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, BanglaDesh)
Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, BanglaDesh)
Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)
Professor Barsanjit Mazumder (USA)

Assistant Editor :
Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.
Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia

Working Editorial Board :
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Mostaq Ahmed, H.O.D. Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata
Jayanta Mistri, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Bidhannagar Govt. College, Kolkata
Sampa Basu, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Soma Bhadra, Dept. of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya, Barracpur
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Sovana Ghosh, Dept. of Bengali, Dhrubachand Halder College, Barasat, W.B.
Dr. Sandip Mondal, Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata
Dr. B. N. Singh, Dept. of Com., R. S. P. College Jharia
Dr. R. Pradhan, Dept. of Chem., P. K. R. M. College, Dhanbad
Dr. N. K. Singh, Dept. of Hindi, R. S. P. College, Jharia
Dr. D. K. Singh. Dept. of Physics, P. K. R. M. College, Dhanbad

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
(জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯—মৃত্যু : ৮ জুলাই ২০০৩)

সম্পাদকীয়

প্রতিদিন ক্লাস করার ফাঁকে আমি আর গিয়াস চলে যেতাম কলেজস্ট্রীটে—স্বপ্ন আর কল্পনার আকাশ এখানে দরাজ। গাঁয়ের ছেলে তখনও সাহিত্যের ছাত্র হলেও অনুরাগী নয়। সময়টা ১৯৮৬। গিয়াস একটু স্বচ্ছল। একদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা কিনে আমাকে উপহার হিসাবে দেয়। তারপর কবিতার সঙ্গে ঘরকন্না করা শুরু। সেই থেকে কবি সুভাষের সহজ বোধ, সরল প্রকাশভঙ্গি মনের কোণে অন্যরকম জায়গা তৈরি করে। তখন তো কবি সুভাষ তখনকার শাসকের বিরুদ্ধেও কথা বলতেন। কেন জানি না, মনে হত তিনি আমাদেরই কথা বলতেন।

সুযোগ হল একদিন, এম. ফিল পড়ার সূত্রে—লঘু গবেষণা করার জন্য অদ্রিশের সঙ্গে গিয়েছিলাম কবি সুভাষের শরৎ বসু রোডের বাড়িতে। পরে সেটা অদ্রীশের সাক্ষাৎকার হিসাবে পত্রপুট-এ বেরোয়। আমি আর একদিন গেলাম, কবির সাক্ষাৎ উষ্ণ স্পর্শ নিতে। সেদিন সেই হাসি-মুখ আজও ভুলিনি। আর আন্তরিকতা অতুলনীয়। যেন অজ্ঞ এক যুবককে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন তাঁর কবিতার নেপথ্য কাহিনী। এমন প্রিয় মানুষের কবিতা যেকোনো পাঠকের মন কাড়বে নিঃসন্দেহ। তারপর ড. তাপস বসুর উদ্যোগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে পুরো মাত্রায় গবেষণা করার কাজটা সম্পূর্ণ করলাম। এখন বুঝি—আমার ভাবনার ওপর, মননের বিকাশে কবি সুভাষ যেন শয়নে-স্বপনে আছেন। এক সহজাত দায়বোধ থেকে তাঁর জন্মশতবর্ষ সংখ্যা করার ব্রত নিলাম। বহু পত্র-পত্রিকা তাঁর ওপর কাজ করেছে—'পরিচয়', দিবারাত্রির কাব্য, 'পত্রপুট', শ্লোক প্রভৃতি। এবং 'সপ্তাহ' তো তাঁকেই ধরে রেখেছে নানা রূপে, নানা দৃষ্টিকোণে। তাঁকে একান্ত অভিভাবক মেনে আজও পথ চলে 'সপ্তাহ'। সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী মহাশয় তাই এগিয়ে এসেছেন আমার এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করতে। এইসব পত্রিকা থেকে গ্রহণ করেছি ঋণ। কৃতজ্ঞতা জানাই।

কবি-সাহিত্যিক তাঁর নিজ নিজ ঘরানায় লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও চিন্তনের কথাকে। কয়েকজন কবি কবিতায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বকীয়তায়। কারো কাছে কবি বিতর্কিত। মধুশ্রী সেন সান্যাল নিয়েছেন নীরেন চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার—বিষয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শঙ্খ ঘোষ, সম্মতি দিয়েছেন তাঁর অনন্য স্মৃতি কথার পুনর্মুদ্রণ-এ। এমনভাবে বহু লেখা পেয়েছি। দিলীপ চক্রবর্তী দিয়েছেন কবির অগ্রন্থিত ও গ্রন্থিত কিছুগদ্য এবং তাঁরই স্মৃতিকথা। কবি গণেশ বসু বলছিলেন তাঁর গরম গরম অনুভূতির কথা—দোষে-গুণে কবি সুভাষ; তাঁর স্মৃতিকথায় পেয়েছি কবিকে। বহু গবেষক, এবং আমার প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক ড. তাপস বসু, তরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ একেবারে স্বতন্ত্র গদ্যে লিখেছেন।

'পদাতিক' (১৯৪০)-এ যে সৈনিকের পোশাকে কবি সুভাষ জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসক, লক্ষ্য ছিল সামন্ত-শোষক, সেই সৈনিকের শিরদাঁড়া নিয়ে চির নায়ক ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় নিজেকে স্থিত করেছিলেন অনন্য প্রজ্ঞায়। তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে ডায়েরীতে লিখে রেখে গেছেন—

'যদি
অটল হন মোদি
বইবে রক্তনদী
অথবা
মোদি অটল
হা রাম! তোবা তোবা
দেশ তুলবে পটল।'

—ভবিষ্যৎ বলবে তাঁর এই দর্শন কতটা সত্য। কিন্তু এই পংক্তিকয়টিতে কাব্য-সৌকর্য ধাক্কা খাচ্ছে। কোনো ব্যক্তি কোনো সমষ্টিগত রাজনৈতিক মতাদর্শের একমাত্র আধার হতে পারে না। এখানে মনে হয় কবির এই আত্মানুভব কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা। রাষ্ট্রনেতার প্রতি কবির ব্যক্তিগত অনুযোগ কবিতার মাধুর্যকে বিনষ্ট করেছে। —এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাসের উত্তাপ প্রকাশিত। যাই হোক না কেন তিনি ছিলেন অপরাজেয় নায়ক—মানুষের উত্তরণ, জীবনের উত্তরণ তাঁর অভীষ্ট।—আজীবন এই স্বপ্নকে লালন করেছেন মনে ও মননে।

'আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনের জন্য' কবিতায় কবি লিখেছেন—'কেবল ওল্টাবেন/কিন্তু পাল্টাবেন না'।—জীবনের শেষপাদে দাঁড়িয়ে যে কবি এমন সোজা-সাপটা করে বলতে পারেন, সেই কবিকে কে নিন্দেমন্দ করল তাতে কিছু যায় আসে না। ভালোয়-মন্দে মেশানো মানুষের জীবন। ব্যক্তিগত কিছু ত্রুটি কেউ খুঁজতেই পারেন। তবুও তিনি চিরজয়ী তাঁর শিল্পের জন্য। যাঁদের লেখায় এই সংখ্যা শরীর পেল তাঁদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। প্রত্যেক লেখার জন্য লেখকই দায়বদ্ধ। যদি কোনো বিতর্ক তৈরি হয়, তা সে লেখকের নিজস্ব। তাই কবির কথায় বলি—

'বাঁশি বাজলে, জিতি কিংবা হারি
বলুক লোক—খেলেছ বেশ,
সাবাশ বলিহারি।'

জয়গোপাল মণ্ডল
৩১ জুলাই, ২০১৮

বিষয়:

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত লেখা—/১১

১ আমি ছেড়ে যাইনি, একপাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি

২ ছোট মুখে কবিতার বড় কথা

৩ বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি

৪ সুখ যায়, স্মৃতি থাকে

৫ নেহরু : 'না'-তে শুরু 'হ্যাঁ'-তে শেষ

৬ জ্ঞানপীঠ সম্মান পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে কবিতা—

অবশেষে—গণেশ বসু/৪৭

কবি যখন পদাতিক— তরুণ মুখোপাধ্যায়/৪৮

পা চালাতে থাকে সব আর রাস্তাও নিজের নিজের মতো চলে—তাপস রায়/৪৯

আবারও বসন্ত এল—রবীন বসু/৫০

লাল টুকটুকে আকাশে বিহঙ্গ একা—শ্রীজয়/৫১

ধর্মের কল—সুশীল মণ্ডল/৫২

কাপুরুষেরা মরেই আছে, আজ পুরুষের এগিয়ে যাবার দিন—অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী/৫৩

নতজানু হই—আনসার উল হক/৫৪

'ওরা বৃষ্টি মেখে অপেক্ষায়'— ইভা চক্রবর্তী/৫৫

তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিরজীবিতেষু—সৌমিত বসু/৫৬

"মুখুজ্জে সুভাষ"—অলোক দাশগুপ্ত/৫৭

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'—কালিদাস ভদ্র/৫৮

শতবর্ষে—মধুশ্রী সেন সান্যাল/৫৯

মূক মুখে দিয়েছেন ভাষা—রমেশ পালিত/৬০

কে যায়....কীভাবে—সুস্মেলী দত্ত/৬১

সেই তো সুভাষ—সৌম্যদীপ্ত বোস/৬২

পদাতিকের অন্তিম যাত্রার খবর : দৈনিক সংবাদপত্র থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পদাতিক কবির চিরযাত্রা—অমিতাভ চৌধুরী/৬৩

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

বিদায় মুখুজ্যে! বিদায় কেতকী!—মহাশ্বেতা দেবী/৬৫

দৈনিক আজকাল পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পদাতিক কবি সুভাষ প্রয়াত—অভিতাভ সিরাজ/৬৭

দৈনিক আজকাল পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

কবির আবার মৃত্যু হয় নাকি!—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়/৬৯

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন—গৌতম ঘোষদস্তিদার/৭১

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

হায়, কবি যদি জানতেন (বিশেষ সংবাদদাতা)/৭৩

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পরলোকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (বিশেষ সংবাদদাতা)/৭৫

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)/৭৬

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

'দুখন্তি, শুকনো গাছে এ বার পাতা জাগবে'—বিশ্বজিৎ রায়/৭৯

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

একেবারে নিজের ধরনে — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/৮২

খবরের কাগজের প্রতিবেদন, ৯ই জুলাই ২০০৩/৮৩

চলে গেলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'পদাতিকের'র কবি— সুজয় বিশ্বাস/৮৪

মুখোমুখি—

পদাতিক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার—অদ্রীশ বিশ্বাস/৮৭

কেউ 'ছাপা' কবি, কেউ 'ছুপা' কবি ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার
—তাপস গঙ্গোপাধ্যায়/১০৪

সুভাষদার জীবনচর্চাটা দেখে খুব ভালো লাগে : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার
— মধুশ্রী সেন সান্যাল/১০৮

স্মৃতি কথায় ও অনুভবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—

আমার বন্ধু সুভাষ—জলি মোহন কল/১১১

ভালোবাসাগুলিকে নিয়েই ভয়—তরুণ সান্যাল/১১৫
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে—অরুণ মিত্র/১৩০
সুভাষদার সঙ্গে পথচলা—শঙ্খ ঘোষ/১৩৫
কখনো খরা, কখনো বর্ষা—গণেশ বসু/১৪৫
সুভাষদাকে যেমন দেখেছি—মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়/১৫৫
আমার এ গল্পের নায়ক—আলোক রায়/১৬৪
কবি সুভাষ এক সময়ে লাঠি হাতে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন
—গোবিন্দ ভট্টাচার্য/১৭৪
মানিকের 'অন্ধের যষ্ঠী' সুভাষ—নিশীথ দে/১৭৭
সুভাষ কাকার স্মৃতি—আহম্মদ আলি/১৮৩
পদাতিক কবির অন্তিম যাত্রা—বাসুদেব গাঙ্গুলী/১৮৬

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে—

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'পদাতিক'—বুদ্ধদেব বসু/১৯৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবি ও কর্মী—জগদীশ ভট্টাচার্য/২০৪
জ্যোতির্লোক থেকে নিসর্গ প্রকৃতি ছুঁয়ে সাধারণের—তাপস বসু/২০৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ দৈনন্দিনের কবি—পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়/২১৭
নারী : কবি সুভাষের কবিতায়—তরুণ মুখোপাধ্যায়/২২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা— পবিত্র মুখোপাধ্যায়/২৩১
ক্ষতপ্রবণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—সুমন গুণ/২৩৮
মানবিক চৈতন্যের কবি—দিলীপ চক্রবর্তী/২৪৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবিশ্ব:মার্ক্সবাদ বনাম মানববাদের দ্বান্দ্বিকতা
—মিষ্টু রায় সামন্ত/২৫২
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান—অমিত মণ্ডল/২৫৮
নাগরিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—রাতুল গোস্বামী/২৬৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লোকজ উপাদান—গুরুপ্রসাদ দাস/২৭৬
সুভাষের কবিতা : শৈলীর বিশেষত্বে—সমরেশ ভৌমিক/২৮৩
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শৈলী— পীযূষ কান্তি অধিকারী/২৯৬
পদাতিক কবি সুভাষ : মননে-চিন্তনে— মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা/৩১২
চিরপদাতিক কবি সুভাষ—রিজওয়ানা নাসিরা/৩১৯

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য এবং.....

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আবিষ্কারের কাজ শুরু হোক—মলয় দাশগুপ্ত/৩২৫
'চে গেভারার ডায়রি'র সন্ধানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়—সুব্রত দাস/৩৩০
'রিপোর্টাজের আধারে গল্পশিল্প : সুভাষ মুখোপাধ্যায়—মৌসুমী সাহা/৩৩৬
এক কমরেড অনেক জীবনের কথা : উপন্যাসের ধারায়—জয়গোপাল মণ্ডল/৩৪৬
অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ : একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া—সোমা ভদ্ররায়/৩৫৭
"কাজে কথায় সমান হ' ভাই"—রূপশ্রী কাহালী/৩৬৪
'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই'—সুচেতনা পাঠক/৩৬৭
পদাতিকের যাত্রাপথ : ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন—ড. সুদীপ্ত ঘোষ/৩৭১

জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি—জয়গোপাল মণ্ডল/৩৮৩
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি/৩৮৯

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র দাবা খেলায় মগ্ন

কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী এবং কথাসাহিত্যিক আপসার আহমেদ-এর প্রয়াণে সাহিত্য অঙ্গন পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)

কথাসাহিত্যিক আপসার আহমেদ (১৯৫৯-২০১৮)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত লেখা—

১ আমি ছেড়ে যাইনি, একপাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি

এ বয়সের যা। এ লেখায় কিছু গালগল্প, কিছু এটা-ওটা-সেটা, কিছু দীর্ঘশ্বাস, কিছু স্বপ্ন—এই সবই থাকবে। জ্ঞান দেওয়ার ব্যাপার আমার আসে না—রাজনীতির তত্ত্বজ্ঞান তো নয়ই। কে কী মনে করবে এই ভেবে চুপ করে থাকার এটা সময় নয়। মনের কথা খুলে বলাই ভাল। ভুল বললে, ধরিয়ে দেওয়ার বেআদবি হলে শায়েস্তা করার লোকের অভাব হবে না। কিছু লোক হাত গুটিয়ে থাকে পাছে তার হাতে আর কেউ তামাক খেয়ে যায়। আমি হাত গোটাই না। দরকার হলে হাতা গোটাই।

যার চোখ আছে সেই দেখছে। দেশের গতিক ভালো নয়। সাধারণ মানুষের মুশকিলের তেমন আশান হচ্ছে না। মুখ বুজে মার খেতে খেতে কেউ কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশ জুড়ে একটা অস্থির উচাটন অবস্থা। গরিবের ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বড়লোকেরা চাইছে ঝাড়া-হাত-পা হতে। সাম্রাজ্যবাদ সদর দরজায় না এসে, খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়ার ফন্দি আঁটছে।

দেখে শুনে হুঁশিয়ার হাওয়া দরকার। কিন্তু আতঙ্কে যাদের নাড়ি ছাড়ার দশা, তারা হয় ভীতু নয় ভণ্ড। স্বাধীনতা হয়ে অব্দি নাকি কিছুই হয়নি। এমন কি স্বাধীনতাও হয়নি। দেশটাকে গোল্লায় দিয়েছেন নেহরু। বড় বড় সরকারি শিল্পে-প্রকল্পে যেটা হয়েছে সেটা আসলে ভস্মে ঘি ঢালা। গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা মানে গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়োনো। একদিন আমিও এসব ভেবেছি, বলেছি।

ভুলটা ছিল পার্টিগত। শুধু এটুকু বললে সেটা হবে মনকে চোখ ঠারা। তাতে আমার পূর্ণ সায় ছিল তা বটেই, তেমনি দলের একজন হিসেব সেই ভুলের দায় থেকেও আমি রেহাই পেতে পারি না।

পার্টির দুদণ্ডপাতের জন্যে যাঁদের হাত নিসপিস করছে তাঁরা একটু ধৈর্য ধরলে ভালো হয়। কেননা একটা পুরনো কথা মনে পড়ে যাওয়ায় এই সূত্রে না বলে পারছি না। আজকের ভিয়েতনাম-বিদ্বেষী চীনপন্থীরা যখন তারস্বরে আমার নাম-তোমার নাম করছিল, এটা সেই সময়ের কথা :

হাইফং ছাড়িয়ে হালং উপসাগরের ধারে খনি শ্রমিকদের এক স্বাস্থ্যনিবাসে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রবীণ সদস্যের সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। কথার কথায় তিনি বললেন : ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে আমরা ঋণী।—পৃথিবীর সবচেয়ে ধড়িবাজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের স্বাধীনতার লড়াই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা দিয়েছে।

তারপর একটু থেমে যা বললেন, আমার কাছে তা আরও চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছিল। বললেন : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। তাকে লড়তে হয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার সবচেয়ে জাঁহাবাজ বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে।

Vol. IV Issue-VIII / ISSN : 2394-4889

কথা দুটো আমাকে অসম্ভব ভাবিয়েছিল। আমাদের জাতীয় নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে আর পার্টির নেতৃত্বকে মনে মনে বহুবার দুয়ো দিয়েছি।

যেমন বৃটিশের সঙ্গে, তেমনি ভারতের বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে দেয়ালে বারবার আমাদের মাথা ঠুকে গেছে। জাতীয় ধূলধারা থেকে সরে থাকার দরুণ আমরা নিজেরাই গিয়েছি শুকিয়ে।

জাতীয় বুর্জোয়াকে এখুনি শত্রুর কোঠায় ফেলব নাকি যতদূরে সম্ভব তাকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের দোসর দেশী একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার মোর্চা গড়ব।

পার্টি যখন প্রথম ভেঙেছিল, তখনও ছিল জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা নিয়ে মতপার্থক্য। জাতীয় গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রে পৌঁছুবার একটা ধাপ। একজোটে থেকে নেতৃত্ব বুর্জোয়ার হাতে থাকলে সেটা হবে জাতীয় গণতন্ত্রের মোর্চা আর নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর হাতে গেলে হবে জনগণতন্ত্রের মোর্চা। ধাপ একটা কি দুটো হবে, নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে সেটা নির্ভর করবে সংগ্রামের গতিপ্রকৃতির ওপর। জনগণতন্ত্রের গোঁ ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনাপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে যাঁরা পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল গড়লেন—পুরনো সহকর্মী আর পুরনো নেতাদের নামে তাদের কিছুই বলতে বাধল না। সোভিয়েত সম্পর্কেও তাঁরা কী না বলবেন।

পার্টিতে যাঁরা দীর্ঘদিন থেকেছেন তাঁরা জানেন, পার্টি ঠিক একটা পরিবারের মত। কমরেডে, কমরেডে যে ভাব, ভালবাসা হয়, যে সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, বাইরে তার তুলনা নেই। তার কারণ এ আত্মীয়তা লড়াইয়ের ময়দানে সহযোদ্ধার সঙ্গে সহযোদ্ধার। দুদলের ভাগ হলেই ঘৃণা কেন ভালবাসার জায়গা নেয়? নিন্দাকে সমালোচনার রকমফের বলে চালানো যায়। কিন্তু ডাহা মিথ্যে আর বানানো সব কেচ্ছা।

যে পরমত অসহিষ্ণুতায়-এর জন্ম তাকে কী আমিও একদিন আস্কারা দিইনি? মতে না মিললেই যখন তখন যাকে তাকে পঞ্চমবাহিনী, দালাল, গুপ্তচর, চোর, চরিত্রহীন বলা হয়েছে। বিনা প্রমাণে, শুধু সন্দেহবশে, নিছক অক্রোশ থেকে। তখন দেখেও দেখিনি, শুনেও শুনিনি। নিজের গায়ে লাগতে ব্যথা মালুম হয়েছে। আর যখন ঘুঁটে পুড়েছে, তখন গোবর হেসেছে।

আজ আবার দুদল মিলে যাবার কথা হচ্ছে। যাঁরা ছিলেন ভাঙবার পাণ্ডা, তারাই আজ চটপট জোড়াতালি দিয়ে একটা গোঁজামিলের তাল করছেন। ওঁদের এই ভাব-ভাব, আদিড়-আদি খেলায় মাঝের থেকে যে প্রাণগুলো চলে গেল, বাজে খরচা দেখিয়ে ওঁরা যেন তার হিসেবটা মিলিয়ে দেন।

মার্কসববাদ-লেনিনবাদ ভিত্তি হলে আলবৎ মিলবে। কিন্তু খিড়কি দিয়ে তাতে, মাওবাদ ঢুকে পড়তে চাইলে? সাত খুন মাপ হয়ে যাবে সিপিএম ক্ষমতায় এসেছে বলে? দুটা এমএলএ দুচারটে এমপি পাওয়ার জন্যে পার্টির উঁচু মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে? যারা আজ একরকম কাল একরকম যারা সব সময় একমুখে দুকথা বলে, সেই হরবোলা আর বহুরূপীর বলে তারা নিজেরা ভিড়ে গেলে কারো কিছু বলার থাকত না।

যারা কমিউনিস্ট তাদের কখনও সুযোগ-সুবিধার রাস্তায় মেলানো যায় না। ক্ষমতায় কিংবা ক্ষমতার গা-ঘেঁসে থাকলে কমবেশি বেনোজল ঢোকেই। কিন্তু সিপিএমের ওপর-নিচে এমন আকছার লোক মিলবে যারা কোনো ধান্দায় নেই। মত জিগ্যেস করুণ, বেজায় কট্টর। কমিউনিস্টরা ভাগ হয়ে যে পার্টিতেই থাক, সেখানে এই এক ছবি। কমিউনিস্টদের হাতে এখন এক চুম্বক আছে যা সৎ কর্মঠ আত্মত্যাগীদের টেনে আনে। নিচের মানুষ তাদেরই মুখ চেয়ে থাকে। দরকার এদের সবাইকে এক করার বীজমন্ত্র। শুধু মুখগুলো এক করলেই হবে না। পৌঁছুতে হবে হৃদয়ে।

এর জন্যে যদি কেঁচেগণ্ডুষ করতে হয়, আমি তাতেও রাজি।

'পদাতিক' বেরিয়ে যাওয়ার পর লেবার পার্টি ছেড়ে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসি। ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ দিয়ে আমার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি যেটুকু দিয়েছি, আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশি। পার্টির কর্মসূচী, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি—আমার পাওয়ার উৎস এসবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেওয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, ক্ষেতখামারে, কলকারখানায় কাজ করা হাতে ছন্দে, খুন্তীতে আর কুঁড়েঘরে মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে বোল ফুটিয়েছে। এক জীবনে আমার কাছে এই ঢের। ভারতবর্ষের ভূগোল আর ইতিহাসে যা বরাবরই একটু একটেরে আমি সেই বাংলার মানুষ। একটেরে কথাটা ভদ্র ভাষায় 'উৎকেন্দ্রিক'। অনুশীলন-যুগান্তর ঠেলে জাতীয় কংগ্রেসের ঢল এখানে খুব নিজের দিকে তেমন বইতে পারেনি। গান্ধী-নেহরুকে ঠেকিয়েছি চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে, হিন্দীকে রুখেছি ইংরেজি দিয়ে; সব হ্যাঁকে আমরা নস্যাৎ করতে চেয়েছি শুধু 'না' দিয়ে।

এই আমরাটা কে? এককথায়, যারা ওপর আর নিচের মাঝখানে। কিছু ফলানোর কিছু তৈরির যাদের কোনো দায় নেই। যাদের ছেলেরা আদর্শের জন্য হাসিমুখে জীবন দেয়। আবার ভাবের ঘোরে চলতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করতেও বাধে না। মাঝখানে ঝুলে থাকা যায় না। ফলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে এক অংশ ওপরে উঠে যায়, বাকি সবাই অগত্যা মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে।

আমি এসেছি সমাজের এই মাঝের একটা স্তর থেকে। বাবা ছিলেন আবগারির দারোগা। জীবনে এক পয়সা ঘুষ না নিয়ে বন্ধুর কাছে পাঁচশো টাকা ধার আর যৎসামান্য পেনশনের শুধু শেষ কিস্তিটা ব্যাঙ্কে রেখে বাবা মারা যান। চাকরি জীবনে ভয় পেলেও গোড়ার দিকে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাবা স্নেহ করতেন। সাম্যবাদ, বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণী—বাবা অতশত বুঝতেন না। গরিবের কথা ওরা ভাবে, ব্যস ঐ পর্যন্ত।

আমি একটু আধটু বুঝতাম। গরিব বলে নয়, গতরে খেটে দল বেঁধে কাজ করে বলে সমাজকে ঢেলে সাজার কলকাঠি ওদের হাতে। শৃঙ্খলা ছাড়া ওদের হারাবার কিছু নেই। সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলাম, সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতা। দেশকে বন্ধনমুক্ত না করে

শ্রমিকের হাতের শিকল ভাঙা যায় না।

আমরা এসেছি যখন সমাজতন্ত্র আর নিছক মানসপ্রতিমা নয়। পৃথিবীর ছভাগের একভাগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে মানুষের এক নতুন সভ্যতা। কমিউনিস্টদের হাতে ক্ষমতা ছিল বলেই জারপদানত জাতিগুলো সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা থেকে একেবারে পরের ধাপে অক্লেশে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুতে পেরেছিল। পরের দেশেও সমাজতন্ত্রের আর জাতীয় মুক্তির সবচেয়ে বড় বন্ধু সোভিয়েত দেশ।

এসব না-মানাটা এখন কোনো কোনো মহলে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে আমি যে তর্কে ফাঁসব না। শুধু বলব, শোনা কথা আর চোখের দেখার তফাত আছে। বলব, দেখতে চাওয়া, না চাওয়া আর দেখতে পাওয়া না-পাওয়ার একটা মনোগত রোগ আছে। কে বলেছে সমাজতন্ত্রের দেশের মানুষ নিখুঁত? তাই বলে সোভিয়েত বিদ্বেষ নিয়ে কমিউনিস্ট তো দূরস্থান, বামপন্থীই বা কেন, প্রকৃত দেশপ্রেমিকও হওয়া যায় না।

আজ শুধু জিজ্ঞাসা : সারা দেশের কাছে কে আজ প্রধান শত্রু? সাম্রাজ্যবাদ আর তার দেশি চেলাচামুণ্ডারা, না ইন্দিরা কংগ্রেস? কে আমাদের সুখ আর শান্তির সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। সীমান্তে ঘোট-পাকানো চীন, না মৈত্রীর বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সোভিয়েত দেশ?

শ্রমিকশ্রেণী কি শুধু নিজেদের পাওনাগণ্ডা নিয়েই মাথা ঘামাবে? নাকি সে সবার অগে দাঁড়িয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে লড়বে? আমি ছেড়ে যাইনি। একপাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি আর মনে মনে বলি :

রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটার
নিষ্ঠুর সময়
সারা পৃথিবীকে টানছে
রসাতলে
এখনও আকাশচুম্বী ভয়।
অথচ সামনেই হাত আরেকটু
বাড়ালে—
রয়েছে বন্ধুর হাত,
সুখশান্তি
বাঞ্ছিত জগৎ—
যদি একবার বোঝো তুমি
থুথু দিয়ে জোড়া যায় না,
জুড়তে হয় ভগ্নমনোরথ—
এ আগুনে
এই রাংঝালে।

২ ছোট মুখে কবিতার বড় কথা

যে ইংরেজি কথাটার আমরা বাংলা করেছি 'আধুনিক' তার ব্যুৎপত্তিগত মানে হল 'মোড় ফেরা' বা 'বাঁক নেওয়া'। অথচ বাংলা সাহিত্যে আমরা আধুনিক বলতে 'হাল আমল' বুঝে থাকি। শুধু তাই নয়, আরও সংকীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যকে ধরা হয়। অবশ্যই সেই ধারা, যা রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার ক'রেও নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

যে কোনো নতুন লেখকের পক্ষেই তাঁর আগের লেখকদের থেকে নিজেকে আলাদা করাটা একটা বড় কাজ। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা হাল আমলের লেখক, তাঁদের কাছে এ কাজ আরও কঠিন ছিল; কেননা সেখানে সম্মুখে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

সমস্যাটা একটু নজর ক'রে দেখা যাক।

এখানে মূল সম্পর্কটা লেখকে-লেখকে নয়—লেখকে-পাঠকে। আগে যা হয়ে গেছে, তার কেবল পুনরুক্তি হলে তাতে কখনই পাঠকের আগ্রহ হতে পারে না। যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যেভাবে পাওয়া যায়, সেই একই জিনিস লোকে আর কারো কাছ থেকে সেভাবে কেনই বা নিতে যাবে? পাঠককে দিতে হবে এমন নতুন কিছু, যা রবীন্দ্রনাথে নেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কম বয়সে 'সম্মুখেতে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর' লিখে মৌচাকে যে ঢিল ছুঁড়েছিলেন, তার পেছনে ছিল উত্তরসাধকের এগিয়ে যাওয়ার এই বিড়ম্বিত প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা সাহিত্য শেষ হয়ে যাবে—এভাবে রবীন্দ্রনাথকে যৎপরোনাস্তি ভাবা রবীন্দ্রভক্তির পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে হলেও সেটা প্রকৃতিস্থতার লক্ষণ নয়। আবার এই একই অপ্রকৃতিস্থতার উল্টোপিঠ হল রবীন্দ্রোত্তরকেই বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ ব'লে ভাবা।

আসলে থামা নয়, চলার দৃষ্টিতে দেখা। ধরা আর ছাড়া, হাঁ আর না—এই দুইকে গতির প্রবাহে এক ক'রে দেখা।

রবীন্দ্রনাথে কী নেই তা সাব্যস্ত হবে পরবর্তীকালে কী-আছে তাই দিয়ে। দেখতে হবে আগে কী-ছিল আর এখন কী নেই।

তার মানে, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াতে হলে শুধু অন্ধ জেদের বশে তা হবে না। নতুনত্ব বলতে বাইরের চটক নয়, ভেতরের বস্তু।

এ থেকে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, ভেতরের বস্তু বলতে আমি কেবল বক্তব্যকেই একমাত্র ক'রে দেখছি। শিল্পে বিষয় আর তার আকার কখনই আলাদাভাবে বিচার্য হতে পারে না। জ্ঞানের রাজ্যে বলবার বিষয়কে নানা আকার ধ'রে দেওয়া যায়; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এ দুইয়ের নিত্য সম্পর্ক। কাজেই পুরনো বোতলে নতুন মদ বা নতুন বোতলে পুরানো মদ—এই উপমা সার্থক শিল্পের ক্ষেত্রে অচল।

শিল্পসৃষ্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার। জ্ঞানের রাজ্যে একের বক্তব্য তার পরবর্তীর বক্তব্যে অন্তর্নিহত হতে পারে। কিন্তু শিল্পে পরেকার সৃষ্টিতে আগেকার সৃষ্টি কখনও নাকচ হয়ে যায় না।

পুরনো পাথরের যুগে কাজের যে ধরন আর আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যুগের কাজের যে ধরন—তার মধ্যে মূলগত কোনো প্রভেদে নেই। কাটা, ঘষা, ছ্যাঁদা করা, পেষাই পেটাই—এই চিরন্তন মূলনীতিগুলোই যন্ত্রের মাধ্যমে আজ মিশ্রিত আর বহুগুণিত হয়ে টিকে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এর বাইর কাজের কোনো নতুন ধরন হতে পারে না।

কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতিতে যে ছাপ ফেলে, তাই দিয়ে কবিতা তৈরি হয়। কবিতার সৃষ্ট বস্তুতে থাকে বহির্জগতের বস্তুপুঞ্জের আদল—তা সে যতই লুকো-ছাপা থাক। একেবারে অবিকল নয়। অভিপ্রায়ের ঝোঁক দিয়ে কমানো বাড়ানো থাকে।

নির্বিশেষকে বিশেষ ক'রে মানুষের চোখেকানে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। উপমা হল কবিতার প্রকরণ। দুটি আপাত পৃথককে একত্রে এনে অন্তর্বস্তুকে মিলিয়ে দেওয়া।

কোনো কবি, তিনি যেকালেরই হোন, এ থেকে তাঁর অব্যাহতি নেই।

ছন্দের বেলায়ও তাই তার যা মূলনীতি, তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ভাষারও যা মূলনীতি, তাকে লঙ্ঘন করা যাবে না।

নিয়মগুলো মানুষের বানানো নয়। প্রকৃতির নিয়ম। তার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষ শুধু পারে এক নিয়মকে অন্য নিয়ম দিয়ে কাটিয়ে প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে। এর অন্য নাম মানুষের মুক্তি।

তাহলে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আনার কোথায় ক্ষেত্র? স্থানকালের বাইরে তেমন কোনো ক্ষেত্র থাকতেই পারে না। নতুনত্বের উৎস যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে তা মনের ভেতরে নয়—বাইরে। সমসাময়িক বাস্তবকে প্রতিফলিত করার সার্থক চেষ্টাতেই এই নতুনত্ব আসতে পারে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় সে-নতুনত্ব এসেছে। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের দক্ষ সমালোচক, তাঁরাই পারেন এই নতুনত্বকে পাঠকের চোখে ধরিয়ে দিতে। আমার সে যোগ্যতাও নেই এবং আমি সে চেষ্টাও করব না।

শুধু ছাড়া-ছাড়া ভাবে আমার উপলব্ধির কথা খুব সংক্ষেপে বলব।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই এই নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। এর বীজ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ধারার মধ্যেই ছিল। যাঁরা একে লালন করেছেন তাঁরা ঘরে বাইরের নানা সূত্র থেকে তাতে সার যোগ করেছেন আর আগাছা সরিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের যে মানসজগৎ, তাতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবী বেশ বড় রকমের আঘাত হেনেছিল। একদিকে যেমন তাঁর আশাভঙ্গের অনেক কারণ ঘটেছিল, তেমনি আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম তীর্থক্ষেত্রে আশা করবারও তিনি অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই পর্বে তাঁর অনেক লেখায় এবং আঁকা ছবিতে তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে।

পুরনো সভ্যতার যেটা ভেঙে পড়ার দিক, রবীন্দ্রোত্তর কবিরা তাকে আরও জোরালো ক'রে তুলে ধরলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যে দুঃখবোধ, তাতে সমসাময়িকের চেতনার

চেয়েও একটা দার্শনিক মনোভাব ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রবল। তাঁর কবিতা সে যুগের বাস্তবতার চিত্র যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি চিরন্তনের ভাবচিত্র। অবশ্য তাঁর কবিতায় এমন সব কথা এল যা ফিটফাট ধোপদুরস্ত তো নয়ই, বরং মাঠময়দানের কাদামাখা। ফলে, তার সঙ্গে যুগমনের একটা মিল ছিল।

সুধীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা ছিল দার্শনিক। কিন্তু সংকটাপন্ন সময়ের চেতনা তাতে স্পষ্ট। আধুনিক জীবনচিত্রে অঙ্গীভূত ছিল তাঁর দার্শনিকতা। ভাষাকে তিনি কঠিন নৈয়ায়িক শাসনে বেঁধে এবং সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের কৌশল প্রয়োগ ক'রে শব্দের প্রকাশ-ক্ষমতা বাড়ালেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যের ভোজে প্রকারান্তরে পঙ্‌ক্তিভেদ এনে দিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ভৌগোলিক সীমানাকে বড় ক'রে মানবিক আবেগকে আরও বেশি পার্থিব করা হল।

বুদ্ধদেব বসু মানবদেহের বন্দনা গাইলেন। কবিতার সৃজনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে এবং কবিতা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে আধুনিক কবিতার ইতিহাসে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জীবনানন্দ কবিতাকে নিয়ে গেলেন বুদ্ধি থেকে বোধের দিকে, যুক্তির শৃঙ্খলা থেকে বস্তুবিশ্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের মধ্যে। হৃদয় সঞ্চারিত হল প্রাণহীন জগতে। কবিতা পেল স্বতোৎসারিত নির্ঝরের গতি প্রকৃতি। হৃদয়বান কবিতার যুগ অতিক্রান্ত ব'লে যারা ভয় পেয়েছিল, নতুন ক'রে তারা ভরসা পেল জীবনানন্দের অনুভূতিনির্ভর কবিতায়। শব্দের সামনে সমস্ত অর্গল মুক্ত হল।

বিষ্ণু দে বাংলা কবিতার এই বিরাট পর্ব জুড়ে সমানে পথ খুঁজেছেন কখনও স্মৃতির মধ্যে, কখনও সামনে লড়াইয়ের ময়দানে। বুদ্ধির আলো ফেলে ফেলে এগোলেও তাঁর পদক্ষেপ কখনও সংশয়িত নয়। তাঁর কবিতায় জীবনের অনালোকিত কোনো দিক নেই। তাঁর চেনায় যেমন পুরনো পৃথিবীর ভেঙে পড়া তেমনি নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় সমান আগ্রহে ধরা পড়েছে।

সমর সেন সৃষ্টিশীলতায় স্বল্পায়ু হলেও এক নতুন দিকে বাংলা কবিতার মুখ ফিরিয়েছেন। স্বচ্ছন্দে কথা বলার মত ক'রে সহজ সাবলীলতায় বাংলা কবিতাকে তিনি যে চলার পথের সন্ধান দিয়েছেন, পরে নতুন নতুন অভিযানের ভেতর দিয়ে সেই পথ দিকে-দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে।

নতুন আশার পথ ধ'রেই শুরু হয়েছিল অরুণ মিত্রের যাত্রা—কথা বলার ভাষাকে কুচকাওয়াজের মত সাজিয়ে। কিন্তু শুধু চূড়ান্ত জয় নয়, সে পথে অনেক আশাভঙ্গ, খণ্ডযুদ্ধে অনেক পরাজয়ও আছে। বাস্তবের চোখে চোখ রেখে অরুণ মিত্র কখনও চিন্তিত, কখনও প্রসন্ন।

এমনি ক'রে বাংলা কবিতা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে পৌঁছেছে। কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে ব'লে যে নৈরাশ্যবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তারা ভ্রান্ত।

বাংলা কবিতার এই মিছিলে যারা আমাদেরও অনেক পরে এসেছে তারা এই পরম্পরার

কথা নিশ্চয় মনে রাখবে।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সৃষ্টির রাজ্যের কাউকে সেলাম ঠোকাটা রেওয়াজ নয়। ছোট -বড় সম্পর্কটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অচল। ঐতিহ্যের ব্যাপারটা আত্মস্থ করার জিনিস; প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান ক'রে তা হয় না। স্রষ্টার পক্ষে দরকার বিনয় নয়—আত্মবিশ্বাস। সঙ্কোচ নয়—স্পর্ধা।

মায়াক ভিস্কি সম্বন্ধে একটা লেখায় পড়েছিলাম : একবার এক সভায় তিনি কবিতা পড়বেন। মঞ্চের ওপর যেখান থেকে কবিতা পড়া হবে, তার পাশেই উঁচু ক'রে বসানো ছিল পুশকিনের একটি আবক্ষ মূর্তি। কবিতা পড়বার ঠিক আগে মায়াকভস্কি সেই মূর্তিটাকে ধ'রে মঞ্চের পাটাতলে নামিয়ে রাখলেন এবং বললেন, পুশকিন আমার প্রণম্য—কিন্তু আমি যখন কবিতা পড়ছি, তখন আমার চেয়ে আর কাউকেই আমি বড় ব'লে মানি না। তারপর কবিতা পড়া শেষ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুশকিনের সেই মূর্তি উঁচু জায়গায় রেখে দিলেন।

একজন কবি যখন লেখেন, তখন প্রেরিত পুরুষ ব'লেই তিনি নিজেকে মনে করেন। যা আগে কেউ লেখে নি, ঠিক এমন ক'রে কেউ লেখে নি—এই প্রথম তা লেখা হচ্ছে। এই প্রত্যয় না থাকলে সৃষ্টি হয় না—পুনরুক্তি হয়।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, কবিদের দুর্বিনীত হতে হবে। অথবা যাঁরা নমস্য, তাঁদের অশ্রদ্ধা করতে হবে। আসলে আমি বলতে চেয়েছি সৃষ্টির সেই অনুপ্রাণিত মুহূর্তের কথা—যখন ইতিপূর্বে মহৎ যা কিছু লেখা হয়েছে; তার সবটাই কবির অন্তর্গত উপাদানের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে; নতুন সৃষ্টির আয়োজনে কবি যখন যজ্ঞকর্তা।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার পর্বে যা নিয়ে বিতর্ক কম হয় নি এবং যার জের আজও চলেছে—এমন দু একটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রে আমি আমার এই ছোট মুখে বড় কথা শেষ করব।

এই পর্বের একেবারে গোড়ার দিকে কবিতাকে সাপ্টাভাবে বলা হত পদ্য এবং আলাদা ক'রে বলা হত গদ্য কবিতা। গদ্য কবিতাকে আরও যা বলা হত, সে আর আমি বলছি না। এখন একমাত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকে বড় 'পদ্য' বলতে শুনি না। গদ্য কবিতা এখন কবিতা বলেই মোটের ওপর গ্রাহ্য হয়ে গেছে।

এটা খুব সহজে হয় নি। প্রথম গীতাঞ্জলির ইংরিজি অনুবাদে এ ধারা রবীন্দ্রনাথই শুরু করেন। তারপর 'পুনশ্চ' লেখবার পরেও এর প্রচলন নিয়ে মনে মনে তাঁর রীতিমত সংশয় ছিল। তাঁর উৎসাহ সত্ত্বেও খুব কম কবিই সে সময়ে গদ্যে কবিতা লেখার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। গদ্য কাবিতাকে বাংলা সাহিত্যে একার চেষ্টার যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত ক'রে থাকেন, তাহলে তা করেছেন এর অনেক পরে সমর সেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে গদ্য, তা একেবরে পদ্যের ছোঁয়াচমুক্ত নয়। বাংলায় প্রথম সমর সেনই কবিতাকে কথা বলার ঢঙের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর লেখার একেবারে শেষ পর্যায়ে সমর সেন ক্রমশ গদ্য থেকে প্রায় পয়ারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বরং গদ্যের পথকে আজও কবিতার প্রায় একমাত্র অবলম্বন ক'রে সমর সেনের চেয়েও অটুটভাবে এবং যথোচিতভাবে লিখে চলেছেন অরুণ মিত্র।

গত প্রায় পঁচিশ বছরের কবিতা আস্তে আস্তে আবার পদ্যের ঝোঁকে ফিরে এসেছ। এটা শুধু জীবনানন্দের ক্রমবর্ধিত প্রভাবের ফলে, কিংবা বিষ্ণু দের অবিরাম ছন্দচর ফলেই ঘটেছে—আমি তা মনে করি না। এর পেছনে সমকালীন জীবনের মূলগত কোনো কারণ আছে। যন্ত্রবিদ্যায় আর বিজ্ঞানে সম্প্রতিকালে যে বিপ্লব চলেছে, তার স্পন্দমান আবেগ, অজ্ঞাতে কোনোভাবে একালের কবিদের সংক্রামিত করেছে কি? আমি জানি না।

এই প্রসঙ্গে আমার কম বয়সের একটি গল্প না ব'লে পারছি না। অমি তখন আই-এ ক্লাসের ছাত্র। সমর সেনের সঙ্গে আমার সবে আলাপ হয়েছে। কামাক্ষীপ্রসাদ দেবীপ্রসাদদের ফ্ল্যাটের ছাদে আমার 'পদাতিক' কবিতার প্রথম খসড়া পড়ে শোনানোর পর সমর সেন বলেছিলেন : 'একেবারে শেষের অংশটা তুমি গদ্যে লিখেছ কেন? সর্বশেষে সাম্যবাদে তো ছন্দের আবার নবজন্ম হবে!' তখনও আমি কডওয়েল পড়িনি।

কিন্তু শঙ্খ ঘোষ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, এমন কি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাকেও নিছক পদ্যে প্রত্যাবর্তন বলা যায় কি? শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তো গদ্যপদ্যের মধ্যেকার সীমরেখা প্রায় লুপ্ত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়েও কিছুদিন সাধু ক্রিয়া আর অব্যয়ে অস্থায়ী বাসা বাঁধার পর এখন পুরোপুরিভাবে চলতি কথা বলার ছাঁদে স্বচ্ছন্দে ফিরে এসেছেন।

মধ্যে এক সময়ে বাংলা কবিতায় রাজনীতির যা যুগচেতনার ছাপ খুব উচ্চকণ্ঠে অথবা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। এখন তা ব্যাপকও নয়, প্রবলও নয়। এখনকার কবিতা ততটা বিষয়প্রধান না, যতটা বিষয়ীপ্রধান। এটা সাধারণ চিত্র। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক'রে চোখে ঠেকে জাতীয় স্বাধীনতা স্বন্বন্ধে নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে কবিদের মমত্ববোধের অভাব। এমনও বলা যায় না যে, তার জায়গা নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ। এত নকশাল আন্দোলন গেল, বাংলা কবিতায় তার ছাপ প্রায় পড়েনি বললেই চলে। বাঙালীর মনে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়ে হারানার বোধ প্রবলতর। যে কবিরা এক সময় প্রগতির আন্দোলনে মুখর ছিলেন, তাঁরা এখন অনেকে হয় চুপচাপ, নয় আত্মসন্ধানে রত। এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার বিগত অর্ধশতাব্দীতে লক্ষিত দুটি ঘটনার প্রতি বিশেষজ্ঞ আর সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি দিতে বলি।

প্রথমত, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় দেশাত্মবোধের প্রকাশ রীতিমত কুণ্ঠিত কেন? গানকে আমি কবিতা থেকে বাদ দিচ্ছি। প্রকৃতি প্রেমের বা শৌর্যবীর্যের কবিতাও আমি ধরছি না। আমি বলছি এমন মন-কেমন করা কবিতার কথা, যার কেন্দ্রে আছে দেশকে ভালবাসা। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতির মধ্যেই কি এর কোনো কারণ নিহিত আছে? এক নজরুল ছাড়া, কোনো নামী কবিই না ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা, না হয়েছেন ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত। এমন কি নজরুলের সংগ্রামী ভূমিকা ও তেমন ধারাবাহিক বা দীর্ঘস্থায়ী নয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের আত্মিক সম্পর্কহীনতা। এ দুইয়ের সাযুজ্য মাঝে মধ্যে যখন ঘটেছে, তখনও তা বিশেষ ঘটনাসূত্রে এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে। কলম ছেড়ে রাজনীতি করা অথবা রাজনীতি ছেড়ে কলম ধরা—সাধারণভাবে এটাই কি এ পর্বের রেওয়াজ নয়?

একালের কবিতার দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গটা অন্তত ছুঁয়ে না গেলে অনেকেই হয়ত আমার ওপর নারাজ হবেন। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যাঁদের দুর্বোধ্যতার নালিশ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁদের কাছে দুর্বোধ্য নয়, তাঁদের বিবেচনার্থে আগে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা পেশ ক'রে রাখছি ঃ

প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও অস্পষ্ট। সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি—দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন।

এ নিয়ে আমি আপাত এর বেশি বাগ্‌বিস্তার করতে চাই না। শুধু এর সঙ্গে সামান্য একটু নিজের কথা যোগ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ স্থানের বিচারে বলেছেন "দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট।" আমি কালের বিচারে এটাকেই একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলতে চাই, "দূর স্পষ্ট, নিকট অস্পষ্ট।" রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের গোড়ার যুগের সঙ্গে আজকের যুগকে মেলালে বর্তমান এবং অনাগত পাঠকদের সম্পর্কে বুক ঠুকে এ কথা বলা যায়।

এ লেখায় আমি যাঁদের নাম করেছি, তাঁরা নমুনা মাত্র—তাঁরাই সব নন। এটা জানিয়ে রাখছি কারো ভয়ে নয়। সত্যের খাতিরে।

৩ বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি

যদি জ্যান্ত ভাষা হয়, তবে সেটা বদলায়। এই যে বাংলা ভাষা, আজ কত বদলে গিয়েছে। ছোটবেলায় দেখতাম, সেটা ৩০ সালের কথা বলছি, কংগ্রেসের আন্দোলন হচ্ছে, বাঙালি কংগ্রেস নেতারা সভায় বক্তৃতা দিতেন সাধুভাষায়। লেখা তো তখনও সাধুভাষাতেই হত। বঙ্কিমের সময় বা কালীপ্রসন্ন সিংহ—এঁদের লেখাতেও প্রায় চলতি বাংলাই ছিল। ক্রিয়াপদ বা কিছু কিছু অব্যয়, সর্বনাম—এগুলো থাকত সাধুভাষায়। তৎসম, তদ্ভব শব্দও থাকত। এখন আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় সাধুভাষাতেই লেখা। কিন্তু ঝোঁকটা চলতি রীতি। ভাষা তো নদীর মতো। সময় বদলেছে। ২০০-৩০০ বছরে আমাদের সমাজও অনেক বদলেছে। ভাষায় তো তার ছাপ পড়বেই।

লিখিত ভাষার ওপর প্রধানত যাঁরা উঁচু জাতের হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—এঁদের প্রভাব ছিল। এঁরা একদিকে খানিকটা জাতীয়তাবাদী ছিলেন। আসলে প্রতিষ্ঠিত সমাজে নিজের জায়গা কায়েম রাখবার কারণে সংস্কৃতঘেঁষা ছিলেন এঁরা। এরপর ক্রমশ সেই জায়গায় যাঁরা ইংরেজি জানা, তাঁদের প্রভাব বাড়ল। ততদিনে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার বেড়েই চলেছে ইংরেজির দৌলতে। ইংরেজদের কল্যাণে বাংলা ভাষায় তার প্রভাবও পড়ল।

আমাদের ভাষায় খুব বড়ো রকমের বদল এল প্রমথ চৌধুরির সময়। এল তাঁর বীরবলি চাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশেষত কল্লোল কালি কলমের সময় খানিকটা ইউরোপের আধুনিকতার ছাপ পড়ল। জাতীয় আন্দোলন চলছে। তাতেও এল নতুন জোয়ার। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্যান-ধারণার বদল হল। স্থিতাবস্থায় বদল হল। এই ভাবনাচিন্তার বদল এল ভাষাতেও।

সাহিত্যের নজর এতদিন ছিল ওপরতলাতেই সীমাবদ্ধ। এবার নীচের দিকে দৃষ্টি গেল। ফলে পুরনো মূল্যবোধ, রক্ষণশীলতা—এগুলো খুব ঘা খেল। শ্লীলতা, অশ্লীলতার প্রশ্ন মাথাচাড়া দিল। এটা শুধু যৌনপ্রসঙ্গ নয়, অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে জীবনযাপন তার একটা বিরোধ ফুটে উঠল। ক্রমশ চলিত ভাষা জিতে গেল। সাহিত্যে সেটাই মানদণ্ড হয়ে গেল। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবণতাটা অনেকটাই এগিয়ে দিলেন।

এবার জনগণের দিকে নজর পড়ল। কিন্তু সে জনগণ হল, প্রথম মধ্যবিত্ত, কিছুটা নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং অসংগঠিত শ্রমজীবীদের আধা কৃষক অবধি ঘিরে।

সাহিত্যে কিছুটা কয়লাখনির মজুর বা বস্তির মানুষ—এঁরা এলেও পুরোদস্তুর শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু তখনও আসেনি। তবে সাধারণ মানুষের এই অনুপ্রবেশ ছিল বেশির ভাগটাই শহরকেন্দ্রিক সাহিত্যে। তার কারণ এই সময়কার লেখকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

শরৎচন্দ্রের লেখাতেও গ্রামের একেবারে চাষীবাসী মানুষের জীবন খুব বড় আকারে ফুটে ওঠেনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পড়ন্ত জমিদার। গ্রামে চাষবাসের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। সেই সূত্রে গ্রামের মানুষ বাংলা উপন্যাসে এল। এর আগেও বাংলা সাহিত্যে গ্রাম এসেছে, তবে বেশিরভাগই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হিসেবে। তারাশঙ্করবাবুই প্রথম গ্রামের মাটিকে সর্বতোভাবে জায়গা দিলেন বাংলা সাহিত্যে।

নিছক প্রকৃতি নয়, গ্রাম যে উৎপাদনের একটা বড় ক্ষেত্র এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিটাই তাঁর লেখায় জোর পেল।

একটা ঘটনার কথা হঠাৎ মনে এল। পি সি জোশি তখন পার্টির নেতা, সঙ্গে বিশ্বনাথ মুখার্জিও ছিলেন। উনি তখন ছাত্রফ্রন্ট থেকে কৃষক ফ্রন্টে এসেছেন। সে সময় আমি গড়বেতা যাচ্ছি একদিন। সেই ট্রেনে ওঁরা ছিলেন আমি ওঁদের সঙ্গে খড়গপুর পর্যন্ত যাব। একসময় পি সি যোশি গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বিশ্বনাথ ওটা কী জাতের জমি? কী ফসল হয়? বিশ্বনাথদা তো থতমত খেয়ে গেছেন। উনি চাষবাসের সঙ্গেও জড়িত নয়। কিছুই বলতে পারলেন না। এদিকে কৃষক ফ্রন্ট করছেন। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন রাজেশ্বর রাও। রাজেশ্বর রাও আসলে ছিলেন গ্রামের যোতদার পরিবারের। জোতজমির সঙ্গে যোগ ছিল ওঁর। উনি পাশ থেকে বলে উঠলেন এটা নাবাল জমি। ফসল বেশ ভাল হয় এই জমিতে।

আমরা মধ্যবিত্তরা আসলে এভাবেই ট্রেনের জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখি। কোন মাটিতে কোন ফসল ফলে কিছুই জানি না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। সঙ্গে এল দুর্ভিক্ষ-মহামারি। আমরা যারা কলকাতা শহরে বাস করতাম, দেখলাম গ্রামের অন্নদাতা চাষী শহরের রাস্তায় ভিখারি হয়ে গেছে। না খেয়ে মরচে সব। ভিক্ষাপাত্র হাতে বসে আছে, 'ফ্যান দাও' বলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। যে গ্রামের মানুষকে কলকাতার রাস্তায় দেখলাম তাদের সঙ্গে ফসলের খেতের কোনও যোগ নেই। তারা রাস্তায় ধুলো ময়লায় লঙ্গরখানার ভিখিরি। যারা ফসল ফলায় আমাদের অন্ন জোগায়—এরা তারা নয়। তারা যেন উচ্ছিষ্ট প্রার্থী। তারপর দেখলাম হঠাৎ একদিন শহরের বুক থেকে উধাও হয়ে গেল তারা। তারপর যখন আমরা গ্রামে গেলাম—দেখলাম শহরের রাস্তার সেইসব কাঙালিরা খেত ভর্তি ফসল ফলিয়েছে। আসলে তারা যখন নিরন্ন হয়ে গ্রাম ছেড়েছিল, তখন মাঠে ধান বুনে এসেছিল। আর যখন ফিরে গেল, মাঠে তখন ফসল।

তারপর স্বাধীনতা হল। এই স্বাধীনতা আমাদের জীবনে একটা বড়ো পরিবর্তন আনল। প্রথমে ইংরেজ চলে গেল। তারপরে প্রজাতন্ত্র হল। গ্রামের লোক এই প্রথম একটা বড়ো অধিকার পেল—ভোট দেবার অধিকার। ততদিনে গ্রামের চেহারাও বদল হয়েছে।

৪ সুখ যায়, স্মৃতি থাকে

ঢেঁকিতে পা দেওয়ার আগে একটু শিবের গীত না গেয়ে উপায় নেই।

সে সব ছিল কষ্টকে-গায়ে-না মাখা সুখের দিন। ছাড়া-ছাড়া সব স্মৃতি। মনের মধ্যে হুস করে ভেসে উঠে ভুল করে ডুবে যায়। সন তারিখ কার্যকারণ—কোনওটাই খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। পুরনো কথা ভাবতে গেলে প্রায়ই উদোর পিণ্ডি গিয়ে পড়ে বুদোর ঘাড়ে। উরুভঙ্গে আমার একটা শালগ্রামের দশা। উঠে হেঁটে একটু যাচাই করে নেব, তারও জো নেই। এ লেখায় নড়বড়ে স্মৃতি কাঁধে ভর দিয়েই আমাকে চলতে হবে।

আমাদের ছেলেবেলায় রাজনীতি বলতে বোঝাত 'স্বদেশি করা'। প্যাঁচ পয়জারের ব্যাপারটা তোলা থাকত ওপরতলায়। রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নয়, সারা জীবনের ব্রত বলে ভাবা হত। বাংলায় যাদের দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কলকারখানায় আর খেতখামারে শেকড় গেড়েছিল, সেই সর্বক্ষণের আটপৌরে কর্মীরা সবাই ছিল ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। অমুকের ছেলে বা তমুকের নাতি বলে কেউ তাদের চিনত না। সাংসারিক জীবনে থাকলে তারা কেউ হত দশটা-পাঁচটা চাকুরে, ইস্কুলের মাস্টার, বটতলার উকিল কিংবা পি. ডব্লিউ. ডি-র ওভারসিয়ার। বাড়ির কেউ যদি স্বদেশি করে, কিংবা শিল্পীর জীবন বেছে নেয়—তাহলে সেখানে যৌথ পরিবারের বাকি সবাই তার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিত। যাতে তারা একেবারে ঘরছাড়া বিবাগী না হয়ে যায়। স্বধর্মে এদের পক্ষে স্বনির্ভর হওয়া

সে সময় সম্ভব হত না। তবু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে তখন লোকের খুব একটা অভাব হত না।

লেবার পার্টি ছেড়ে আমরা কয়েকজন যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে আসি, পার্টির সদস্য সংখ্যা তখন খুবই কম। আনকোরাদের ভাল করে যাচাই-বাছাই করে তবে সদস্যপদ দেওয়া হত। আরও বেশি কড়া নজরে দেখা হত অন্যদল থেকে কেউ এলে। জেলে কমিউনিস্ট হওয়া বিপ্লবীরা ছাড়া পেয়ে এবং কমিউনিস্ট ছাত্রনেতারা লেখাপড়া শেষ করে কলকারখানায় খেতখামারে ছড়িয়ে পড়ে খেটে-খাওয়া মানুষদের নিয়ে পার্টির ভিত গড়ার কাজ শুরু করে দিলেন। জনযুদ্ধের নীতি নিয়ে পার্টি তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খোলাখুলি কাজ করছে। পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' সবে বেরোতে শুরু করেছে। ছাত্র আন্দোলন ছেড়ে যখন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দায় আমার কাঁধে চাপানো হয়, তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে আমি হয়ে গেছি গণসংগঠনের সারাক্ষণের স্বেচ্ছাসেবক। ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির একই আপিসঘরে আমরা ঠাঁই পেয়েছি। ঘরের আসল মালিকেরা তখন সারা বাংলায় আজ এখানে, কাল সেখানে সভা করে বেড়ান। ফলে, তাঁদের ফাঁকা ঘরে আমারই শেষ পর্যন্ত আসর জাঁকিয়ে বলসাম।

এবার যদি শিবের গীত বন্ধ না করি, তাহলে গোটা ঢেঁসকেলটাই শেষ পর্যন্ত গানের আখড়া হয়ে পড়ার ভয় আছে।

জ্যোতি বসু তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সম্পাদক।

আমাদের সমাজে তখনও বিলেত ফেরতদের ছিল আলাদা কদর। বাকি সবার চেয়ে তাঁদের এককাঠি ওপরে স্থান দেওয়া হত। ভেতো বাঙালির ছেলে হয়েও কেউ কেউ আপাদমস্তক বিদেশ ঘুরে এসে পাকা সাহেব বনে যেতেন। বাংলা বলতেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

তিরিশের দশকের মধ্যপর্বে কমিউনিস্ট হয়ে যাঁরা দেশে ফিরেছিলেন, প্রবাসে থাকতেই তাঁরা ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই পথিকৃৎদের একজন হলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে টেনেছিলেন। পার্টিতে নাম লেখালেও অধ্যাপনাকেই তিনি তাঁর পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, অরুণ বসু, মোহিত ব্যানার্জি দেশে ফিরেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সন্ধিক্ষণে। মোহন কুমারমঙ্গলম, পার্বতী আর এন. কে কৃষ্ণও দেশে ফেরেন একই সময়ে। এঁরা সবাই ফিরে এসে পার্টির কাজে পুরোপুরিভাবে নিজেদের ঢেলে দেন। নিখিল চক্রবর্তীর ওপর তখন প্রাদেশিক দপ্তরের ভার বর্তালেও নিখিলদা-রেণুদি আংশিক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। এই সময় নিখিলদার সম্পাদনায় পার্টি আপিসে একটা প্রাচীরপত্র বার হত। একটি সংখ্যায় আঁকা একটা কার্টুন ছবির কথা এখনও আমার মনে আছে। ছবিটা ছিল কোমরে আঁচল জড়ানো এক বিদূষী তরুণী ঝাড়ুদারনির। বিলেত থেকে ফিরে পার্বতী কুমারমঙ্গলম আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময় পার্টির ঘর ঝাঁট দিতেন, তার খবর। খ্যাতি বা বংশগৌরব নিয়ে যারা তখন পার্টিতে আসত, তাদের হামবড়া ভাব যাতে না থাকে, তার

জন্য কীভাবে তাদের ঝেড়ে কাপড় পরানো হত—জমিদারপুত্র স্নেহাংশু আচার্যের কাছ তার অনেক গল্প শুনেছি।

৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে আমরা ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখকশিল্পীরা যখন উড়ে এসে জুড়ে বসি, তখন জ্যোতিবাবুরা কেবলি ঠাঁইনাড়া হয়ে সভা করে বেড়ান। পরে যখন প্রাদেশিক দপ্তরে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় যোগ দিলাম, একমাত্র তখনই আমার জ্যোতিবাবুদের কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়। কেন না পার্টি অফিসে একবার না একবার ওঁরা আসতেনই। জাতীয় নেতারা তখন জেলে।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্রসংকট— কমিউনিস্ট পার্টিকে এক হাতে সব কিছু সামলাতে হচ্ছে। গ্রামে শহরে দ্রুত ছড়াচ্ছে গণসংগঠন। আমাদের জনযুদ্ধের রাজনীতিতে লোকে সায় না দিলেও নিঃস্বার্থ জনসেবা আর সততা দিয়ে কমিউনিস্টরা সেদিন মানুষের মন কেড়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তখন পার্টিতে সে কাঁধে কাঁধ মেলাচ্ছিল। কলকাতার বনেদি কায়স্থকুল, সুবর্ণবণিক, ব্রাহ্ম, বাঙালি, খ্রিষ্টান, ইহুদি, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—কেউ বাদ ছিল না। 'কমরেড' কথাটা তখন আপনপর, উচ্চনীচ, ইতরভদ্রের তফাত ঘুচিয়ে নবযুগের হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে। পার্টির এই আবহাওয়ার মধ্যে আমরা সবাই সমানে মিশতে পারতাম। নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে আমাদের মতন সাধারণ কর্মীদের কোনও অসুবিধে হত না।

বিলেত ফেরতদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে সর্বঘটে ছিল তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি। ফলে, শ্রমিক-কৃষকের বাইরের জগৎটাও পার্টির নাগালের মধ্যে আসে। ইংরেজ লেখক ই. এম. ফস্টার, কবি-গায়ক হারীন চট্টোপাধ্যায়, মহা পণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতন দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীরা তাঁর বাড়িতে প্রায়ই অতিথি হয়ে থাকায়, আমরা তাঁদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি।

বন্ধ দরজা-জানালাগুলো একে একে খুলে যাওয়ায় কুনোভাব কেটে গিয়ে সমাজের সর্বস্তরে পার্টির প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খোলা হাওয়ায় পার্টির অচলায়তন আস্তে আস্তে ভাঙছিল। নেতাদের কথাই ছিল আগে বেদবাক্য। জ্যোতিবাবুরা সেই প্রথা ভেঙে দিয়ে প্রাদেশিক কমিটির সভায় যুক্তিতর্ক আর বাদ-প্রতিবাদের রেওয়াজ আনলেন। এটা স্বচক্ষে দেখেছি।

সে সময়ে আমাদের অনেকের মধ্যেই ছিল জান-লড়িয়ে-দেওয়া একটা উস্‌কো-খুস্‌কো ভাব। জ্যোতিবাবু ছিলেন তার ব্যতিক্রম। ভেতরের দৃঢ়তাকে তিনি বাইরের নম্রতা দিয়ে ঢেকে রাখতেন আত্মগোপন করে পার্টির সেন্টারে থেকেছেন, কিন্তু নিজের বাড়ি ছেড়ে পার্টির কমিউনে গিয়ে কখনও থাকেননি। গৃহপালিত ভাব নিয়েই পার্টির কাজে সব সময় তাঁকে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য আর বাইরে কৃচ্ছ্রতাকে সমানভাবে তিনি জীবনে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

আমরা তখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি যে, হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের পর থেকেই বিশ্বযুদ্ধের চালচিত্র আমূল বদলে গেছে। ফ্যাসিস্টবিরোধী এই জনযুদ্ধের জয় পরাজয়ের ওপরই নির্ভর করছে গোটা মানবসমাজের ভবিতব্য। জাতীয় স্রোতের বিরুদ্ধে

গেলেও, আমাদের সততা আর আন্তরিকতায় কোনও খাদ ছিল না বলেই নিজেদের কখনই আমাদের জলছাড়া মাছ বলে মনে হয়নি। এ সত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জনযুদ্ধে বিঘ্ন ঘটার ভয়ে আগস্ট আন্দোলনের লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে থাকা আর নেতাজিকে ভুল বোঝা—পরে পার্টিকে এই একজোড়া ভুলের জন্য কম খেসারত দিতে হয়নি।

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির হয়ে যখন বাংলার মাঠেঘাটে জ্যোতিবাবুরা সভা করে বেড়াচ্ছেন, তখন কাতারে কাতারে লোক আসত তাঁদের কথা শুনতে। খেটে-খাওয়া গরিব মানুষেরা একজোট হয়ে কীভাবে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সুখশান্তির এক নতুন জগৎ গড়ে তুলেছে—এসব কথা এর আগে এমনভাবে আর কেউ তাদের বলেনি।

জ্যোতিবাবুদের চষে ফেলা এইসব জমিতে গায়ে গায়ে গজিয়ে উঠেছিল কত যে কৃষক সমিতি, তার ইয়ত্তা নেই। সে সময়ে পার্টির আন্তর্জাতিকতার মধ্যে তাঁরা বিজাতীয়তার গন্ধ পেতেন, তাঁরাও জনসংগঠন আর জনসেবার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদের নিষ্ঠা আর আত্মত্যাগের তারিফ না করে পারতেন না।

সংসদীয় রাজনীতিতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, জ্যোতিবাবু ছিলেন পার্টির পাঁচজন নেতার একজন। বঙ্কিম-বিশ্বনাথ মুখুজ্যেদের মতন কথার ফুলঝুরি, আবদুল মোমিনের মতন রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান, সোমনাথ লাহিড়ীর মতন বাক্যবাণ—সভায় লোক টানার এসব কোনও গুণই জ্যোতিবাবুর বক্তৃতায় থাকত না। জবরদস্ত সংগঠকও তিনি ছিলেন না। মার্কসবাদের পুঁথিবিদ্যে আওড়ানোর ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে খুব একটা ঝোঁক দেখা যেত না। পরনের ধুতি পাঞ্জাবিটা যে নেহাত পোষাকি, আসলে যে তিনি আবেগতাড়িত ভেতো বাঙালি নন, কাছে গেলে সেটা টের পাওয়া যেত। গায়ে পড়ে আলাপ জমানো, আদিখ্যেতা দেখানো, কথাবার্তায় আত্মীয়ভাব—এসব সহজে আসত না বলে, অনেকে মনে করত উনি খুব দাম্ভিক মানুষ। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে জেল থেকে বেরিয়ে পার্টির ছত্রভঙ্গ অবস্থায় সকালে প্রায়ই জ্যোতিবাবুর বাড়িতে চলে যেতাম। জ্যোতিবাবুকে না পেলে কখনও কখনও ওঁর বাবার সঙ্গে বসে গল্প করতাম। ওঁর বাবা ছিলেন সুখ স্নেহময় দিলখোলা মানুষ।

রণদিভের অতিবাম পন্থার পরিণতিতে পার্টির তখন হাঁটুভাঙা দ-এর মত অবস্থা, তাতে জ্যোতিবাবুদেরও কম ভোগান্তি হয়নি। পার্টির সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অবিচার—কীভাবে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে সে সব স্বচক্ষে দেখতে আর স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছিলাম। সবাই আশা করছিল, জ্যোতিবাবুরা নতুনভাবে হাল ধরে এর একটা বিহিত করবেন। পার্টির নড়বড়ে ছত্রখান অবস্থার জন্যই হয়ত তা সম্ভব হয়নি। ফলে, কমরেডদের ভাঙা মন জোড়া লাগার বদলে দিশোহারা ভাব সবাইকে দমিয়ে দিচ্ছিল।

আগের দশটা বছর ছিল একটা কঠিন সময়। একদিকে প্রকৃতির মার, অন্যদিকে বিদেশি শাসনের দমনপীড়নে দেশ ও দশের মরণাপন্ন অবস্থা। ঘূর্ণিঝড় আর বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, পুলিশ আর মিলিটারি, মজুদতার আর চোরাকারবারি যুগপৎ স্বাধীন বঙ্গ আর দেশভাগ—সব মিলেমিশে সে এক সসেমিরা অবস্থা। যারা সমাজতন্ত্র চায়, তারা কি জাতীয়

স্বাধীনতার লড়াইয়ের মঞ্চ থেকে দূরে সরে থাকবে? আমাদের প্রধান শত্রু কে? তাকে হাঁটতে গেলে শ্রমিকশ্রেণী কাকে কাকে সঙ্গে পাবে? দেশি বুর্জোয়াকে কি নেতৃত্বে ঠাঁই দেওয়া যাবে? বিপ্লবের চরিত্র, সংগ্রামের শরিক, লড়াইয়ের মঞ্চ, নেতৃত্বের প্রশ্ন—এসব নিয়ে রণনীতি আর রণকৌশলের কূটতর্কের শেষ নেই। মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্তালিন আউড়ে যে যার বিদ্যে জাহির করতে সবাই ব্যস্ত। এসব সাতপাঁচে জ্যোতিবাবু বড় একটা জড়িত থাকতেন বলে মনে পড়ে না।

এরই ভেতর দিয়ে আইনসভায় বিরোধী নেতা হিসাবে বাংলার জনমনে জ্যোতি বসুর একটা বিশেষ মানসমূর্তি ফুটে উঠতে থাকে।

পার্টির যাঁরা ডাকসাইটে নেতা, তাঁরা সুবক্তা হলে সাধারণ মানুষের কিছুটা মন কাড়তে পারেন। সভা তো আর রোজ হয় না। যারা শ্রোতা, তারাও স্থানকালে সীমাবদ্ধ। পার্টির কাগজে ছাপা হলেও সে খবর ক'জনের কাছেইবা পৌঁছায়? কিন্তু জ্যোতিবাবু আইনসভায় যা বলেন, দৈনিক তা ইংরেজি বাংলা সব কাগজে বেরোয়। লোকজনের আড্ডারও তা খোরাক হয়।

ইংরেজি রাজত্বের যখন যায় যায় অবস্থা, গোরার দল গুলি বন্দুক চালিয়েও মিছিল, ধর্মঘট, বিদ্রোহ অন্তর্ঘাত ঠেকাতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান সেই আগুনের আঁচ জ্যোতিবাবুর গলায়। আইনসভায় তখন অনায়াসে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া যেত। ফলে, অশৈশব ইংরেজিতে দুরস্ত জ্যোতি বসুকে তেমন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। বাংলা তর্জমায় তাঁর কথাগুলো সাধারণ পাঠকের কাছে অবাধে পৌঁছে যেত। সে সময়ে পার্টির উঁচুদরের নেতা না হয়েও বাংলা জনমানসে তাঁর আসন ক্রমেই পাকা হতে লাগল। ব্যক্তি জ্যোতিবাবু সম্পর্কে আমার যতটুকু ধ্যানধারণা, তার সবটাই তাঁর গদিতে বসার আগে। জেল থেকে বেরিয়ে একটা সময়ে প্রায়ই সকালে ওঁর বাড়িতে চলে যেতাম। জ্যোতিবাবু না থাকলেওঁর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে আসতাম। নিশিকান্ত বসু ছিলেন খুব খোলামনের সাদাসিধে মানুষ। আমার বাবার মতই ছেলে-অন্তপ্রাণ। ওঁদের কারও মধ্যে কখনও কোনও বড়লোকি ভাব চোখে পড়েনি।

জ্যোতিবাবু ছিলেন তাঁর বন্ধু স্নেহাংশু আচার্যের একেবারে উল্টো প্রকৃতির লোক। সবার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারতেন না। সাধারণ পার্টি কমরেডরা তার জন্যে অনেক সময় ওঁকে ভুল বুঝত। উনি যখন প্রাদেশিক পার্টির সেক্রেটারি, তখন কথাটা ওঁর কানে তুলেছিলাম। শুনে উনি কী বলেছিলেন, এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিলেন ঃ তুমি এটা ঠিক বলেছ। এই যেমন কাল আমি বাসে উঠে দেখি, আমার সামনের সিটের একজন পার্টি কমরেড বসে আছে। আমি মনে মনে ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু বলতে পারছি না। এমন সময় ও স্পষ্ট সে যাওয়ায়, বাস থেকেও নেমে গেল। আমি তখন মনে মনে ভাবছি—ও নিশ্চিয় বাস থেকে নেমেই বলবে, নিকুচি করেছে জ্যোতি বসুর। বললেন, এটা কেন হয় জানো?

ছেলেবেলায় আমি এমন এক ইংরেজি ইস্কুলে পড়েছি, যেখানে সাধারণ বাঙালির ছেলেরা পড়ে না। সেটা আমার স্বভাবে থেকে গেছে।

সেই মানুষই আজ কী করে বাঙালির জনগণমনের অধিনায়ক হয়ে উঠেছেন, এটা ভেবে অবাক লাগে।

আমাদের ছেলেবেলায় কেউ হাত দেখতে চাইলে আমরা প্রথমেই জিগ্যেস করতাম —দেখুন তো সমুদ্রযাত্রা আছে কিনা! হয় খুব মেধাবী, নয় অনেক টাকা আছে—এসব ছেলেমেয়েরাই তখন বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেত। এছাড়াও কেউ যেত কোনও বিপ্লবী দলে কর্মসূত্রে, কিংবা জাহাজের খালাসি হয়ে। একবার বিলেত ফেরত হয়ে আসতে পারলে লোকে উঁচু নজরে দেখত। সেই সঙ্গে কিছু ঈর্ষাও করত।

একবার বহরমপুরে গিয়ে একজনের বাড়িতে উঠেছি। রোয়াকে বসেছিল বিকেলের বুড়োদের আড্ডা। ঘরে বসে শুনতে পেলাম কেউ একজন এসে বললেন—রেডিওতে বলল, প্রফুল্লবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। শুনে সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—হয়েছেন? যাক বাবা, এই প্রথম একজন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন যিনি বিলেত ফেরত নন।

পার্টিতেও তখন বিলেত ফেরত কমিউনিস্টদের বেশ কদর ছিল। ইংরেজিতে ভাল বলা আর লেখার গুণে কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বভারতীয় কাজে তাঁদের টেনে নিত। জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্তরা ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এঁরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। উঁচুতলার লোক হয়েও কেউই এঁরা আরামের জীবন বেছে নেননি। পার্টির বাইরের লোকেও এঁদের আত্মত্যাগী স্বদেশি হিসেবে দেখেছে। ফলে জনযুদ্ধের পর্বে যারা আমাদের দেশের শত্রু বলে হাজির করে হাতে মাথা কাটতে চাইছিল, তাদের অস্ত্রের ধার ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

জেলে থাকার সময় সরকারি চার্জশিটের জবাবে জলি কল যে মুসাবিদ্যা তৈরি করেছিল, তাতে ছিল—অধিকাংশ মানুষকে স্বমতে এনে আমরা শাসন ক্ষমতার বদল ঘটাতে চাই। তখনও আমাদের মাথায় ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ভোটের জোরে পার্টি কখনও ক্ষমতায় আসতে পারে, এটা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। পরে পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে জলি কলের আরও একটা প্রস্তাবে আমাদের খটকা লেগেছিল। তাতে বলা হয়েছিল : আমরা একদলীয় সরকার গড়তে চাই না। জলির এইসব বক্তব্যের পেছনে পার্টির নেতৃত্বের নিশ্চয় সায় ছিল। অন্তত একাংশের। জ্যোতিবাবুর প্রসঙ্গে এসব পুরনো কথা মনে পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

দুনিয়া জুড়ে কমিউনিজমের এত ভাঙাগড়ার মধ্যেও জ্যোতিবাবুর বিশ্বাসের কোনও নড়চড় হয়নি। তিনি মার্কসবাদী। কিন্তু মার্কসবাদকে তিনি অপৌরুষেয় বলে মনে করেন না। মার্কস স্মরণে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—মার্কসবাদী হিসেবে আমি এও শিখেছি যে, মার্কসকে দেবতা করে বেদীতে বসানো ঠিক নয়। যারা আমরা মার্কসবাদী, তাদের কাছে মাকর্স ভগবান নয়। একজন বিরাট প্রতিভাধর হলেও তিনি ছিলেন রক্তমাংসেরই মানুষ। হামবুর্গের ডব্লিউ ব্লসকে মার্কস এই কথা লিখে জানিয়েছিলেন—'আমি আর এঙ্গেসল যখন

গুপ্ত কমিউনিস্ট সমিতিতে যোগ দিই, তখন আমরা শর্ত করে নিয়েছিলাম যে, আপ্তবাক্যে (অথরিটি) অন্ধ বিশ্বাস প্রশ্রয় পেতে পারে এমন কিছুই সংবিধিতে রাখা চলবে না।'

বিলেতে থাকতে জ্যোতিবাবুর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল মার্কসবাদ। তখনই তিনি সংকল্প করেন যে, দেশে ফিরে মানুষের ভাল করাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে নেবেন। সেই সংকল্প থেকে কখনই তিনি সরে যাননি। সংসদের ভেতরের লড়াইয়ের সঙ্গে বাইরের লড়াইকে জুড়তে হয়েছে। শুধু ভোটে জেতা নয়, ক্ষমতার ভারও পার্টি বইতে পারবে—রাজ্যের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে তা বোঝাতে হয়েছে। কেবল পুঁথিবিদ্যার জোরে কিংবা বাঁধা রাস্তায় তা হয়নি। নিজেদের পথ নিজেদেরই কেটে নিতে হয়েছে। অনর্থক তত্ত্বের জালে নিজেকে না জড়িয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন নিজের রাজ্যে জ্যোতি তা করে দেখিয়েছেন।

জ্যোতিবাবুর গড়া রাজ্যপাট যে নিখুঁত, কেউ তা বলবে না। অনেক অন্যায় দূর হতে আজও বাকি আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, একাই একশো হওয়া সত্ত্বেও একই পথের পথিকদের তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। তাঁর নিজের যে পার্টি তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে, আজও সে পার্টি বড় নজরে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাদের অনেকেই এখনও শুচিবায়ুগ্রস্ত।

কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁর পার্টির যোগ না দেওয়াকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে জ্যোতিবাবু চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কথা যে কত সত্যি, তাঁর দলের নেতারা তা আখেরে বুঝবেন। শুধু সমষ্টি নয়, ইতিহাসে ব্যক্তিরও যে বড় ভূমিকা থাকে—এই সহজ সরল কথাটা তাঁরা মানতে না চেয়ে সারা দেশের দিক থেকে একটা বড় সুযোগ হাতছাড়া করলেন।

এই লেখার প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা অকপটে বলা ভাল। পার্টি ভাগ হওয়ার পর সাবেক পার্টিতে আমি থেকে যাওয়ার অনেক কাজের লোকও দূরে হয়ে যায়। আমাদের যারা দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী বলত, আমরাও তাদের আকাট অতিবাম বলেছি। ওরা যখন বলেছে কংগ্রেসই প্রধান শত্রু, আমরা বলেছি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াই হল আসল শত্রু—দলীয় সংকীর্ণতা ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পার্টি ভাগ হওয়ার পর জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমার আরও কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। তাঁর সম্পর্কে আমার যা কিছু ধারণা তার সবটাই কাগজে খবর পড়ে। তাঁর মুখের কথাগুলো এমন খাপছাড়াভাবে দেওয়া হয় যে, তাতে তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলো ঠিকভাবে ধরা পড়ে না। বাংলায় খুব একটা দখল না থাকায় তাঁর কথাগুলো খুব কাঠখোট্টা শোনায়। অথচ বাংলার বাইরে যান, দেখবেন জ্যোতিবাবু সব দলেরই প্রিয়পাত্র। জ্যোতিবাবুকে তাঁরা পান অন্যভাবে, অন্যভাষায়। জ্যোতিবাবু তাঁদের কাছে শুধু কমিউনিস্ট নন। তিনি একজন তীক্ষ্ণধী অতি সজ্জন বাঙালি ভদ্রলোক। তাঁর ওপর ভরসা করা যায়। অন্য দলনেতাদের সম্পর্কেও সশ্রদ্ধ। ঘর জ্বালানো আর পরভোলানো। যেন দুই জ্যোতি বসু।

জ্যোতিবাবুকে যাঁরা নিছক প্রয়োগবাদী বলে তারিফ করেন, তাঁরা খুব তলিয়ে দেখেন বলে আমার মনে হয় না। ভাবখানা এই যে, যখন যেমন তখন তেমন—এটাই যেন তাঁর

জীবনের দর্শন। এর কারণ, অন্য অনেকের মতন তিনি কথায় কথায় তত্ত্ব আওড়ান না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা তো আক্কেলমন্তেরাই নিয়ে থাকে। জ্যোতিবাবুর পথ চলার হিসেব নিলে বোঝা যাবে তাঁর মধ্যে একটা আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতা আছে। মনস্থির করেই তিনি এগিয়েছেন। তাঁর পদক্ষেপগুলি জোড়া দিলে তাঁর পথের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটে ওঠে।

আমি আমার সব কথা এ লেখায় গুছিয়ে বলতে পারিনি। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ঢাল-তরোয়াল ছাড়াই অপ্রস্তুত অবস্থায় এ লেখায় আমাকে হাত দিতে হয়েছে। কেননা ভেতরে ভেতরে আমি কিছু বলার একটা তাড়না অনুভব করেছি। এ শতাব্দীর গোড়ায় দুনিয়া যেখানে ছিল, আজ সেখানেই নেই। আমাদের পেছনে যেমন অনেক স্বপ্নভঙ্গ, সামনেও তেমনি আশা করার রয়েছে অনেক কিছু।

ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। তবু আমি বলব : রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মার্কসবাদী পার্টি হতে চেয়েছে সর্বগ্রাসী। নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস না করায় নীতিনিয়মের বাইরে গিয়ে হাতধরা লোকদের বসানো হয়েছে। গণসংগঠন আর পার্টি সংগঠনের মধ্যে কোনও ফারাক রাখা হয়নি। গণতন্ত্রের জায়গা গিয়েছে পার্টিতন্ত্র। কারও কাছে জানা আর শেখার কিছু নেই। নেতা হলেই সে সবজান্তা। জো হুকুমের সাতখুন মাপ। দলে ভিড়লে—'আছে-র' জল 'নেই-দের' ট্যাঁকে পুরতে পারবে। জোর যার মুলুক তার। বেড়ে গেছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর নিজের কোলে ঝোল টানার ভাব। ভাঙা রেকর্ডের মত এখনও সমানে আওড়ে যাওয়া—মার্কসবাদ সমাজতন্ত্র, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, লাল সেলাম আর শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি।

এত কিছু দেখেও জ্যোতিবাবু কেন চুপ করে আছেন? আমার গলা কেটে ফেললেও জ্যোতিবাবুকে আমি ব্যগ্রতা করে বলবো : আপনি তাকিয়ে দেখার মত এ প্রতিমা গড়েছেন, লগ্ন বয়ে যাবার আগে এবার তার চক্ষুদান করুন।

৫ নেহরু : 'না'-তে শুরু 'হ্যাঁ'-তে শেষ

'না-দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমাদের কালে চোখ ফোটার এটাই ছিল ধরন। আমাদের দেখে কারো বলার উপায় ছিল না—'ঘাড় কেন কাত? না, ঐ এক জাত।'

'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে' ভেসে যায়'—এমনটা বোধ হয় চৈতন্যদেবের পর বাংলায় আর ঘটেনি। না ধর্ম, না রাজনীতি, না সংস্কৃতি—কোনো ক্ষেত্রেই।

তাই আমাদের ছেলেবেলায় দু-চারটে ঢেউ গায়ে এসে আছড়ে পড়লেও আমাদের ঠিক ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

কাকেই বা ছেড়ে কথা বলেছি? গান্ধিজিকে নয়, বল্লভভাইকে নয়, নেহরু বংশকে নয়,

এমন কি বাঙালির মনের মানুষ সুভাষ বোসকেও নয়। কেউই শিরোধার্য নন। সকলেই সন্দেহভাজন।

এটা কি বাংলার মাটির দোষ? খেদানো বৌদ্ধরা এই মাটিতেই পেয়েছিল শেষ আশ্রয়স্থল। নৈয়ায়িকেরা তর্কযুদ্ধং দেহি বলে এখানেই ধনুতে টঙ্কার তুলেছিল। ন্যাড়ানেড়ির বড় একটা অংশ ধর্মান্তরিত নেড়ে হয়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচার রাস্তা নিয়েছিল।

বাদবাকি দেশের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটেরে বাংলা যদি ইতিহাসের নানা পর্বে নিজেকে একঘরে করে রেখে থাকে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাগরপারে মুখ ফেরানোর এটাই কি কারণ?

অহিংসা, চরকা, রঘুপতি রাঘব—বলতে গেলে, এর কোনোটাই এ মাটিতে তেমন কল্কে পায়নি। আমরা কান দিয়েছি বোমা পিস্তলের আওয়াজে। তাও ধোপে টেকেনি।

কিছুতেই ভরসা হয়নি।

কাজেই চায়ের দোকানে বসে মুখে খই ফুটিয়ে রাজাউজির মেরেছি। আর মনে মনে মূর্তির পর মূর্তি ভেঙেছি। পরে সেই ভাঙার কাজটা হাতেকলমে তুলে নিয়েছিল আমাদের পরের প্রজন্ম। চায়ের টেবিলে নয়। দিনেদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায়।

মনে মনে সেদিন যে মূর্তিগুলো আমরা ভেঙেছিলাম, তার একটি মূর্তি জওহরলাল নেহরুর। মূর্তিটাও ছিল মনগড়া। কাজেই আমাদের সেই সব খোঁচায় তার গায়ে কোনো আঁচড় লাগেনি।

তবু সেসব ছাপার অক্ষরে আছে বলেই শতবর্ষীয়ান সেই মূর্তির সামনে মাথা নোয়াবার আগে ঘাট না মেনে উপায় নেই।

এসব কথা কেন উঠছে?

জওহরলালের কথাতেই এর উত্তর দেব : 'অনেক দিন আগে একটা সময় ছিল যখন দিনের পর দিন আমি আবেগে উচাটন হয়ে থেকেছি। আপাদমস্তক কাজে বিভোর হয়েছিলাম। যৌবনের সেই দিনগুলো এখন মনে হয় অনেক দূরে—বহু বছরের ব্যবধানের জন্যেই শুধু নয়, এটা আরও বেশি করে মনে হয়, কেননা সেদিন আর আজকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে অভিজ্ঞতার পারাবার আর বেদনাবিধুর ভাবনা। আগের সে প্রাণোচ্ছলতায় এখন ভাঁটা পড়েছে, প্রায় বল্গাহীন আবেগের সুর এখন নরম, রিপু আর অনুভূতিগুলো তখন অনেকটা বাগ মেনে চলে। চিন্তার ভার প্রায় পথে কাঁটা হয়ে ওঠে। আর মনের মধ্যে আগে যেখানে স্থিরনিশ্চয়তা ছিল, সেখানে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে সংশয়। হয়তো নেহাত বয়সের দোষে, কিংবা আমাদের এই সময়ের গুণে।'

অতীতের ভূত বর্তমানের কাঁধে এমনভাবে চেপে থাকে যে, খোলা চোখেও সব কিম্ভূতকিমাকার দেখায়। আজ সময় এসেছে অতীতকে নতুন করে বাজিয়ে দেখার। দরকার বুকে হাত অকপটে মুখ খোলার। যদি ভূত ঝাড়াবার তেমন ওঝা নাও মেলে, আমরা লোকমুখে বহুবচনে কথা বলব।

একবার এক আমেরিকান প্রকাশক একটি সংকলনের জন্যে নেহরুর কাছ থেকে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে একটি লেখা চেয়েছিলেন। বিষয়টা মনে ধরলেও ভাবতে গিয়ে এমন দ্বিধায় পড়েন যে শেষ পর্যন্ত আর লিখে উঠতে পারেননি।

পরে এ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ক'বছর আগে হলে তাঁকে এমন দ্বিধায় পড়তে হত না। তখন তাঁর চিন্তায় আর লক্ষ্যবস্তুতে একটা স্পষ্ট ধরাবাঁধা ভাব ছিল। পরে সেটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। কারণ, ততদিনে ঘরে বাইরে এমন সব তালগোল পাকানো মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে গেছে যে, সামনে দূরের জিনিস তখন হয়ে পড়েছে ভাসা-ভাসা, আবছা।

মৌলিক ব্যাপারগুলো নিয়ে এই সন্দেহ আর গোলমাল তাঁর অব্যবহিত কাজের ক্ষেত্রে তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে তাতে কাজের ধার কিছুটা ভোঁতা হয়েছিল তো বটেই। যখন বয়স কম ছিল তখন তীর ছুড়তে গিয়ে পাখির চোখই শুধু নজরে। পরে সে নিশানা অতটা চোখা থাকেনি। তবে তখনই হাত গুটিয়ে নেননি। আদর্শের সঙ্গে কাজের একটা সত্যিকার বা মনগড়া সম্পর্ক বরাবরই বজায় ছিল। দেখে দেখে রাজনীতির ওপর তাঁর অরুচি ধরে গিয়েছিল। জীবনকে দেখার ভঙ্গিতেও একটা পরিবর্তন এসেছিল।

নেহরু বলছেন : 'কাল যা সব আদর্শ আর লক্ষ্য ছিল, আজও তা আছে। কিন্তু তাদের আর ঠিক তেমন জেল্লা নেই। এমনকি লক্ষ্যের দিকে চলেছি বলে ওপরসা মনে হলেও, আদর্শগুলো হারিয়ে ফেলেছে হৃদয়কে সন্দীপিত আর দেহকে সঞ্জীবিত করা তাদের সেই জ্যোতির্ময় রূপ। অশুভ শক্তি বারংবার জিতেছে। কিন্তু তার চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার, যারপরনাই ঠিক বলে যা মনে হয়েছিল তার স্খলন আর বিকৃতি। আদতে মনুষ্যপ্রকৃতি কি তাহলে এতটাই হীন যে, যুগ যুগ ধরে তালিম না নিলে, দুঃখদুর্দশার ভেতর দিয়ে না গেলে মানুষ কিছুতেই উচিত মতে চলতে পারবে না এবং আজকের মতো লালসা আর হিংসা আর ছলনার দাসত্ব থেকে তাকে কখনই কি টেনে তোলা যাবে না? আর ইতিমধ্যে আজ বা অদূর ভবিষ্যতে মানুষ্যপ্রকৃতির আমূল বদলের সব চেষ্টাই কি হবে ভস্মে ঘি ঢালার শামিল?

উদ্দেশ্য আর উপায় নিয়েও পরে তাঁর সংশয় জেগেছে। এই দুইয়ের কি নিত্য সম্বন্ধ? ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েনের অচ্ছেদ্য বন্ধনে তারা বাঁধা? ভ্রান্ত উপায় কি উদ্দেশ্যকে শুধু বিকৃত নয়, সময় বিশেষে তার বিনাশও ঘটায়? কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ উনপাঁজুরে আর একালষেঁড়ে। সঠিক পথ তার ক্ষমতার বাইরে। এ অবস্থায় মানুষ তাহলে কী করতে? যদি কিছু না করে, তাহালে সেটা হয় অশুভ শক্তির কাছে সম্পূর্ণভাবে ঘাট মানা আর মাথা নোয়ানো। আর যদি কিছু করতে চায়, প্রায়ই সেটা হয়ে দাঁড়ায় কোনো না কোনো চেহারায় সেই অশুভের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা। আর এই সব আপোস রফার ফলের মধ্যে অবাঞ্ছিত পরিণতিগুলো বেবাক থেকেই যায়।

কাজের মানুষ বলেই নেহরুর আত্মজিজ্ঞাসাগুলো অনেক বেশি মাটি আর মানুষ ঘেঁষা।

নেহরু গোড়ার দিকে জীবনের সমস্যাগুলোকে কমবেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

তাতে ছিল একদিকে উনিবিংশ শতাব্দীর আর অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার সহজ সরল আশাবাদ। নিশ্চিন্ত আরামের জীবন আর সেই সঙ্গে প্রাণশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হওয়ায় তাঁর এই আশাবাদের ভাব আরও বেড়ে যায়। মানবধর্মের প্রতি তাঁর একটা অস্পষ্ট টান ছিল।

ধর্মকে নেহরু দেখেছেন খোলা-মনে। ধর্মের যে বাহ্য রূপ আচার-অনুষ্ঠানে আর আড়ম্বর—তা সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, যারই হোক-কখনই তিনি পছন্দ করেননি। তাতে অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার এত বেশি যে, জীবনের সমস্যাগুলো ধামাচাপা পড়ে। তার মধ্যে মিশে থাকে তুকতাক, গুরুবাদ আর আলৌকিকের ওপর ভরসা।

নেহরু এত জানতেন, দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষই কোনো না কোনো ধর্ম বিশ্বাস না করে থাকতে পারে না। তাদের গভীর অন্তলোকের চাহিদা মেটায় ধর্ম। একদিকে আমরা পেয়েছি এমন সব ধর্মপ্রাণ মহানুভব মানুষ, যাঁরা সবাইকে কোল দিয়েছেন, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে ধর্মের ধ্বজা ধরে সংকীর্ণমনা একদল নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী। ধর্ম থেকে মানুষ জীবনে পালনযোগ্য যা কিছু পেয়েছে, তার কিছু যেমন আজ আর খাটে না, তেমনি কিছু আছে যা ক্ষতিকর। অবার ধর্মের কাছ থেকে পাওয়া অনেক কিছুই আজও আমাদের সদাচার আর ভালোমন্দ বোধের বনিয়াদ।

মানুষের অভিজ্ঞতায় যে দিকগুলো এখনও বিজ্ঞানের পুরো কব্জায় আসেনি, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনায়ত্ত সেই জগৎ নিয়েই মোটামুটিভাবে ধর্মের কারবার। বিজ্ঞানের সঙ্গে রীতি পদ্ধতির কোনো মিল না থাকলেও আপাতত জানার সঙ্গে অজানার সেতুবন্ধ ঘটাচ্ছে ধর্ম। আমাদের চারপাশে বিস্তর জমি পড়ে রয়েছে বিজ্ঞান যেদিকে নজর দিলেও সেসব এখন ঠিক ছকে ফেলতে পারেনি। তার বেশি ভাগটাই অন্তঃপ্রকৃতির এলাকায় পড়ে। বিজ্ঞানের যে প্রক্রিয়ায় দৃশ্যবস্তুর বিচার করা হয়, হুবহু সেই একই প্রক্রিয়া হয়তো পুরোপুরি খাপ খায় না। নেহরুর মতে, ধরাছোঁয়ার বাইরের এই জগৎটাও মানুষের জীবনের ফেলনা নয়।

নেহরুর ভরসা ছিল বিজ্ঞান একদিন এমনভাবে অদৃশ্য জগতেও তার ডালপালা ছড়াবে যাতে মানুষকে তার অস্তিত্বের সমস্যার জন্যে আর ধর্মের দোর-ধরা হতে হবে না।

বাজারে অতিপ্রাকৃতবাদ বলে যা চলে, তার প্রতি খড়্গহস্ত হলেও মরমী মহাপুরুষদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে চেখেছেন। এককথায় আত্মপ্রতারক নির্বোধ বলে তাঁদের উড়িয়ে দেননি। যা বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, নিছক আবেগের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়—তেমন কিছুতেই নেহরুর সায় ছিল না।

বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার ভেতর দিয়ে প্রত্যেকেরই মনে ভাষা ভাষাভাবে কিংবা কিছুটা স্পষ্টাকারে একটা জীবনবোধ গড়ে ওঠে। ধ্যান-ধারণাতেও পারিপার্শ্বিকের ছাপ পড়ে। ফলে, নেহরুর মনও একটা বিশেষ খাতে বয়েছিল। কল্পনাবিলাস তাঁর ধাতে না সইলেও কখনও কখনও অস্তিত্ব আর চেতনার কূটতর্কজালে নিজেকে জড়িয়েছেন। তত্ত্বকথার মোহজাল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যেন বেঁচেছেন।

'কোনো পরলোক নয়, কোনো জন্মান্তর নয়—আসলে এই জগৎ আর এই জীবনের

ওপরই আমার টান। আত্মা বলে কিছু আছে কিনা, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে কিনা আমি জানি না। এসব প্রশ্নের যতই গুরুত্ব থাক, ও নিয়ে আমার এতটুকু কোনো মাথাব্যথা নেই। যে আবহাওয়ায় আমি মানুষ হয়েছি, তাকে আত্মা আর পরজন্ম, কর্মফল, দেহান্তর—এসবই ছিল ধরে নেওয়া সত্য। তার আঁচ আমার গায়েও লেগেছে। সুতরাং, এক হিসেব এইসব ধরে নেওয়া ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা অনুকূল ভাব থেকে গেছে। আত্মা একটা থাকতে পারে, দেহ পঞ্চত্ব পেলেও যা টিকে যায়; জীবনের কৃতকর্মের বিধায়ক যে কর্মকারণবাদ, তা সঙ্গত বলে বোধ হয়—যদিও আদি কারণের কথা ভাবতে গিয়ে স্পষ্টতই মুশকিল বাধে। আত্মা আছে বলে ধরে নিলে জন্মান্তরবাদেরও কিছুটা যেন যুক্তি থাকে।

'কিন্তু কোনো ধর্মীয় মতের অঙ্গ হিসেবে আমি এমন বা অন্য কোনো তত্ত্বের বা ধারনায় বিশ্বাস করি না। যে রহস্যলোক সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, এ হল তা নিয়ে মস্তিস্কপ্রসূত নিছক জল্পনাকল্পনা। এসব জিনিস আমার জীবনে কোনো দাগ কাটে না; পরে তা ঠিক বা ভুল বলে প্রমাণিত হলেও আমার কিছু উনিশ-বিশ হবে না।...'

প্রেতাত্মা নামানো কিংবা পরলোকচর্চা এসব ছিল নেহরুর কাছে একেবারেই শোকগ্রস্ত বিশ্বাসপ্রবণ মানুষকে নিয়ে মিথ্যে স্তোক দেওয়ার ব্যাপার। এসব আধিদৈবিক কোনো কেনো ঘটনার পেছনে যদি কিছু সত্যি থেকেও থাকে, যে দৃষ্টিতে তা দেখা হয় তাকে নেহরু পুরোপুরি ভুল বলে মনে করতেন। তিলকে তাল করার এই প্রবণতাকে তিনি কখনই আমল দেননি।

এ সত্ত্বেও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে প্রায়ই একটা রহস্যের অজানা অথই ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করত। নিজের সাধ্যমত তা অনুধাবন করার প্রবল ঝোঁক হত; তার সুরে সুর মিলিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে চাইতেন। তিনি মনে করতেন মূলত বিজ্ঞানের পথেই সে উপলব্ধিতে পৌঁছুনো সম্ভব। সম্পূর্ণ বিষয়গত হওয়া যদি সম্ভব নাও হয়, তবু নিজেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে বাঁধতে হবে।

রহস্যের সূত্র ধরেই এসেছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ।

নেহরু বলছেন, 'রহস্যময় যে কী জিনিস আমি জানি না। আমি তাকে ঈশ্বর বলি না, কেননা ঈশ্বর বলতে এখন অনেক কিছু এমন মনে করা হয় যাতে আমার বিশ্বাস নেই। দেবতা বা নরমূর্তিধারী পরম কোনো শক্তির কথা মনে আনাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে যে তা ভেবে থাকে, সেটাই আমার কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার। সাকার ঈশ্বরের ভাবনাটাই আমার কাছে খুব বিসদৃশ ঠেকে। অভেদের তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে তবু কিছুটা বুঝতে পারি; বেদান্তের অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রতি আমি টান অনুভব করেছি; যদিও মনে করি না যে, তার গূঢ় ভাব আর কূটার্থ সর্বতোভাবে আমি বুঝেছি; এসব জিনিস কেবল বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করার ব্যাপারটা যে বেশিদূর নিয়ে যায় না, সে কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। আবার এও ঠিক যে, বেদান্ত বা অনুরূপ সব দেখার ভঙ্গিগুলো এমন ভাষা ভাষা নিরাবয়ব হয়ে অনন্তলোকে চড়াও হয় যে, আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে যাই। প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর পরিপূর্ণতা আমাকে নাড়া দেয়, প্রাণের সুরে সুর মেলায়; আমি ভেবে দেখেছি যে, প্রাচীন

ভারতীয় বা গ্রিক পৌত্তলিক বা সর্বভূতের ঈশ্বরবাদের মধ্যে রাখলে আমি ঢের আপন বোধ করব—তবে তার সঙ্গে জুড়ে থাকা ঈশ্বর আর দেবদেবীর ভাবনাগুলো বাদ দিয়ে।

'কিছুটা নৈতিকতার দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা—আমার কাছে তার টান খুব প্রবল; যদিও তাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করা আমার পক্ষে শক্ত। গান্ধিজি জোর দেন ন্যায্য পন্থার ওপর; তাতে আমি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি মনে করি এই জোর দেওয়াটা আমাদের জনজীবনে গান্ধিজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ভাবনাটা এমন কিছু নতুন নয়, কিন্তু বড় আকারের দশের কাজে এই নৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ অবশ্যই অভিনব। রাস্তাটা নয়; তাছাড়া লক্ষ্য আর উপায়কে বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে আলাদা করা যায় না। দুইয়ে মিলে তারা পূর্ণাঙ্গ একাকার। যে দুনিয়ায় বলতে গেলে একান্তভাবে শুধু লক্ষ্যের কথাই ভাবা হয় এবং উপায়কে আমল দেওয়া হয় না, সেখানে উপায়ের ওপর জোর দেওয়াটা কেমন যেন বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ভারতে এটা কতটা সফল হয়েছে বলতে পারি না। তবে বিপুল-সংখ্যক লোকের মনে যে এর গভীর এবং স্থায়ী ছাপ পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।'

জীবনবোধের কথা বলতে গিয়ে নেহরু যেভাবে অকপটে নিজেকে মেলে ধরেছেন, তাকে সত্যিই অবাক হতে হয়। কোনো বাঁধাধরা তত্ত্বে নিজেকে তিনি আটকে রাখেননি। খোলা মনে খোলা চোখে শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে সবকিছু তিনি যাচাই করে দেখেছেন আর সেইসঙ্গে পুরনোকে ছাড়িয়ে নতুনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর হাত।

'মার্কস আর লেনিনের বই আমার মনে প্রচণ্ড ছাপ ফেলেছিল এবং তার ফলে ইতিহাস আর চলমান দুনিয়াকে আমি নতুন আলোয় দেখতে শিখেছি। মনে হয়েছে ইতিহাস আর সমাজবিকাশের সুদীর্ঘ পরম্পরায় একটা অর্থ, একটা ক্রমান্বয় আছে। আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের না-বোঝা ভাব কিছুটা কেটে গেছে। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতেকলমে সাফল্যও ছিল বেজায় রকম চমকপ্রদ। ওদেশের কিছু কিছু ব্যাপার আনেক সময় আমার পছন্দ হয়নি, নয় আমি বুঝতে পারিনি; আমার মনে হয়েছে ওরা তাৎক্ষণিক সুবিধাবাদ অথবা সেই সময়কার ক্ষমতার রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত। কিন্তু এসব ঘটনাচক্র এবং মানবকল্যাণের গোড়াকার তীব্র আবেগের সম্ভবপর বিকৃতি সত্ত্বেও, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে, সোভিয়েত বিপ্লব মানবসমাজকে এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে; এমন এক দীপ্যমান শিখা জ্বালিয়েছে, জোর করে যা নেবানো যাবে না; 'নতুন সভ্যতা'র এমন এক বনিয়াদ গড়েছে, যেদিকে নানা দুনিয়া এগিয়ে যাবে। আমি একটু বেশি রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী; অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আমার পছন্দ হয় না। এ সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি যে, জটিল সামাজিক কাঠামোয় বাধ্য হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে হয়েছিল এবং সম্ভবত সামাজিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু গণ্ডী টানাই হল সত্যিকারের ব্যক্তিস্বাধীনতায় পৌঁছুবার একমাত্র উপায়। বৃহত্তম স্বাধীনতার খাতিরে অনেক সময় ছোটোখাটো অধিকারে বেড়া দিতে হয়।'

মার্কসবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই মেনে নিতে তাঁর তেমন অসুবিধে হয়নি। যেমন : তার সর্বাঙ্গীণ অখণ্ডতা এবং মন আর বস্তুর অদ্বয়ভাব, বস্তুর গতিময়তা এবং

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কার্যকারণ আর উৎপত্তি, বৈপরীত্য আর সংশ্লেষের ভেতর দিয়ে বিবর্তন অথবা উল্লম্ফনজনিত ক্রমাগত পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব।

কিন্তু তাতেও তাঁর খাঁই পুরো মেটেনি এবং সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

প্রায় নিজের অজান্তে তাঁর মনে ঠাঁই নিয়েছে ভাষা ভাষা ধরনের বেদান্ত ঘেঁষা একটা ভাববাদী দৃষ্টি। মন আর বস্তুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ততটা নয়—ফারাকটা ছিল মন পেরিয়ে কিছু একটা থাকার ব্যাপারে। সেই সঙ্গে ছিল নীতিশাস্ত্রের একটা প্রেক্ষাপট। নৈতিক দৃষ্টি বরাবর এক থাকে না। মনের সাবালকত্ব আর সভ্যতার অগ্রগতির ওপর তা নির্ভর করে। নেহরু বলতেন যুগের যেমন মানসিক আবহাওয়া, নৈতিক দৃষ্টিও সেইমত হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর মনে হয়েছে, এর ওপরও কিছু থেকে যায়—কিছু মৌলিক প্রেরণা, যার জান খুব শক্ত। কমিউনিস্ট বা আর কারো কাজ আর মৌলিক প্রেরণা বা নীতির মধ্যে প্রায়ই যে বিচ্ছেদ দেখা দিত, তাতে নেহরু ক্ষুণ্ণ হতেন।

নেহরুর মানসতীর্থে এসে মিশেছিল নানা খাপছাড়া ভাব। তিনি সেসবের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে বা তাদের মিলিয়ে দিতে পারেননি। তখন সাধারণভাবে ঝোঁকটা ছিল এই—যে মৌলিক প্রশ্নগুলোকে নাগালের বাইরে বলে মনে হচ্ছে, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না; তার চেয়ে একমনে জীবনের সমস্যাগুলোর কথা ভাবো—নজরটাকে নাকের নীচের ছোটো করে দেখ কী করবে এবং কীভাবে করবে। চূড়ান্ত সত্য কী, আমরা পুরোপুরিভাবে বা অংশত তা ধরতে পারি বা না পারি—কমবেশি বিষয়ীগত হলেও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিস্তর বাড়ানো যায়; তাতে একদিকে মানুষ মাথা উঁচু করে যেমন ভালোভাবে বাঁচতে পারবে, তেমনি সমাজ সংগঠনেরও ঢের উন্নতি হবে।

তিনি দেখেছেন এমন লোকের অভাব নেই, বিশ্বের রহস্যভেদ করতে যারা মশগুল হয়। সমাজ আর ব্যক্তির হালফিল সমস্যা থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখে। এদিকে বিশ্বরহস্যের খেই খুঁজে না পেয়ে হয় তার হতাশা আর নিস্ক্রিয়তায় ডুবে যায়, নয় তো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতে, না হলে কোনো অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। সমাজের বাইগুলোকে পূর্বজন্মের কর্মফল বা মানুষের স্বভাবের দোষ বলে তারা মনে করে। অথচ এর অনেক কিছুই দূর করা সম্ভব। তা না করে তারা যুক্তিবিচারহীন কুসংস্কারের জালের নিজেদের বেঁধে রাখে।

যুক্তিবিচার আর বিজ্ঞানের পথে চললেও আমাদের চিন্তাভাবনা সব সময় বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। ঘটনাপুঞ্জকে নানা মাত্রায় প্রভাবিত আর নিয়ন্ত্রিত করে এত সব উপাদান আর সম্পর্ক যে তার থই পাওয়া সম্ভব নয়। এ সত্ত্বেও ক্রিয়াশীল প্রধান প্রধান শক্তিগুলোকে বেছে নিয়ে এবং বাইরের বস্তুজগৎকে নজর করে দেখা, পরীক্ষানিরীক্ষা আর হাতেকলমে যাচাই করার ভেতর দিয়ে আমরা ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আর সত্যের দিকে হাতড়ে হাতড়ে এগোই।

নেহরু বলেছেন : 'এ ক্ষেত্রে এবং এইসব গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে, আমার মনে হয় সাধারণ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলেও তা থেকে টানা সিদ্ধান্তগুলো এবং অতীত আর বর্তমানের

ঘটনাবলির ব্যাখ্যাগুলো সব সময় মোটেই স্বচ্ছ নয়। সমাজের বিকাশ বিষয়ে মার্কস সব মিলিয়ে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা আশ্চর্যরকমের নির্ভুল বলে মনে হয়। এ সত্ত্বেও, পরে নূতন এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যার সঙ্গে তাঁর অব্যবহিত কালের ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি। পরেকার পরিবর্তিত অবস্থায় মার্কসীয় তত্ত্বকে লেনিন কয়েক ক্ষেত্রে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এরপরও আবার টনক নড়ার মতো সব ঘটনা ঘটছে—ফ্যাসিবাদ আর নাৎসিবাদের উত্থান এবং তার অন্তরালবর্তী যা কিছু। সাক্ষাৎ প্রযুক্তিবাদের দ্রুততার সঙ্গে দুনিয়ার চেহারা বদলে দিচ্ছে। আর তার জের হিসেবে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা।'

সমাজতন্ত্রবাদের মূলতত্ত্ব নেহরু মানতেন। তার মধ্যে আবার নানা মুনির নানা মত। ঘরোয়া বিতর্কের অত সব ঝামেলায় নিজেকে তিনি জড়াতে চাননি। এদেশের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো তাঁর ধাতে সইত না। তাঁর ধারণায়, চুলচেরা তাত্ত্বিক তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে তারা কেবল শক্তিক্ষয় করে। নেহরুর তাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। বিজ্ঞান এখন যে পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তাকে জীবনের এই জটিলতায় কোনো একটা বাঁধা তত্ত্বের অচলায়তনে নিজেকে ধরে রাখার কোনো মানে হয় না।

ব্যক্তিজীবন আর সমাজজীবন, সুসমঞ্জস্যভাবে বাঁচা, ব্যক্তির অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আর গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সম্পর্কের মধ্যে সাযুজ্য, ক্রমান্বয়ে আরও ভালো আরও উন্নত হওয়া, সমাজের ক্রমাভিব্যক্তি, মানুষের নিরন্তর দুঃসাহসী অভিযান—নেহরুর কাছে এই সবই ছিল আসল সমস্যা। বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী নজর করে দেখা, যথাযথভাবে জানা, সুচিন্তিত যুক্তি—এই হবে তার সমাধানের পথ। সত্যানুসন্ধানে সব সময়ই যে এ পদ্ধতি খাটবে এমন নয়। যেমন, শিল্পে কাব্যে বা অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তব পদ্ধতি চলবে বলে মনে হয় না। সত্যকে উপলব্ধি করার আর যেসব উপায় আর অন্তর্দৃষ্টি—সেসবও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। বিজ্ঞানের জন্যেই তার প্রয়োজন—এই খুঁটি কিছুতেই ছাড়া চলবে না, নইলে সমকালীন জীবনের সমস্যা আর লোকের অভাবমোচনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা কেবল উদ্ভট কল্পনার অকূল পাথারে হাবুডুবু খাব। জীবন্ত দর্শন হল সেই, যাতে থাকে আজকের প্রশ্নের উত্তর।

নেহেরু মনে করেন, আধুনিক সভ্যতা যতই কৃতিত্ব দেখাক, তার মানে এ নয় যে, আমরা সব কিছুর শেষ জেনে গিয়েছি। প্রাচীনকাল আর মধ্যযুগের মানুষও এক সময় নিজেদের মনকে এই বলে চোখ ঠেরেছিলেন। আমাদের আর কিছুই জানতে বাকি নেই—এই ভ্রান্তিবিলাস একালে আমাদেরও সাজে না।

বিজ্ঞানের সাধনপ্রণালী আর গতিমুখ মানুষের জীবনে যে বিপ্লব এনেছে ইতিহাসে অবশ্যই তার তুলনা নেই। আমূল বদলের বহু বন্ধ পথ খুলে দিয়ে অজানা রহস্যের দোরগড়ায় আজ তা মানুষকে এনে দিয়েছে। জ্ঞান আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কোনো ভেদ থাকছে না। প্রকৃতির ছন্দোময় শক্তির অঙ্গ হয়ে দেখা দিচ্ছে মানুষের ভবিতব্য।

প্রকৃতি আর অতিপ্রকৃতের সীমারেখা লঙ্ঘন করা যাবে কি যাবে না, এ সংশয় নিয়েই

নেহরুকে বলতে হয়েছে : '...হয়তো সেই বেড়া ডিঙোতে আমরা পারব না, যা দুর্জ্ঞেয় তা দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যাবে, যাবতীয় বদল সত্ত্বেও জীবন হয়ে থাকবে গুচ্ছের শুভ অশুভের বোঝা, একের পর এক সংঘাত, বিসদৃশ আর পরস্পরবিরোধী তাড়নার এক অদ্ভুত যোগফল।'

এই ভয়ও নেহরু করেছিলেন যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যদি নৈতিক শৃঙ্খলা আর ন্যায়-অন্যায় বোধ যুক্ত না হয়, তাহলে তার ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে এবং শয়তান স্বার্থান্ধের দল অন্যের ওপর আধিপত্য করবে বলে বিজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে বিজ্ঞানেরই মহৎ কীর্তির ধ্বংস ডেকে আনবে।

ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত আর অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেহরু তখনও মানুষের ওপর ভরসা হারাননি। শত দুর্বলতা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে মানুষ আদর্শের জন্যে, সত্যের জন্যে, বিশ্বাসের জন্যে, দেশের জন্যে—শুধু জীবন নয়, নিজের প্রিয় সব কিছু বিসর্জন দিয়েছে। সেই আদর্শ বদলাতে পারে, কিন্তু আত্মত্যাগের সেই ক্ষমতা আজও বজায় আছে; আর সেই জন্যেই তার অনেক কিছুই ক্ষমা করা যায় এবং তার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও মানুষ তার মর্যাদা, তার অভীষ্ট শ্রেয়োবোধে বিশ্বাস—কোনেটাই হারায়নি। প্রকৃতির প্রচণ্ড ক্ষমতার কাছে সে তো খেলনামাত্র, এই বিপুলাকার বিশ্বে সামান্য ধূলিকণাও নয়—তবু সে চতুর্ভুজের শক্তিকে পরোয়া করেনি। যে মনবিপ্লবের লালনস্থল, সেই মনের জোরেই সেইসব শক্তিকে সে মুঠোয় আনে। দেবতারা, যেমনই হোক, মানুষের মধ্যে দেবতুল্য কিছু একটা আছে, শয়তানেরও কিছুটা।'

আমার এ লেখায় আমি নেহরুর কথা থেকেই তাঁর মনের হদিশ পেতে চেয়েছি। সব কথা যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, নানা প্রসঙ্গেই একথা তিনি বলেছেন। ভাষান্তর করতে গিয়ে সে মুশকিল বেড়েছে বই কমেনি। উদ্বৃত্তির বাইরেও আমি যথাসম্ভব তাঁরই কথা মাথায় রেখেছি। ফলে, ভাষান্তরে সব কথার ঠিক আড় ভাঙেনি। এ সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে, শতবর্ষ আগে জন্মেও এ দুনিয়ায়, নেহরুই একালের সবচেয়ে কাছের লোক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মনশ্চক্ষে যে ভবিষ্যৎকে তিনি দূর থেকে দেখেয়েছিলেন, তার অনেক কিছুই আমরা আজ চোখের সামনে ঘটতে দেখছি।

আমার সমবয়সী আরও অনেকের মত রাস্তায় মিছিল থেকে মার্কসবাদী এ-দেওয়ালে সে-দেওয়ালে মাথা ঠুকে শেষ পর্যন্ত কমিউস্টি পার্টির সদর দরজায় পৌঁছেছিলাম। লেবার পার্টির হাত ধরে শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ির পর দল বদলে ছাত্র আন্দোলনে বাঁধা পড়েছিলাম। লেবার পার্টি ছিল ঘোর কংগ্রেসবিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টি দলগতভাবে তখনও কংগ্রেসে। কিন্তু না শ্রমিক আন্দোলনে, না ছাত্র আন্দোলনে আমরা বিশুদ্ধ কংগ্রেসিদের ধারেকাছে পাইনি।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমাদের কাছে কংগ্রেস তখন খরচের খাতায়। গান্ধি-অনুগত নেহরু প্রগতি শিবিরে থেকেও আমাদের চোখে সন্দেহভাজন। স্তালিনপন্থী নেতাদের মুখনিঃসৃত মার্কসবাদই আমাদের কাছে ছিল বেদবাক্য। সেইসঙ্গে সংগঠনে তার হাত শক্ত

করেছিল এখানকার সন্ত্রাসবাদের ঐতিহ্য। সমাজতন্ত্রবাদের সোভিয়েত ছাঁচের বাইরে আর কিছু থাকতে পারে, এটা আমাদের কাছে তখন ছিল অকল্পনীয়।

কংগ্রেস সম্পর্কে কমিউনিস্টদের সমালোচনাকে নেহরু কী চোখে দেখেছিলেন? 'কংগ্রেসের মতাদর্শ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অনেক সমালোচনাই যেমন জোরালো তেমনি সুনির্দিষ্ট; পরবর্তী ঘটনায় তা অংশত প্রমাণিত। দেখা গেছে ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত তাঁদের কিছু কিছু পূর্বেকার বিশ্লেষণ আশ্চর্য রকমভাবে নির্ভুল। কিন্তু যখনই তাঁরা নির্বিশেষ তত্ত্ব ছেড়ে খুঁটিনাটিতে পা দেন বিশেষ করে কংগ্রেসের ভূমিকা বিচার করেন, তখনই হতাশজনকভাবে তাঁরা পথ হারান।' এদেশে সংখ্যায় আর প্রভাবে কমিউনিস্টদের পিছিয়ে থাকার কারণ 'কমিউনিজম সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে স্বমতে টেনে আনার বদলে তাঁরা অন্যদের গালাগাল দেওয়াতেই বেশি মন দিয়েছেন। সে আঘাত ফিরে এসে তাঁদেরই গায়ে লেগেছে এবং তাতে তাঁদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে।'

নেহরু মনে করতেন কংগ্রেস সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণার গোড়ায় গলদ রয়েছে। সে ধারণাটা হল : ভারতীয় ধনিকশ্রেণী আর জমিদারদের স্বার্থে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধে আদায় করার জন্যেই কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ওপর জনশক্তির চাপ সৃষ্টি করছে। কংগ্রেসের কাজ হল 'কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত আর কলকারখানার শ্রমিকশ্রেণির অর্ধনৈতিক আর রাজনৈতিক বিক্ষোভকে বোম্বাই, আমেদাবাদ আর কলকাতার মিলমালিক অর্থলগ্নিকারীদের রথের সঙ্গে যুতে দেওয়া।' ভারতীয় পুঁজিপতিরা যেন পর্দার আড়ালে থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে হুকুম দিচ্ছে—গোড়ায় গণ-আন্দোলন গড়ে তোলো এবং যেই দেখবে বেশি বেড়ে যাচ্ছে আর বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখনই তা থামিয়ে দেবে কিংবা তার মোড় ঘুরিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়। কংগ্রেস নেতারা আদতে চায় না ব্রিটিশ চলে যাক, কেননা তাহলে অনাহারী দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ আর দোহন করার ভার তাদের ঘাড়ে এসে পড়বে এবং ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণি মনে করে তারা সেটা পেরে উঠবে না।

নেহরুর মতে, এটা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলার ব্যাপার। ইউরোপে, শ্রমিক আন্দোলনের পিঠে ছুরি মেরেছে শ্রমিক নেতৃত্ব। কিন্তু সে নজির ভারতের ক্ষেত্রে খাটে না। এখানকার জাতীয় আন্দোলন শ্রমিক বা সর্বহারার আন্দোলন নয়। নাম থেকেই ধরা যায় যে, সেটা বুর্জোয়া আন্দোলন; সমাজব্যবস্থার বদল তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আন্দোলনের এই মূল ভিত্তিটা মেনে নিলে, তারপর আর একথা বলার কোনো মানে হয় না যে, যেহেতু নেতারা ভূমিব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা করছেন না, সুতরাং তাঁরা জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। কংগ্রেসের মধ্যে কিছু লোক ভূমিব্যবস্থা আর পুঁজিবাদব্যবস্থার বদল চেয়েছে; কংগ্রেসে তারা ক্রমশই দলে ভারী হয়ে উঠছিল।

কংগ্রেসের ভেতরে তখনও নানা মুনির নানা মত। এমন লোকেরও অভাব ছিল না যাদের ফ্যাসিবাদের সঙ্গে পীরিত। স্বদেশি আন্দোলনে ভারতীয় মালিক শ্রেণির অবশ্যই

স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে। কিন্তু জমিদার শ্রেণি কংগ্রেসের ওপর খাপ্পা তো ছিলই, পুঁজিপতিরাও অনেকেই কংগ্রেসকে ডোবাতে ছাড়েনি। কংগ্রেসের চোখের সামনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সামাজিক স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। এ সত্ত্বেও গান্ধিজির নেতৃত্বে যে আশ্চর্য গণজাগরণ ঘটেছে, ভাসা ভাসাভাবে তার ওপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ছাপ থাকলেও তাকে বৈপ্লবিক লক্ষ্য হাসিল হয়েছে।

জওহরলাল নেহরুর কাছে এই কারণে কংগ্রেস ছাড়ার প্রশ্নই ওঠেনি। কেননা তার অর্থ হত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সবচেয়ে জোরালো অস্ত্রের ধার ভোঁতা করা এবং নিষ্ফল হঠকারিতায় মিথ্যে পণ্ডশ্রম। কংগ্রেস সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এইখানেই ছিল নেহরুর পার্থক্য।

কংগ্রেসের যা গড়ন, তাতে কি তার পক্ষে মৌলিক সামাজিক সমাধার পন্থা নেওয়া কোনো কালেই সম্ভব? আজ থেকে অর্ধশতাধিক বছর আগেই নেহরু তাঁর 'আত্মজীবনী'তে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কংগ্রেসে 'এই সমস্যা যদি তোলা হয়, তাহলে পরিণামে তা দুই, বা ততোধিক টুকরোয় ভাগ হয়ে যাবে কিংবা তাতে করে অন্তত বড় বড় গোষ্ঠীকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে। বিরোধগুলো যদি স্পষ্টতর আকার নেয় এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু দৃঢ়বদ্ধ একটি দল যদি সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কর্মসূচি নিয়ে ভোঁটে দাঁড়ায়, তাহলে আর সেটা অবাঞ্ছিত বা অনভিপ্রেত হবে না।' পরে সেই ভাঙন সত্যিই ঘটেছে।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে মতপার্থক্যের কথা নেহরু কখনও চেপে যাননি। তাঁর মতে, কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকে আছেন, অন্যদের খোঁচা মারা যাঁদের স্বভাব। দেশের অতীত নিয়ে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই; সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের ছকবাঁধা ধারণা। দেশের মাটির সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগের অভাব।

কিন্তু এ সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর ছিল পুরোপুরি শ্রদ্ধার মনোভাব। 'কমিউনিস্টরা হলেন সেই মানুষ যাঁরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; সোভিয়েত দেশের বাইরে, কমিউনিস্টদের বিস্তর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আমি বরাবর তাঁদের অশেষ সাহস আর আত্মত্যাগের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অগণিত মানুষ দুর্ভাগ্যক্রমে যেমন দুঃখক্লেশ ভোগ করে, সেইমত তাঁরাও প্রচুর কষ্ট পান, কিন্তু অশুভঙ্কর সর্বশক্তিময় অদৃষ্টের সামনে চোখ বন্ধ করে নয়। তাঁরা দুঃখ বরণ করেন মানুষের মতন; সেই ক্লেশ স্বীকারের মধ্যে থাকা একটা সকরুণ মহিমা।'

কমিউনিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে খোঁচার চেয়ে তাঁর অভিমানের সুরই বেশি ধরা পড়ে। 'আমার শিকড় আজও বোধ হয় অংশত উনিশ শতকের মাটিতে; আমার ওপর মানবতাবাদী উদার ঐতিহ্যের এত বেশি প্রভাব যে তার থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বুর্জোয়া পটভূমি আমার পায়ে পায়ে লেগে থাকে; স্বভাবতই এটা অনেক কমিউনিস্টের আমার প্রতি চটবার কারণ। আমি গোঁড়ামি অপছন্দ করি; কার্ল মার্কসের রচনা বা অন্যান্য বই অপৌরুষের শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেব প্রশ্নাতীত বলে মানা, সেই সঙ্গে

আধুনিক সাম্যবাদের উপসর্গ হয়ে দেখা দেওয়া বিধিনিষেধের কড়াকড়ি আর মতে না মিললেই পেছনে হন্যে হয়ে লাগা—এসব আমার খারাপ লাগে। রুশ দেশে যা ঘটেছে তার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়—বিশেষ করে, স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যধিক বল প্রয়োগ। এ সত্ত্বেও সাম্যবাদী দর্শনে আমার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।'

নেহরুর কাছে মার্কসবাদ ষোলোআনা মূল্য পেয়েছিল এই কারণেই যে, তাতে কোনোরকম গোঁড়ামি নেই, আছে বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ আর লক্ষ্যে পৌঁছুবার রাস্তা এবং সেইসঙ্গে কথাকে কাজে পরিণত করার মনোভাব। সমসাময়িক কালের সামাজিক ঘটনাবলি বুঝতে যেমন তা সাহায্য করে, তেমনি সেই গোলকধাঁধা থেকে নিষ্ক্রমণের পথও দেখিয়ে দেয়। এই ক্রিয়াপদ্ধতি কোনো বাঁধাধরা অপরিবর্তনযোগ্য রাস্তা ধরে চলে না। তাকে চলতে হয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। নেহরুর এর স্বপক্ষে লেনিনের লেখার দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একটি হল : 'একটা বিশেষ ঘটনা কোনো একটা সময়ে বিকাশের ঠিক কোন স্তরে রয়েছে তা খুঁটিয়ে বিচার না করে সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় সম্পর্কে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার অর্থ হল মার্কসীয় ভিত্তি থেকে একেবারেই সরে যাওয়া।' দ্বিতীয়টি হল : 'শেষ কথা বলে কিছু নেই; আমাদের সব সময়ই চারদিকের অবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নেহরুর বারবারই একটা টান ছিল। তার সব কিছুই তিনি পছন্দ করেননি। বিরুদ্ধে সব মত জোর করে চেপে দেওয়া, বিধিনিষেধের কড়াকড়ি আর ছাঁচে ঢালার চেষ্টা, নীতি অনুযায়ী চলতে গিয়ে অনর্থক বলপ্রয়োগ—এর কোনোটাই তিনি সমর্থন করেননি। কিন্তু একদিকে তিনি যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা আর যথেচ্ছাচারের মধ্যে তফাত টানায় বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বলপ্রয়োগকে এক করে দেখেননি। নেহরু মনে করতেন, 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগের ব্যাপারটা মনে হয় তার সহজাত; রুশ দেশে বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় হলেও তার উদ্দেশ্য হল শান্তি আর সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে জনসাধারণ সত্যিকার স্বাধীনতা পাবে।'

নেহরু কখনই মনে করেননি যে, সোভিয়েত দেশের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর মার্কসবাদের সত্যাসত্য নির্ভর করছে। এমন হতে পারে না যে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে সে দেশের পরীক্ষানিরীক্ষা ধোপে টিকল না। কিন্তু তাতে তার সামাজিক বিপ্লবের মূল্য নাকচ হয়ে যাবে না। সে দেশের অনেক ঘটনা নেহরুর মনঃপুত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি সোভিয়েতকেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভরসাস্থল বলে মনে করেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল যে, অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ আর দমনপীড়ন এমন একটা অশুভ পরিণাম সৃষ্টি করবে, যা কাটিয়ে ওঠা রীতিমত শক্ত হবে। কিন্তু সে দেশের নের্তৃত্বের ওপর তাঁর ভরসাও ছিল যে তাঁরা ভুল করলেও তা থেকে শিক্ষা নিতে ভয় পান না। তাঁরা তাঁদের চাল বদল করে আবার নতুন করে গড়বেন।

সোভিয়েতে ইউনিয়নে আজ যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর নবনির্মাণের পর্ব শুরু হয়েছে, তা নেহরুর সেই মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে।

নেহরু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে বিশ্বাসের জোরে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাশিত নবযুগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, আজ সেই পটপরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে এদেশের দলভুক্ত কমিউনিস্টরা কেন কিন্তু কিন্তু করছেন?

এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, স্তালিনবাদের ভূত তাঁরা এখনও ঘাড় থেকে নামাতে পারছেন না। আসলে নকলনবিসি ছেড়ে নেহরু দেশের মাটিতে সমাজতন্ত্রকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার যে ডাক দিয়েছিলেন, তাকে ভেজালের কারবার বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলায় নেহরুকে পশ্চিমীদের বন্ধু বলে উপহাস করা হয়েছিল।

নিকটকে দূর আর আপনকে পর করতে এদেশে কমিউনিস্টদের জুড়ি নেই। নইলে কমিউনিস্টরা নেহরুর হাতে হাত মেলালে এদেশের চেহারা কবে বদলে যেত। নেহরুর জন্মশতবর্ষে দরকার কমিউনিস্টদের খোলাখুলি আত্মসমীক্ষার এবং অতীতের পুনর্বিচার।

নেহরু নেই। কিন্তু নেহরুপন্থা আজও বেঁচে আছে. নেহরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেসি আর কমিউনিস্টরা এক সঙ্গে কাঁধ মেলাবেন কি মেলাবেন না—তারই ওপর নির্ভর করছে এদেশের আশু ভবিষ্যৎ।

নেহরুর স্মৃতিরক্ষার এমন সুযোগ যেন আমাদের হাতছাড়া না হয়।

(জওহরলাল নেহরু জন্মশতবর্ষে এই লেখাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। বর্তমান সময়ে এটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পুনরায় প্রকাশ করা হল।)

৬ জ্ঞানপীঠ সম্মান পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি

(৭ নভেম্বর ১৯৮৪, কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়। জ্ঞানপীঠ নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ড: করণ সিংহ, কমিটির সচিব ড. এ কে জৈন, ড. গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা প্রমুখ এই সভায় ভাষণ দেন। ওই অনুষ্ঠানে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ কবিতার হিন্দি অনুবাদের একটি বই প্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সুমিত্রা সেন ও সুমন চট্টোপাধ্যায় গান শোনান। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার গ্রহণকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দেন তার পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করা হল।)

'স্বাগতম' কথাটা বড় বেশি পোশাকী। আমরা বাঙালিরা বলে থাকি 'আসতে আজ্ঞা হোক'। আমার হাতে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তুলে দিয়ে বাংলা ভাষাকে সম্মান জানাতে এতদূর কষ্ট করে আমাদের এ শহরে আপনারা যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তার জন্যে সকলের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশের বাড়ি হলে দিতাম বসবার পিঁড়ি আর পা ধোবার জল। কিন্তু দেশভাগ হয়ে দেশের বাড়ি বলে আর আমাদের কিছু নেই। কলকাতা কোলে তুলে না নিলে কোথায় থাকতাম কে জানে।

ফুলের কাঁটাকে আমি ভয় করি, কিন্তু মাছের কাঁটার আমি যম। বাড়ির ছেলেপুলেদের গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালজ্ঞানে আমার পায়ে পড়ে। এটা জেনে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া প্রবাদটা যে কত সঠিক, আমাকে দেখে আপনারা সবাই সেটা বুঝতে পারবেন।

ছেলেবেলায় আমার কপাল এতই সরু ছিল যে, গুরুজনেরা বলতেন ছেলেটার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

এরপর একটা ঘটনা ঘটল। চুনোপুকুর লেনের স্পোর্টস-এ হাইজাম্প আর লংজাম্পে ফার্স্ট হওয়ার পর ছিল স্লো-সাইকেল রেস। শুরু করেই দেখি আমি সকলের আগে। আমি ধরেই নিলাম আমার জেতার কোন আশা নেই। এমন সময় কানে এল আমাকে সবাই 'বাক্ অপ, বাক্ আপ' করছে। পেছনে তাকিয়ে দেখি ব্যালেন্স রাখতে না পেরে একের পর এক সবাই পড়ে গেছে। আমি তখন পাঁই পাঁই করে চালিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেলাম। মেডেল কম পড়ে যাওয়ায় বেস্টম্যান হয়ে সেবার পেয়েছিলাম গাঁদাফুলের মালা।

পরে বাড়ি ফিরে আয়নায় দেখে মনে হল আমার কপালটা যেন আর তত সরু নেই।

আমার তিন কুলে কেউ বাহাত্তর পেরোয়নি। ভাগ্যের জোরে আমি হেসেখেলে তিয়াত্তর টপকেছি। সবুরে মেওয়া ফলে, এটা মেনে নিলেও শিকে ছেঁড়ার ব্যাপারটা কিন্তু থেকেই যায়। অন্য ভারতীয় ভাষার কথা বলতে পারব না। কিন্তু বাংলাভাষার স্বয়ম্ভরসভায় রাজপুত্তুররা সবাই ডাকসাইটে। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। রাজকন্যাকে এখানে এগোতে হয় চোখ বুজে, নয় কপাল ঠুকে। তা না হলে কাকে ফেলে কার গলাই বা সে মালা দেবে?

ভাগ্য মানুষকে আকাশে তোলে। উড়োজাহাজের যাত্রীর মতন আবার তাকে নেমেও আসতে হয়। ওঠা আর নামার মাঝখানে থাকে একটা কি-হয় কি-হয় ভাব। ভালোয় ভালোয় নেমে আসবে না ভেঙে পড়ে পিণ্ডি পাকিয়ে যাবে— কেউ তা জোর গলায় বলতে পারে না। কেন না দুর্ভাগ্য সব সময়ই ছায়ার মতন ভাগ্যকে অনুসরণ করে।

সৌভাগ্য লাভের হয়। কিন্তু বীরভোগ্য পৃথিবীতে দৃঢ়পায়ে মাটি আঁকড়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় যে পুরুষকার, তা অনেক বেশি গৌরবের।

এবার নিজের কথায় আসি।

ভারত উপমহাদেশের আমরা অগ্নিকোণের মানুষ। আর্য-সভ্যতার মানচিত্রে আমরা অন্তেবাসী। আর্যভাষারা এ প্রান্তে এসে আদিবাসীদের সঙ্গে কায়োমনোবাক্যে মিশে গিয়েছিল। আমাদের আকৃতি প্রকৃতি ভাষায় আচার আচরণে তার ছাপ আজও স্পষ্ট। আমরা পুরুষেরা কুচ্ছিত হলেও, আমাদের মেয়েদের একটা আলাদা লাবণ্য আছে। আমরা একটু বেশি ভাবপ্রবণ, চট করে তেতে উঠি, চট করে দৃষ্টিটা প্রায়ই একটু একপেশে হয়। বাংলার ব্রতপার্বণে, ধ্যানধারণায়, নাচগানে, নকশা-আলপনায়, হাতের কাজে সেই পূর্বাপর জনজীবনের সমন্বয়ের ধারা আজও বহমান। বাংলার লোকশ্রুতিকে যে ডোম-চাঁড়ালেরা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে আমাদের হাতে ধরে দিয়েছে, তারা আমাদের প্রণম্য।

হাজার কয়েক বছর আগে এ-তল্লাটের মানুষ কী ভাষায় কথা বলত, তা জানবার আজ আর কোনো উপায় নেই। ছাড়া ছাড়া কিছু শব্দে তার রেশ রয়ে গেছে। মুখে মুখে আর্যভাষার

ভোল পালটে দিয়ে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে তাকে বাংলা করে নিয়েছি। জাতের বিচার না করে লাগসই শব্দজুড়ে আমরা বাংলাভাষার খাঁই মিটিয়েছি।

সাহিত্যে কৃত্রিমতার পাট উঠিয়ে দিয়ে বাংলায় আমরা মুখের ভাষাকেই লেখার রাজ্যে তুলে এনেছি। সংস্কৃতপীড়িত বাংলাকে বাঁচাতে একদিন এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথের আজ্ঞা অমান্য করে আজও বাংলার ঘাড়ে আমরা ইংরেজির জোয়াল চাপিয়ে রেখেছি।

আমি জানি, কেউ তার একার জীবন দিয়ে সব কিছুর পরিমাপ করতে পারে না। আজ যা আছে, কাল তা ছিল না। তেমনি আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না। ইতিহাসের সেই ভাঙাগড়া আর ওঠাপড়ার হিসেবনিকেশের মধ্যে যাব না। আমার আশাভঙ্গের বেদনাগুলোকে আজ এমন দিনে কী হবে খুঁচিয়ে তুলে? তার চেয়ে বলি আমার জীবনের গল্প। আমি লেখার জগতে কীভাবে এলাম। সেটা আগে বলে নিই।

খুব ছেলেবেলায় বাড়ির আর সবার মত আমার গানের ভালো গলা ছিল। বারো বছর বয়সে টাইফয়েড হয় যমে-মানুষের টানাটানিতে আমি বেঁচে উঠি, কিন্তু আমার গানের গলা, মনে রাখার ক্ষমতা আর দৃষ্টিশক্তি মার খায়।

দুনিয়াজোড়া আর্থিক সঙ্কটের ধাক্কায় সরকারি চাকরিতে বাবার মাইনে কাটা গেলে, মেজোকাকার জুট অফিসের চাকরি চলে গেলে আমরা শহরতলিতে সস্তায় দেড়খানা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে আসি।

প্রকৃতির কোল ছেড়ে প্রথম যখন কলকাতায় আসি তখন আমি এক মনমরা হুতুশে বালক। এঁদো ঘর থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে চোখের জল মুখে মায়া কাজল পরিয়ে দিয়েছিল রাস্তা। গান্ধী-মহারাজের ডাকে তখন বিলিতি কাপড় পুড়ছে, মদের দোকানে পিকেটিং, লাল পাগড়ির দল বেধড়ক পেটাচ্ছে, খবরের কাগজ বন্ধ। যারা একদিন বাঙাল বলে দূর-দূর করত, পাড়ার গেজেট হওয়া ইস্তক তারাও আমাকে আদর করে কাছে ডেকে শহরের খবর শুনছে। তারপর এলো আগুন ঝরা দিন। গুলিতে ফাঁসিকাঠে, অনশনে শহিদেরা প্রাণ দিচ্ছে। হাতে চাবুক নিয়ে পুলিশ ঘোড়া ছোটালেও রাস্তা কখনও ফাঁকা হয় না।

ছুটিতে গ্রামে গেলে লক্ষ্মীর পাঁচালি আর সত্যপীরের পাঁচালি ভক্তিভরে শুনতাম সিন্নির লোভে। রাজশাহীর নওগাঁয় হিন্দু-মুসলমানেরা আমরা একচত্বরে থাকতাম। ঈদ হোক, পুজো হোক, আমরা ছোটরা কেউ কারও কাছছাড়া হতাম না। লালনীল কাগজ কেটে মিলাদশরিফে ইস্কুল সাজাতাম।

যখন আমরা লালবাজারে আবগারি ব্যারাকে থাকতাম, দাদার সঙ্গে আমি গির্জার প্রেয়ারে যেতাম। বাবা-মার সঙ্গে যেতাম বেলুড় মঠে। পাড়ায় আমাদের খেলার সাথী ছিল বাঙালি, খ্রীস্টান আর অ্যাংলোইন্ডিয়ান ছেলেরা। গোটা পাড়া ছিল পার্শি, সিন্ধি, ইহুদি আর আর্মানিতে ঠাসা। পাশেই ছিল চীনাপট্টি। ব্যারাক ভর্তি ছিল অবাঙালি সেপাই. তাদের কাছে গায়ে মাটি মেখে কুস্তি শিখতাম। নানা লোককে নিজেদের নানান ভাষায় কথা বলতে শুনেছি, মা গড়গড় করে হিন্দি আর ওড়িয়া বলতে পারতেন—মাতৃভাষা আমাদের মনগুলোকে

ছোট করে দিতে পারেনি।

আমি চেয়েছিলাম অন্য কিছু হতে। খুব ছোটতে ইচ্ছে ছিল সন্ন্যাসী হওয়ার। নয়তো হব পল্টন। শুনে মা বলেছিলেন, 'আমার কী হবে?' মাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, 'কেন, তোমাকে পিঠের ঝোলায় বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাব।' একটু বড় হয়ে আমার উচ্চাশা পথ ছেড়ে খেলার মাঠে গিয়ে ঠেকল।

আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখালিখি শুরু করিনি। আমার এক সহপাঠীর দাদাকে খুব সমীহ করতাম। ওঁদের হাতে লেখা কাগজে লেখা চেয়ে প্রথম উনিই আমাকে লেখার জগতে ঠেলে দেন। লোকে যেভাবে কথা বলে সেইভবে একটা লেখা কষ্টে সৃষ্টে দাঁড় করালাম। ওরা দল বেঁধে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, আমার গদ্যের হাত বেশ ভালো। উৎসাহের চোটে আরও একটা লিখে ফেললাম। ইস্কুল যখন ফাঁকা, তখন একদিন বিকেলে চুপি চুপি লেখা দুটো ম্যাগাজিনের বাক্সে ফেলে দিলাম। লেখার ভূতও সেই সঙ্গে ঘাড় থেকে নেমে গেল।

তখন আমার চোদ্দ বছর বয়স। ইস্কুলে গরমের ছুটি শুরু হয়ে যাবে। নগেনবাবু সংস্কৃত পড়ালেও বেশ হালফ্যাশানের মানুষ ছিলেন। স্কুলের বেয়ারা এসে ওঁর টেবিলে সদ্য ছাপা একতাড়া ম্যাগাজিন দিয়ে গেল। উনি তার থেকে একটা নিয়ে পড়াতে লাগালেন। আমরা সেই ফাঁকে মনের সুখে গল্প জুড়ে দিলাম। হঠাৎ কানে এলো স্যার আমার নাম ধরে ডাকছেন। উঠে দাঁড়ালাম। 'এটা তুমি নিজে লিখেছ?' তখনও আমি জানি না ম্যাগাজিনে আমার লেখা ছাপা হয়েছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ, স্যার।' 'তুমি গ্যেটে পড়েছ?' পড়া দূরের কথা, তখন পর্যন্ত গ্যেটের নামও শুনিনি। স্যার বললেন, আমার লেখায় নাকি গ্যেটের ভাব আছে। আমি তাঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

ক্লাস যখন শেষ হল, দেখি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁচু ক্লাসের একদল ছেলে আমার খোঁজ করছে। আমি এগিয়ে যেতেই তারা এক ঝটকায় আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে যেতে যেতে বলল, 'লক্ষ্মীবাবু' বসে আছেন। তোমাকে ডাকছেন।' লক্ষ্মীবাবু আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। আমরা ওঁকে যমের মতো ভয় করতাম। গিয়ে দেখি সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেদের উনি আমার লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন। পড়া শেষ করে সেখানেও আবার আমাকে নিয়ে একচোট আদিখ্যেতা হল।

ইস্কুলের বাইরেও বেশ কিছুদিন ধরে চলল এর জের।

লেখার ভূত ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরল। যাই লিখি তাই গদ্য হয়ে যাচ্ছে দেখে কিছুদিন পর, যারা আমার কাছের লোক, যারা চাইছিল আমাকে দিয়ে তাদের ব্যর্থ মনস্কাম পূরণ করিয়ে নিতে —তারা বেঁকে বসল। তারা বলতে লাগল, 'তুমি লেখক হয়েছ। কিন্তু এবার তোমাকে কবি হতে হবে।'

সে সময়ে গদ্য লিখতে না জানলে কবি হওয়া যেত না। কবির স্থান ছিল লেখকের এককাঠি ওপরে।

তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নাকের জলে-চোখের জলে হয়ে পদ্যের চরণে কোনওরকমে ঠাঁই করে নিয়ে কীভাবে আমি কবির পদবি জুটিয়েছিলাম, সে আর এক

বৃত্তান্ত। আমি সেই ঘোরপ্যাচের মধ্যে যাব না।

মোট কথা, আমার জীবনভর চলছে গদ্য পদ্যের এই টানাপোড়েন।

আমার কতটা দৌড়, আমি তা জানি। আমি কালের রাখাল নয়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, আমি কালের পুতুল। আমি নেচেছি কুঁদেছি দেশকালের সূত্র ধরে।

মঙ্গলকাব্যের কবিরা অনেকটা সেইরকম মনে করতেন। ঠাকুর দেবতারা নাকি তাঁদের ওপর ভর করে তাঁদের দিয়ে নিজের নিজের মাহাত্ম্যের কথা বলিয়ে নিয়েছেন।

কে কীভাবে নেবেন জানি না। তবে ভর হওয়া মানে বিভোর হওয়া। তাতে অন্তঃপ্রকৃতির আর বহিঃপ্রকৃতির দ্বৈতভাব ঘুচে যায়। যে কোনও সৃজনক্রিয়ার এটাই হল শর্ত। অভিপ্রায় যেন গুণপনার জোরে স্বচ্ছন্দে নাচতে নাচতে সূচনা থেকে পরিণামে পৌঁছে যায়।

দান জিনিসটা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন কেউ তা গ্রহণ করে। যেমন 'একাকী গায়কের নহে তো গান', তেমনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে চাই, যে চোখ দিয়ে দেখবে, কান দিয়ে শুনবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, সৃষ্টির উদ্ধার নেই।

দ্রষ্টা, শ্রোতা আর পাঠক। এঁরাই হল সেই আর কেউ। এঁরা ছাড়া কোনও সৃষ্টিই সম্পূর্ণ হয় না বলে এঁরাও সৃষ্টির অংশীদার। একথা কবুল করে, আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি যে, নিজের বিপদ আমি নিজেই ডেকে আনছি। জ্ঞানপীঠের সম্মান আমি সর্বান্তঃকরণে আমার পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। কিন্তু সম্মানের সঙ্গে বড় রকমের একটা অর্থমূল্যও যে জড়িয়ে আছে। আমার ষাট বছরের লেখকজীবনে আমি যত পাঠক পেয়েছি তাঁরা সবাই যদি তার অংশ চান, তাহলে আমার কপালে কানাকড়িও জুটবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং পাঠকেরা যদি নিছক তত্ত্ব হিসেব এটাকে ধরেন, তাহলে আমি এ যাত্রা বেঁচে যাই। কিন্তু দোহাই 'তত্ত্ব' কথাটাকে আবার বৈষয়িক অর্থে কেউ নেবেন না।

জ্ঞানপীঠ যত ভাষাকে পুরস্কৃত করে, তার সব ভাষার মানুষকেই আমাদের এই হরবোলা শহরে মিলবে। দেশের বাড়ি খোয়ালেও আমি সে জায়গায় পেয়েছি বিশাল এক দেশ। যার ভূত, ভবিষ্যৎ সবটাই আমার। আসমুদ্র-হিমাচল আমার কাছে অবারিত দ্বার। জাতে বাঙালি হয়েও আমি জাতিতে ভারতীয়। আমরা নিজের ভাষায় ঘর-সংসার করি, হিন্দির ফেরিনৌকায় হাটে যাই, তীর্থ করে ফিরি। আমাদের এই হরবোলা শহরের দর্পণে আমি দেখি সারা ভারতের মুখ বংশপরম্পরায় এখানকার শানবাঁধানো পাথরে মাথা কুটে যারা কলকাতাকে বড় করেছে, বস্তা বস্তা টাকা তাদের মাথা-গোঁজার জায়গা, পার্ক ময়দান, জলাভূমি সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। এই হরবোলা শহরে আসুন আমরা সব ভাষাভাষী একবাক্যে হাতে হাত বেঁধে এর গতি রোধ করি।

গোড়ার যুগে কবিরা ছিল সমাজের নায়ক। মন্ত্র পড়ে তারা বৃষ্টি নামাত, ভূত ছাড়াত। সেই সুবাদে আমি আপনাদের হাত সাফাইয়ের একটা জাদু দেখাব। তাতে আপনাদের ধৈর্যের ওপর চাপও একটু কমবে।

সারা দেশ আজ হাপিত্যেশ করে আছে সর্বদুঃখহারা নতুন শতাব্দীর জন্যে। আমার মতন যাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তাদের বুক ঢিপ ঢিপ করছে। সাতসাতটা

শীত এখনও তাদের ভালোয় ভালোয় উৎরোতে হবে। আমি এই সাতকে ফুসমন্তরে একে নামিয়ে এনে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।

আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দেব রবীন্দ্রনাথের সেই 'কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি, কৌতূহল ভরে আজি হতে শতবর্ষ পরে' কবিতাটা। তাকিয়ে দেখুন, ষোলোকলায় পূর্ণ হয়ে তখনই আমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চদশী। বাংলার আগন্তুক নতুন শতাব্দী। আর সামান্য একটু অপেক্ষা। তারপরেই 'ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে' বলে বরণ করে তাকে আমরা ঘরে ডেকে নেব।

কবিদের জাদুতে লোকের আর এখন বিশ্বাস নেই। আশা করি এবার আপনাদের বিশ্বাস হল।

ভানুমতীর খেলাটা দেখিয়ে এবার আমি বিদায় হই ঃ

সাদার গায়ে ছিটানো কিছু কালি—
বিষয়আশয় বলতে সেই বুড়োর
আর আছে কী?
এই নিয়েই তো খালি
যত রাজ্যের চাপান আর উতোর।

ইহকালের কাছে তো সেই বুড়ো
পাতেন হাত,
আপনি মিলেছে যা
তাতেই খুশি, হোক না খুদকুড়ো
হোক কিছু তার চোখের জলে ভেজা।

ইহকালের ভয় নেই আর বুড়োর
ভয়টা শুধু পরকালের এখন,
পড়েছে দাঁত, গেছে চোখের নজর,
মানে না দেহ আগের কড়া শাসন।

স্বর্গনরক পাপপূণ্য ওসব
দেয় না তাকে টান কিংবা ঠেলা,
বেঁচে থাকার প্রত্যহই পরব,
যা দেখে তাই ভানুমতীর খেলা।।

বুড়ো হলে লোকে একটু বেশি বক বক করে। ইংরিজিতে কারো হয়তো মনে হবে—'খালি কলসির আওয়াজ বেশি'। আমি ভাবছি বাংলার সেই প্রবাদটার কথা—'ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি' সেই মিষ্টতার স্বাদ নিশ্চিন্তে এবার আপনারা গ্রহণ করুন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে কবিতা—

অবশেষে

গণেশ বসু

দখল কি হয়ে গিয়েছিলে?
না।
উপেক্ষায় দুঃখ পেয়েছিলে?
না।
অতীত কি ভুলে গিয়েছিলে?
না।
চেতনা কি হারিয়েই ছিলে?
না

গলা ছেড়ে আগে-পরে কী কী গেয়েছিলে?
মানুষের গান।
পায়ে-পায়ে আগে-পরে কী কী চেয়েছিলে?
মানুষের মান।
হাতে হাতে সে সময় কী কী বয়েছিলে?
রাতুলনিশান।
চোখে চোখে সে সময় কী কী খুঁজেছিলে?
মানুষের ঘ্রাণ।

অবশেষে পেঁচারা কোথায়?
বাদুড়েরা খেলে কোন্ গাছে?
স্মৃতি সব মহেঞ্জোদারোয়?
কবিতাই রোদ হয়ে আছে।

Vol. IV Issue-VIII / ISSN : 2394-4889

কবি যখন পদাতিক

তরুণ মুখোপাধ্যায়

তাঁর কলম ট্রাক্টরের পাশে নামিয়ে রেখে
তিনি হাঁটছেন;
মাঝে মাঝে সঙ্গীদের ডেকে বলছেন
: একটু পা চালিয়ে ভাই—

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে
শতাব্দী গড়ে উঠছে
তবু সভ্যতা, মানুষ কেউ এগোচ্ছে না;
সবাই পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,
আর ক্ষমতা, অর্থ, চটজলদি খ্যাতি
কিংবা শিরোপার লোভ বাড়ছে;

মুখুজ্যে দেখছেন :
আজও অনেকের পেটে ভাত নেই
আজও যুবকেরা কাঠবেকার
আজও নারীরা ধর্ষিতা অবমানিতা.....

আখের গুছিয়ে নিচ্ছে সবাই; বাড়ছে প্রতাপ,
দম্ভ আর অযোগ্যের ভিড়—
যোগ্যতা এখন আনুগত্য, পদলেহন;
আর প্রতিবাদ শুধু নিজে না-পেলে!

তাই মুখুজ্যে ফের নেমেছেন পথে;
ফুলখেলা ছেড়ে অন্ধকারে হাতে-হাতে
গুঁজে দিচ্ছেন চিরকুট; বলছেন,
একটু আগুন দেবে ভাই?

পা চালাতে থাকে সব আর রাস্তাও নিজের নিজের মতো চলে

তাপস রায়

কিন্তু কোথাও পৌঁছানো গেল না। ক্যানিং লোকাল রোজ রোজ ভোরবেলা করে
সাঁতার সাঁতার ভোরবেলা মেলে দিচ্ছে এই
পথের বাজার, বিক্রি না হোক তোলা দিতে হবে
আজ কাঁকড়া এনেছি, সাথে দেশি ডিম, সাপলার আঁটি
মিড-ডে-মিলের কাছে ছেড়ে আসি বাছাদের
ও আমার সাত রাজার ধন রিকশাচালক স্বামী, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো

যেভাবে প্রত্যেকে ঘুমোতে যায়, কবিও গেলেন সেইভাবে
শুধু রজনীগন্ধার বুকে ওগুলো সাজিয়ে রাখতে হলো
মস্কোর ভদকা এখনো রয়েছে, ঘুমোতে যাবার আগে নার্ভগুলো শান্ত হতে হবে
কাল আবার মিছিলে নিজের মুখ, কাল আবার হুডখোলা গাড়ি
স্বপ্ন আসবে না, টাকা চাই, সল্টলেকের দিকে সরকারি বাড়ি ফসকে না যায়।

ঝা ঝা রোদ, কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটাকে ফিরতে হবে ক্যানিং লোকালে
ও রকম তাকায় কেন ঘুঘনিওলাটি! মর মর
চোখে ন্যাবা নাকি, হাতের নোয়ায় কোনো বিশ্বেস নেই! দে দুটাকার দে
ছিটকে পড়েছি আমি গাঁয়ের বধূটি, কিন্তু সত্যি সত্যি
কোথাও যাইনি, সে মিনসেকে বলে একবার পুরী ধামে যাওয়া যেত যদি।

কবি খুব নজরে রাখেন দেশকাল, কবি খুব যোগাযোগ প্রিয়
পুরস্কার মূল্যের দিকে তাঁবু গেড়ে রাখা আছে, যেকোনো হাওয়ার উপরে উঠে
ঘোড়া ছুটোনোতে দর তাঁর, শুধু তিনি লিখে যান হাঁটবার অমোঘ নিয়ম

আবারও বসন্ত এল

রবীন বসু

আবারও বসন্ত এল, আবারও রঙের ফাগুন
তুমি কবি শব্দ ছেনে বর্ণ দিয়ে ঝরালে আগুন!

সাম্যবাদ চেয়েছিলে, চেয়েছিলে শ্রেণির বিলোপ
লেখকের কলম যেন হয় শ্রমজীবী, হয় নির্লোভ!

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ যেন না করে বিভেদ
তুমি রাম আমি রহিম প্রতিবেশী থাকি অভেদ!

মিছিলে মিছিলে পা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়েছ অহরহ
তবুও বেড়ার ধারে জীবন দেখি এখনও দুর্বিসহ!

আজও কারা যেন চোখ রাঙিয়ে হচ্ছে যাচ্ছে অন্ধ
'তাদের নাকের কাছে ধরে দিও ফুলের একটু গন্ধ'!

আবারও বসন্ত এল, আবারও এক জন্মদিন অনন্ত
তাই বলি কবি, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'।

লাল টুকটুকে আকাশে বিহঙ্গ একা

শ্রীজয়

একটা লোক
গ্রাম-গঞ্জে শহরে-নগরে চষে বেড়িয়েছে,
জাতীয় পতাকার তিনটি রঙকে
একটা লাল কাপড়ে ঢেকে।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাটের চুল
দশাসই চেহারায় কলের ধোঁয়া আর
পথের ধূলো এঁদো পুকুরের পাড় ধরে
দিয়েছিল রাজার কান মলে।

লাল আকাশের কোল ধরে ওড়ে
সাদা সাদা বক, শত পানকৌড়ি
ঝুপ ঝুপ করে পদ্ম-পানির বনে;
ঝুলছে প্রাণ, অসংখ্য ফাঁস-দড়ি।

লোকটার পাঁজরে লাগে বুটের আঘাত,
গরাদের কালো রাত ভেঙে সেদিন
বাইরে এসে দেখে রক্ত আর হিংসা
দিয়েছে জুড়ে আকাশের সীমানা।

একদিন দিলেন টেনে ফেলে
রাতের সামিয়ানা, দুঃখের জানালা,
মহাকাশে উড়িয়ে জয়ের ফানুস
লাল টুকটুকে আকাশে বিহঙ্গ একা।

সবুজ আর সবুজ কলে-কারখানায়,
ছেঁড়া রেশনের থলি উঠেছে ভরে কানায় কানায়,
রিপু করা ফতুয়ার নীচে ঘুমায় এবার
হিংসুটে অমাবস্যা।

কিছুদিন পর দেখি লোকটা, লাল কাপড়টা
কাঁদছে বুকে জড়িয়ে বাতাস বিদীর্ণ করে,

আবার আমরা বন্দী নিজেদের তৈরি করা
'নিজেদের জেলে পাশাপাশি সেলে'।

বার বার লোকটা পথ মাড়ায় আর খোঁজে
কোথায় গেল সে বসন্তের খামার—
যেখানে উদ্ভিন্ন কালো কোকিলকে ঘিরে
পাঁজর ফাটিয়ে একটা গাছ
চেয়েছিল ভাঙতে পাথর।

ধর্মের কল

সুশীল মণ্ডল

পদাতিক জীবনের কবিতা
ছড়িয়ে আছে আকাশের নৈঋত কোণে
আছে বনে এবং মনে।
বড় মনোরম,
তবু অনুভবে অন্তরপ্রদাহ
তাই পা চালিয়ে
আমাদের সেখানে যাওয়া
হয়ে ওঠে না।

মানুষ যন্ত্রণায় কাতরায়
আর তখনি মুঠো হয়ে আসে
তোমার ম্রিয়মান বিষণ্ণ নগ্ন হাত
মানুষের কথা লেখা হয়ে যায়
মানুষের কথা বলা হয়ে যায়
শুধু মানুষের কথা।

শায়িত পৃথিবীর দৃষ্টিতে
শালিসি তির নিক্ষেপ কর
পৃথিবীকে জানিয়ে দাও—
'ধর্মের কল' শুধু বাতাসেই নড়ে।

কাপুরুষেরা মরেই আছে, আজ পুরুষের এগিয়ে যাবার দিন

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

জাগ্রত বিবেকের বুকে হাত রেখে দেখি
পৃথিবীর সমস্ত গুটানো হাতের মধ্যে থেকে
বজ্র দৃঢ় একটি হাত তির্যকভাবে
লক্ষ্য আমার চোখের তারাতে

কোনও দিন ভয় পাই নি কাউকে
মাটিতে চলার আগে
হলুদ হয়ে গিয়েছিল ঘাস
বিবর্ণ হয়ে গেছে আগুনের শিখা
অথচ—

অথচ কঠিন দৃঢ় হাতটা আমার দিকে
আজো সেইভাবে—
রাত্রির বুক চিরে বলে গেল
কাপুরুষগুলো জাগবে না কোনও দিন
এইভাবেই তুই এগিয়ে যা
মনে রাখিস
দুই দিকের সপ্ততল ভেদ করতে হবে

পূর্ণিমা আলোতে চেয়ে দেখি
ছিমছাম চশমা পরিহিত কবি সুভাষ...

নতজানু হই

আনসার উল হক

অগোছালো সময় আর এলোমেলো বাতাসে
পূর্ণিমার চাঁদ আটকে থাকে ঘোড়ানিমের ডালে
তুমি পথের খোঁজে ঘর ছাড়ো, মানুষ খোঁজো
সূর্য থেকে আগুন নিয়ে উনুন জ্বালাও
উজাগর ময়দানের পাশে।
উলঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে তুমি প্রতিবাদমুখর
জ্বলে উঠবার সাহস জোগাও, এখনও।

জ্যামিতি আজ ভূগোল ভেঙেছে, জানি নদী খুঁজি
নদীর জলে তোমার পুনর্জীবন দেখি
ছড়ানো ঘুঁটিগুলো নতুন করে সাজাই

তোমার নাজিম হিকমতের কবিতা' পড়ি প্রতি সন্ধ্যায়
নির্মল আনন্দে নাচে আমার হৃদয়।
দাপাদাপি হুংকারেও তুমি অটল
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকো ঝড়-তুফানেও।
তোমার কাছে নতজানু হই।

‘ওরা বৃষ্টি মেখে অপেক্ষায়’

ইভা চক্রবর্তী

কালো ধোঁয়া এবড়ো খেবড়ো রক্তাক্ত পথে
এক হাতে লাল নিশান কালিতে ডোবানো
তীক্ষ্ণ হাতিয়ার অন্য হাতে
হাঁটা শুরু—ভাঙনের শব্দ আসে কানে
ভাঙে সমাজ ভাঙে স্বপ্ন তবুও জিরোয়নি পা,
থামেনি লেখনী প্রতিশ্রুতি নতুন পৃথিবীর।
বুকের অতলে বিশ্বাসের ভিত, কোনো ঝড় পারেনি টলাতে।
হাঁটতে হাঁটতে বীজ কুড়ানো
মনের জমিতে চষে ফলানো ফসল
বাসরে তাঁর সুবাস ছিল না ফুলের, বারুদের গন্ধ ছিল ঘরে।
নীল কালো অক্ষরে সারি সারি মুখের মিছিল।

কোনো একদিন নিশানে কাদার ছোপ দলছুট।
একা! ভয় কী? গোটা আকাশের তলাটাই তো
বিশ্বাসের জমি, হারাবার ভয় নেই।
অবাধ্য শরীর আজ পড়ন্ত বেলার সঙ্গীশয্যা
ঘোরানো মুখের অস্পষ্ট ছবি—
শ্লথ হতে হতে একসময় স্তব্ধ গতি।

এদিকে গুঞ্জন ফিসফাস চাপান-উতোর
কখনো খাদে চড়ায় কখনও
ওদিকে ওরা চোখে বৃষ্টি মেঘে অপেক্ষায়।
কারও হাতে লাঙল, টায়ারের চটি কারও পায়
কারও তেলকালি মাখা হাত-দুটোতে,
বাগানের টাটকা ফুল
যাতে ওদের হৃদয় আছে মিশে।

তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিরজীবিতেষু

সৌমিত বসু

যেতে যেতে একটা ছোট নদীর সঙ্গে দেখা
ওমা, দেখি অবাক দুটো মুখ
একটা মুখে নতুন ভাষা কথার মায়াজাল
অন্য মুখে হারিয়ে যাওয়া সুখ।

একটা যুগে লুকিয়ে থাকে অন্যযুগের আলো
একটা আঙুল জন্মে সমকালীন
ভাঙতে পারো গদ্য এবং পদ্য সীমারেখা
তুচ্ছ হাতে যেন কী অদ্ভুত।

দূরে দেখি রবীন্দ্রনাথ, ‘সাতটি তারার তিমির’
দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রতীক্ষায়
বাংলা ভাষা উঠছে জেগে প্রেমের পথে ঘাটে
মাথায় তোমার পরাবে উষ্ণীষ।

একশো বছর ক’দিনে হয়, কতো ঘামের শেষে
হাতানিয়ায় দোয়ানিয়ায় ভাসে বারুদ-বিষ
হঠাৎ হঠাৎ নৌকো তোমার পেরিয়ে যায় বাঁক
তাতেই রাখি, তুচ্ছ কবির নোয়ানো কুর্নিস।

"মুখুজ্জে সুভাষ"

অলোক দাশগুপ্ত

তুমি কাস্তে তুমিই সাইরেন শঙ্খ
তুমি চির যৌবন আত্মা তুমি লালে মগ্ন,
তুমি বিরোধ সুখের, তুমি মিছিলের রাস্তা
দ্বৈপায়নে তুমি একাকিত্বের বৃত্তের দিস্তা।

আজ প্রয়োজন লুটের বিরুদ্ধে তোমার জনযুদ্ধের গান
তুমিই দাও শত্রুর জ্বলন্ত চোখে জীবনদক্ষিণা বান
তোমার আহ্বানে সীমান্তে জাগে উদ্যত খড়্গ
তুমিই বলো আগস্ট পনেরোই ফের আসবো।

তুমিই স্ট্রাইক দুঃশাসেনর পাঁজর খুলতে খসাবে চামড়া
তুমি স্ট্রাইক সাদাকে করতে পারো কালোপানি পরে
তুমি স্ফুলিঙ্গ হতাশ জীবনে ধরো হাতিয়ার
তুমিই ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত সবাকার।

তোমাকে যেতেই হবে দমন রাজার দরবারে
তুমিই বলো, হে বিষাদ তুমি যাও সময় নেই, তুমি যাও
রক্তে ভাসছে ভারত, তুমি শুনছো জলদ্‌গম্ভীর মহাকালের হাঁক
তুমি অন্ধকার কালো বারুদের মত তুমি নির্ধারিত মিছিলের বাঁক।

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'

কালিদাস ভদ্র

রাস্তার পাশে কংক্রিট পাঁজর ভেঙ্গে
হাঁটু মুড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছ
লাল লাল ফুলে গলা ফাটিয়ে
ডাকছে না, বসন্ত এসেছে আজ

নির্বাক এখন
লেনিন মূর্তি, জেরিনা ক্রসিং
রাণি রাসমণি রোড

অন্ধকার ঘুরছে
বাইক বাহিনীর মতো
কথারা নিষিদ্ধ আজ
ফতোয়া মাটিচোর, বালিচোর
ধর্ষক আর কয়লা মাফিয়াদের

দু' হাত বাড়িয়ে তবু
সামনে মিছিল
পা ছড়িয়ে রাস্তা
দাঁড়িয়ে আছে রণপায়ে

'ফুল ফুটুক না ফুটুক'
আমি আজ মিছিলে যাবো
মিছিলের সেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ধরে
মিশে যাব আমিও অনন্ত আকাশে।

শতবর্ষে

মধুশ্রী সেন সান্যাল

শব্দেরা নেশার মতো—
নিরাকার নয়, রূপ রস গন্ধ নিয়ে
রাস্তায় বাজারে হাটে, মাঠে ও ময়দানে...
আকীর্ণ অব্যয় আঁকে
হোঁচট, সংঘাত আর জীবনের গান—

কাঠাফাঠা রোদ্দুরে চামড়া সেঁকে
ভালোবেসে আগুনের ফুলকি,
নবযুগের শাণিত স্বপ্নের বুঁদ
ব্যঞ্জনা এগিয়ে যায় পা-চালিয়ে দূরে.....
'আফ্রিকা'-র অপার মহিমা আর
না-ফেরা ছেলের গল্প ঘিরে
চমক গড়িয়ে নামে ইতিহাস ছুঁয়ে

দূরের অন্বয়ে, লগ্ন হয়ে থাকে 'যাওয়া'
মজার এ-খেলাঘর ছেড়ে....
অথচ উনুনে দ্যাখো 'একুশ'-এর জন্মদিনের পায়েস
বুকের বাঁ-দরজা,
টোকা মেরে তাই
ঝেড়ে ফ্যালে ঘুমপাড়ানি গান
জেগে উঠে শতবর্ষে—

আগুনের আঁচ নিভে এলে
গনগনে খুঁচিয়ে
সহযোদ্ধাকে আবার ভালোবাসে
নখের ডগায় টিপে চক্রান্তকে মেরে
খুলে ফ্যালে সব দরজা—
ভেতর-বাহির একাকার
কখন সকাল হবে!
মুখুজ্জ্যের সঙ্গে জমে উঠবে কি আবার
আলাপচারিতা?

মূক মুখে দিয়েছেন ভাষা

রমেশ পালিত

'হে পদাতিক কবি' তোমাকে মনে পড়ে অক্ষরামৃতে
১২ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, কৃষ্ণনগরের মাটি ধন্য হল তোমার আবির্ভাবে
সার্থক এ জীবন, তোমার শব্দের সোঁদা গন্ধে জারিত এ দেহ-মন
কৃষ্ণনাগরিক হিসেবে এ বড় প্রাপ্তি!
মানুষের কথা লিখেছ তুমি মানুষের ভাষায়
শহর ছেড়ে গঞ্জ, গঞ্জ হয়ে গ্রাম
পায়ে হেঁটে ঘুরেছ প্রান্তরে প্রান্তরে
দুখী মানুষের যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে ঘুরেছ অন্দরে-বন্দরে।

মনে পড়ে সেই দিনটি, ২৬ মার্চ ১৯৪৮ কারারুদ্ধ হলে তুমি
অপরাধ, মেহনতী মানুষের কথা কেন বলেছিলে উচ্চকণ্ঠে
সর্বহারা কৃষক-শ্রমিক-উপেক্ষিত-বঞ্চিত মানুষের ব্যথা বয়ে বেড়িয়েছ
মূক মুখে দিয়েছ ভাষা
আজও তুমি পৃথিবীর পথে পথে পড়ে থাকা
শত-সহস্র মানুষের জীবন্ত-আশা।

কে যায়....কীভাবে

সুস্মেলী দত্ত

শুধু জায়গা বদলে বদলে
সবকিছুই
জায়গা বদলে বদলে
সকলেই

থাকে (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কে যায়' অবলম্বনে)
বদল এলোমেলো বদল হাবিজাবি দুনিয়া ক্যানভাস নাটুকেশব
পাখিরা ডানাবতী প্রদীপ ধকধক আসলে জেগে থাকা আস্ত শব

এগলি বদলায় ও গলি বদলায় শব্দ কান পাতে ছলাৎছল
নষ্টনীড় পাখি সভ্য ঘেরাটোপ বদল হা হা সুখ সত্যি বল

অদলে বদলানো আগুন শাড়ি টারি আলনা পাট পাট মাঞ্জারঙ
ডাইনে বামে শোয়া আদতে একাকার সময় ককটেল ধিঙ্গিঢঙ

বদল আমি তুমি হাসছে হরিনাম নগ্ন আয়নারা মটকে চোখ
আমরা সব জানি তোমরা আরো জানো তবুও বলাবলি বদল হোক।

সেই তো সুভাষ

সৌম্যদীপ্ত বোস

শাণিত সত্ত্বার মতো
প্লাবিত সময়ের যুগশঙ্খ হাতে
ধৈর্য্যরত একফালি লাল আকাশ...

উজ্জ্বল সবুজ সাগরের উপর দিয়ে বয়ে চলে
মিছিল...মিছিলের পর মিছিল।

বসন্তের ডাক দিয়ে
সবাইকে জাগায় জরায়ু কুঞ্চিত সালেমানের মা।
স্তব্ধ শালীনতা
ঝরে ঝরে পড়ে মাটিতে,
অসম্ভব কালো—ধর্ষিতার কেশাগ্র।
সুপ্ত অন্ধকারে
আন্টার্কটিকার বিষ...তীক্ষ্ণ, অসহ্য,
সভ্যতার নীলকণ্ঠ কোথায়?
তুমি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন
লেনিন?

সামনে এসো...জাগাও খোলসের শীতঘুম থেকে
জাগিয়ে তোলো অন্ধকারের অধিকার,
সুপ্তথিত পরমায়ু, নির্নিমেশ শিহরণ,

যার বুকে হাত রেখে পায় প্রকাশ, সামঞ্জস্যের মুক্তাকাশ
সেই তো দৃপ্ত কণ্ঠের প্রত্যুষিত সুভাষ।

পদাতিকের অন্তিম যাত্রার খবর : দৈনিক সংবাদপত্র থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পদাতিক কবির চিরযাত্রা

অমিতাভ চৌধুরী

'কবিতা মূল্যবান, কিন্তু জীবনকে আমি আরও মূল্যবান মনে করি' — এই কথাগুলো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, যিনি দশকের পর দশক কবিতা লিখে আমাদের আলোড়িত করেছেন, যিনি জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই কবে 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ লিখে তাঁর জয়যাত্রা শুরু। তার পর আর থামেননি পদাতিক-কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ লিখে তাঁর জয়যাত্রা শুরু। তার পর আর থামেননি পদাতিক-কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ লিখেই রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিলেন, তার পর ভারতের তাবৎ মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার। বাংলা ভাষাও সাহিত্যকে ঐশ্বর্যে ভরিয়েছেন অবিরাম। সব্যসাচী লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালে। অবিভক্ত নদীয়া জেলায়—এখন যা বাংলাদেশ। ছোটবেলা কেটেছে মধ্য কলকাতার প্রায়-বস্তি এলাকায়, তার পর উত্তরবঙ্গের গাঁজা বিক্রির সরকারি আড়তে গুরুজনদের চাকরি-সূত্রে। কলকাতায় এসে ভর্তি হন ভবানীপুরের মেট্রোপলিটান স্কুলে। সেই স্কুলেই তাঁর বন্ধুত্ব হয় পরবর্তিকালে বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হেমন্তবাবুর প্রথম বেতার-গানের গীতিকার ছিলেন তিনি। প্রথম যৌবনেই যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। দলের নির্দেশে বজবজে চটকল মজুরদের সঙ্গে কাজ করতে যান। সেখানেই গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। তারপর কলকাতায় এসে চল্লিশের দশকেই দলীয় মুখপত্র 'স্বাধীনতা' দৈনিকে রিপোর্টারের কাজ করতে থাকেন। সেই সময় চলতি বাংলায় লেখা তাঁর কয়েকটি রিপোর্ট পাঠক-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ওই সময়ই তিনি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস নামে এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাজে সঙ্গে যুক্ত হন। তবে কোথাও কোনও পাকা চাকরিতে বাঁধা পড়েননি। কখনও তিনি ছিলেন বিজ্ঞাপন সংস্থার অনুবাদক, কখনও প্রকাশন সংস্থার ফরমায়েশি লেখক, কখনও ফ্যাসিবিরোধী সঙ্ঘের সক্রিয় প্রচারক, কখনও বা সংবাদপত্রে ফিচার লেখক হিসেবে বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে ভ্রাম্যমাণ। এইভাবেই লেখা হয়েছে ডাকবাংলোর ডাকে, যেতে যেতে দেখা, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ। আবার প্রকাশকের তাড়ায় লিখেছেন ছোটদের উপযোগী কবিতায় রামায়ণ—সংক্ষিপ্ত অথচ অসাধারণ। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক বিরাট বইয়ের সংক্ষিপ্ত রূপও তাঁর হাতে। তেমনি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে লেখা 'অক্ষরে অক্ষরে' বা 'কথার কথা' তাঁর ভাষা-চিন্তার সংক্ষিপ্ত রূপ। নিজে লিখি নিজে পড়ি, সেদিন জঙ্গলে জঙ্গলে, আমার বাংলা, দেশ-বিদেশের রূপকথা, মিউয়ের জন্যে

ছড়ানো-ছিটানো ইত্যাদি ছোটদের জন্যে বই তিনি লিখেছেন অতি যত্নে। অনুবাদ সাহিত্যেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দগতি। নাজিম হিকমতের কবিতা, অমরুশতক, আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি, পাবলো নেরুদার কবিতা, চে গুয়েভারার ডায়েরি, হাফিজের কবিতা, নাজিম হিকমতের আরও কবিতা, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ কত ক্ষুধা, রুশ গল্পসম্ভার ইত্যাদি অনুবাদ তাঁর সাবলীল হাতে পরিচয়। 'ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' নামে তাঁর অত্মচরিত বার বার পড়ার মত।

প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'। তারপর একের পর এক অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, জল সইতে, একটু পা চালিয়ে ভাই, ধর্মের কল, যারে কাগজের নৌকো, দুই খণ্ডে কাব্যসংগ্রহ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, বাঘ ডেকেছিল, নারদের ডায়েরি, চৈ চৈ চৈ চৈ, এই ভাই ইত্যাদি। তা ছাড়া উপন্যাস লিখেছেন কয়েকখানি। যেমন হাংরাস, ইয়াসিনের কলকাতা, কে কোথায় যায়, অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ ইত্যাদি। 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' নামে তাঁর বই বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে দিগদর্শক। মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের মত কঠিন বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর নিজস্ব সাবলীল বাংলায় 'ভূতের বেগার'। তা ছাড়া তাঁর বহু লেখা—গদ্য ও পদ্য—ছড়িয়ে আছে নানা পত্রিকায়। এই ব্যাপারে সুভাষবাবু ছিলেন কিঞ্চিৎ উদাসীন। পুরস্কারপ্রাপ্তির ব্যাপারেও অনেকটা তাই। পুরস্কারের অর্থমূল্য তাঁর কাছে ছিল অধিক মূল্যবান। পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ, আকাদেমি বা রবীন্দ্র পুরস্কার। তা ছাড়াও কালিদাস সম্মান কুমারন পুরস্কার, আফ্রো-এশীয় সাহিত্য পুরস্কার, মধ্যপ্রদেশ সরকরের দেওয়া কবীর সম্মান, আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি।

তিনি 'পরিচয়' সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার তিনি একাধিক বার গেছেন। তা ছাড়া ১৯৬১ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকা যখন নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন তিনিও সত্যজিৎ রায় ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। তিন এক কালে ছিলেন সি পি আই দলের একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী। কিন্তু ১৯৮২ সালে সব দলীয় কাজকর্ম ও কথাবার্তাকে 'ফাঁকা বুলি' মনে করে দল ছাড়েন। কিছু দিন ডাঙ্গে-প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করার পর শেষদিকে সব ছেড়েছুড়ে রাজনীতিহীন জীবন কাটাতে শুরু করেন। রাজনৈতিক আদর্শ ও কাব্য-অনুভূতির যে সমন্বয় দেখা দিয়েছিল প্রথম জীবনে, তা ভেঙে যায় নতুন পরিস্থিতিতে। তবে সব ছাড়িয়ে সব ছাপিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানুষটি ছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রিয়। দক্ষিণ কলকাতার শরৎ ব্যানার্জি রোডের ফ্ল্যাটটি ছিল সকলের জন্যে খোলা। তিনি এবং তাঁর লেখিকা ও শিক্ষিকা স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতিথিদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে কখনও দ্বিধা করতেন না। নম্রস্বভাব ও ধীরভাষী অথচ জীবনে ও মননে দৃঢ় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভালবাসার মানুষ ছিলেন সবার। তিনিও ভালবাসতেন মানুষের সঙ্গে এবং তা ধরা আছে তাঁর অজস্র রচনায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

বিদায় মুখুজ্যে! বিদায় কেতকী!

মহাশ্বেতা দেবী

সুভাষের শারীরিক এবং রোগগত অবস্থা যা ছিল, তাতে আর ও যে থাকবেন না, সেটা মনে হচ্ছিলই। তা হলেও বলব, আমাদের বয়সী বা কাছাকাছি বয়সের লোকেদের (আমরা কজনই বা আছি!) খুব শূন্য করে রেখে গেলেন। কবি হিসেব সুভাষ কী ছিলেন, তা বলতে আমি অনধিকারী। তাঁর সাংবাদিকতাধর্মী লেখাও পড়েছি, সেই চল্লিশের দশকে। কী স্বচ্ছন্দে কবিতা থেকে গদ্যে চারণ করেছেন। অবাক হয়ে ভাবি। আজ সে সব স্মৃতির মিছিল শরতের মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে, সে একান্তই ব্যক্তিগত স্মৃতির। গীতা ও সুভাষের সঙ্গে বন্ধুত্ব অনেক বছরের। অমন আনন্দে বাঁচতে কম লোককে দেখিছি, অমন মানবিক ও বিবেকী দম্পতিও অনেক দেখিনি। যখন 'সন্দেশ'-এ লেখা শুরু করি, তখন সুভাষ ও সত্যজিৎ দুজনেই আছেন। তখন আমরা ছিলাম অন্যরকম। একের আনন্দে সবার আনন্দ হোত। বিনয় ঘোষ রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন, তো আমরা সবাই কলেজ স্ট্রিটে সেই সংবর্ধনা সভায় হাজির। সুভাষ জ্ঞানপীঠ পেলেন তো সবাই আনন্দিত।

গীতা ও সুভাষের অনেকদিন একতম কন্যা পুপে। তারপর ওঁরা এক সঙ্গেই নিয়ে এলেন তোতা আর পাপুকে। কী সাহস, কী চমৎকার। আমি তো দৌড়েছিলাম ওঁদের বাড়ি, মহা আনন্দে। গীতা চালান 'সুশিক্ষণ', আমরা বেজায় খুশি। কিন্তু সবচেয়ে ভাল ওঁদের ঘরসংসার। পনেরোটা না উনিশটা বেড়াল। তাদের একেকজন একক মেজাজের। বেড়ালরা আরশোলা মারে, ইতিশ্রুতি। গরম-বর্ষা দুই ঋতুতে ওদের উঠোনে আরশোলারা কুইক মার্চ করত, বেড়ালরা বসে বসে দেখত। নানারকম ওষুধে ওদের কিছুই হোত না। একদিন দেখি সুভাষ ঝাঁটা পিটিয়ে আরশোলা মারছে। বলল; মহাশ্বেতা, ধরো আর মারো। অন্য ওষুধ নেই।

দেখা হয়, দেখা হয় না। কান যখন হরতাল করল, তখন সুভাষ কথা বলত আর কাগজ-কলম এগিয়ে দিত। যাদবপুর ব্যবসায়ী সমিতি বছর বছর অনেক স্কুলের অনেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক দেয়। একবার সৌমিত্র, সুভাষ ও আমি আছি। সুভাষ আমাদের অনেক প্রশ্ন করছেন ও মধুর হেসে কাগজ-কলম এগিয়ে দিচ্ছেন। ২০০২ সালে গুজরাট-গমন অধ্যায়ে সুভাষকে দেখতে পেলাম, উডবার্ন ওয়ার্ডে। সুভাষ লিখলেন, 'গুজরাট যাচ্ছ কেন বারবার?'

লিখলাম, 'সচল থাকলে তুমি যেতে না?'

বেজায় খুশি। মধুর হেসে বলল, 'যেতাম।'

বাংলা আকাদেমিতে সুভাষের সংবর্ধনা। ডায়াসে উঠে আমার পাশেই বসলেন। বক্তারা যে যা বলছেন, তা লিখে ওঁকে দেখাচ্ছি। উনি তার উত্তর দিচ্ছেন।

সুভাষের হাসিই বলে দিত সে শিশুদের চেয়েও শিশু, আশ্চর্য অমলিন ও শুভ্র হৃদয়। সেদিন মঙ্গলাচরণ গেলেন (কেউ কি পড়েন?)। সিদ্ধেশ্বর স্মৃতি উসকে দেওয়া লেখা লিখলেন। সুভাষও চলে গেলেন। কী আশ্চর্য গদ্য লিখতেন সুভাষ! ঢোলগোবিন্দকে কী করে ভোলা যাবে। আর কবিতার লাইন, সে সব তো 'উলিড়ুলি ছেঁড়া কাপড়ে' বুকের মধ্যে ঢেকে রেখেছি। মঙ্গলবারের দ্বিপ্রহরে, শরৎ ব্যানার্জি রোডের সেই বাড়ির সামনে অনেক মানুষ। শুয়ে আছেন সুভাষ। বুকের ওপর একটা গোলাপ। গোলাপটা না সরিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিলাম। মুখুজ্যে তবুও হাসল না। আজকের কবিতাও গদ্যলিখিয়েরা সুভাষের কবিতা, গদ্য অনেক পড়ুন।

গীতার কথা বলাই গেল না। যাবে না। আজ ৮ জুলাই সকালে একের পর এক টেলিফোন। দুঃসংবাদ আসছে আর যাচ্ছে। অন্যন্যা চট্টোপাধ্যায়কে সুভাষের কথা জানালাম।.... ও প্রান্তের অনন্যা জানালেন, কেতকীও চলে গেছেন গতকাল রাত্রি থেকে প্রত্যুষের আন্তযামে। কদিন আগেই ঊষা গাঙ্গুলি এসেছিলেন। সদুঃখে বললেন, 'মুক্তি' নাটক নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। কিন্তু খুবই আফসোস কেতকীদিদি যেতে পারবেন না। ওঁর ক্যান্সার কেতকী বড়ই আপনজন ছিল। কেতকীর মা, যিনি সত্যিই সুপারস্টার ছিলেন। প্রভাদেবীকে বিজন খুবই শ্রদ্ধা করতেন। পঞ্চাশের দশকে মোহনলাল স্ট্রিটের বাড়িতে থাকি, তখন প্রভাদেবী অনেকবার এসেছেন। কিশোরী কেতকীও এসেছে। অভিনয়, গান, সব ছিল ওর স্বভাবজ, সহজ। 'মুক্তি' নাটকে কেতকীর যোগদান, খুব দরকারি একটি কাজ হয়েছিল। ওর সময়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চলে গেলে সে সব শূন্যস্থান পূর্ণ হবে না। সম্ভবত গত বছর, রঙ্গকর্মী আয়োজিত কোনও এক সভায় কেতকী বলল, গান করুন বৌদি। অমি গাইলাম আমার মত, কেতকী নিজের মত কত না গান গাইল। সাদাপাটেই ফিরে এসেছিল, এটা ওর অর্জন।

ওর মুক্তি ঘটাল ক্যান্সার। এ মুক্তি কেউ কি চায়?
কেতকীও বড় শূন্য করে রেখে গেল।

আমার সময়ের নানা বয়সী মানুষজন আজ-কাল-পরশু মনে করিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের সান্ত্বনা কোথায়? ভোলা তো সম্ভব নয়। তাই সুভাষ ও কেতকীর সদাহাস্যময় মুখ মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সুভাষের কবিতা। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে

'দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।
মুখুজ্যে, তুমি লেখো।।'

দৈনিক আজকাল পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পদাতিক কবি সুভাষ প্রয়াত

অভিতাভ সিরাজ

পথ-চলা কবির এবার সত্যিই চলার পথ শেষ হল। মারা গেলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিক নার্সিংহোকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। গত ২৮ জুন তাঁকে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কবির চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তোলেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতে অসুস্থ অবস্থাতেই বর্ষীয়ান মানুষটিকে সরকারি হাসপাতাল থেকে তুলেএনে ওই বেসরকারি নার্সিংহোম ভর্তি করান তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে জীবনাবসান হয় 'পদাতিক' কবির। এবং তারপর থেকে শেষকৃত্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রীতিমত টানাপোড়েন চলে কবির মরদেহ নিয়ে। প্রয়াত কবির যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে নেন সপার্ষদ তৃণমূল নেত্রী। কবির অসংখ্য অনুাগী, পাঠক, বন্ধুবান্ধব ও শিল্পী-সাহিত্যিকের আশাকে ধূলিস্যাৎ করে এক 'রাজনৈতিক ঘেরাটোপে' বন্দী হয়ে চলে গেছেন অন্তিম যাত্রায়। তড়িঘড়ি কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর মরদেহ নিয়ে চলে যাওয়া হয়। তার আগে বুড়ি ছোঁয়া করে লেক টেরাসে কবি প্রতিষ্ঠিত 'সুশিক্ষণ বিদ্যালয়ে'। সেখানে প্রয়াত কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। তারপর শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও ব্রাত্য ছিলেন কবি-সাহিত্যিকরা। সকালেই দুঃসংবাদ শুনে বেলভিউতে চলে আসেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা। এসে পড়েন কবি-পত্নী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি ছিলেন এস এস কে এমে ভর্তি। খবর পেয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয় গাড়িতে। একটু পরে এসে পৌঁছন সপার্ষদ মমতা ব্যানার্জি। মেয়র সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে সুব্রত বক্সি, রাজীব দেব, মদন মিত্ররা। এসেছিলেন কবির তিন পালিতা কন্যা ও জামাতারাও। প্রায় ১০ বছর আগে 'গণদর্পণের' কাছে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৯৫ সালে ৮ মার্চ সেই অঙ্গীকারপত্রের সাক্ষী ছিলেন কবির স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বড় মেয়ে কৃষ্ণকলি রায়। এদিন কবির শেষ ইচ্ছাতে সায় (নাকি সম্মান!) দিলেন না পরিবারের লোকেরা। মমতাও কবির পরিবারের হয়ে জানিয়ে দেন, 'বৌদি (গীতা দেবী) চান না দেহদান হোক। কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি। তাই মেডিকেল নয়, কেওড়াতলা শ্মশানে শেষকৃত্য করব আমরা। তৃণমূল নেত্রীর কথায় হতাশই হলেন গণদর্পণের ব্রজ রায়। সকাল সকাল বেলভিউতে এসেছিলেন তিনিও। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী মরদেহ রাখার সব বন্দোবস্তই করা ছিল। ব্রজ রায় বলেন, 'কী করব, এখনও বহু মানুষ পুরনো সংস্কার বয়ে চলেছেন। পরিবার না চাইলে

মরদেহ নেওয়া যায় না।' প্রয়াত কবির মরদেহ 'বাংলা আকাদেমিতে' নিয়ে যাওয়া হবে কিনা, তা নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ চাপা গুঞ্জন চলে। রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে সৌমিত্র মিত্র, আকাদেমির সচিব সনৎ চট্টোপাধ্যায়, কবিপত্নীকে প্রস্তাবও দেন। কিন্তু গীতাদেবী রাজি হননি বলে জানিয়ে দেন মমতা। এরই মধ্যে বেলা ১১ টা নাগাদ এসে পড়েন রাজ্যের দুই মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার মুখার্জি ও সিপি আইয়ের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার। নার্সিংহোমের ভেতরে চুপচাপ বসেছিলেন সাহিত্যিক সুনীল, শঙ্খ ও দিব্যেন্দু। তাঁদের পাশ দিয়েই দুরন্ত গতিতে মমতা তদারকিতে নার্সিংহোমের ওপর নিচ করছিলেন। কিন্তু কথা বলেননি একবারের জন্যও। সেল ফোন হাতে মদন মিত্রও ততক্ষণে গোলাপি গোলাপের অর্ডার দিয়ে ফেলেছেন। কবির মরদেহে কোনও ফুল থাকবেনা—এমনই নির্দেশ তৃণমূল নেত্রীর। এরকমই নাকি কবির ইচ্ছে ছিল। তাই স্ত্রীর নিবেদিত একটি গোলাপ বুকে নিয়েই শকটে রওনা হলেন অন্তিম যাত্রায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঘড়িতে তখন ১২টা। গ্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সি মেনস ইউনিয়নের সাদা মরদেহবাহী শকটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রয়াত কবিকে। 'রাজনৈতিক নেতা'র ঢঙে শকটের সামনে জ্বলজ্বল করছে : সুভাষ মুখোপাধ্যায় অমর রহে'—রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটি।' বেরনোর মুখে ঢুকলেন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। মিছিল অবশ্য থামেনি। দূর থেকেই নমস্কার করলেন সুভাষ চক্রবর্তী। পেছনে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন কবি সাহিত্যিকরা। শরৎ ব্যানার্জি রোডে কবির বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন মৃণাল সেন, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, পবিত্র সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অমিয় দেব, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎ মুখোপাধ্যায়, পার্থ বসু, রামকুমার মুখার্জি, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবোধ সরকার, জয়দেব বসু, দে'জ প্রকাশনার কর্ণধার সুধাংশু দে প্রমুখ। বাইরের ঘরে কবির মরদেহ রাখা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুষ্পস্তবক পাঠান কবির প্রতি শ্রদ্ধায়। বাংলা আকাদেমিতেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে মরদেহ না নিয়ে যাওয়ায় অনেকেই বহুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যান। চির বিদায়ের অন্তিম মুহূর্তে শ্মশানে এসে শ্রদ্ধা জানান কবি জয় গোস্বামী। বহু যুগ আগে যে 'পদাতিকতায়' তাঁকে ভূষিত করেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়, সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এভাবে অন্তিম যাত্রা হয়ত মেনে নিতে পারছিলেন না অনেকেই। শরৎ ব্যানার্জি রোডের শান বাঁধানো ফুটপাথের সেই বকুল গাছকে দেখে একসময় তিনি লিখেছিলেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত.....।' বাড়ির বাইরে সেই ফুটপাথেই ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা, বুদ্ধিজীবীরা। অসহায়ের মত দেখাচ্ছিল প্রত্যেককেই। কিছুটা ক্ষুব্ধও। ছোট্ট ঘরে যেখানে গত ৪০ বছর কাটিয়েছিলেন, প্রয়াত কবির মরদেহ রাখা হয়েছিল সেখানেই। মাঝেমধ্যেই এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন গুণমুগ্ধরা। বেশিরভাগই বর্ষীয়ান। তরুণ কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যা কম চোখে পড়ল। ভেতরের ঘরে কবিপত্নীকে তখনও শান্ত্বনা দিচ্ছেন মমতা। বেলা আড়াইটা নাগাদ কেওড়াতলা শ্মশানের উদ্দেশে যখন মিছিল রওনা হল, তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন কবি-সাহিত্যিকরা। চিরশায়িত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শকটের সামনে তখন হাঁটছেন মমতা ব্যানার্জি, সুব্রত মুখার্জি, মদন মিত্র, রাজী দেব, মালা রায়, সোনালি গুহরা।

দৈনিক আজকাল পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

কবির আবার মৃত্যু হয় নাকি!

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

Do I know what rice is?
Do I know who knows it?
I do not know what rice is
I only know its price.
–Song of rice : Bertolt Brecht

গোটা ৭০ দশকটা আমি ছিলাম মুখুজ্জে পরিবারের খুব গা ঘেঁসে। পুপে-সহ তিনটি মেয়ে তো বটেই, ওদের বাড়ির বেড়ালগুলোও আমাকে পর মনে করত না।

কেউ যদি একজন নাগরিক কবির বাড়ি কেমন হবে জানতে চান, কবির শরৎ ব্যানার্জি রোডের ঝরঝরে ফ্ল্যাটে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, কবি ভাড়াটে মাত্র। যখনই গেছি, দেখেছি ৫০ বছর ধরে সব যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে, প্রতিটি আসবাব। অনেকদিনের মধ্যে নতুন বলতে একবার এসেছিল একটি টাইপ রাইটার। তার হরফগুলো ছিল বাংলা অক্ষরে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি কিংবদন্তী কাহিনীর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা আমি। একদিন সুভাষদার সঙ্গে বেরিয়েছি। তখন সন্ধ্যেবেলা। ওঁরা পরনে ক্রিজহীন শার্ট। পরিতোষ সেন থাকেন দু-একটা বাড়ি পরেই। তিনতলা থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'কী সুভাষদা, চললেন কোথায়?' সুভাষদা মুখ উঁচু করে বললেন, 'এই একটু মস্কো যাচ্ছি ভাই। তোমার কাছে একটা ওভারকোট হবে?' আমি সেই তখন জানতে পারলাম উনি সান্ধ্যভ্রমণে বেরোননি। বা, আমাকে এগিয়ে দিতে। গল্পটা অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি, লিখেওছি। আবার বললাম। লালনের একটি প্রসিদ্ধ গান আছে যার শুরু—'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কী?' বিশ্ব কেন, অনাবিস্কৃত ব্রহ্মাণ্ডেও এর তুল্য কবিতা কখনও হবে না। তো, এই 'করব কী' মিল দিয়ে সামাল দিতে 'ফকিরি' শব্দটা ওখানে এসেছে এভাবে :

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল
নয় মাসে তার গর্ভ হল।
এগারো মাসে তিনটি সন্তান
কোনটা ক'রবে ফকিরি।।

আমি যখন সুভাষদার কথা ভাবি, তখন মনে হয়, এই কূট প্রশ্নের জবাবই যেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন। পার্টির হয়ে জেল খাটলেন টানা দু'বছর—যখন পার্টি ভাঙল, যোগ দিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল সি পি আইয়ে। সিপি আই ভাঙল তো ডাঙ্গের দলে। মাঝে ছিলেন নকশালপন্থীদের জন্য ব্যাকুল। কখনও তৃণমূলিদের সঙ্গে দহরম। কখনও কংগ্রেসিদের সঙ্গে মহরম।

আজ তাঁর মৃত্যুতে শ্মশানে গিয়ে গেট থেকে ফিরে এলাম। শুধু তিনজন কবির জটলা গেটের কাছে। ভেবেছিলাম ভিড় ঠেলে এগোতে হবে। আজকের দিনটা পিস হেভেনে রাখলে তাই হত নিশ্চয়। ব্রিজের নিচে থেকে কি আর। কিন্তু শ্মশানের গেট থেকে ভিড় ঠেলে ঢুকতে হত বলেই আমার ধারণা।

তারাশঙ্করের মৃত্যুতে এইরকম চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছিল। না, আমি কোনও ইঙ্গিত করছি না। তৃণমূলের তখন জন্মই হয়নি। ১৯৭১ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর টালার বাড়িতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান। কাছেই বরানগরে মাত্র একমাস আগে রাতারাতি ১০০ ছেলে খুন হয়েছে। খানপঞ্চাশেক লোক নিয়ে মিছিলটি নিমতলা পর্যন্ত দৌড়েছিল বলাই ভাল। কিন্তু তখন না হয় বাঘ বেরিয়েছিল। আজ কী হল? কে বেরুল?

কেন বাংলা আকাদেমিতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল না? কেন এ কালের প্রিয়তম কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে পারল না তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী। আজ শোকের দিন। আজ এ-সব কথা না তুললেই ছিল ভাল।

এবং গভীর বেদনা থেকে আরও একটা জিনিস দেখলাম। যে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম পঙক্তি হল : 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?'—তাঁর জন্যে নতমস্তক একটা লাল পতাকা কোথাও দেখা গেল না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কোনও আলাদা শেকগাথা রচনা করতে চাই না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবির আবার মৃত্যুও হয় নাকি। ওই তো জীবনানন্দ দাশ। যত দিন যাচ্ছে তত বেঁচে উঠছেন। বরং যখন বেঁচে ছিলেন, তখনই ছিলন মৃত।

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন

গৌতম ঘোষদস্তিদার

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার শ্রুতকীর্তি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যা ও জামাতাকে। গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় শায়িত ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। গতকাল, সোমবার রাতে তাঁকে একটি নার্সিহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। চিরযুবক এই পদাতিক কবির মৃত্যুতে বাংলাভাষী পৃথিবী অনেকটাই অনাথ হল। শুভ্র-কেশ, শাল-প্রাংশু, সুভাষিত প্রবীণ কবির মৃত্যুর খবর পেয়ে কবি-লেখক-শিল্পীরা নার্সিংহোমে জড়ো হন কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা কবিতার একটি যুগের অবসান হল। এ-দিন বিকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তড়িঘড়ি কবির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সকলেরই যেমন হয়, তেমনই হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। কৃষ্ণনগরের সত্যভামা স্কুল ম্যাগাজিন ফল্গু-তে প্রথম কবিতা লিখেছিলেন ছাপার হরফে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তেই কবিতার দোলায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি। আজীবন ছন্দই হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিতার প্রাণ। পরে এলিয়ট, হুইটম্যান, আরাগঁ, মায়াকভস্কি, পস্তেরনাক, পাবলো নেরুদার কবিতার পাঠ নিতে নিতে তৈরি হতে থাকে তাঁর নিজস্ব কবিতাভুবন। তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন, সমাজের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির সঙ্গে সংস্কৃতির প্রশ্নটি জড়িত। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোই কবির অন্যতম কাজ।

আর সেই কাজটিই তিনি করে গিয়েছেন আজীবন। ১৯৪০ সালে প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক' বের হওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাননি বাংলা কবিতার এই অগ্রপথিক। রচনা করেছেন 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ', 'ফুল ফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'কে কোথায় যায়', 'ছেলে গেছে বনে', 'জলে সইতে', 'যা রে কাগজের নৌকো', ' শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা', 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্যসংগ্রহ'-এর মতো অবিস্মরণীয়-সব কাব্যগ্রন্থ।

চল্লিশের প্রগতিবাদী কবিতাধারায় তিনি ছিলেন প্রধানতম স্তম্ভ। সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যময়তার যে কোনও বিবাদ নেই, তা সুভাষ বুঝিয়েছিলেন আমাদের। লোকায়ত ছন্দে কবিতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মুখের ভাষার কাছাকাছি। যে-জন্যই তাঁর অসংখ্য পঙ্‌ক্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে।

নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা, জুলিয়াস ফুচিক, ওলঝাস সুলেনেভ -এর কবিতার অনুবাদেও তিনি বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। লিখেছেন 'হানসেনের অসুখ'-এর মতো অভূতপূর্ব উপন্যাস, 'ফকিরের আলখাল্লা'-র মতো অন্যমাত্রিক গদ্যগ্রন্থ।

পাঠকের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাশাপাশি তিনি পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি, জ্ঞানপীঠ এবং দেশিকোত্তম পুরস্কার।

'পদাতিক' নামে একটি কৃশকায় কবিতার বই লিখে বা কবিতায় এক অসচরাচর ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। রাজনীতি আর মানুষকে তিনি করে তুলেছিলেন কবির উপজীব্য। এ-বিষয়ে অভিভাবক বুদ্ধদেব বসুর দ্বিধাদীর্ণ আপত্তি ছিল। তিনি লিখেছেন "আমি বলতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ। হয়তো বিক্ষণ এখন আমরা ইতিহাসে এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছে যখন বাঙালি কবির হাতেও কথা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না। অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।" অনুজ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "আমি নিজে জানি, সুভাষদার মতো সহজ করে পদ্য লিখতে, চেষ্টা করেছি। পারিনি। ওঁর সে মানুষের অন্তকরণ পাব কোথায়, মানুষকে ভালো না বাসতে পারলে বুঝি এমন লেখা বের হয় না।"

সুভাষের পূর্বজ এবং অনুজ দুই কবির এই অবলোকন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝতে সাহায্য করে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও কংগ্রেস পরিষদীয় দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি শোক জ্ঞাপন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সুভাষের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে জানিয়েছেন মরদেহে মালা পাঠিয়েছেন তিনি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজীবন ছিলেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী। সতেরো বছর বয়সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থানে ছিলেন। সম্ভবত সে-জন্য বামপন্থী সরকারও তাঁকে কোল দেয়নি। অর্থাভাবে ভুগছিলেন। মৃত্যুর পর রাজনীতির থাবা পড়েছে তাঁর মৃতদেহে।

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

হায়, কবি যদি জানতেন (বিশেষ সংবাদদাতা)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৌভাগ্য তিনি এই বাংলায় জন্মেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্য তিনি এই বাংলায় জন্মেছিলেন।

সৌভাগ্যের কারণ, এই বাংলায় অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন কবি হিসাবে। দুর্ভাগ্যের কারণ, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহটিকে কেন্দ্র করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটে যাওয়া বিচিত্র এবং চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনাবলী।

সরকার পরিচালনাধীন এস এস কে এম হাসপাতালে সুভাষবাবু মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন দীর্ঘদিনই। সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা অভিযোগ করেন যে এস এস কে এম-এ সুভাষবাবুকে প্রয়োজনীয় পথ্য দেওয়া হত না। তাঁর যে শয্যাক্ষত (বেডশোর) হয়ে গিয়েছে তাও বাড়ির লোকদের জানানো হয়নি। এমনকী, বাড়ির লোকজনকে তাঁর কাছে যেতেও দেওয়া হত না। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ শুনেই তাঁকে সোমবার রাতে নিয়ে আসেন বেলভিউ নার্সিংহোমে। মঙ্গলবার সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুভাষবাবু। কলকাতার মহানাগরিক হিসাবে সুব্রতবাবু কিংবা কবির ঘনিষ্ঠ হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন তাকে বলার কিছু নেই। রাজ্য সরকারের এ-ব্যাপারে ভূমিকাও প্রশ্নাতীত নয়। যদিও এস এস কে এমের সার্জেন সুপার ডাঃ দেবদ্বৈপায়ন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—এমন কোনও অভিযোগ তাঁদের জানা নেই। এটাই তিনি জানেন না যে সুভাষবাবুর রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট কর্তব্যরত স্টাফ নার্সের হাতে জমা পড়লেও তা চিকিৎসকদের কাছে পৌঁছয়নি।

সুভাষবাবুর মৃত্যুর পর এইসব প্রশ্ন অবশ্য অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু পাশাপাশি অন্য কিছু প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়। শুরু হয়ে যায় নেপথ্যের সুতো-টানাটানি। বিনা চিকিৎসায় কবির মৃত্যু হয়েছে—এই অভিযোগ জানান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষবাবুর আত্মীয়দেরও অভিযোগের আঙুল ওঠে এস এস কে এমের দিকে। যে রাজ্যসরকার অন্য যে কোনও বিখ্যাতের মৃত্যু হলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের আপাত নিস্পৃহতাও কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে সাংবাদিকদের সুভাষবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবির লেখা চার লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন।

বিকেলে তিনি অবশ্য বলেন—"আমার মালা পৌঁছে গিয়েছে প্রয়াত কবির কাছে।" বুদ্ধিজীবী মহলে যখন প্রশ্নের ভ্রূকুটি—নন্দনে নাকি বাংলা আকাদেমিতে—কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে প্রয়াত কবিকে? তখন কিন্তু বেলভিউ চত্বর চলে য়িেছে তৃণমূল কর্মীদের দখলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট ঘোষণা—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান

দেখায়নি রাজ্য সরকার। তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেনি। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে তাদের রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। মমতার এই ঘোষণার মাঝেই বেলভিউতে পৌঁছে যান রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং নন্দগোপাল ভট্টাচার্য। কিন্তু তৃণমূলীদের বেষ্টনীতে তাঁরা হারিয়েই যান। একদিকে নেত্রীর নির্দেশ পালন, অন্যদিকে টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখলেই তৃণমূলের কিছু মাঝারি নেতার উৎসাহের মধ্যে বুদবুদের মতাই মিলিয়ে যেতে থাকে কবির শেষ ইচ্ছাটি। ১৯৯৩ সালে মৃত্যুর পর দেহদানের অঙ্গীকার করেছিলেন কবি।

তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর দেহ যেন ব্যবহার হয় মেডিক্যাল গবেষণার কাজে। গণদর্পণের সঙ্গেই ব্যবস্থা ছিল যে সুভাষবাবুর মৃত্যুর পর দেহদান এর ব্যবস্থাটি করবে তারা। গণদর্পণের কর্তা ব্রজ রায় পৌঁছে যান বেলভিউতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? যদি মরণোত্তর দেহদান-এর নামে মৃতদেহটিই 'হাইজ্যাক' হয়ে যায় বিপক্ষের হাতে! প্রয়াত কবির স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন না মরণোত্তর দেহদান করা হোক—এই রব উঠে গেল আকাশে-বাতাসে। অতএব মরণোত্তর দেহদানের কোনও সুযোগ নেই। নজরবন্দি হয়েই সুভাষবাবুর মরদেহ বের হল বেলিভউ থেকে।

যত দুরেই তিনি যান না কেন, তাঁর সঙ্গে হাঁটার অঙ্গীকার যাঁরা একদা করেছিলেন সেই কমরেডরাই বা কোথায়? সুভাষবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তাঁর অনুজ কবিরাই। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনে তাঁরাও ব্রাত্য।

সরকারি ফুলের মালা এদিন অবশ্যই পৌঁছেছে সুভাষবাবুর মরদেহে। কিন্তু সেই ফুলের কি কোনও অদৃশ্য কাঁটা ছিল! আর কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টাও কি ছিল না দু-পক্ষেরই।

হায়, কবি! মৃত্যুর পরে তাহলে সেই বিচারটা হল, আপনি কাদের কবি ছিলেন।

দৈনিক বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

পরলোকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় (বিশেষ সংবাদদাতা)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কিছুকাল রোগেভোগের পর মঙ্গলবার সকালে নার্সিহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। গত ২৮ জুন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। হৃদযন্ত্র ও কিডনির নানা সমস্যায় তিনি ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৮৪। স্ত্রী কবি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি খুবই অসুস্থ। কবি দম্পতির রয়েছে তিন পালিত কন্যা। তাঁর অমৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্টজন শেষ দর্শনে উপস্থিত হন। কবির প্রয়াণে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। কবি বেশ কিছুদিন আগেই মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করে যান। তবে মঙ্গলবার পারিবারিক আপত্তি ওঠায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালে অভিভক্ত বাংলার নদীয়ায়। মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বজবজ শ্রমিক বস্তিতে কমিউনে থাকতেন। শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। (পরে অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়) একটানা বেশ কিছু বছর ধরেই চলে এই জীবনযাপন। এই সময়েই কবিতার আত্মপ্রকাশ ১৯৩৯ সালে। পরবর্তী সময়ে ডাক বাংলোর ডায়েরি বইতে তিনি এই জীবনযাপনের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। লিখে গেছেন একের পর এক কবিতা। পদাতিক, যত দুরেই যাই, ফুল ফুটুক, ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের অসংখ্য কবিতা এই সময়কার সাক্ষী। সক্রিয় রাজনীতির পাশাপাশিই তখন বেশ কিছুকাল তাঁর লেখালেখি। কবিতা ছাড়াও অজস্র গদ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন প্রায় ষাট বছর। কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গদ্যগ্রন্থও। অনুবাদ গ্রন্থও সাতটি। এছাড়া শিশু ও কিশোরদের জন্য কয়েকটি বই। চল্লিশটিরও বেশি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটু পা চালিয়ে ভাই, ছেলে গেছে বনে, 'যেতে যেতে দেখা', 'কাল মধুমাস', 'হাংরাস', 'কবিতার বোঝাপড়া', 'চিরকূট', 'নারদের ডায়েরি', 'নিজে লিখি নিজে পড়ি', 'আমার বাংলা', 'বাণিজ্যে বাঙালি একাল ও সেকাল', 'ভূতের বেগার', 'নাজিম হিকমতের কবিতা', 'পাবলো নেরুদার কবিতা', 'চর্যাপদ', 'গাথা সপ্তশতী', 'যা রে কাগজের নৌকা', 'অন্তরীপ বা হ্যানসনের অসুখ'।

দীর্ঘ সময় ধরে কবিতা ও গদ্যে যা কিছু তিনি লিখেছেন, তার অধিকাংশই বাংলা ভাষার অসাধারণ সঞ্চয়। তাঁর গদ্যও রীতিমতো সুস্বাদু। অত্যন্ত সহজ ভাষা ও ভঙ্গির জন্য তিনি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখালিখির স্বীকৃতি সুবাদে ভূষিত হয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি (১৯৬৪), কালিদাস সম্মান, কবীর সম্মান, জ্ঞানপীঠ (১৯৯১) পুরস্কারে। এছাড়া ১৯৯৩ সালে বিশ্বভারতী কবিকে দেশিকোত্তম সম্পানে ভূষিত করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)

আমার লেখায় আমি দেখেছি, যে জায়গাটা লোকে খুব প্রশংসা করে, একটা দারুণ লিখেছ, সে সব জায়গা, আমি দেখেছি, আসলে আমার নয়। অন্যের কথা। সাধারণ মানুষের কথা। আমি মেরে দিয়েছি।

— দশ বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন কথাগুলি। নিজের সম্পর্কে, নিজের লেখা সম্পর্কে এই মন্তব্য নিশ্চয়ই তাঁর স্বভাবগত পরিহাসপ্রিয়তারই এক প্রয়াস। কিন্তু সত্যিই কি এ কেবল রসিকতার কথা? না পরতে পরতে এতে লুকিয়ে অনেকগুলি সত্য। আধুনিক বাংলা কবিতার বিশ্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেবল এক জন নায়কই নন, তাঁর অনন্য বিশিষ্টতা এইখানে যে, বাংলা ভাষাকে, বাংলা কথাকে, সাধারণ মানুষের কথাকে তিনি 'কবিতা' করে তুলেছেন। তাঁর কবিতা—শহরগাঁয়ের দিনযাপনের সাধারণ কথার প্রবল সম্ভাবনাময়তার পরিস্ফুটন। তাঁর কবিতা—মায়ের মুখের কথা, গাঁয়ের ব্রত পাঁচালি, প্রবাদ প্রবচন, রাজপথের ঘাম-রক্ত-থুতু মেশা ক্লিন্নতা ও বাঁচার অন্তহীন তাগিদের অনায়াস প্রকাশ। কী তাঁর 'কাজ, জিজ্ঞাসা করলে 'কবিতা লেখা' না বলে 'লেখা' বলতেই বেশি পছন্দ করতেন তিনি; আরও সত্যি করে বলতে গেলে, 'কথা লেখা'।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক জন মানুষ, যাঁর ক্ষেত্রে জীবনবোধ, রাজনীতি, সামাজিক অস্তিত্ব এবং সাহিত্যচর্চা পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিল এই 'কথা'র মধ্য দিয়েই। লেখাপত্রের কথা যদি বা ছেড়েই দেওয়া যায়, তাঁর দর্শনই ছিল সাধারণ জীবনস্রোতের মধ্যে ডুবস্নান করে চলা, স্নানের আনন্দেই। একেবারে গোড়া থেকেই তাঁর ভাবনায় আগে মানুষ, পরে আর সব। আগে জীবন, পরে তত্ত্ব। আগে দেশ, পরে সাহিত্য। এই মূল সূত্রটা বুঝে নিয়েই স্পষ্ট হবে, এই মূল সুত্রটা বুঝে নিলেই স্পষ্ট হবে, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলা সাহিত্যজগৎ ঠিক কোনখানটায় রিক্ত হল।

১৯১৯ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক বাড়ি অবশ্য কুষ্টিয়ার লোকনাথপুর। কিন্তু কী-ই বা প্রয়োজন নাড়ির দেশ স্মরণ করার, যখন তিনি নিজেই বলে গেছেন আর বিশ্বাস করেছেন যে 'দেশের বাড়ি খুইয়ে আমি পেয়েছি বিশাল এক দেশ, আসমুদ্রহিমাচল আমার কাছে অবারিতদ্বার। আমার এই হরবোলা শহরের দর্পণে আমি দেখি সারা দেশের মুখ।' সেই হরবোলা শহর কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের শুরু ১১ বছর বয়সে আর মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পেরোতে না পেরোতেই কলকাতার রাস্তার জীবনের হাতছানি। সেই হাতছানিতেই কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যোগাযোগ। সেই যোগাযোগেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কারাবাস। কিন্তু তার অনেক আগেই, ১৯৪০ সালে, বেরিয়ে গেছে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'। বেরিয়ে গেছে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট

কবিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮)। রাজনীতি কেমন করে মিলেছে তাঁর কবিতার সঙ্গে বুঝতে গেলে রাজনীতি থেকে তিনি কী পেয়েছেন সেটাই আগে জানতে হবে। তাঁর নিজের মতে রাজনীতি থেকে তাঁর প্রাপ্তির উৎস-কর্মসূচি, প্রস্তাবকরণ কৌশল নয়, তাঁর প্রাপ্তির উৎস—দেওয়ালে পোষ্টার মারা, অফিসঘর ঝাঁট দেওয়া, মিছিলে গলা মেলানো, কাগজে ডাকটিকিট সাঁটা, খেতখামার কলকারখানার কাজ করা, বস্তিতে আর কুঁড়ে ঘরে মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথার শোওয়ার সব অভিজ্ঞতা।

হাটতে হাঁটতে কবিতা রচনা চলত, তাই তিনি 'পদাতিক'। হাঁটার সঙ্গে কবিতার এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থেকেছে সারা জীবন। সাধে কি বলতেন, পায়ে ব্যথা, তাই আর কবিতা লিখতে পারছি না। সাধে কি বলতেন, তাঁর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁর পা! রাস্তার সঙ্গে ভালবাসাটাও লক্ষণীয়। কেবল কি শহরের রাস্তা? যখনই পারতেন, বেরিয়ে পড়তেন কোনও না কোনও একটা গ্রামের দিকে, না হলে লিখতে পারবেন না বলে আর তার চেয়েও বড় কথা, না হলে তিষ্ঠোতে পারবেন না বলে। কেবল কি দেশের রাস্তা? গল্প প্রচলিত আছে, এক বার উত্তর কলকাতার বাসে তাঁকে দেখে এক জন জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছেন সুভাষদা? 'মস্কো।' বিস্মিত আর্তনাদ—সে কি? কেমন করে?' 'কেন, বাসে এয়ারপোর্ট, সেখান থেকে প্লেন!' কবে থেকে নেমেছিলেন তিনি রাস্তায়? সহজ উত্তর, 'আমাদের বাড়িতে বসার ঘর ছিল না, তাই রাস্তাই ছিল আমাদের দারুণ বাইরের ঘর। কেউ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বেরিয়ে আসতে পারি।

ডাক যে এমন ভাবে শুনতে পায় বা শুনতে চায়, তার জীবনে ডাক কি আর থামে? বাইরেই তাই কাটিয়ে দিয়েছেন সবটা সময়। মাটির বাড়িতে থেকেছেন, পার্টি কর্মীর অতি সামান্য টাকায় গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছেন, স্থির করে ফেলেছেন, অন্য কোনও জীবিকা নয়, কেবল লিখেই বাঁচবেন তিনি। বস্তুত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই বিরল দৃষ্টান্ত, যিনি পার্টি মুখপাত্র 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা'য় সাংবাদিকতা করেছেন, প্রুফ দেখেছেন, হকারিও করেছেন, কিন্তু আসলে কেবল লেখাকেই জীবিকা করেছেন আমৃত্যু। অনেক দুঃখ, অনেক অভাবের তাড়না সইতে হয়েছে তার জন্য। সয়েছেন, কিন্তু নিজেকে ক্লিষ্ট হতে দেননি।। ঠিক এই জায়গাটাতেই স্মরণ করতে হবে তাঁর সাহিত্যিক-সহধর্মিনী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, দু'জনে মিলে কী ভাবে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন সব ভয় আর বিপদ, কী ভাবে মহোৎসাহে লালন করে গেছেন লালিত কন্যাদের।

এর মধ্যেই কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ কিংবা গদ্য লেখা এসেছে হাত ধরাধরি করে। 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই'—এর সঙ্গেই এসেছে প্রথম উপন্যাস 'হাংরাস', এল নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ, হাফিজের অনুবাদ, রোজেনবার্গের পত্রগুচ্ছ বা অ্যান ফ্রাঙ্কের ডায়রির অনুবাদ। বেড়াতে ভালবাসতেন খুব, তাই লিখলেন কিছু ভ্রমণকাহিনিও। পুরস্কার-স্রোতও থেমে থাকল না, দেশ-বিদেশের নানা শিরোপা এসে জমা হল কয়েক দশক ধরে। পুরস্কার প্রসঙ্গে একটা তাঁর একটা বিশ্বাসের

কথা উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, পুরস্কার তাঁকে অবশ্যই বিগলিত বা বিচলিত করতে পারত না, কিন্তু বাস্তববাদিতার খাতিরে তার একটা প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতেন তিনি। অনুবাদ সাহিত্যের কোনও প্রকৃত কদর নেই এ দেশে, এই ছিল তাঁর বরাবরের আক্ষেপ। কেউ মন দিয়ে অনুবাদের কাজটা করেন না, আর তাই একটা বিশাল ফাঁক থেকে যায় এখানকার সাহিত্যজগতে। অন্য ভাষার লেখা পড়তে পড়তেই তো অন্য সমাজ বা অন্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। অনুবাদ-সাহিত্যকেও পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানাতে শুরু করলে এই অভাব দূর হতে পারে, বলতেন তিনি।

বেড়া ভাঙতে ভয় পেতেন না মোটে। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বার বার সেই দৃষ্টি ও সাহসের পরিচয় মিলেছে। যে কমিউনিজমের হাত ধরে তিনি কৈশোরেই জীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সেই রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয় পরে, কেননা সেখানে তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁর প্রিয় দেশকে আর দেশের মানুষকে। দুঃসাহসী সুভাষ স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ দেশি বুর্জোয়ার চেয়ে বড় শত্রু। যে জাতীয় কংগ্রেস সম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-এর সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কী করে তাকে একেবারে দুচ্ছাই বলব, ভেবেছিলেন তিনি। মনে করেছিলেন, পেরেস্ত্রৈকা, গ্লাসনস্ত দুঃখী মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেবে। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার দাম হিসেব রাজনীতিগত দুর্নাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু থেমে থাকেননি। যে সাহস ও বলিষ্ঠতা বাঙালি চরিত্রে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, তাঁর মুখে শোনা গেছে তা 'কে কী মনে করবে এই ভেবে চুপ করে থাকার সময় এটা নয়। মনের কথা খুলে বলাই ভাল। ভুল বললে, ধরিয়ে দেবার, শায়েস্তা করার লোকের অভাব হবে না।' তাই, 'সবই আজ নতুন করে ভাবছি।' বুঝে নিতে দেরি হয় না যে এই কবিই বলতে পারেন 'ফুলকে দিয়ে/ মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই/ফুলের ওপর কোনও দিনই আমার টান নেই। /তার চেয়ে আমার পছন্দ/আগুনের ফুলকি/যা দিয়ে কোনও দিন কারও মুখোশ হয় না।'

তত্ত্ব বা আদর্শের চেয়ে ভালবাসা (তাঁর প্রিয়তম শব্দ) অনেক বেশি বড় ছিল তাঁর কাছে, তাই এতটা স্পষ্ট আর সাহসী হতে পারতেন। বুকভরা ভালবাসা নিয়ে একটু পা চালিয়ে এগোলেই মিলবে মুক্তি, বিশ্বাস করতেন। 'সারা দেশ আজ হাপিত্যেশ করে আছে সর্বদুঃখহরা নতুন শতাব্দীর জন্যে। আমার মতন যাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তাদের বুক টিপটিপ করছে,.....(এ সময়টা) ভালয় ভালয় উৎরাতে হবে, সবার মুখে হাসি ফোটাতে হবে।' পদাতিক কবি যথাসাধ্য করেছেন সবার জন্য, চুরাশি বছর ধরে হেঁটে হেঁটে নতুন শতাব্দীতে উৎরে দিয়েছেন ঠিকই। যা যা দায় বাকি রইল, তা এখন আমাদের।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

‘দুখন্তি, শুকনো গাছে এ বার পাতা জাগবে’

বিশ্বজিৎ রায়

পদাতিকের কবি চলে গেলেন। তাঁর এই শেষ যাত্রার আগের মাসগুলোতে বার বার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছিলেন তিনি। না কোনও নতুন স্মৃতিধার্য কাব্যপংক্তির জন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম না আমরা; আলোচনা করছিলাম তাঁর শারীরিক দুর্ভোগ নিয়ে, আর্থিক সংকট নিয়ে। বিশেষ করে কবির আর্থিক সংকটের খবরটা বড় গায়ে লেগেছিল আমাদের। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দজীবী কেন দিন কাটাবেন দারিদ্রে। কেন সরকার বহন করবেন না তাঁর ব্যয়ভার, এমন জিজ্ঞাসাও উঠে পড়ছিল। আর তখনই অনিবার্য ভাবে আলোচনার কেন্দ্র দখল করছিল রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয় আশয়।

আচ্ছা, এ সব আলোচনার শব্দকল্পক্রমও কি শ্রুতিহীন শব্দসন্ধানীর বোধ স্পর্শ করেছিল? তার উত্তর জানা নেই। তবে অর্থের আর এক সংকটে বিচলিত ছিলেন তিনি। সেই সংকট শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং সমস্ত পৃথিবীরও বটে। কয়েক মাস আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ডাক পড়েছিল তাঁর। এক প্রান্ত বিকেলে শুনিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাস ‘কে কোথায় যায়’-এর অংশ বিশেষ। সে দিনের সেই পাঠকক্ষে যাদবপুরের তরুণ-তরুণীরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন, যে ক’জন ছিলেন তাঁদের বসার জন্য সেখানে সুপ্রচুর জায়গা ছিল। স্রোতাদের সংখ্যা ও চরিত্র লক্ষ করলে টের পাওয়া যাচ্ছিল, কবির উপন্যাস-পাঠ যাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন তাঁর অধিকাংশই মানবিকী বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন বিষয়ের প্রাজ্ঞ প্রৌঢ় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। কেউ কেউ অবসরও নিয়েছেন। সুভাষের পাঠ শুনতে শুনতে তাঁরা সবাই নিজের মতো করে যাচাই করে নিচ্ছিলেন আধুনিক সময়ের সংকটকে। অনেকে ভাবছিলেন হয়তো, কবির সংকটমোচনের জন্য কিছু তো অবশ্য করা উচিত কিন্তু অন্য এক অর্থসম্পদে ঋদ্ধ এই মানুষটি জীবনের এই প্রান্তবেলায় আবারও যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, সেগুলো নিয়েও কি কিছু করা যায় না?

‘কে কোথায় যায়’ সুভাষের দ্বিতীয় উপন্যাস, সেই ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত। অথচ ২০০৩-এর বসন্ত বিকেলে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এই তো আজকের কথা, আজকের জিজ্ঞাসা। উপন্যাসটি উপেনবাবুকে নিয়ে। কমরেড উপেনবাবু অবশ্যি কেউকেটা নন; এম পি, এম এল এ হওয়ার জন্য ক্ষমতার অলিন্দে টুল পেতে ভিক্ষের বাটি নিয়ে বসে পড়ার রুচি হয়নি তাঁর। এই বর্ষীয়ান কমরেডের জন্য শেষ পর্যন্ত অবশ্য পার্টি একটা ব্যবস্থা করেছে। রাশিয়ায় যাচ্ছেন তিনি চিকিৎসার জন্য। কলকাতা থেকে ট্রেনে করে দিল্লি যাবেন উপেনবাবু, তারপর সেখান থেকে প্লেনে করে সোজা মজুর-চাষির দেশ রাশিয়ায়। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল কলকাতা-দিল্লি রেলযাত্রাপথে সীমাবদ্ধ।

এই যাত্রা শেষে মারা যাচ্ছেন উপেনবাবু। আর মৃত্যুপূর্বে বার বার অজস্র প্রশ্নে নিজেকে আর পরিপার্শ্বকে যাচাই করছেন তিনি। সুভাষের সে দিনের পাঠ শুনতে শুনতে অনেকেরই মনে হচ্ছিল উপেনবাবুর প্রশ্নাবলির মধ্যে নিজেই যেন ঢুকে পড়ছেন পদাতিক। ‘পার্টির টান নাড়ির টানের চেয়েও বেশি’, উপেনবাবুর এই অতীত উপলব্ধি কবির পাঠে সহসা যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। ঈষৎ টেনে এই অংশটা উচ্চারণ করেন সুভাষ। উপন্যাসের বাক্যে যে সব অর্থ নেই সেই অর্থগুলোও যেন সমবেত শোতৃমণ্ডলীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উপন্যাস কথকের সুর, হাসি ও নীরবতায়।

আচ্ছা, কার কাছে অনুগত থাকবেন একজন কমরেড? পার্টির কাছে, মানুষের কাছে নাকি কোনও গ্রন্থবদ্ধ নীতির কাছে? এই প্রশ্নটাই তো উপেনবাবুদের প্রশ্ন। কোনও সদুত্তর নেই বলেই হয়তো ইদানিং আমাদের আলোচনায় সুভাষের তাত্ত্বিক প্রশ্নের থেকেও গুরুত্ব পাচ্ছিল তাঁর আর্থিক অভাব। ‘কে কোথায় যায়’, ‘কাঁচাপাকা’, ‘কমরেড, কথা কও’—এই সব লেখায় যে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি তা বরং মুলতুবি থাক। সে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হলে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান অটল থাকবে না আর। তাই আসুন বরং পদাতিকের ব্যক্তিগত সংকট নিয়ে কথা বলে সভা করে খানিটা দায়মুক্ত হই। এই বিতর্কে অবশ্য আজকের তরুণ-তরুণীরা তেমন ভাবে আন্দোলিত হচ্ছিলেন না। সেদিনের পাঠকক্ষে তাঁদের ক্ষীণ উপস্থিতির মতো অন্যত্রও বৌদ্ধিক বিতর্কে, তা যদি দেশকাল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বিতর্ক হয়, তাঁরা অনুপস্থিত। সে সব দিন তো নেই আর যখন তরুণতুর্কি সুভাষের আবির্ভাবেই ঢেউ উঠবে। আবেগ স্বপ্নের গন্ধ মেখে উঠে দাঁড়াবে সারি সারি মুখ। পথ আর পথের পরিণতি নিয়ে কবি মহলে বিপরীত মেরুতে সম্ভ্রম বিতর্কের তুফান তুলবেন বুদ্ধদেব। সবাই ভেবেই নিয়েছেন আজ পথ একটাই, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাফল্য। আর সব ভাঙা ঘর, বাঁকা রাস্তা, অর্থহীন ছেঁড়া সমাজবাদ।

পদাতিকের কবিকে অবশ্য থামানো যায়নি তবু। আসলে তিনি তো কোনও শুকনো তত্ত্বের লড়াই লড়ছিলেন না। লড়ছিলেন জীবনের লড়াই—এ জীবন যে যাপন করছেন তিনি। অন্তিম ট্রেন যাত্রায় মৃত্যু মুহূর্তের কিছু আগে আধো ঘুমে আধো জাগরণে তলিয়ে যাচ্ছিলেন উপেনবাবু। আর সেই দোটানার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছিল এক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন মায়ের স্বপ্ন, ঘরের স্বপ্ন। ‘মা কোল নাচাচ্ছে। খোকন সোনা চাঁদের কণা—একরত্তি ছেলে। আর কোনো ধন চায় না খোকন—মায়ের কোলটি পেলে।...ওপারেতে তিলগাছটি তিল ঝুর ঝুর করে, তার তলায় মা আমার লক্ষ্মীপ্রদীপ জ্বালে। মা আমার জটাধারী ঘর নিকোচ্ছেন।

সত্যিই তো তত্ত্ব যাই বলুক কমরেড উপনেবাবু কি এই ঘর ছেড়ে যেতে পারেন। যতদূরেই যান এই ঘর তাঁর সঙ্গে যায়। সকলের জন্য লক্ষ্মীপ্রদীপ নিকোনো সংসারের স্বপ্ন দেখেই তো একদিন কমরেড হয়েছিলেন তাঁরা। নাস্তিকতা নয়, তাত্ত্বিকতা নয়, এই জল মাটি মানুষের আস্তিকতাই তো তাঁদের পথে নামার কারণ। তাই পার্টির ক্ষমতাবান বিলাসী

ঘটকবাবুদের দেখে বিরক্ত বিচলিত উপেনবাবু মৃত্যুপূর্বে শুরুর স্বপ্নে ডুবে যান—'দোর গোড়ায় পিটুলি দিয়ে লক্ষ্মীর পা।' এই লক্ষ্মীই তো তাঁদের যৌথ খামারের স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল।

তা হলে কি কোনও তাত্ত্বিক ভর ছিল না এ সব প্রশ্নের? উপেনবাবু রাশিয়ার অরোগ্যনিকেতনে পড়ার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন তিন খণ্ড 'ক্যাপিটাল'। হাসপাতালের পর স্যানাটোরিয়ামে ঢালাও সময় পাওয়া যাবে। তখন তেত্রিশ বছর পরে আবার 'ক্যাপিটাল' পড়বেন তিনি। বড় প্রতীকী লাগে এই সাধ। মার্কসবাদ সত্য কারণ তা বিজ্ঞান, এই দেওয়াল-লিখন যদি মাননীয় হয় তাহলে তো বিজ্ঞানের বদলও মেনে নিতে হবে। নিউটনের ফিজিক্সকে ঝাঁকি মেরে আইনস্টানের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ওপরে উঠে এসেছে। তেমনই হয়তো মার্ক্সসকে ঝাঁকি মেরে উঠে আসতে পারে পরিবর্তিত কোনও তত্ত্ব। হয়তো উপেনবাবু সে জন্যই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইছিলেন তেত্রিশ বছর আগের বইখানিকে। সুভাষও কি চাইছিলেন?

না, সে উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না আর। শুধু এইটুকুই বলবার, এ সব জিজ্ঞাসা তিনি তুলে ধরছিলেন বড় মমতাময় অথচ তির্যক এক বাংলা ভাষায়। শত সেমিনারের তত্ত্বনির্ঘোষের থেকে অনেক বেশি ভাবিয়ে তোলে সুভাষের এই সব লেখার শত জল ঝরনার ধ্বনি। অবশ্য এই সব গদ্যের সানুদেশে এ কালের তরুণ-তরুণীদের কি ডেকে আনবেন কেউ?

যদি আনত, তা হলে কী দেখতে পেত তারা? আমেরিকার ভিসা না পাওয়ার টেনশনের মুখে নতজানু হয়ে তারা দেখতে পেত সদাহাস্য এক বৃদ্ধ তাদের কাছে ডাকছেন, হাসি মুখে ফুটফুটে বাংলায় বলছেন, 'দেখে দিও, দুখন্তি—শুকনো গাছে এ বার পাতা জাগবে।' হ্যাঁ, মৃত্যু আগে উপেনবাবুর শ্রুতিতে শেষবার এই বাক্যটিই তো ভর করেছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জুলাই ২০০৩

একেবারে নিজের ধরনে — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। তাঁর সাহিত্য রইল। আর সেই সাহিত্যের মধ্যে ধরা রইল এমন কিছু কাণ্ড-কারখানা, আমাদের গদ্য-পদ্যের উপরে এমনও অনেক বছর ধরে বারে-বারে যার ছায়া পড়তে থাকবে। জীবনযাপনের যে একটা নিজস্ব শৈলী তিনি বানিয়ে নিয়েছিলেন, এবং যা নিয়ে আমাদের যৌবনকালেই সত্যি-মিথ্যে অসংখ্য গল্প আমরা শুনতে পেতুম, তার স্মৃতিও চট করে মুছে যাবে বলে মনে হয় না। যাঁরা বলেন, এমন কবি আর হয় না, তাঁদের বলি, 'শুধু কবি? গদ্যভাষার এমন লেখকই কি গণ্ডায়-গণ্ডায় হয় নাকি?'

আবার একই সঙ্গে এমন বর্ণাঢ্য মানুষও আমরা কালেভদ্রে দেখতে পাই। শতকরা নিরানব্বইজন মানুষই তো আর পাঁচজনের ধারণা অনুযায়ী বাঁচে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে-ক্ষেত্রে নিজের ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি মিল খুঁজে নিয়ে একেবারে নিজের ধরনে বাঁচতে চেয়েছিলেন। সেটা কি কম কথা হল? অন্যের মুখ ম্লান করে দেখার যে একটা খেলা আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটা বরাবরই ছিল, ইদানীং আর-পাঁচটা ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন ওতপ্রোত ভাবে রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তখনও কিন্তু এই বিচ্ছিরি খেলাটা তাঁকে কখনও খেলতে দেখা যায়নি। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের ব্যবধান ছিল অসেতুসম্ভব, তাঁরাও যে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও স্বজন-জ্ঞান করতেন, এটা তার এক মস্ত কারণ। মানুষ দেখতে, মানুষ চিনতেও মানুষের মুখে মানুষের সুখদুঃখের কথা শুনতে এই মানুষটি বড় ভালবাসতেন। কাছে টানতে পারতেন সব রকম মানুষকেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উচ্চকোটির মানুষ, তাঁদের অনেকেই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আবার হুগলি নদীর দুই পাড়ের যে বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল, তার প্রতিটি মহল্লায় প্রতিটি বস্তিতে এককালে তাঁর বন্ধুজনের অন্ত ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বস্তুত তাঁদেরই একজন হয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। কবি হিসেবে তাঁর সর্বাধিক স্মরণীয় কাজ কী, যদি কেউ এই প্রশ্ন করেন তো বলব, মানুষের মুখের ভাষাকেই যে তিনি কবিতার ভাষা করে তুলেছিলেন, এর গুরুত্বই সর্বাধিক। তাঁর গদ্যও সর্বদা আঁকড়ে ধরে আটপৌরে সেই মুখের ভাষা আর সহজ সতেজ ও স্বাভাবিক বাগ্‌ধারাকেই। কবির কপালে একটা -না -একটা লেবেল না-সেঁটে যাঁদের শান্তি নেই, তাঁদের কাছে কেউ 'প্রেমের কবি', কেউ 'প্রকৃতির কবি', কেউ 'বিদ্রোহী কবি', কেউ অন্য-কিছু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কপালে একদা 'বিপ্লবী কবি'র লেবেল সাঁটা হয়েছিল। কিন্তু এই 'বিপ্লবী কবি' যে মানুষী ভালবাসার কবিতাও অনেক লিখেছিলেন, সে-কথা ভুলে না যাই। এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে সেই, কবিতাটির কথা, যার প্রথম পঙক্তি—'মুখখানি তার ভোরের শেফালি, নেমে গেল এক্ষুনি—পড়বামাত্র বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই জীবনটাকেই আসলে ভালবেসেছিলেন। বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি ব্যাপারগুলি যার এক-একটা অংশ মাত্র।

খবরের কাগজের প্রতিবেদন, ৯ই জুলাই ২০০৩

চলে গেলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালে। ২০০৩ সালের ৮ জুলাই ৮৪ বছর বয়সে থেমে গেল 'পদাতিক'-এর পথচলা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগান্তকারী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বল্প রোগভোগের পর এদিন সকাল ৬-৫৫ মিনিটে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণ কলকাতার একটি বিখ্যাত বেসরকারি নার্সিহোমে। শুভ্রকেশী স্বনামধন্য এই কবি মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়, কন্যা-সহ তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধদের। কবির মৃত্যু বাঙালি বিশ্বকে কিছুটা হলেও অনাথ করে দিল। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলা সাহিত্যের। সাহিত্যিক থেকে রাজনীতিবিদ, অভিনেতা থেকে সমস্ত সাধারণ মানুষ এই দুঃসংবাদে বিষণ্ণ-বিধ্বস্ত। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরই লেখা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'লাখো লাখো হাত এক হলে/ বলো পরোয়া কাকে/আমাদের দাবিকে রোখে/কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে'। বহু বিখ্যাত মানুষ তো বটেই অনেক সাধারণ মানুষও ছুটে যান কবির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে। জ্ঞানপীঠ, আকাডেমি, রবীন্দ্রপুরস্কার, কালিদাস ও কবীর সম্মানে ভূষিত এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। আর তারপর 'চিরকুট', 'ফুল ফুটুক', 'এককটু পা চালিয়ে ভাই', 'ছেলে গেছে বনে', 'কথার-কথা' প্রভৃতি সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। অনুবাদক হিসাবেও তিনি তাঁর স্বকীয়তার ছাপ রেখেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করা চিরযুবক 'বামপন্থী' আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ জীবন প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ছাত্রজীবন থেকে বামপন্থী অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই কবি মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই সরে আসেন সক্রিয় বামপন্থা থেকে। বেশ কয়েকদিন ধরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন থাকলেও সোমবার তাঁর আত্মীয়রা বণ্ডে সই করে কবিকে বেলভিউ নার্সিংহোমে নিয়ে যান। তাঁদের অভিযোগ হাসপাতালে কবির প্রতি সঠিক যত্ন নেওয়া হচ্ছিল না। তিনবার রক্ত নিয়েও কোনও রিপোর্ট না দেওয়া, সঠিক লক্ষ্য না রাখার জন্য শয্যাক্ষত (বেডসোর) সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। তবে চিকিৎসাকেন্দ্র বদলালেও কেউ আটকাতে পারল না পদাতিকের শেষ যাত্রা।

এদিকে, এদিন সকাল থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সোনালী গুহ-সহ এক ঝাঁক তৃণমূল নেতা-নেত্রী ছাড়াও মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য এবং সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডু মজুমদার নার্সিংহোমে উপস্থিত ছিলেন। কবি মরণোত্তর দেহদান এবং চক্ষুদান রেখে গেলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না পাবার জন্য তা সম্ভব হয়নি। এরপর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় শিশুশিক্ষায়তন, একটি ক্লাব, বাড়ি হয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন

হয়। মৃণাল সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নার্সিংহোম উপস্থিত হন। পরে মেয়র পুরসভায় বলেন, তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন বলে জানান। তিনি কবিকে সাহিত্যের একনিষ্ঠ কর্মী বলেও উল্লেখ করেন। মেয়রের আক্ষেপ কবির সঙ্গে তাঁর অনেক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হলেও সেগুলি আর বাস্তবায়িত হল না। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকেও কবির মৃত্যুতে গভীর শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে। পদাতিক কবির মৃত্যুতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন—

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) : বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের পর তিনিই একমাত্র যুগ বদলের কবি। আমাদের অল্প বয়স থেকেই বহু প্রেরণা দিতেন। তরুণ কবিদের কাছেও তিনি মস্ত বড় প্রেরণা। সুভাষবাবু যথেষ্ট পরিণত বয়সে মারা গেলেও থাকা না থাকার অভাব আমরা অনুভব করব। মানুষ হিসাবেও তিনি অতি মধুর স্বভাবের ছিলেন। কোনওদিন বয়সের তফাৎ বুঝতে দেননি আমাদের। সুনীলবাবু কবির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাঁর মরদেহ নিয়ে করুচিপূর্ণ রাজনীতি না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাঁর দেহদানের ইচ্ছাকেও যথাযোগ্য সম্মান না দেওয়াটা মেনে নিতে পারেননি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) : সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, কবির অসুস্থতার কথা জেনে এমন পরিণতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে। তবুও মানতে পারছি না তিনি নেই। মানুষ হিসাবে অসাধারণ এখন কবি আর পাওয়া যাবে না বলেও অভিমত সঞ্জীববাবুর। তাঁর কথায় ঋষির মত চেহারার কবিকে দূর থেকেই চেনা যেত সাদা চুলের জন্য। কিছুদিন আগে কবি দেখতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল পদাতিক কবি বড় নিঃসঙ্গ, অসহায়। শোকজ্ঞাপন করে তিনি বলেন, অনুকরণ করার মত এখন মানুষ খুব কমই হয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা) : নিজেকে পদাতিক কবির একজন গুণমুগ্ধ পাঠক বলে জানিয়ে বললেন, এক মৃত্যু তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। কথা বলার তো অবস্থা তাঁর নেই। সত্যিকারের বড় কবি হিসাবে উল্লেখ করে জানালেন এই নক্ষত্র পতন বাংলা সাহিত্যের গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল। যথেষ্ট পরিণত বয়সে তিনি মারা গেলেও আরও অনেক কিছু পাবার ছিল তাঁর কাছে।

সনৎ চট্টোপাধ্যায় (সচিব, বাংলা আকাদেমি) : বাংলা আকাদেমির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে শোকগ্রস্ত সনৎবাবু জানালেন, 'আমদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চলে গেলেন'। বাংলা বানানের উন্নয়ন নিয়ে আকাদেমির উদ্যোগের প্রতি কবির পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি আকাদেমিকে এ ব্যাপারে বহু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কবিকে বাংলা তথ্য-গল্পের অন্যতম পথিকৃত হিসাবে বর্ণনা করে জানালেন, এ এক অপূরণীয় ক্ষতি, বাংলা সাহিত্যের যা পূরণ হওয়া অসম্ভব।

দিলীপ রায় (অভিনেতা) : শোক বিহ্বল অভিনেতা জানালেন কবির সঙ্গে তাঁদের

দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্কের কথা। কবি এবং তাঁর বাবা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এছাড়া কবি এবং দিলীপবাবুর দাদা ছিলেন স্কুলের সহপাঠী। কবির বাসভবনের ঠিক বিপরীত বাড়িতে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এ ঘটনাকে বাংলা বা বাঙালির অপূরণীয় ক্ষতি বলে জানিয়ে বলেন, এতবড় মানুষ খুব কম হয়। তিনি জানালেন, কবির লেখা 'ফুলের ব্যথা' কবিতাটি মনে পড়ে যায় মৃত্যুর কথা শোনার পরই। তাই তিনি কোনও ফুল নিয়ে যাননি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। শুধুমাত্র অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেই চলে এসেছেন।

'পদাতিকের'র কবি— সুজয় বিশ্বাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও চলে গেলেন। একটা যুগের অবসান। আমরা যখন ছাত্র তখন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও অমাদের খুব ভাল লাগত। আমাদের কাছে উনি বেঁচে আছেন 'পদাতিকে'র কবি হিসেবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে চিরদিনই একটা বোহেমিয়ান ভাব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বলা যেতে পারে তাঁর যোগ সেই কৈশোর থেকেই। কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক সংবাদপত্র 'স্বাধীনতা'র যখন সম্পাদক ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন তার রিপোর্টার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হীরেন মুখোপাধ্যায়, রণেন সেন, রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি যখন ভাগ হয় তখন তিনি থেকে যান কমিউনিস্ট পার্টিতেই। সিপিএমএর সঙ্গে কোনভাবেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। এস এ ডাঙ্গের অনুগামী তাইতো ১৯৭৭ সালে সিপিআই যখন ভাতিন্দা কংগ্রেসে সিপিএম-এর দিকে অবস্থান নেয় তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় কার্যত রাজনীতি থেকে বলা যেতে পারে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেন।

সিপিআই এ সময় ভাগ হয়ে সিপিআই ও ইউনাইটেড সিপিআই হলে ডাঙ্গেপন্থী সুভাষ মুখোপাধ্যায় এতেই যোগ দেন। মোহিত সেন ছিলেন এই দলের সাধারণ সম্পাদক পরে এর নাম পাল্টে হয় অল ইণ্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টি। এ বাদে এই দলের তেমন কোনও প্রভাব না থাকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সেভাবে আর প্রকাশ্যে আসেনি।

এতো গেল রাজনৈতিক কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো স্কুল থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর আবাল্য শৈশবের বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে তিনি প্রথম এক নম্বর গ্যাস্টিন প্লেসে রেডিও অফিসে নিয়ে যান। তাঁর লেখা গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন রেডিওতে। একই স্কুলে পড়তেন দু'জনে। পরিচালক সত্যেন বসুর ডাকে মুম্বাই যাত্রার আগে পর্যন্ত হেমন্ত-সুভাষ ছিলেন হরিহর আত্মা। তারপর সুভাষ মুখোপাধ্যায় থাকতেন কলকাতায় আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বাইয়ে। তাই নিয়মিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না। চিঠিতে আর হেমন্ত কলকাতায় এলে বা

সুভাষ মুম্বাই গেলে দুজনেই ফিরে পেতেন তাদের হারানো কৈশোর, হারানো যৌবন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই যৌবনে গল্প লিখেছিলেন বন্ধু সুভাষের প্রেরণায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা পড়েছি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক কবিতা গ্রন্থে। সেখানেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাও পাই। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর 'ছাড়পত্র' গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই জন্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মুখে অনেকবার শুনেছি সুকান্তর কথা। সুকান্ত মনের গভীরে যে আমাদের স্থান করে নিয়েছেন তার জন্য আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই কাছে ঋণী। আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তার ছিল এক অপরিসীম ভালবাসার রঙে রাঙানো শ্রদ্ধাবোধ।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভুগছিলেন। 'পদাতিকে'র কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক', 'যা রে কাগজের নৌকো', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'এই ভাই'—সবই আমাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের ভাল লাগার প্রতিচ্ছবি।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য রচনাতেও ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁর উপন্যাস 'হাংরাস' অন্তরীপ বা হানসেনের অসুখ' সমান আনন্দ দিয়েছে পাঠককে। একটি সংবাদপত্রের রবিবারের পাতায় 'পদাতিকের আত্মকথা' লিখছিলেন সে লেখা শেষ হল না। এ আফসোস থাকবেই আমাদের। তাঁর এতো আত্মকথা এতো একটা যুগের ইতিহাস। তাঁর প্রাঞ্জল সাবলীল গদ্য দিয়েছে আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দ। তিনি সাহিত্য আকাদেমি ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। এ পুরস্কার না পেলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় থাকতেন। যেমন পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ না পেয়েও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হয়ে বেঁচে আছেন।

মুখোমুখি—

পদাতিক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

অদ্রীশ বিশ্বাস

অদ্রীশ : আপনার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবি সাজানো রয়েছে। আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন?

সুভাষ : রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখেছি, কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। মানে দশ-এগারো বছর বয়সে, যখন প্রায় কিছুই বোঝার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'সিনেট হলে' ছন্দের উপর বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। আমি আমার ছোটকাকার সঙ্গে গিয়েছিলাম একেবারেই একটা কৌতূহল থেকে। কী বলেছিলেন, আমি কিছুই বুঝিনি। তাঁর কণ্ঠস্বরের কথাও আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন, তবু পুরো 'সিনেট হল' ভরেনি। পরে দেখার আর কোনো সুযোগ হয়নি। মৃত্যুর সময় শুধু শোভাযাত্রা দেখেছি। তাঁর মৃত্যুর পরের বছর অমিয় চক্রবর্তী আমায় শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কখনো শান্তিনিকেতন যাইনি শুনে, আমার সমস্ত খরচ-খরচার ভার নিয়ে তিনি আমায় শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। ব্যাস। এটুকুই আমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুস বা ওইজাতীয় যা বলবে, তার সম্পর্ক। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেলেবেলা থেকেই মনপ্রাণ জুড়ে ছিলেন। ছ'-সাত বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি, গেয়েছি। আমরা থাকতাম মফঃস্বলের ছোট্ট শহরে। সেখানে যারা বয়স্ক লোক, তাঁরা সবাই ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তেন না। তবে, তাঁদের ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথ ছেলেপুলেদের মাথা খাচ্ছেন, গান দিয়ে, নাচ দিয়ে, বড় বড় চুল রেখে। আবার অন্য একটা ধারা ছিল মনে আছে, সেই মফঃস্বল শহরের যারা ডানপিটে ছেলে তাদের, যাদের বড়রা এক্কেবারে পছন্দ করতেন না। কারণ তারা সব খেলধূলা করত, বর্ষার সময় পাঁঠাচুরি করত বা কারো বাড়িতে কেউ মারা গেলে সৎকার করত, কিংবা রাত জেগে রোগীর সেবা করত। এই দুরন্ত ছেলেরাই তখন অন্যধারায় ছিল, তারাই রবীন্দ্রনাথের গান গাইত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করত। যদিও সব গানই তারা ভুল সুরে গাইত। শান্তিনিকেতন থেকে তো তারা শিখত না, অন্য কোনো সূত্রে শেখা, তাই সুর ঠিক থাকত না। কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মন জুড়ে ছিলেন।

অদ্রীশ : আপনি এই দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে ছিলেন?

সুভাষ : হ্যাঁ। আমরা তাদের ভক্ত ছিলাম, যারা একটু দুরন্ত, ডানপিটে, তথাকথিত ভালছেলে

নয়। পরে কলকাতায় এসে দীর্ঘদিন বাদে রবীন্দ্রনাথকে ভালভাবে পেলাম। তাঁর লেখা পড়লাম। তবে একটা জিনিস কিন্তু আমরা সেই সময়ে খুব পৃথক করতাম, সেটা হল, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রভক্তদল। একটা আলাদা ভক্তমণ্ডলী ছিল রবীন্দ্রনাথের, যাঁদের চালচলন কথাবার্তা সমস্তই একটা রাবীন্দ্রিক ভাবাপন্ন, যেটা আমরা পছন্দ করতাম না। রবীন্দ্রনাথকে অনেক বেশি ভাল লাগত কিন্তু রবীন্দ্রভক্তদের একেবারেই ভাল লাগত না। তাঁদের মধ্যে আর একটা জিনিসও ছিল যে রবীন্দ্রনাথক কেবল তাঁরাই বোঝে এবং বেশি লোকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সম্ভব নয়।

অদ্রীশ : এই সময়টাতে আপনি রবীন্দ্রনাথের বাইরে যে সমস্ত লেখকদের পেলেন, ধরা যাক, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু—এই এঁদের সঙ্গটা আপনাকে কীরকম প্রভাবিত করেছিল, বা এঁদের গোষ্ঠীটাকে কিভাবে বোঝেন আপনি—

সুভাষ : এটা অনেক পরের ব্যাপার। আমরা যখন লিখতে শিখছি সেটা ঐ রবীন্দ্রনাথকে ধরে। যাই লিখি, লোকে বলে, 'বাঃ ভাল; ঠিক রবি ঠাকুরের মত।' গোড়ায় এসব কথা শুনে খুশি হতাম, কিন্তু পরে বুঝলাম যে, যদি আমার লেখা রবীন্দ্রনাথের মতনই হয় তাহলে আমার কী দরকার, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যখন রয়েছেন। কপিটাকে লোকে নেবে না, মূলটাকেই নেবে। তখন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সরে আসার চেষ্টা শুরু করলাম। এটা খুব সহজে হয় নি, তবে নিশ্চয় হয়েছিল; কারণ একটা সময় লোকে আর রবীন্দ্রনাথের মত হয়েছে বলত না। তবে তখনও রবীন্দ্রনির্ভর আমার লেখা। কলেজে উঠে এটা চলে গেল একেবারে, যখন আমারই সহপাঠীরা আমার 'কবিতা', পত্রিকা, 'পরিচয়' পত্রিকা পড়ল। একেবারে আধুনিক লেখা দেখলাম সেখানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনো মিল নেই। একেবারে অন্যরকম লেখা সে সব। তখন আবার আমরা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে এঁদের উপর ভর করলাম। যখন আমার এঁদের লেখা খানিকটা নকল করার চেষ্টা শুরু হল। সে সময় লোক বলতে লাগল, এটা ঠিক তমুকের মত, ওটা ঠিক অমুকের মত হয়েছে। বুঝলাম, এটাও ঠিক নয়। কিন্তু কখন যে ঠিক নিজের মত করে লিখতে শুরু করেছি, সেটা বলতে পারব না। তবে একটা সময় দেখলাম, লোকে আলাদাভাবে আমায় ধরতে পারছে।

ব্যক্তিগত পরিচয় এঁদের মধ্যে প্রথম হয় সমর সেনের সঙ্গে। সবচেয়ে তরুণ তখন তিনি। আমাদের মধ্যে 'হিরো'। তাঁর লেখার ধরণও একদম অন্যরকম। আমি আবার তখন খানিকটা ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। যে কারণেও তাঁর লেখা ভাল লাগছিল।

অদ্রীশ : রাজনীতি বলতে ঠিক কী? 'পদাতিক' যে সময়টায় লেখা এটা কি সেই সময়ের কথা বলছেন।

সুভাষ : হ্যাঁ, ঠিক তাই। তখন মিছিল, সভা, পোস্টার মারার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছি। পাশাপাশি 'পদাতিকের' কবিতাগুলোর কিছু কিছু লিখছিও। সেই সমস্ত ভবানীপুরের কল্যাণসঙ্ঘের পাঠাগারে পড়তাম মাঝে মাঝে। হেমন্ত, রামকৃষ্ণ মৈত্র সদস্য ছিল, ওরাই নিয়ে যেত। ওরাই উদ্যোগ করে সে সব পড়ার ব্যবস্থা করাত। দেখতাম, কবিতা শুনে সাধারণ শ্রোতারা খুব তারিফ করত। তারপর একদিন সাহস করে 'পদাতিকের' খসড়া পাণ্ডুলিপিটা সমর সেনকে শুনিয়েছিলাম। উনি শুনে বললেন, 'তুমি রাজনীতি কর, তুমি মার্ক্সবাদ পড়েছ?' আমি তো তখনও সেসব পড়ি নি। উনি তখন 'হ্যাণ্ড বুক অব মার্ক্সইজম' নামে একটা বই দেন আমায় পড়তে। আমি আই. এ. পরীক্ষার পর, ছুটিতে এক নিঃশ্বাসে সেটা পড়ে ফেলি। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বইটা এবং বিষয়টা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। আমি সিরিয়াসলি রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়ি। লেবার পার্টির সংস্পর্শে আসি। এই দেখে আমার ঘনিস্ট সব বন্ধুরাই রাজনীতিতে চলে এল। ১৯৪০ সালে 'পদাতিক' বের হল। আমি তখন খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ করছি। থাকতাম রাসবিহারীর মহানির্বাণ মঠের কাছে। সেখান থেকে হেঁটে খিদিরপুরে যেতাম, আসতাম। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সারাদিন ধরে সংগঠন গড়ার কাজ করেছি। সংগঠন কিছু দাঁড়ালে পরে আমাকে ছাত্র রাজনীতিতে যেতে বলা হয়। এই ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়েই প্রশ্ন আসে। এসময় আমরা অনেকে মিলে লেবার পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পাটিতে আসি। আমি খেলাধূলায় খুব ভালছিলাম বরাবরই। সেই কম বয়স থেকে মোট তিনটে টান ছিল, খেলা, লেখা এবং রাজনীতি। রাজনীতিতে এসে প্রথমে খেলাটা চলে গেল। তারপর বন্ধ হল লেখা। পুরোপুরি সব বন্ধ করে, রাজনীতিতে সম্পূর্ণ সময়ের কর্মী হয়ে গেলাম। এইভাবে চলতে চলতে '৪২ সালে পার্টি মেম্বারশিপ্ পেলাম।

অদ্রীশ : আমরা অনেকটা প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে গেছি। ফিরে আসি পুরনো প্রসঙ্গে, লেখালিখির প্রথম দিকে লেখকদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কেমন ছিল?

সুভাষ : বুদ্ধদেব বসুর একটা দল ছিল। বিষ্ণু দের আর একটা। আবার এঁরা বন্ধুও পরস্পরের। 'কল্লোল' গোষ্ঠীটাও পৃথকভাবে বসতেন। আমি 'পরিচয়ে'র আড্ডায় যেতাম। সেখানে বহু বড় বড় লোকদের আনাগোনা। ওদিকে আবার 'অরণি'-কে কেন্দ্র করে আর একটা দল। এই সমস্ত দলের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল। আমরা 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' গঠন করি যখন, তাতে সমস্ত দলের লোকদের ডাকি এবং দলগুলোর একটা মিলিতরূপ দেবার চেষ্টা করি। একটা প্রতিবাদের ইস্যুতে সকলে এক হয়ে কাজ শুরু করে।

অদ্রীশ : এই সময়ের কবিদের মধ্যে এলিয়ট চর্চার ঢেউ এসেছিল। এলিয়ট আপনাকে ভাবায় নি?

সুভাষ : এলিয়ট তখন লোকেদের মধ্যে এত সাড়া জাগিয়েছিল যে আমিও বাদ থাকলাম

না। খুব যে বুঝতাম, তা নয়। তবে বেশ পড়তাম এলিয়ট। এলিয়টের মধ্যে সেই সময়ের যে সমাজ, তার যে শূন্যগর্ভতা, তার কথা ছিল। একটা নেগেটিভ্ দৃষ্টিভঙ্গী। পাশাপাশি হুইটম্যান, মায়াকোভস্কিও পড়তাম। তাঁরাও জনপ্রিয় ছিলেন আমাদের মধ্যে। এলিয়টের এই নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশে হুইটম্যানের ছিল ভীষণরকম আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। আর মায়াকোভস্কিকে সমাজতন্ত্রের কবি, নতুন সমাজের কবি মনে করতাম। তখন রাশিয়ান জানতাম না। মায়াকোভস্কি ইংরাজি অনুবাদে পড়েছি।

চারদিকে তখন নানা আলোড়ন চলেছে। স্পেনের স্বাধীনতা যুদ্ধ, চীনের প্রতিরোধ অ্যান্টিফ্যাসিস্ট মুভমেন্ট—এইসব মিলে সময়টা খুব উত্তাল। ইংল্যাণ্ডের স্পেণ্ডার, অডেন ডেনিস—এঁদের লেখায় এই স্পেনের ঘটনায় একটা অন্যভাব ফুটে উঠেছিল। একটা আমাদের খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। এদের লেখা পড়ি আর পার্টির কাজকর্ম করি। এই সময়ের পার্টির কাগজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং গদ্য লেখা শুরু করলাম। সারা বাংলা ঘুরে বেরিয়ে রিপোর্টাজ লিখেছি।

অদ্রীশ : নাজিম হিকমতের কবিতা নাকি আপনাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। এইসময় নাজিম হিকমতের কবিতা কীভাবে পেয়েছিলেন?

সুভাষ : ১৯৪৮ সালে আমি প্রথম জেলে যাই। তিনমাস ছিলাম। ছাড়া পেয়ে কয়েকমাস বাইরে থেকেছি। পার্টি ব্যান হয়ে গেছে। 'স্বাধীনতা' ব্যান হয়ে গেছে। ব্যান হলে তো চলবে না, কাগজ বের করতেই হবে; না হলে বক্তব্য পৌঁছাবে কীভাবে? আমরা নানা নামে প্রায় নিয়মিতই একটা করে কাগজ বের করি আর তা ব্যান হয়ে যায়। এভাবে প্রচণ্ড টানাটানির মধ্যে পড়লাম। কাগজ বের করার টাকা নেই। মনে হল, কবিতার বই বের করে যদি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিক্রি করে কিছু টাকা-পয়সা ওঠে, তাহলে তা দিয়ে পার্টির কাগজ বের করা যায়। 'অগ্নিকোণ'টা সেই পরিকল্পনাতেই বের করা। তারপর আবার জেলে। এভাবে '৫১ সালে পৌঁছে 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব এল আমার উপর। টাকার টানাটানি চলেছে। এমন সময় একদিন ডেভিড কোহেম নামে একজন ইহুদি, তিনি পার্টি মেম্বার ছিলেন, তাঁদের একটা কাগজ ছিল, সেখানে কেউ আমেরিকা থেকে ইংরাজি অনুবাদে সাইক্লোস্টাইল করা নাজিম হিকমতের কবিতা পাঠিয়েছিল। 'পরিচয়ে'র জন্য সেটা আমাকে পাঠানো হয়। আমি ফরাসিতে অনুবাদ করা একটা কপিও পেলাম। এই দুটো মিলিয়ে নাজিম হিকমত অনুবাদ করলাম। আমার ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে নাজিম হিকমত বড় রকমের ঘটনা এটা সন্দেহ নেই।

অদ্রীশ : আপনার কবিতার ভাষার দুই মেরু—নিপুণ ছন্দ, অন্যদিকে তীব্র গদ্য। এই দুই মেরুকে আপনি নিশ্চয় মনের মধ্যে মেলান। কীভাবে মেলান আর কীভাবেই বা সম্ভব হয় এরকম দুই মেরুর কবিতা সৃষ্টি?

সুভাষ : এটা কোনও চিন্তা করে করি না যে এভাবে লিখব কবিতাটা। তবে আমি শুরু

করেছিলাম ছন্দ মিলিয়েই। যখন শুরু করেছিলাম তখন আমি বাংলা কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে, তার তৎকালীন ছন্দ বা গদ্যরীতি বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানতাম না। লোকে ভালো বলেছে, লিখে গেছি। সাধারণত রাজনৈতিক জগতের লোকজনরাই প্রতিক্রিয়াটা জানাত। তাদের তো সেভাবে নন্দনতত্ত্বের ধারণা ছিল না। রাজনীতির লোকেদের সেটা কোনওকালেই ভাল থাকে না। সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই একটা সত্য, যত খারাপই শোনাক। তাদের ভাল-মন্দ। সেসব তো আমরা ভালই পারতাম। ফলে আমার ছন্দমিলের কবিতার কদর হল। চলছিল, একসময় গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করলাম। এই শুরুটা কিন্তু ভেবে-চিন্তেই করেছিলাম। মানে, প্ল্যান করে করে গদ্য কবিতার দিকে আসি আমি। তবে, গদ্য কবিতাকে যতটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে নিয়েছিলাম ততটা প্রাণ থেকে নিতে পারিনি। আমার মনে হত গদ্য কবিতায় একটা ফাঁকি থাকে, যেটা থাকা কবির পক্ষে অনুচিত। শেষে একসময় একটা অভিজ্ঞতা আমার মনের জোর বাড়িয়ে দিল। গোলাম কুদ্দুসের একটা গদ্য কবিতা বের হল। সেটা লোকে খুব নিল। কেউ ভাবেইনি সেটা গদ্যে না পদ্যে লেখা। আমার মনে হল, এটাই বড় কথা, যেভাবে বলছি সেটা কতটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হল, কতটা অ্যাপিলিং হল। যদি অ্যাপিল করে তো সেটা উৎরে গেল, না হলে বৃথা চেষ্টা। সেই থেকে আমি দুটো মাধ্যমই ব্যবহার করে আসছি। এটাকে মেলানোর ব্যাপারটা জীবনেরই মতো। যেভাবে আমি পল রোবসন শুনি আবার রবীন্দ্রনাথও শুনি। যেভাবে আমি জামা পরি আবার পাঞ্জাবিও পরি। পদ্য আর গদ্যের মেলবন্ধন ঘটানোই তো জীবন।

অদ্রীশ : আপনার কবিতা খুব 'টপিক্যাল', সেটা কোনও নিউজ আইটেমকে জড়িয়ে পড়ে ওঠে বা ইন্‌ফরমেটিভ হয়ে ওঠে। আপনি কি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে এভাবেই ভাবতে চান?

সুভাষ : খুব সত্যি কথা, আমি এভাবেই ভেবেছি। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, বহু আছে। তবে আমি কবিতাকে যে কোনও অস্ত্রের চেয়ে যথেষ্ট বেশি শক্তিশালী ভাবতাম একমসয়। আমার কাছে কোনও কবিতাই অপচয় নয়। তাই যেটা লিখেছি, সেটা হয় উদ্দেশ্যমূলক হয়েছে, নয় তো সংবাদমূলক। এটাও অবশ্য উদ্দেশ্যকেই জাহির করে।

অদ্রীশ : এখন আর কবিতাকে অত শক্তিশালী ভাবেন না?

সুভাষ : কবিতা একটা সেরিব্রাল প্রসেসের পার্ট মাত্র। তাতে কেবলমাত্র তাঁদের মনই আলোড়িত হয়, যাঁদের মন অলরেডি আলোড়িত হয়ে গেছে। ফলে, কেবলমাত্র কবিতা দিয়ে অস্ত্রের বিকল্প শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এটা আমার উদ্দেশ্যের ব্যাপার। আমি কবিতার উদ্দেশ্যকে অতটা আর মহৎ ভাবি না। তা বলে যে 'টপিক্যাল' হবে না তা নয়।

অদ্রীশ : বাংলা কবিতার মূলধারা সেভাবে কোনওদিনই রাজনৈতিক নয়। রবীন্দ্রনাথের কারণেই হয়তো। তারপর 'কবিতা' পত্রিকা, 'কবিতাভবন' ইত্যাদি এবং জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তীরাও সে অর্থে রাজনীতির বাইরে। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি 'রাজনীতি' মানে সমকালীন উল্লেখযোগ্য বামপন্থী-রাজনীতি, যা বৃটিশ বিরোধিতার পর এদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ধারা। তখন তো এই ধারাটাই সমাজসভ্যতায় ছায়া ফেলেছে। তাতেই অধিকাংশের আশ্রয়। কবিতা চর্চাতেও এটা এল কিন্তু প্রধান ধারা হতে পারল না। কেন এমন হল?

সুভাষ : এর দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই ধারার প্রধান রাজনীতি-বিরোধীরা বুদ্ধদেব বসু, আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথরা। এঁরা কবি হিসাবে তো কম শক্তিশালী নন। তবে রাজনীতির ব্যাপারে আমরা সে সময় এঁদের সমালোচনা করতাম। আইয়ুব যদিও কবি নন। কিন্তু এঁদের বিশ্বাসের জায়গাটাকে সেই আমলে আমাদের খুব আপন মনে হত না। এটার ফলে তাঁরাও আমাদের পছন্দ করতেন। মানে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক মানুষজনদের। ক্রমে দূরত্ব তৈরি হল, দূরত্ব বাড়ল। আর রাজনীতির লোকেদেরও একটা উন্নাসিকতা ছিল রাজনীতি করার কারণে। তাঁরা ভাবতেন তাঁরা মহৎ কিছু করছেন। কেউ চাননি নিজেদের সংস্কৃতিকে ধারালো করতে। এভাবেই রাজনৈতিক কবিতার ধারাটা গৌণ হয়ে গেছে।

অদ্রীশ : আমাদের বাংলাভাষায় রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত কবিতার গুণমাণ কতটা বলে আপনি মনে করেন?

সুভাষ : এটা 'সময়' বলবে। রাজনৈতিক কবিতার একটা সমকালীন দাবী আছে। তাকে একটা উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হয়। একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে কবির দায়িত্বকে তুমি যদি মহৎ চোখে দেখো, তাহলে নিশ্চয় তাঁর কবিতা পড়তে তোমার ধৈর্য থাকবে, কবিতাও ভাল লাগবে। আর যদি সেটাকে তুমি তুচ্ছ ভাবো, কবির কাজ নয় ভাবো, তাহলে তো সেসব কবিতা পড়তে তোমার মানসিকতাই থাকবে না। এটা পুরোপুরি তোমাদের মনের ব্যাপার।

অদ্রীশ : আপনার মন কী বলে—বাংলা রাজনৈতিক কবিতা সম্পর্কে?

সুভাষ : সব রকমই আছে। ভালও আছে আবার আমার মতো আজেবাজে কবিও দিব্যি ঢুকে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় (হাসি...)।

অদ্রীশ : রাজনৈতিক কবিতার ভাল কবি কারা?

সুভাষ : মুকুন্দ দাস, নজরুল, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র—প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে থেকে বা না থেকেও বেশ কিছু ভাল রাজনীতি বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন। তারপর অরুণ মিত্র কিছুটা, মঙ্গলাচরণ, সুকান্ত, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ দাস কত নাম.....

অদ্রীশ : মাও-সে-তুংয়ের মত ছিল—রাজনীতিটা আগে স্পষ্ট হওয়া উচিত, তারপর

কবিতা চর্চা। এদিকে নেরুদা সে কথার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন, কবিতা আগে, রাজনীতি পরে। রাজনীতির আধার কবিতা। আধারই যদি না থাকে তো রাজনীতিটা রাখবে কোথায়? কীভাবে ম্যানিফেস্টেড হবে? এসব তো আপনি জানেনই—সেই ইয়েনান ফোরামের ভাষণের পর তৈরি হওয়া বিতর্ক। সেটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি এ কারণেই যে, ওই ভাষণটাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতিচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা আইডিয়াল রূপ ধরা হয়। আমার প্রশ্ন, আপনি এ ব্যাপারে কী মনে করেন?

সুভাষ : আগে এভাবে ভাবতাম না। এখন মনে হয়, দু'টোই যদি স্বাভাবিকভাবে আসে তো দুটোই সার্থক রূপ লাভ করবে। কোনও একটা চাপিয়ে দিলেই সেটা দুর্বল হয়ে যাবে। পাশাপাশি দু'টোই আসা উচিত। তোমাকে কবিও হতে হবে, আবার রাজনীতি সচেতনও।

অদ্রীশ : তাহলে, আপনি মাও-সে-তুং এবং নেরুদা কাউকেই মানতে চান না?

সুভাষ : এখন তো ডিকনস্ট্রাক্শনের পালা (হাসি....)!

অদ্রীশ : মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক আবর্তে আজীবন থেকে যাওয়াটা আপনার কবিতাকে কতটা ক্ষতি করেছে বলে আপনার মনে হয়?

সুভাষ : সে তো তোমরাই বলবে?

অদ্রীশ : খুব টিপিক্যাল ইমেজারি, খুব আদর্শবাদী কবিতা আপনার। আমরা জানতাম যে আপনি কবিতায় কতটা লিখবেন, কতটা লিখবেন না। মনে হতো সাবজেকটিভ্ ইভেল্যুয়েশন সেভাবে আপনার কবিতায় থাকবে না। আমরা ধরে ফেলতাম....

সুভাষ : তবুও পড়তে কেন?

অদ্রীশ : কী বলব, সব জেনেও যেভাবে জ্যোতিবাবুর বক্তৃতার খবর পড়ি প্রতিদিন, যেভাবে নরসিমার ভাষণ শুনি টিভিতে, যেভাবে প্রতিবছর বাজেট বক্তৃতা শুনে দিন কাটাই...

সুভাষ : এই পরিস্থিতির জন্যে আমরাই অনেকটা দায়ী।

অদ্রীশ : গত দশ-পনেরো বছরে আপনার কবিতা কিন্তু একেবারে ভিন্নরকম হয়ে গেছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যকে ছুঁয়েছে। এখন আর সেভাবে অগ্রিম বলে দিতে পারব না পরবর্তী কবিতা আপনি কিরকম লিখবেন। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট কিছু কবিতা লিখছেন। সেগুলোর সম্পর্কে কিছু বলুন।

সুভাষ : নিজের ভিতরে ছড়িয়ে ফেলা অনেকগুলো নুড়ি এখন আমি কুড়োনোর উদ্যোগ নিয়েছি। এক ধরনের আত্ম-প্রত্যক্ষণ। সব নুড়ি যে তুলে আনলেই চিনতে পারছি তা নয়। অচেনা অজানা তার অস্তিত্ব। দুর্বোধ্য লাগে মাঝে মাঝে নিজেরই। আসলে হয়েছে কি, সারাজীবন আমি অনেক পথ চলেছি। নানারকম পথ। পথ আমাকে ভীষণ টানে। বহুবার বলেছি সে কথা। আর পথ হাঁটলেই দেখবে নুড়ি কুড়োনোর একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে যাবে। যাবেই। এটা হ্যাংলামো। যা দেখছি,

তা স্মৃতিতে ধরে রাখার ইচ্ছে। আমাদের তো সাহসের চেয়েও ভয় অনেক বেশি! তাই যা বলবার তা সবসময় বলতে পারি না। আমিও তো পারিনি। এবার সে সব বলতে চাই। এখন এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছি যে আর নিজের কথা বলবার জন্যে কাউকে পরোয়া করবার দরকার মনে করি না। সেসব গদ্যে যতটা সহজ, কবিতায় ততটা নয়। গদ্য আমিও লিখছি। আর কবিতায় যা ধরা পড়ছে তা কখনও দুর্বোধ্য, কখনও অসম্পূর্ণ, কখনও সামান্যই।

অদ্রীশ : পার্টিতে থেকেও অনেক সময় আপনি পার্টির লাইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। একসময় পার্টি এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আজ সেগুলো আপনার ভুল মনে হয়। সেগুলো সম্বন্ধে আপনি একটু বলুন।

সুভাষ : ১৯৪৮ সাল, রণদিভের সময়। রণদিভে পার্টিতে এক্সট্রিম লেফট লাইন আনলেন। বললেন, নেহরুকে উৎখাত করতে সশস্ত্র সংগ্রাম চাই। তখন আমরা ধরা পড়ে জেলে যাই। একটা যে ভুল লাইন ছিল, তা '৫০ সালে ধরা পড়ল। ততদিনে সব গণসংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পার্টির মধ্যে লাইন নিয়ে নানা বিতর্ক। একটা সোভিয়েতের লাইন, অন্যটা চীনের লাইন। আমি সোভিয়েতের লাইনে ছিলাম। তবে তর্কাতর্কির শহুরে যুদ্ধে আমি থাকলাম না। বিয়ে করে ঐ '৫১ সালেই বজবজে চটকল মজদুর আন্দোলন করতে চলে গেলাম। অনুবাদ করে-টরে সংসার চালাতাম।

তাছাড়া পার্টির এমন অনেক সিদ্ধান্ত ছিল যেগুলো ভুল হয়েছিল। যেমন, রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করা, কিংবা, উনিশ শতাব্দীর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা। তাছাড়া স্বাধীনতা নিয়ে বলা হয়েছিল, এই স্বাধীনতা ঝুটা—এটাও ঠিক নয়। সত্যিকারের স্বাধীনতাই হয়েছে। আজ পার্টি তা বলছেও। তখন দেশ গড়ার কাজে মন দেওয়া উচিত ছিল। পঞ্চবার্ষিকী হতে পারে না, মিশ্র অর্থনীতি হতে পারে না বলেছিলাম। আজ এসবই হয়েছে। তখন এসবে আমাদের অংশগ্রহণ থাকলে দেশ-এ অবস্থায় পৌঁছাত না হয়তো। আমরা না বুঝে এইগুলোর বিরোধিতা করেছিলাম।

অদ্রীশ : অনেকটা সরে এসে এবার একটা প্রশ্ন করতে চাই। সম্প্রতি আপনাকে ঘিরে যে রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রশ্নটা গড়ে উঠেছে, সেই বদলের কথাটা জানতে চাই।

সুভাষ : সারা দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গিয়েছে। একটা-দু'টে জায়গায় টিকে আছে, তাও যে কিভাবে টিকে আছে বলা মুশকিল। মার্কসবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেটা একেবারে বেঠিক নাকি কিছুটা ঠিক, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন-উত্তর চলছে। ফলে, এখন ভবিষ্যৎ, তা খুব স্পষ্ট নয়। এর জন্য সময়ের দরকার। অতীতে কী ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে না হয়েছে তার হিসেব নেওয়ার দরকার।

আমার নিজের কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার নয়। কিছুটা হয়তো পরিষ্কার,

অনেকটাই আবার অপরিষ্কার, সুতরাং খুব স্পষ্ট ধারণার কথা যদি জানতে চাও, তাহলে তা কারোরই আছে বলে আমি মনে করি না।

এটা একটা বাস্তবের সংকট। বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের মিল হয়নি। কেন মিল হয় নি? স্বপ্নের চোখে বাস্তবকে দেখা হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু, সেই বাস্তবটা কী আকার নেবে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা তো এটা বলি সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই, ধনতন্ত্রে শেষ পর্যায় এসে গেছে। কিন্তু আজও দেখা যাচ্ছে যে তার মরবার কোনো লক্ষণ নেই। বরং সমাজতন্ত্রই সেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু তার মানে কি এই যে, ধনতন্ত্র ঠিক, বা, যে রকম আছে সেই রকমই থাকবে? না, ধনতন্ত্র যেমন ছিল সেই রকমও থাকছে না। অনেক বদল ঘটেছে। তাই আমার মনে হয় এখুনি এর কোনো মীমাংসা হবে না।

অদ্রীশ : তাহলে কি আপনার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে?

সুভাষ : এ প্রশ্নে আমি বলব, 'বিশ্বাস' বলতে কী বোঝায়? আমরা মানুষের ভাল চেয়েছিলাম, এই বিশ্বাস কি ভেঙে গিয়েছে? মানুষের কতগুলো মূল্যবোধ থাকা উচিত, এই বিশ্বাস কী ভেঙে গিয়েছে? আমি বলব, না। কিন্তু আমরা যে কতগুলো জিনিস ধরে নিয়েছিলাম, সেই ধারণাগুলো এখন মনে হচ্ছে ভুল। রবীন্দ্রনাথ সেটা বলে গিয়েছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে, সেখানে অনেক সাবধানবাণী আছে রাশিয়া সম্পর্কে। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, মানুষের যে স্বভাব, তাতে যে কোনো সামাজিক পরিবর্তন, রূপান্তরকে মানুষের সেই স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মিলিয়ে আনতে হবে। তার বিরুদ্ধে গেলে সে এটার বিরোধিতা করবে। সমাজতন্ত্রে এটা একটু বেশি হয়েছে। জোর করে চাপানো হচ্ছে। কাজেই, সেটা টেকেনি। জোর করাটা, চাপানোটা চলবে না। মানুষকে দিয়ে গ্রহণ করিয়ে নিতে হবে।

অদ্রীশ : এই বিশ্বাসের জায়গাটাকেও কি এভাবে আস্তে আস্তে গ্রহণ করিয়ে নিতে হবে?

সুভাষ : 'বিশ্বাস' কথাটা খুব 'ভেগ্'। বিশ্বাস বলতে তো কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম বোঝায়। যেমন, আগুনে পোড়ায়। এর উল্টো বিশ্বাস—আগুন পুড়িয়ে দেয় না, এটা কখনই হয় না। সুতরাং, আগুনের ধর্ম হল পোড়ানো—এটা একটা বিশ্বাস। জলের ধর্ম হচ্ছে জুড়িয়ে দেওয়া, ঠাণ্ডা করা। এইরকম, অর্থাৎ—যা হবেই, হতে বাধ্য, তাকেই আমরা বলি বিশ্বাস। কেউ যদি বলে, লণ্ডন বলে একটা শহর আছে। তাকে তো আবার অন্য কেউ বলতে পারে, তুমি দেখেছ লণ্ডন শহর? কী করে জানলে যে লণ্ডন বলে শহর আছে? অর্থাৎ বিশ্বাস ব্যাপারটা নানাভাবে হয়। দেখে হয়, ঠেকে হয়, শিখে হয়। কাজেই বিশ্বাস বলতেই আমরা কতগুলো রাজনৈতিক বিশ্বাস ধরে নিই যে সেটা ঠিক নয়। বিশ্বাস হচ্ছে কতকগুলো

নিয়ম। সেই নিয়ম সম্পর্কে সজাগ হওয়া। আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে যতটুকু বুঝতে পারি, সেটুকুই আমার বিশ্বাস। তাই, কেউ কেউ ভগবানে বিশ্বাস করেন। কেউ করেন না। আমি একে বিশ্বাস বলব না। কারণ, এখানে যুক্তি কাজ করছে না।

অদ্রীশ : অভিজ্ঞতাকে আপনি অনেক বেশি মূল্য দিতে চান।

সুভাষ : যাচাই করা অভিজ্ঞতাকে!

অদ্রীশ : তাহলে প্রশ্ন জাগে, সেখান থেকেই কি এরকম মনে হল? আপনার চারপাশে আপনার সঙ্গীসাথীদের এখনো তো কেউ কেউ কাজ করছেন, এখান থেকেই যদি প্রশ্ন তোলা যায়।

সুভাষ : আমি মনে করি, তাঁরা অধিকাংশই এগুলো তলিয়ে বুঝতে চায় না। ভয় পায়, যদি সেটা ভুল প্রতিপন্ন হয়। এতদিন ধরে যেটা আঁকড়ে আছে, শেষপর্যন্ত সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। না হলেই সে অসহায় হয়ে পড়বে। এরকম আমি অনেককেই দেখেছি, তারা এরকম মনে করে যে আর কিছুই রইল না। এ সমস্ত যখন ভুল, তখন বেঁচে থাকারই কোনো মানে হয় না। সেটা আমি ঠিক বলে মনে করি না।

অদ্রীশ : এটা তো তাঁদের এক ধরনের অন্ধতার দিকে চলে যাওয়া।

সুভাষ : হ্যাঁ। আমি সেটা সমর্থন করি না। আমার মতে সবকিছু বাজিয়ে দেখা দরকার। ঠিক কি ভুল। ভুল হলে সেটাকে বর্জন করতে হবে।

অদ্রীশ : আচ্ছা, এরকম আমরা মনে করতাম, সমাজতন্ত্রের পথে যাচ্ছে যে সমস্ত দেশগুলো, তাতে শিল্পী, লেখকরা একটা অন্যরকম মাত্রা পাবেন। চিন্তার বিকাশে কিংবা লেখালিখি করার ব্যাপারে একটা অন্যরকম সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে। কিন্তু, অদ্ভুত ব্যাপার! এই সমস্ত দেশগুলোতে এই পর্যায়টায় আর দ্বিতীয় কোনো লু সুন, গোর্কি, মায়াকোভস্কি, নেরুদা—দেখাই গেল না। এটা কেন হল?

সুভাষ : যদি প্রতিভার কথা বল, তাহলে এভাবে হিসাব করা যায় না। একটা ভাল সমাজ মানেই তাতে প্রতিভার ছড়াছড়ি হবে—এমনটা ঠিক নয়। তবে, কীভাবে হয় এটা বলা খুব মুশকিল। যেমন, গোর্কি বা মায়াকোভস্কি তো আর সমাজতন্ত্রের প্রোডাক্ট নন। পাস্তরনাকও নন। বরং দেখা গিয়েছে, যাঁরা সমাজতন্ত্রের মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁদের হাত পা একেবারে বাঁধা। রেজিমেন্টেশনের চূড়ান্ত। তাঁদের সৃষ্টি কিছুই হয় নি। সেভাবে হতেও পারে না। কাজেই, যে কথাগুলো বলা হত, সমাজ যদি অনেক বেশি উন্নত হয়, তাহলেই যে সেখানেই প্রতিভার উন্মেষ হবে—তা বলা যায় না। কেন না, আমাদের যে সমাজে মহাত্মা গান্ধী কিংবা রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, এখনকার সমাজ তার চেয়ে অনেক উন্নত। কারণ, পরাধীনতার গ্লানি নেই, অনেক শিল্পপ্রসার ঘটেছে। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে—কিন্তু আর একটা মহাত্মা গান্ধী কি রবীন্দ্রনাথ তো আমরা পাই নি। কাজেই এর সঙ্গে মেশানো যায়

না। সমাজের কী চেহারা, তাই দিয়ে ব্যক্তিগুলো গড়ে উঠবে, তা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। বরং প্রতিকূল সময়ে অনেক বেশি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

অদ্রীশ : আমরা জেনেছি, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়, চীনে বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে একটু অন্যরকমের লেখালিখি করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যেই যেন প্রতিভার চিহ্নটা আছে। একটা সোসালিস্ট কান্ট্রিতে তার যে প্রতিবন্ধকতা সেটাকেই তুলে ধরাটা কেউ কেউ অর্থপূর্ণ মনে করেন।

সুভাষ : তা তো বটেই। গোর্কি একটা কথা বলেছিলেন—ডিভাইন দিস কনটেন্ট। তুমি যদি কোনো সমাজে সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তোমার যদি মনে হয় যে আর কিছু এগোবার নেই, বা পাবার কিছু নেই, তাহলে তো সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবেই। সৃষ্টি তখনই হয়, যখন তুমি মনে কর, এটা নেই। এটা হওয়ানো দরকার। কাজেই এটা মনে হয়, যাঁরা সৃষ্টিশীল, তাঁরা যে সমাজের মানুষ হোক না কেন, তাঁরা ডিসিডেন্ট হন। এছাড়া তাঁদের কোনও পথ নেই। কারণ, তাঁকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

অদ্রীশ : আপনি কী নিজেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করেন?

সুভাষ : না।

অদ্রীশ : একটু এক্সপ্লেন করে দিন।

সুভাষ : কমিউনিস্ট কথাটার আমরা যে মানে বুঝতাম তা হল, যে কমিউনিজমে বিশ্বাস করে, সে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাস করে। যে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাস করে, সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ায় বিশ্বাস করবে। ইনডিপেডেন্ট কমিউনিস্ট বলে কিছু থাকতে পারে না। আমি সেই অর্থে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করি না। আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে বিশ্বাস করি না। আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ায় বিশ্বাস করি না। সুতরাং, আমি কমিউনিস্ট নই।

আর তাছাড়া, কমিউনিজম তো একটা খুব ভেগ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা একটাই মানে বুঝতাম কমিউনিস্টদের। আন্তর্জাতিক ভাবে, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র যারা সদস্য তারাই হচ্ছে কমিউনিস্ট। যাকে আমরা লাল ঝাণ্ডা বলি, সেটাই হচ্ছে কমিউনিস্টদের ঝাণ্ডা। এখন তুমি লাল ঝাণ্ডা দেখলে বলতে পারে না, এটা কাদের। এখন কমিউনিস্ট নাম দেখলে তুমি বলতে পারবে না, এটা কোন্ কমিউনিস্ট। কাজেই, কেউ যদি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে, তাহলে তাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে, সে কোন কমিউনিস্ট পার্টির। লাল ঝাণ্ডা নিলে বলতে হয় সেটা কোন পার্টির। কাজেই আমি আর এগুলোতে বিশ্বাস করি না।

অদ্রীশ : এখন যে পরিস্থিতিটা আপনার চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে চলেছে, সেটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কিছু কি বলতে চান, কোনো নামে বা অন্য কোনো ভাবে?

সুভাষ : আমি তো আর সমাজ-বিজ্ঞানী নই। আমার সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা, প্রথমত তা একটা ওপর ওপর ধারণা। তার মূলে হচ্ছে, সমাজটা এমন হবে যাতে

মানুষের ভাল হয়। কিন্তু, এটাও খুব রিলেটিভ। যে শ্রমিক কিছু কাজ না করে মজুরী নিচ্ছে, বোনাস পাচ্ছে, নানা রকমের সুবিধা পাচ্ছে—আমি তাকে সমর্থন করি না। কেন না, শুধু তার ভাল হওয়াটাই সব নয়। তাতে সমাজের ভাল হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এতে সমাজ আরো তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, মানুষের ভাল হওয়াটা পরিষ্কার করে দেখা দরকার।

আজ যদি একটা কারখানার কথা ধরি। সেখানে মজুররা কাজ নিচ্ছে আর মালিক কাজ করাচ্ছে। সম্পর্কটা শোষণের সম্পর্ক। কিন্তু আগে হলে আমি যেটা নিন্দনীয় মনে করতাম, এখন তা মনে করি না। কারণ, সেখানে একটা উৎপাদন হচ্ছে, তার যে মূল্য তৈরি হচ্ছে সেটার ওপর শ্রমিক কতটা পাবে মালিক কতটা পাবে তা নিয়ে দরকষাকষি হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে মালিক কোনো মুনাফা পাবে না। যা হবে তার সবটা শ্রমিক পাবে আমি এটা ঠিক মনে করি না। কেন না, আমাদের কতগুলো জিনিস দেখতে হবে। যেমন, পাব্লিক সেক্টর—সেই অর্থে তো জনসাধারণই তার মালিক। অথচ, সেখানে নৈরাজ্যের অবস্থা। যারা কাজ করে তারা কেউই সেটাকে নিজের বলে মনে করে না। তাই ক্রমশ তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই অনেক কিছু সম্পর্কে যে 'ধরতাই' বুলি আমাদের ছিল তা আজ নতুন করে ভাবতে হবে! যেমন, একজন চাষীর নিজের জমি থাকবে কিনা। আমরা ভাবতাম যে, কেন থাকবে? সব জমি হবে সকারের। কৃষককে দেওয়া হবে চাষ করতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কৃষক যদি জমিটাকে নিজের বলে না মনে করে তাহলে সেইভাবে সে কখনই চাষের জন্য খাটছে না। আজ এতগুলো সব নতুন করে ভাবাচ্ছে, আমাদের। আমি যে তার সব উত্তর পেয়েছি তা নয়। কিন্তু চিরাচরিত যে ধারা, সেই ধারায় আর চলছি না।

অদ্রীশ : আলটারনেটিভ কোনো ধারা কি দেখতে পাচ্ছেন?

সুভাষ : শাখারভের দু'টো লেখা ছিল। তাতে এসব বিষয় নিয়ে অলোচনা করেছেন। মানে ভবিষ্যৎ নিয়ে। তার মূল কথা হচ্ছে, সমাজতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র এগুলো এক জায়গায় এসে মিলে যাবে। কিছু সমাজতন্ত্রের এলিমেন্ট ধনতন্ত্রে ঢুকবে। কিছু ধনতন্ত্রের এলিমেন্ট সমাজতন্ত্রে। এটাও যে আমি খুব স্পষ্ট করে ভাবতে পারি তা নয়। আমার নিজের কাছে মনে হয় খুব জীর্ণ। কেন না, আজকে ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো তো আর আগের মত থাকছে না। তাদের ওয়েল ফেয়ারের দিকে যেতে হচ্ছে। আর তার সমাজ থাকে না।

অদ্রীশ : এই সমস্ত মিলে আপনার প্রতি চারপাশের রিঅ্যাকশনটা কী রকম?

সুভাষ : সেটা আমি খুব একটা ভাবি না।

অদ্রীশ : না ভাবুন, আমি বলতে চাইছি অন্যেরা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছেন?

সুভাষ : অনেক সময় শুনেছি লোকে খুব গালাগাল দেয় আমায়, আবার একসময় গালাগাল দিত এখন তারা নতুন করে ভাবছে এরকমও আছে। তার মানে এই নয়, আমি

যা ভাবি সবটাই ঠিক। তবে আমার তো চিন্তা বদলাচ্ছে, এক জায়গায় তা দাঁড়িয়ে নেই। সেটা আমৃত্যু থাকবে। যেমন যেমন অবস্থা দেখব সেই সেইমত বদলাবে। তবে, কে কী ভাবছে তাই দিয়ে আমি আমার ধারণাগুলোকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলব না।

অদ্রীশ : আপনি আমায় আগে একদিন বলেছিলেন, কোনো কোনো জায়গায় নানা রকমের বিক্ষোভও হয়েছে আপনাকে ঘিরে....

সুভাষ : হ্যাঁ, সে তো হবেই। তারা তো একা নয়। সে সমস্ত সংগঠিত পার্টি আছে তারা আমার সংগঠিতভাবেই বিরোধিতা করে, করতে হয় তাদের।

অদ্রীশ : এটা খুব ধোঁয়াশার বলে মনে হয় অনেকের যে আপনি বিভিন্ন সময় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রতিবাদ করেছেন।

সুভাষ : আপত্তিটা কী?

অদ্রীশ : কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই কেন?

সুভাষ : আমি যে মঞ্চ পেয়েছি সে মঞ্চেই করেছি। কংগ্রেস বলে নয়। এখন তো আর আমি কোনো মঞ্চ তৈরি করতে পারি না। কাজেই তৈরি মঞ্চতেই আমাকে যেতে হয়। শুধু কংগ্রেস নয়, আরো মঞ্চে আমি গেছি। আর আমি কংগ্রেসকে অচ্ছ্যুৎ বলে মনে করি না। এক সময় মনে করতাম, এখন করি না। আমাদের পার্টিতে একসময় অন্য কোনো লেফট পার্টির লোকজনদের সঙ্গে মেশা নিষিদ্ধ ছিল। তার জন্য আমাকে নানা সময়ে মিশে জবাবদিহি করতে হয়েছে। এই যে সংকীর্ণতা বিভিন্ন দলে, তা শুধু কমিউনিস্ট পার্টির নয়, তা কংগ্রেসের মধ্যেও আছে, সেই সংকীর্ণতায় আমি বিশ্বাস করিনা।

অদ্রীশ : কংগ্রেসকে আপনি অলটারনেটিভ মনে করেন?

সুভাষ : কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে অলটারনেটিভ হতে পারছে না। কংগ্রেসও একটা ঘুণ ধরা সংগঠন। তার কোনো সুস্পষ্ট কর্মসূচী নেই বা কর্মসূচী থাকলেও, তাকে কাজে পরিণত করার মত সংকল্প নেই। কাজেই কী হবে কিচ্ছু বলা যায় না। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে, পুরনো সব দলই একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড হচ্ছে। ভেস্টেভ ইন্টারেস্টেড হয় নি এমন কেনোও সংগঠন নতুন করে উঠে দাঁড়াতে পারে নি। যতদিন তারা এই ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড না হচ্ছে ততদিন তাদের উপর মানুষ আশা করতে পারে না।

অদ্রীশ : তাহলে, আলটিমেটলি সেও ভেস্টেড ইন্টারেস্টের দিকেই চলে যাবে?

সুভাষ : নিশ্চয়। ক্ষমতার ব্যবহারে তো তাই-ই হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় এটাই দেখা গেল। তারা এত আশা করেছিল অথচ তা টিকলো না। আসলে এটা একটা ট্র্যাঞ্জিশনাল পিরিয়ড। নানারকম রদ-বদল হয়ে কি দাঁড়াবে সেটা বলা যাচ্ছে না। কিভাবে থিতোবে তাও বলা যাচ্ছে না।

অদ্রীশ : সব মিলে কি খুব হতাশার?

সুভাষ : আমার কাছে কোনো হতাশাই নেই। আমি সেরকম মনে করি না। সবাই চাইছে একটা কিছু ভাল হোক। গোড়াতে একটা জড়তা থাকে, তারপর সে জড়তাটা কেটে যায়। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে লোকেরা এখনও ভীষণ ভয় পায়। আগে সহ্য করত। এখন আর সহ্য করতে চায় না। কিন্তু এখনও সেই ভয়টা কাটাতে পারেনি। তবে, এটা একদিন ফেটে পড়বেই। কবে, তা আগে থেকে দিনক্ষণ বলা যায় না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই বদলটা ঘটবেই।

অদ্রীশ : সারা জীবনে অনেক স্রোতের বিরুদ্ধে চলেছেন আপনি। বিরোধী দলকে যেমন বলেছেন আবার তেমনিভাবে দলের মধ্যে নানা বিরোধিতা করেছেন। আজ এই ৭৬ বছর বয়সেও তা সাহসের সঙ্গে করছেন।

সুভাষ : কিন্তু, সত্যি বলতে গেলেই, সেভাবে অনেক কিছুই বলতে পারিনি। খুবই কম বলেছি। আরো বহু ইস্যু ছিল যেগুলো সম্পর্কে কিছু বলাই হয়নি, বলা যায় নি, সম্ভব হয়নি। গোটা ব্যাপারটা তো খুচখাচ প্রতিবাদের ব্যাপার না। যদি তুমি আজ তরুণ সমাজের দিকে তাকাও, কী তাদের জীবন আছে? লেখাপড়া করবে? ভর্তি হওয়ার সমস্যা। ভর্তি হলে, কী লেখাপড়া করবে? যেটা শিখবে তার সঙ্গে তার জীবনের কোনো মিল আছে? তারপর পাশফেলের কোনো গ্যারান্টি নেই। যে পাশ করতে পারল না, সে নিজেকে মনে করল জীবন থেকেই খারিজ হয়ে গেল বলে। আর যে পাশ করল সে কোনো কাজ পেল না। এই সমস্ত নিয়ে যে গোটা সিস্টেমটা, তার কথা আমরা তার কিছুই ভাবছি না। যারা সরকারে তাদের এ নিয়ে আর এখন মাথাব্যাথা নেই। এতগুলো প্রাণ নষ্ট হচ্ছে, তা নিয়ে যে বিচলিত হওয়া তার কিছুই দেখছি না। কত কারখানা বন্ধ, লোক আত্মহত্যা করছে তবু এদের কোনো চিন্তা নেই। যে যার নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত। আজ বাংলায় মেয়েদের প্রতি যে ব্যবহার হচ্ছে তা তো ভাবা যায় না, তা নিয়েও কোনো ভাবনা নেই। ওই কাগজেই শুধু বের হয়। আসলে আমরা সবই সহ্য করে যাচ্ছি। একমাত্র যারা কমবয়সী তারাই এটাকে ওল্টাতে পারবে। তাদের এবার বেঁকে বসা উচিত। ঘুরে দাঁড়ানো উচিত।

অদ্রীশ : শিক্ষিত লোকেদের কথা বলছিলেন, তাঁরা বলেন, ব্যবস্থা বদল তো সহজ ব্যাপার নয়, তো সেক্ষেত্রে অলটারনেটিভ যখন নেই তখন মন্দের-ভাল' হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট মন্দ কী?

সুভাষ : 'মন্দের -ভাল'টা আমি পছন্দ করি না। হয় ভাল হবে, নয় খারাপ হবে। 'মন্দের ভাল'টা আরো মানুষকে ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। সবচেয়ে ভাল খারাপ হওয়া।

অদ্রীশ : ইমিডিয়েট অলটারনেটিভ আপনি দেখতে পান?

সুভাষ : দেখো, তৈরি কোনো অলটারনেটিভ নেই। আমি মনে করি বদলাতে হবে

রাজনৈতিক ভাবেই। যার জন্য আমি অরাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হতে হবে। তারা রাজনৈতিক নয় এটাও ঠিক নয়। ভোট যখন দেয় তখন তাদের প্রত্যেককেই একটা রাজনৈতিক স্ট্যাণ্ড নিতে হয়। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই এখন অন্যরকম চলেছে। অলটারনেটিভ পথ ভাবতে গেলে আমি প্রথমেই ভাবি 'ভোটারস কাউন্সিলের' কথা। প্রত্যেকটা কনসটিট্যুয়েন্সিতে ভোটারা ঠিক করবে, কারা ভোটার। অন্তত দেখবে যে কারা ভোটার হল, কারা হল না। ফল্‌স্‌ ভোটার হয়েছে কিনা। প্রত্যেকে নিজের ভোট নিজে দেবে। এটা যদি হয়, তাহলে ভোটাররাই নানা দলের প্রতিনিধিদের বলবে যে, তোমরা এসে আমাদের মঞ্চে সভা করে বল, কারা কী চাও। এত পয়সা উড়িয়ে সভা করা চলবে না। যদি এইভাবে আন্দোলন করা যায় তাহলে এটাকে 'ইমিডিয়েট অলটারনেটিভ' পথে বদলানোর কথা বলতে পারি। অন্তত একটা নতুন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া দরকার। না হলে, এটা এতদিনে যা দাঁড়িয়েছে তাতে সবাই ধরেই নিয়েছে, যারা ক্ষমতায় আছে আবার তারাই ক্ষমতায় ফিরে আসবে। সেটা এখনও পর্যন্ত গায়ের জোরে, টাকার জোরে, নানারকম ফন্দিফিকিরে ঘটে চলেছে। এটা বদলানো উচিত।

অদ্রীশ : আমার মনে হয় চারদিকে একটা সাংঘাতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আপনি এটু আগে যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে আপনি এইসব 'ভোটারস কাউন্সিল', 'কমন প্ল্যাটফর্ম' এগুলোর প্রতি আস্থাশীল। এখানেই তো পার্টির লোক ঢুকে গণ্ডগোল পাকায়। মানুষ নিজেও সব সময় সব জটিলতা ধরতে পারে না।

সুভাষ : এটা ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণ লোক অত বোকা নয়। কিসে তার ভাল হয় সেটা সে বোঝে। কাজেই তাকে যদি অভয় দিয়ে বলা হয়, তুমি বুঝে-শুনে ভোটটা দেবে, তাহলেই সে ঠিক সিদ্ধান্তটা জানাতে পারবে। তার সঙ্গে লেখাপড়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

অদ্রীশ : চারদিকে এত রিগিং চলেছে, এত টাকা ছড়িয়ে ভোট হচ্ছে বা এমন নানারকমের অসামাজিক কাজ করে পুরো পরিকল্পনাটার মধ্যে বিষ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ তার অধিকারটাই প্রয়োগ করতে পারছে না ভোটে বা ভোটের বাইরে। এই প্রক্রিয়াটা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে—এই অবস্থায় কি আপনি সেরকম কোনো জনচেতনার আলো দেখতে পাচ্ছেন?

সুভাষ : এটা যদি একবার ধরিয়ে দেওয়া যায় মানুষকে তাহলেই হবে। যেমন, যে ভোট দেবে তারই পাওয়ার, এটা যদি সে বোঝে।

অদ্রীশ : এটা তো এখনও বলা হয়, আমরা হাজার হাজার বার শুনেছি একথা।

সুভাষ : বলা হয় কিন্তু সে তো তা করে না। করে তো রাজনৈতিক দলগুলো। তারা ম্যানিপুলেট করে। সেটার বদলে যদি ভোটাররা সরাসরি নিজেদের অ্যাসার্ট

করে তাহলে হবে। কে ভোটার, কে নয়—এটা পাড়ার লোকই একমাত্র জানবে। কে ফল্‌স্‌ ভোটার তা চিনতে পারবে।

অদ্রীশ : হ্যাঁ, ফলস ভোটটা যে দিচ্ছে সে পাড়ারই লোক থাকে। সে নির্দিষ্ট একটা পার্টির লোক হয়।

সুভাষ : এই জালিয়াতিটা রুখতে হবে। এখন তো তাই-ই হয়েছে। ভোটারদের হাতে আর নির্বাচন নেই। ভোটই দিতে পারল না। গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড রকমের হয় এসব।

অদ্রীশ : এখন একটা প্রশ্ন জাগছে আমার, আপনি বলেছিলেন একটু আগেই, প্রশ্নটা সামগ্রিক পরিবর্তন হতে হবে যা এই চারপাশের প্রসেসগুলোর মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে নয়। আবার এখন আপনি ভোটিং প্রসেসটার মধ্যে একটা আস্থা রাখছেন। এটাকে কনট্রাডিকটারি মনে হচ্ছে....

সুভাষ : গণতন্ত্রের এটাই হল স্তম্ভ যে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোট। তারপর আমরা বলছি, যে লোকটা নিরক্ষর তার ভোটের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আমি তা মনে করি না। এটা বারবার প্রমাণ হয়ে গেছে—নিরক্ষর হওয়া মানেই অশিক্ষিত এটা বলা যায় না। সে খেটে যাচ্ছে। সে ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, যাচাই করতে পারে। সে লোক চেনে। তাকে ঠকানো এত সহজ নয়। বরং শিক্ষিত লোকরা অন্য নানাভাবে হয়তো মোটিভেটেড হয়। সেইজন্য জোর করা উচিত সমস্ত ভোটারদের উপর। যারা ভোটে দাঁড়াবে তারা সামনে আসুক। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে বলুক তাদের যা বলবার। এখানে একজনের মিটিং ভাঙা, আর একজনের মিছিল ভাঙা, আর তো দরকার নেই।

অদ্রীশ : সেটা কি সম্ভব; এই পরিস্থিতিটা যে আর গড়ে উঠবে না তা তো সবাই জানি।

সুভাষ : করতে হবে। কেন হবে না? আসলে, আমরা গণতন্ত্রটাকে চালু করছি না। এটাকে খোঁড়া করে রেখেছি। একবার যে ভোট নিয়ে চলে গেল, তারপর আর তার মুখ দর্শন করতে পারে না কেউ। দ্বিতীয়ত, তুমি যে পার্লমেন্টে যাচ্ছো, তুমি কে? তুমি গিয়ে কী করবে; তোমার পেটে বিদ্যা আছে কি নেই তা দেখা দরকার। এটা তো বললে হবে না যে অশিক্ষা দিয়েই হয়ে যাবে। আজকে যে দেশটা চালাবে, তাকে অনেক কিছু জানতে হবে। তাক এক্সপার্ট হওয়া দরকার। না হলে তার হাতে অন্যেরা তামাক খেয়ে যাবে। সে একটা পুতুলের মত বসে থাকবে। আর সেই অবস্থাটাই আজ দাঁড়িয়েছে। হয় ব্যুরোক্র্যাটরা, নয় পার্টি তাকে চালাচ্ছে।

অদ্রীশ : তাহলে আপনার এই পরিকল্পনায় খুব সাধারণ মানুষ যে ক্ষমতায় যেতে পারবে সেটা বোঝাচ্ছে না। খুব প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একজন এম. পি. হয়ে গেল, তারপর আর তাকে মন্ত্রী করা যাবে না, কারণ সে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। সে ওয়াকিবহাল নয় সে অর্থে।

সুভাষ : তা তো হবেই। তোমাকে বেছে যোগ্য লোক পাঠাতে হবে। অযোগ্য লোককে যদি তুমি পাঠাও তাহলে তোমার কাজ হবে না। যোগ্য বলতে সব সময় দিগ্‌গজ পণ্ডিত হতে হবে তা নয়। এমন লোকও হতে পারে যে খুব ডেডিকেটেড, সৎ এবং যে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

এই নিয়ে অনেক কিছু ভাবা দরকার। আজ যে কাঠামোটা রয়েছে ভারতবর্ষের, দরকার হলে তাকেও বদল করতে হবে। এমন যতটা সেন্ট্রালাইজড্ ক্ষমতা তাকে আরো ডি-সেন্ট্রালাইজড্ করা দরকার। না হলে সারা ভারতকে এক রাখা যাবে না।

অদ্রীশ : আর এই সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে কি আপনি সংসদীয় পথে সামলানো যায় বলে মনে করছেন?

সুভাষ : হ্যাঁ। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সময় লাগতে পারে, ভুল হতে পারে অনেক, কিন্তু এইটাই একমাত্র রাস্তা।

———————

কেউ 'ছাপা' কবি, কেউ 'ছুপা' কবি : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

('দি উইক' পত্রিকার সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য। কবির 'চিঠির-দর্পণে' বইয়ের শুরুর কথায় তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা আছে। তাপস গঙ্গোপাধ্যায় কবিকে লিখিতভাবে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন ১৯৯৯ সালের ২৮ নভেম্বর, কবি লিখিতভাবেই এই প্রশ্নের জবাব দেন।)

আজ থেকে কয়েক বছর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে গিয়েছিলাম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত কোনও কবির পক্ষে কি শুধু কবিতা লিখে ভদ্রভাবে সংসার চালানো সম্ভব; সেই সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন ছিল। কবি তখনই বধির। উনি প্রশ্নপত্রটি পড়ে বললেন, লিখে উত্তর দেবেন। দিলেনও তাই। ১৯৯৯ সালের ২৮ নভেম্বর ওঁর ৫ বি, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাসায় গিয়ে দেখি তিন পাতা জুড়ে আমার দশটি প্রশ্নের উত্তর নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। সেই লেখা কোনো একটি কারণে সেদিন ছাপা সম্ভব হয়নি।

আজ কবি নেই। দেশি ও বিদেশি সাহিত্য, পুরস্কারের মূল্য, টিভি-রেডিও-র যুগে কবিতা, সরকারি বদান্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় এখানে অনেকটাই ধরা পড়েছে।

প্রশ্ন : আর মাসখানেকের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখব। যে শতাব্দীকে পেছনে রেখে যাচ্ছি সে সময়ে বাংলা সাহিত্য, অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য এবং ভারতীয়দের লেখা ইংরেজি সাহিত্য, যাকে আমরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লিটারেচার বলি, এই তিন ধরনের সাহিত্যে প্রকৃত কাজ কতটা হয়েছে।

সুভাষ : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ কথাসাহিত্যে যে জায়গা ছিল ১৯ শতকে, ২০ শতকে তা ম্লান। ২০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজদের হাত থেকে রথের রাশ গিয়ে উঠল মার্কিনদের হাতে। আবার তারই মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল স্প্যানিস সাহিত্য। তখন বোধ হয় সেখানেও ভাঁটার টান। ২১ শতকে সম্ভবত ইংরিজিই আবার বাজার মাত করবে। ভাষা হিসেব হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ইংরিজিরই হবে জয়জয়কার।

ইংরেজ রাজত্বে বাঙালিরা ইংরিজি আয়ত্ত করে এগিয়েছে। অন্য ভারতীয় ভাষাকে টেক্কা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর অন্য ভারতীয় ভাষাগুলোর গায়েও আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে। তার বড় কারণ সব অঞ্চলেই মধ্যবিত্তের বিস্তার। এখন আর তারা বাংলার মুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়ার সঙ্গে তাদের এখন প্রত্যক্ষ যোগ ঘটেছে।

ফলে, খুব কম সময়ের মধ্যে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত আর দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য বাংলার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

স্বাধীনতার পর অন্তভারতীয় কতকাংশ কমেছে। এখন এ-রাজ্যের মানুষ কাজের সুবাদে ও -রাজ্যে, ও-রাজ্যের মানুষ এ-রাজ্যে হামেশাই থাকছে। আস্তে আস্তে সপরিবারে রপ্ত করে

নিচ্ছে স্থানীয় ভাষা। আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই এটা দেখছি। আমার এক শ্যালক আর শ্যালকের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করছে মারাঠিভাষীদের। তাদের কেউ কেউ বাংলা বললেও লিখতে পড়তে পারে না। আমার এক নাতি তেলেগু জানে। আর বউ তামিল-জানা বাঙালি। আরেক নাতবৌ গুজরাতে বড় হয়েছে। আমার ভাইঝি আর তার ছেলেমেয়েরা গড়গড় করে ওড়িয়া বলে। আমার এক জামাই পাঞ্জাবি।

প্রশ্ন : বিংশ শতাব্দীর পাঁচজন লেখকের নাম বলুন যাঁদের লেখা বাংলা সাহিত্যকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পরবর্তী শতাব্দীতেও করছে।

সুভাষ : ১৯ শতকে জন্ম—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ শতকে জন্ম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অন্নদাশংকর রায়, সমরেশ বসু ও অরুন মিত্র।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্য কী কোনওভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে? যদি করে থাকে তাহলে কোন্ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এর দ্বারা সবচেয়ে লাভবান হয়েছে?

সুভাষ : প্রধানত শরৎচন্দ্রের প্রভাব। তুলনায় রবীন্দ্রপ্রভাব কম। শরৎচন্দ্রের প্রভাব কাজ করেছে যতদিন ভারত ছিল পল্লীসমাজকেন্দ্রিক। নগরায়ণ আর শিল্পায়নের যুগে গদ্যে মানিক আর সমরেশ, পরে আদিবাসী নিয়ে মহাশ্বেতার লেখা। কবিতায় শক্তি আর সাময়িকভাবে হাংরি লেখকেরা।

প্রশ্ন : দশজন অন্য ভারতীয় ভাষার লেখকের নাম উল্লেখ করুন যাঁদের লেখা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও নৃত্য সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

সুভাষ : প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মণ্যম ভারতী, তাকাজি, বিষ্ণু দে, অমৃতা প্রিতম, কন্নড়—

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যে ও ভারতীয় সাহিত্যে আপনার ভূমিকা কী? আপনি যে ধারার জন্ম দিয়েছেন পরবর্তী শতাব্দীর তরুণ কবিরা কি তাকে অনুকরণ করবে?

সুভাষ : অশিক্ষিত পটু হিসেবে লোকমুখের আটপৌরে কথায় তাৎক্ষণিক বিষয়ে দিন বদলের পালাগান গেয়েছি। তার ছাপ সুদূরপ্রসারী হয়নি।

প্রশ্ন : একজন কবি কীভাবে একটি জাতিকে প্রবুদ্ধ করেন? আপনার কবিতা লাখ লাখ তরুণকে একটি বিশেষ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ করেছে?

সুভাষ : দেশের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে আর সাধারণ মানুষই যে দেশকালের আসল বনিয়াদ, ওপরওয়ালাদের চিন্তার সেই হারানো খেই ধরিয়ে দিয়ে।

প্রশ্ন : কবি কে? যাঁরা নিত্য লেখেন এবং যাঁদের কবিতা নিয়মিত ছাপা হয় তারা সবাই কি কবি?

সুভাষ : স্বচ্ছন্দে মনের কথা গুছিয়ে লেখার ব্যাপারটা অভ্যেস করতে হয়। যে পারে তাকেই আমরা বলি কবি। কেউ 'ছাপা' কবি কেউ 'ছুপা' কবি।

প্রশ্ন : জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-প্রাপ্ত একজন কবি কি শুধু কবিতা লিখেই স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারেন?

সুভাষ :আমার জানা মতে, শুধু কবিতা লিখে দুনিয়ার কোথাওই কোনও কবি সংসার চালাতে পারে না। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিও-টিভি, পত্রপত্রিকা আছে—বক্তৃতা দিয়ে, লিখে, কবিতা পাঠ করে, অতিথি-অধ্যাপক হয়ে কবিরা বাঁচার রাস্তা পায়।

প্রশ্ন : জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মূল্যায়ন কী?

সুভাষ : জীবনানন্দ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের হৃত সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করেছেন। বুদ্ধির নাগপাশ থেকে হৃদয়কে দিয়েছেন মুক্তি। শহরকে দিয়েছেন গ্রামের সরলতা। গ্রামে পত্তন করেছেন শহরের বহুমাত্রিকতা।

নজরুলের কবিতায় নজরুল নেই, সে জায়গায় আছে দেশশুদ্ধ মানুষ। তাই কালক্রমে কবিতাকে পর করে দিয়ে তিনি গানকে আপন করেছেন। নিজে ছিলেন উদার মনের মানুষ। কিন্তু অনেক হিন্দু কদর করেছেন তাঁর হিঁদুয়ানিকে। অনেক মুসলমান তাঁকে স্বজাতি বলে তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন : একুশ শতকে কি কবিতা টিকে থাকবে? নাকি টিভি, রেডিও আর ইনফরমেশন টেকনোলজির অন্যান্য বাইপ্রোডাক্টের ঝড়ে উড়ে যাবে?

সুভাষ : কবিতা হল রক্তবীজ। কথা থাকলে কবিতাও থাকবে। কেননা কথা মানেই ধ্বনি দিয়ে জগৎকে মুঠোয় আনা। মনশ্চক্ষে দেখতে পাওয়ার মতো করে ধরা। কথা তাই একই সঙ্গে দেখায় আর শোনায়। গোড়ায় ছিল মন্ত্র। পরে তার রূপান্তর কবিতায়। মন্ত্রের কাজ মনে মনে প্রার্থিতকে পাইয়ে দেওয়া। মানুষ যতদিন থাকবে, ততদিন প্রার্থনা আর পাওয়ার ইচ্ছে থেকে তার রেহাই নেই। তার নিরন্তর নবকলেবরে কবিতা থেকে যাবে। রক্তবীজের মতো। কবিতা তো কলাকৌশলেরই জাতভাই। মানুষের তৈরি জিনিসও মানুষ একদিন স্বভাবগত করে নেয়। সে কাজে কবিতা সহায় হয়।

প্রশ্ন : পুরস্কার ও অর্থ দিয়ে লেখকদের পৃষ্ঠপোষণা কি কোনও সরকারের কাজ হতে পারে? এ ধরনের পৃষ্ঠপোষণা কি লেখক বা লেখার পক্ষে মঙ্গলময় হতে পারে? এ প্রশ্ন করার কারণ কোনও সরকারই লেখকদের যৌবনে বা মধ্য বয়সে সাধারণত পুরস্কৃত করে না। জীবন সায়াহ্নে পুরস্কারের মূল্য কী?

সুভাষ : সরকার মানে তো পরের ধনে পোদ্দার। দেয় লোকের কাছে চক্ষুলজ্জায়। দেয় নিজেদের ইজ্জত রাখতে। সেকালে যেমন রাজামহারাজারা দিত। হাতটা রাজার, কিন্তু ইচ্ছেটা প্রজার। দস্তুরমতো পাওনা জিনিসই লেখকেরা পুরস্কার বলে নিচ্ছে। ক্ষমতাবানেরা ভাবে দানখয়রাত। লোকের চোখে ভালো সাজাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। লোকে যাকে ভালো বলে তাকে পুরস্কৃত করলে সরকারের মুখরক্ষা হয়। সেইসঙ্গে পক্ষপাত আর মাথা কেনার মতলব। লেকের সম্ভাবনার বিচারের পথে হাঁটলে পায়ে কাঁটা ফোটার ভয় থাকে। নামডাক হওয়ার পর দিলে এক ঢিলে দু-পাখি মারা যায়। গুণগ্রাহিতাও হয় এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করা যায়।

লেখক অথবা তাঁর সৃষ্টি বিচারে মহাকালের মানদণ্ডে খেতাব বা পুরস্কার কক্ষে পায় না।

প্রশ্ন ঃ সরকারি কোনও পুরস্কারে লেখকের কোনও উপকার হয়?

সুভাষ : অভাবী লেখক ইজ্জত পায়, বই বিক্রি হয়, বাঁচার কিছু সুরাহা হয়।

প্রশ্ন : সদ্যোজাত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগৎ আজ উচ্ছ্বসিত। তাঁদের মধ্যে কেউ কী কালের মানদণ্ডে উতরোতে পারবেন?

সুভাষ : যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের লেখা পড়ার সুযোগ পাইনি। কাজেই এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এটা স্পষ্ট যে ইংরিজি এখন আর কোনও এক জাতির আঁচলে গেরো দেওয়া থাকবে না। তাতে ভূ-ভারতে সবারই অধিকার বর্তাচ্ছে।

পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা
'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ

৮৪ বছরেও পদাতিক

সুভাষদার জীবনচর্চাটা দেখে খুব ভালো লাগে : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার

মধুশ্রী সেন সান্যাল

পশ্চিমি কাব্যতরঙ্গের নানা অভিঘাত যখন বাংলা কবিতাকে অস্থির করে তুলেছিল, সেই পটভূমিতে চল্লিশের দশকে দেশকাল ও সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে প্রখর সচেতনতা, রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা এবং মার্কসীয় বিশ্ববিক্ষার আলোকে প্রত্যয়দৃপ্ত, রাজনৈতিক কবিতা লিখে যিনি বাংলা কবিতায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'পদাতিক' (১৯৪০) নিয়ে তিনি যখন বাংলা কবিতা-অঙ্গনে প্রবেশ করলেন, তখনই তা হয়ে উঠল ঐতিহাসিক এবং তা সমাদৃত হয়েছিল সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে। বাংলা কবিতার আরেক আলোকস্তম্ভ, তাঁর অনুজ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখালেখির সূচনা সেই চল্লিশের দশকেই। তিনিও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সড়ক ছেড়ে তৈরি করে নিলেন নিজস্ব এক পথ, কোনোরকম মতাদর্শের পরোয়া না করেই। ফলে পাঠক পেয়ে গেলেন অপর একটি স্বর, যা ভাবতে শেখায় অন্যরকম করে। শব্দবিন্যাস আর সহজ চলনে চল্লিশের এই দুই কবির কবিতা, অভিনব একটি ধারার বাহক। ছন্দ নির্মাণের কুশলী ব্যবহারে তাঁদের অসামান্য দক্ষতা। দুজনেই আবার কবিতার মতো তাঁদের বাচনেও অনন্য।

নবতিপর নীরেন্দ্রনাথ বর্তমানে অসুস্থ, বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। তবু 'সাহিত্য অঙ্গন'-এর পক্ষ থেকে, শতবর্ষের প্রাকমুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর কিছু স্মৃতিচারণা শোনার আশায়, এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় হাজির হলাম ম্যানডিভিলা গার্ডেন্‌সে কবির ছোটো মেয়ের ফ্ল্যাটে। বেশ কিছুদিন ধরে নীরেন্দ্রনাথ ভোকাল-কর্ডের এক সমস্যায় ভুগছেন, কথা বলতে কষ্ট, গলা বারবার ভেঙে যাচ্ছে, তবু টুকরো-টুকরো আলাপচারিতায় কিছু কথা উঠে এলো।

প্রশ্ন : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার কবে প্রথম পরিচয় হয়?

উত্তর : ১৯৫৮-এ কবিতার জন্য আমরা একসাথে 'উল্টোরথ পুরস্কার' পাই। তখনই সুভাষদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সেইসময় ওঁর খুব নাম-ডাক।

প্রশ্ন : ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলুন—

উত্তর : সুভাষদার জীবনচর্চাটা দেখে আমাদের খুব ভালো লাগে। মানুষ যেটা বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী সব সময় চলতে পারে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সে অনেক কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুভাষদা যেমন চেয়েছিলেন সেরকমই তাঁর জীবনটা

কাটিয়ে গেছেন। একটি দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল, সেই দল সবসময়ে যে তাঁর ভালো করেছে তা নয়, অনেকসময় তাঁর ক্ষতিও করেছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সেই দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করতে হলো, বাধ্য হয়েছিলেন। দল থেকে এমন উপদেশ তাঁকে দেওয়া হতো, যেগুলি মানতে কবি হিসেবে তাঁর আটকাতো। একটা কবিতার মধ্যে এসব কথা আছে, তখনও তিনি দল ছাড়েন নি, তবু বলেছেন—'আমার খেলাটা আমাকেই খেলতে দাও, পেছন থেকে চাল বলে দিও না।'

আসলে সুভাষদা যে ধরণের শিল্পী, যে ধরণের স্বাধীনতা তাঁর প্রয়োজন, দল সেই স্বাধীনতা তাঁকে দিতে পারেনি বলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন সেইসময় এবং শেষদিকে তো দল ছেড়েই দিলেন। যখন দল ডাঙ্গের প্রতি সুবিচার করেনি, ডাঙ্গেকে দল থেকে বহিঃস্কৃত করে দিল, সুভাষদা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। সুভাষদা সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি যেভাবে জীবনটা যাপন করতে চেয়েছিলেন সেভাবেই যাপন করে গেছেন।

প্রশ্ন : আপনাদের দুজনের কবিতা-আঙ্গিকে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই, আবার পার্থক্যও আছে। সেইসময় ওঁর লেখা আপনাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

উত্তর : সহজকে জটিল করে তুলে সে যতই আনন্দ পাক, কঠিনকে সহজ করাই ছিল সুভাষদার প্রকৃতি। ছন্দকে নিয়ে উনি হরেকরকম পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে ওঁর দক্ষতা প্রায় প্রবাদপ্রতিম। আমাদের মুখের ভাষাকে ওঁর মতো এত সার্থকভাবে একালে আর কে-ইবা সাহিত্যে তুলে আনতে পেরেছেন? তবে ওঁর লেখায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কম, আমি প্রয়োজনে তৎসম শব্দকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছি।

আর, কার প্রভাব আমার ওপরে নেই! আমার নাতি-নাতনিরা যেভাবে কথা বলে, আমি কি তার দ্বারা প্রভাবিত নই? এই যে বাজারে লোকেরা যেভাবে কথা বলে, আমি তো তার দ্বারাও প্রভাবিত। পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু আমার ওপর প্রভাব ফেলে। সব প্রভাব আত্মস্থ করতে পেরেছি বলেই কবিতাটা লিখে যেতে পারি।

প্রশ্ন : নীরেনদা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আপনার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।

উত্তর : বাংলা ভাষার প্রতিনিধি হয়ে আমি দুই জায়গায় যাই। ১৯৮৫-এর অক্টোবরে প্যারিসে। সেবার ভারতীয় কবিতা উৎসবে মোট ন'টি ভাষার ন'জন কবিকে প্যারিসে যেতে হয়েছিল। আবার ১৯৮৮-এর জানুয়ারি মাসে মস্কোতে, ভারত উৎসব উপলক্ষে বছরব্যাপী সেখানে নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেইসব অনুষ্ঠানের একটি হল কবিতা-সন্ধ্যা। এদেশ থেকে আমরা পাঁচজন গিয়েছিলাম—হিন্দি, মালয়ালম্, ওড়িয়া, ডোগরি আর বাংলার কবিতা-প্রতিনিধিরা। ভারত সরকার বাংলার জন্য আমাকে

মনোনীত করে। তখন স্তালিন নেই, গোরবাচেভের আমল। আমার শরীর ভালো নেই। সুভাষদা শুনলেন, তাঁর ইচ্ছে আমি যাই। আমি বললাম—একেই রাশিয়া, তারপর শীতকাল। এখন আবার কে কেনাকাটা করবে? সুভাষদা তাঁর ওভারকোটটা নিয়ে সোজা চলে এলেন আমার বাড়ি, বললেন—নীরেন তুমি যাও, একবার দেখে এসো ব্যাপারটা কি? এমনই ছিলেন সুভাষদা.....

প্রশ্ন : কবির জন্ম শতবর্ষ নানাভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, এই সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : শতবর্ষে নতুন করে আবার মানুষটিকে চিনবার এক উদ্যোগ দেখা দিক। যদি ঠিকমতো পড়াশুনো করে, ওঁর সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করা হয়, তাহলে হয় তো প্রকৃত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছবিটা আমরা পেয়ে যাবো। আমাদের সামনে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেন তিনি।

স্মৃতি কথায় ও অনুভবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—

আমার বন্ধু সুভাষ

জলি মোহন কল

আমি ঠিক সাহিত্যের লোক নই, বাংলাভাষার জ্ঞানও আমার খুব সীমিত। আমি সুভাষ সম্পর্কে যা বলব সেটা হচ্ছে সুভাষকে আমি বন্ধু হিসেবে যেমন দেখেছি এবং মানুষ হিসেবে ওকে যেমন চিনেছি।

সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সম্ভবত ১৯৪২ সালে। যখন আমি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন ফ্যাসিজম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আর আমরা ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছিলাম। তখনকার দিনে সুভাষের খুব সরল অথচ জোরালো ভাষায় কবিতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওঁর ভাষাটা এমন সহজ যে আমার মতো লোকেও বুঝতে পারত।

আমার এই যে বন্ধুত্ব সুভাষের সঙ্গে আরম্ভ হল সেটা শেষদিন অবধি বজায় ছিল। আমার সঙ্গে সুভাষের বিভিন্ন সময়ে যে সম্পর্ক হয়েছিল সেটা বলার আগে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই আর একটি দিক যেটা আজকাল উল্লেখ করা হয় না। সময়, সন তারিখ আমার ঠিক মনে নেই কিন্তু সম্ভবত চল্লিশ দশকেই বা হতে পারে পঞ্চাশ দশকের ঠিক গোড়ার দিকে সুভাষ এবং তাঁর স্ত্রী গীতা দু'জনেই বজবজে গিয়ে থাকল এবং ওখানকার চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করল এটা স্বাভাবিক, কারণ সুভাষের কাছে মানুষ সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ সবার ওপরে ছিল।

সুভাষের সঙ্গে আমার আবার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হল যখন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হল এবং যখন বহু কমিউনিস্ট কর্মী ধরা পড়ে জেলে গেল। কোন সময়ে সুভাষ ধরা পড়েছিল এবং ঠিক কবে বেরিয়েছিল আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমরা একসঙ্গে দমদম জেলে প্রায় আড়াই বছর কাটিয়েছি। এই সময়টা খুব কঠিন সংগ্রামের ছিল, সেই সংগ্রাম কখনও সরাসরি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের রূপ নিয়েছিল আবার কখনও দীর্ঘ অনশনের রূপ। সুভাষ এই সময়কার বর্ণনা তাঁর এক অসাধারণ বইয়ে দিয়েছে। বইয়ের নাম 'হাংরাস'। আমি এটাকে অসাধারণ বলছি এই কারণে যে অনেকেই কোনও বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে একটা কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে। সুভাষের বই তা নয়। সেটাকে আমি একটা ডকুমেন্টারি বলতে পারি, কারণ সে সময়কার জেলের ঘটনা সে হুবহু বর্ণনা করেছে। যদিও যারা জেলে তখন ছিলেন তাঁদের নাম পরিবর্তন করে এটাকে গল্প আকারে প্রসব করেছে। আটচল্লিশ থেকে একান্ন এই তিন বছরের জেল জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলি আর কেউ এরকমভাবে হাজির করতে পেরেছে কিনা আমি জানি না। এটা মনে

রাখা দরকার যে, সুভাষ আমাদের এই জেল জীবনের প্রত্যেকটি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

এই জেল জীবনে আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আমি তাকে অনুরোধ করলাম সে যেন আমাকে বাংলা শেখায়। কয়েকমাস ধরে সে তাই করল এবং আমার বাংলা জ্ঞানের অনেকটাই তাঁরই অবদান। পরবর্তীকালে আমি ঠিক ভাষার চর্চা যেভাবে করা উচিত ছিল করতে পারিনি, কিন্তু যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হত সুভাষ আমাকে বলত 'জলি তুমি লেখ, লিখছ না কেন?'

১৯৬৩ সালের গোড়ায় আমি তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করলাম। নীরবে বেরিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমার পার্টির থেকে সরে আসার নানারকম ভুল ব্যাখ্যা বের হতে লাগলো। তাই আমি খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে বাধ্য হলাম। পার্টির থেকে বেরিয়ে আসার পরে, আমার অনেক সাথী আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করল এবং কেউ কেউ নানান কুৎসা রটনাও আরম্ভ করল। সুভাষ কিন্তু আমার মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল যার সম্পর্কে মনোভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। যদিও সে তখনও পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার কয়েক বছর পরের আর একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করতে চাই যখন আমি পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং কলকাতা জেলার সম্পাদকও ছিলাম। একদিন শুনলাম সুভাষ একটা বই লিখেছে যার মারফত সে মার্কসবাদের মূলকথা সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বই-এর নাম 'ভূতের বেগার'। এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা তখন যারা নিজেদের গোঁড়া মার্ক্সবাদী মনে করত তাঁরা সুভাষকে সামনে করে কড়া সমালোচনা করল। আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম এবং আমি দেখলাম যে প্রায় স্প্যানিশ ইনকুইজিশান-এর মতো এই বই-এর হেরেসিকে ওরা ভৎর্সনা করল।

আমার যতটা মনে আছে সুভাষ এই ঘটনার পরেও সে পার্টিতে ছিল।

সুভাষ কোন সময় পার্টি ছাড়লো বা বহিষ্কৃত হল আমি জানি না। আমার সঙ্গে সম্পর্কের কোনও ছেদ কখনও হয়নি। মাঝখানে একটা সময়ে আমি যখন একটা কোম্পানিতে চাকরি করছি সে আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে বহু দেশ ঘুরতে আরম্ভ করল। কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ এত এবং আমার মনে আছে আমরা লেক ক্লাবে গিয়ে কয়েকবার অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছি। সুভাষের জীবনী এবং সাহিত্য নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি হয়েছিল, কারা করেছিল আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমাকে তারা আমন্ত্রণ করেছিল কিছু বলার জন্য এবং সেইসঙ্গে সুভাষের সঙ্গে আমার সম্পর্কের দীর্ঘ কাহিনী আমি সেখানে বলেছি।

ইদানীংকালে কেউ কেউ মনে করতে আরম্ভ করেছিল যে, সুভাষ এখন প্রগতিশীল নয়, আমার কিন্তু কখনও তা মনে হয়নি। সুভাষ সবসময় একটা পিপল্‌স পোয়েট ছিল। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাকে যদি এস্টাব্লিশমেন্টের বাইরে যেতে হয় তাতে সে দ্বিধা

করেনি। কানোরিয়া জুট মিলের স্ট্রাইকের সময় যখন অনেকে এস্টাব্লিশমেন্টের ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের ত্যাগ করেছিল সে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালো। যদিও তাঁর বয়স তখন সত্তরের ঊর্ধ্বে। শেষদিকে তাঁকে ঘনঘন হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। যখনই সে গেছে সে আমাকে স্মরণ করেছে আর বলেছে 'জলিকে খবর দিও।'

তাঁর মৃত্যুর বোধহয় তিন চারদিন আগে আমি আবার প্রণব বিশ্বাসের কাছ থেকে খবর পেলাম যে সে আবার এস এস কে এম হাসপাতালে আছে ও আবার বলেছে 'জলিকে খবর দিও।' সে তখন কার্ডিয়াক ওয়ার্ডে ছিল। আইসিই-তে। গীতাও তখন হাসপাতালে উডবার্ণ ওয়ার্ডে ছিল। উডবার্ণ ওয়ার্ডে গীতার সঙ্গে দেখা করলাম, কিন্তু জানতে পারলাম যে আইসিইউতে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। আমাকেও বারণ করা হল, তাই আমি যেতে পারলাম না। একজন ডাক্তার গীতার ঘরে উপস্থিত ছিল, তাকে অনুরোধ করলাম যে সুভাষকে খবর দিও যে আমি এসেছিলাম, কিন্তু দেখা করতে পারলাম না। ভেবেছিলাম পরে যখন আইসিইউ থেকে বেরিয়ে আসবে তখন দেখা হবে। দেখা হলো ৮ই জুলাই সকাল বেলা পৌনে ন'টার সময়। বেলভিউ নার্সিংহোমে সিক্সথ্ ফ্লোরে যেখানে তাঁর শরীরটা পড়ে ছিল। কিন্তু সুভাষ তখন আর নেই।

উৎস সপ্তাহ, ২৫ জুলাই-৮ আগষ্ট, ২০০৩

মুখুজ্যে এখনো সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্র

ভালোবাসাগুলিকে নিয়েই ভয়

তরুণ সান্যাল

দু'বছরে মধ্যে সমসাময়িক তিনজন কবির মৃত্যু হলো। মণীন্দ্র রায় (জন্ম : ১৯১৯) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম :১৯২০), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম : ১৯১৯)। তিনজনের ভিতরেই আদর্শগত ও সংগঠনগত ঘনিষ্ঠতা ছিল একসময়। মঙ্গলাচরণ ও সুভাষ তো এক স্কুলের সহপাঠীই ছিলেন। মণীন্দ্র রায় জন্মেছিলেন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলায় শিতলাই গ্রামে ৪ অক্টোবর। মঙ্গলাচরণ যশোহরে নড়াইল থানার নলডাঙ্গায় ১৭ জুন। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে। তিনজনেরই বালক বয়স কেটেছে নদীমাতৃক উত্তর ও পূর্ববঙ্গে। মণীন্দ্রর পাবনায় সুভাষের রাজশাহী জেলায় নওগাঁ শহরে ও মঙ্গলাচরণের পিতার কর্মস্থান বরিশাল। কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী বলেন বালক বয়সে যে নিসর্গপ্রকৃতি, সমাজ, পরিবার এবং নানা সম্পর্কগুলি যে ছাপ রাখে, পরবর্তী জীবনে শিল্পকর্মে তা ঘুরে ঘুরে আসে। কবিতা যে প্রত্যক্ষ সামাজিক ফসল, সমাজে প্রচলিত শব্দকেই বাহন করেন, ঐ শব্দেই চিহ্নিত হতে থাকে বাক্ প্রতিমায়, ছন্দে অন্তর্গত সংগীতে, চমকে বাক্যগত স্থাপত্যে ও স্তবক রচনায় ভাস্কর্যে, মানবজীবনের অন্তর্গত রূপটি বহিরঙ্গ দিয়ে। আমরা এরচনায় যদিও তিনজন কবির নাম উল্লেখ করলাম, উল্লেখিত হওয়ার কথাও ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে বালক বয়স কাটানো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাও (জন্ম : ১৯২০)। আমরা অবশ্য সদ্যপ্রয়াত (৮ জুলাই, ২০০৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

কবি কি স্বতঃবিকশিত প্রায় ঊর্বশীর মতো কেউ? আমি অবশ্যই মনে করি যে কবিত্ব গুণের জন্য নন্দনতাত্ত্বিকরা কবিকে প্রজাপতির সঙ্গে তুলনায় দেখতে চান, সেই কবিত্ব কিন্তু সর্বসাধারণ্যেই রয়েছে। নইলে তুমি কবিতা লিখলে, আমি কবি নই বা কবিতা লিখি না ধরে নাও, তাহলে কবিতাটি আমার পছন্দসই হবে কি হবে না, তা পাঠক হিসেবেই আমি বলব কেন? লক্ষ্য করে দেখো শিশু হাতে রং তুলি পেলে কাগজে কিছু একটা আঁকে, সে যখন হাঁটতে শেখে, হাঁটাও তার নেচে নেচে। একটু কাদামাটি দাও সে কিছু গড়বে। সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাও সে বালি দিয়ে ঘর বানাবে। পুতুল দাও সে পুতুল নিয়ে মানুষের সংসারের খেলা খেলবে। আবার সে নিজের সুর দিয়ে, সুরে কথা বসিয়ে গানও গাইবে। তাহলে তার ভেতরে রয়ে গেছে একই সঙ্গে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, গায়ক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক, নৃত্যশিল্পী, নট, কবি-কে নয়! মনঃস্তাত্ত্বিকরা আজকাল বলেন, যা কিছু ঐ শিশু গড়ছে সে সবই পরিণত বয়স্কদের পৃথিবীতে পরিচিত হবার পাসপোর্ট। তুমি যদি কোনও একটি বিশেষ পরিচয়ে বিকশিত করার সুযোগ দাও সে হয়ে উঠবে পরিণত বয়েসেও কতকটা তাই। আবার উপযুক্ত পরিশীলনের সুযোগ দাও সে হয়ে উঠবে সমস্ত নান্দনিক শিল্পেরই সমঝদার। তাই ঐ যে কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন—না, সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি, যেহেতু ব্যক্তিটির বিশেষ মনের গড়ন অনুভবে স্পর্শপ্রবণতা রয়েছে বলে। আমরা

কিন্তু বলবো ঠিক উল্টো কথা, কেউ কেউ কবি নয় সকলেই কবি। খাওয়া পরার রেস্ত সংগ্রহের জন্যে উর্ধ্বশ্বাস ছুট আমাদের স্পর্শপ্রবণতা, অনুভব ক্ষমতা, পরিশীলনজাত শিল্প অনুভব ক্ষমতা লোপ পেতে পেতে এমন হয়েছে সাহিত্যিক শিল্পী কবি—এঁদের আমরা এক বিশেষ প্রজাতি বলেই যেমন চিহ্নিত করছি। এই অবস্থাটি ভয়ঙ্কর শ্রম বিভাজন ও শ্রেণী বৈষম্য গড়ে দিয়েছে। যে চারজন কবির কথা উল্লেখ করেছি প্রথমেই তাঁরা সবাই জনসমাজকে কবিত্বে ও সৃষ্টিশীলতায় উত্তীর্ণ হওয়া দেখতে চেয়েছেন।

আমাদের সমাজে শ্রেণী বিভাজন মানুষকে তার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গুণ ঠিকমত প্রকাশ হতে দেয় না। যার বিশেষ গুণ আছে ইঞ্জিনিয়ার হবার তাকে হতে হয় হয়তো ডাক্তার, ডাক্তারকে কেরাণী, কেরাণীকে স্থপতি.....এমনি কত না এলোমেলো জীবিকা-প্রস্থান গড়ে ওঠে আমাদের সমাজে। আসলে আমাদের সমাজে মানুষের প্রয়োজনটাই বিকৃতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর, আমার এই বাগুইআটি থেকে বেহালায় পৌঁছতে বাসে দেড়ঘন্টা লাগে। অবশ্য হেলিকপ্টারে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। বাসকেই বাহন ধরছি, কেননা ওটাই সর্বসাধারণের যৌথ বহন। আগেকার দিনের কথা ভাব। হেঁটে যাচ্ছি বা গরুর গাড়িতে যাচ্ছি। রাস্তা নেই ঘাট নেই। যেতে আট ঘন্টা লাগলো। তার মানে দেড় ঘন্টায় পৌঁছে, সাড়ে ছ'ঘন্টা আমার আয়ু হাঁটাচলা না করে হাতে রয়ে গেল। ঐ সাড়ে ছ'ঘন্টা কিন্তু কোনও মালিক আমাকে কাজে লাগিয়ে দেড়ঘন্টা সময়ের চেয়ে কিছু বেশী মজুরি দিয়ে, বা পুরোনো দিনের আট ঘন্টার বেশি কিছু সম্মানি দিয়ে প্রায় সাড়ে ছ'ঘন্টা বা ছয়ঘন্টার উদ্বৃত্তটা হাতিয়ে নিল। এভাবে ব্যক্তি মালিকের নতুন নতুন উন্নত প্রকৌশলে সম্পদের পাহাড় বাড়ছে, আমার কৃত্রিম প্রয়োজন বাড়ানো হচ্ছে, অন্ধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে, কিভাবে আমার কিছু উপার্জন বাড়ে। বিজ্ঞাপন এবং নানাভাবে প্রচার আমার পরিবারের সবাইকে বাধ্য করছে প্রয়োজনের বিকৃত আধিক্য গড়ে তুলতে। ফলে বেশী উপার্জন হবে সেই জীবিকাতেই আমাকে ও আমার পরিজনদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ঘন্টা দেড়েক পরিশ্রমেই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আমি আট ঘন্টা খাটছি। সাড়ে ছয়ঘন্টা আমি গায়ক স্থপতি ভাস্কর চিত্রকর কবি ইত্যাদি হয়ে আমার সময়টা ভরিয়ে দিতে পারতাম। মার্কস এমনটিই ভেবেছিলেন তাঁর কমিউনিস্ট সমাজে। তাই বলছিলাম শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি বটে। কিন্তু সুস্থ সুষম মানবিক সমাজে, সকলেরই কবি হবার কথা। এমনকি ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীও ইত্যাদি। এই জন্যেই বলছিলাম স্বাভাবিক সমাজে কেউ কেউ কবি নয় সকলেই কবি।

নোয়াম চমস্কি বলেছেন দুধরনের শব্দের কথা। শিশু মানবসন্তান বলেই মানস কোষে কোষে অজস্র শব্দ, তার নিজের সৃষ্টি শব্দ অভিজ্ঞতার রসে আর্দ্র করে জমিয়ে রেখে দেয়। শব্দও তো প্রতীক চিহ্ন, সাইন যা কোনও বস্তু বা ভাবকে চিহ্নিত বা সিগনিফাই করে। ফলে ঐ বস্তু বা ভাব উত্তর আধুনিকদের মধ্যে সাস্যুর বলবেন সিগনিফায়ার। তার নিজের মনের ভেতরেও ঐ শব্দগুলির সন্নিবেশ বিশেষ বাক্যবন্ধ রচনা করে। এই শব্দগুলি কিন্তু বালকের অনুভবে অভিজ্ঞতায় সংখ্যা ও সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনায় বহু। এই শব্দই কবি যিনি

হবে তার অন্তর্গত শব্দ। তার অভিজ্ঞতালালিত ছন্দোময়তাও আছে সেখানে। আছে শব্দ সমন্বয়ে ভাস্কর্য স্থাপত্য কথাশিল্প সংগীত গান—কী নয়! সেই বালক বা বালিকা যখন সমাজে তার সৃষ্টি ছবি বা ভাস্কর্য ইত্যাদির পাসপোর্ট নিয়ে প্রবেশ করতে চায় ক্রমশ, পরিণত মানুষের সিভিল সোসাইটি এবং কিছুটা পলিটিক্যাল সোসাইটির সমাজ স্বীকৃত শব্দ বা তার বহিরঙ্গের শব্দ তার অন্তর্গত শব্দগুলির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটায়, শিশুটি হতে থাকে ক্রমশ ক্রমশ সামাজিক, নির্দেশিত এবং ক্রমশ পরিবেশের দাক্ষিণ্যে তার অন্তর্গত শিকড়বাকড় ও ডালপালাওয়ালা শব্দগুলি উয়ে যেতে থাকে, সেই জায়গায় স্থান নেয় সমাজস্বীকৃত শব্দগুলি, সেই সামাজিক শব্দের ব্যাকরণ এবং ইত্যাদি।

তুমি একজন পরিণত মানুষ সূর্য দেখলে। তোমার কাছে সূর্যে মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র, তার অস্ত বা উদয়ের আপেক্ষিকতায় তোমার দিন রাত, ঋতুচক্র। কিন্তু একটি শিশুর কাছে সূর্যোদয় মানে পাখপাখালির ডাক তার ঘুম ভেঙে পৃথিবীকে নতুন করে দেখা, মা বাবার কাছে শোনা রূপকথা অনুযায়ী 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ'। তেমনি চাঁদ ও নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃষ্টিপাত, গাছপালা সবকিছুরই তার নিজস্ব আপনরূপ আছে। রয়েছে সেই শব্দগুলির শিকড়বাকড়, আছে তাদের ডালপালাও। কবি কিন্তু পরিণত মানুষের সমাজে পরিণত শব্দগুলি দিয়ে বাল্যের শব্দ চিহ্নিত ভুবনে চিত্রময়তার ফিরে যান। এজন্যেই কবিতাও এক ধরণের ভাষা। কবিতার ভাষায় কবি কথা বলেন। যত বেশি সে পরিণত সমাজের ভাষায় কথা বলে, কবিতায় কথা বলে, ততই তার কাছে পদ্যছন্দের কারিকুরি কারিগরি আমাদের মুগ্ধ করার উপকরণ হয়ে আসে। ঐ যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন না 'আমি শব্দগুলিকে তাদের আপন পায়ের উপর দাঁড় করাতে চাই।' তার মানে কি এই হবে—সামাজিক অভিজ্ঞতা মানবিক সারল্য এমনটি হবে, যাতে কবির শব্দই হবে সমাজের শব্দ, সমাজের শব্দই হবে কবির শব্দ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাল্য ও উত্তর বাল্যকালে তিন ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটে। প্রথমটি যেমন সব বালক বালিকারই ঘটে থাকে। বাল্যের অভিজ্ঞতায় পাওয়া সামাজিক ও শৈল্পিক পরিবেশ ও ভূগোল বেশি গুরুত্ব পায়। যেমন নওগাঁ শহরের রাস্তায় বড় বড় রেনট্রি, সিনেমার প্রচার গাড়ীর বিজ্ঞপ্তি বিলোনো, প্রতিবেশনী বালিকার নরম হাত, সাঁকো থেকে দেখা নদীতে নৌকোর কাটাকুটি ছবি, ধূলো ওড়ানো রাস্তায় টমটম ঘোড়ার গাড়ি, দুবলহাটি-দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ীর হাতির হেঁটে যাওয়া, পতিশরে রবিঠাকুরদের কাছারী, ভীমের জাঙ্গাল দিব্যকের দিঘি, পাহাড়পুরের প্রত্নস্থাপত্য, দিদির বিয়েতে-টাকা যোগাড় করার অসম্ভাব্যতা মনে করে বাবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছা, বাবার উৎকোচ না নেবার সততার পরিচয়, পাশের বাড়ির পিসিমার ওপর কালীর 'ভর' হওয়া। এমনকী কাঁচের কাগজচাপার ভেতরে শ্যামপত্র শোভা সম্বন্বিত সম্পূর্ণ একটি গাছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেও এক ব্রিজ-ই
ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়
নিচে চাও যদি—

হিজি বিজি হিজি বিজি
নদী নৌকো নদী নৌকো নদী।

নাম নওগাঁ,
অজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর।
বৃষ্টিপাত বেশ ক-ইঞ্চি বেশি;
নেহাত নগণ্য নয়
সেখানকার শীতের বহর।

দুপাশে রেন্‌ট্রি গাছে ছায়ায় ছায়ায়
দিগন্তের কোন্ অন্তরালে
জানতাম না কোথায় রাস্তা যায়—

কোন্ সে দুবলহাটি, দিঘাপাতিয়াই বা কোথায়?
রান্নাঘরে জানলা দিয়ে দেখা যেত দূরের রাস্তায়
গলায় দুলিয়ে ঘন্টা হাতি,
দুল্‌কি চালে কখনও বা উট।
দৈনিক সকালে ঠিক কাঁটায় কাঁটায়
রানারের ছুট।... (কাল মধুমাস)

এমনই কতকতই না বালক সুভাষচন্দ্রকে স্মৃতিময় করেছে। নামটিও তাঁর অর্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর জন্মের দুবছর আগে, আরেক সুভাষচন্দ্রের ও টেন সাহেবের আচরণের বিরুদ্ধতা নিয়ে তুলকালামের স্মৃতি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হল তাঁর বাল্য উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই বিধ্বংসী সান্নিপাত বা টাইফায়েডে আক্রান্ত হওয়া। এই আক্রমণের ফলে তাঁর কান দুর্বল হলো, দৃষ্টি ঘোলা হলো, নাকে গন্ধ পাবার ক্ষমতা হলো দুর্বল, জিভের স্বাদ পাওয়াও গেল। পঞ্চেন্দ্রিয়তেই দারুণ আঘাত করে গেল সেই অসুখ। কিন্তু নওগাঁ থেকে কলকাতায় আস্তানা নেবার কালে শহরের আক্রমণ ছিল ঐ অসুখটিতেই পল্লীবালকের উপর। কিন্তু অন্তবর্তী সময়ে কিশোর সুভাষ তিরিশের আইন অমান্য আন্দোলনে উত্তাল কলকাতার উত্তর অঞ্চলে ঘুরছেন ফিরছেন এবং বাড়ী ও পাড়ায় সেই বিক্ষোভ সংবাদ পরিবেশন করছেন। এমনকী যে বাড়িতে ভাড়া থাকতনে বাড়ীওয়ালাও গেলেন জেলখানায়, দেখে, গর্বিত হয়েও, বেলুন তার ফেঁসে যায় যখন জেল ফেরত বাড়িওয়ালা আক্ষেপ করতে থাকেন জেলে যাওয়াটা তার আর্থিক ও সম্পত্তিগত সুরাহা ঘটায় নি বলে। এই তিনটি অভিজ্ঞতা যদি পাশাপাশি রাখি তিনটি থেকে অর্জনের বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটিতে পাওয়া যাবে বাল্য অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক ও সামাজিক। দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যাবে বাল্য অনুভবটাকে ভুলতে ভুলতে স্মৃতিতে আঁকড়ে ধরা এবং বাল্যের ব্যক্তিক শব্দ থেকে সামাজিক শব্দ বেশি করে আয়ত্তে আনার। শুধু তাই নয় কৈশোর উত্তীর্ণ হলে তরুণদের যে নারী

বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকে তাও অনেক কমে গিয়েছিল। এমন মন্তব্য সুভাষের বাল্যবন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র রয়েছেন। আর তৃতীয় অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়েছিল কংগ্রেসি রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দেখার অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হয় বিপ্লবী মতবাদে দীক্ষিত হওয়ায়। বন্দীমুক্তি আন্দোলনের বিপুল মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে পেয়েছিলেন তিনি 'পদাতিক' হওয়ার অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা ১৯৩৬ সালের হিস্পানি গৃহযুদ্ধের পথ বাছাই করার উত্তর সাধনাও বটে। এই দীক্ষার দিকটিও ছিল রাজনীতি ও সাহিত্যকে একবৃন্তে ধারণের মাধ্যমে। তাঁর কবিতার উৎসে শিক্ষক কালিদাস রায়ের কিঞ্চিৎ অবদানও তো ছিল মিত্র ইন্সটিটিউসানে। কালিদাস রায়ই তৎকালীন রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের মধ্যে অনেকখানি আধুনিকদের কাছাকাছি ছিলেন, তাঁর বৈষ্ণব ভাবনা সত্ত্বেও। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পঙ্‌ক্তি গঠনের শিক্ষা ও আধুনিক মনস্কতা, অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওয়া চিত্রময়তা ও শব্দ গ্রন্থনার অভিজ্ঞতা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতার আয়রনি বক্রোক্তি ও তির্যক ভাষণ এসবই ছিল তাঁর কবিতা সৃষ্টি হেঁসেলের নানা উপকরণ। তাছাড়া তো ছিলই রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' পরবর্তী কবিতা থেকে অর্জন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সদর্থক চোখ ফেরানো। এছাড়া ছিল ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ দুরে সমাজতন্ত্র বিষয়ে অনুধ্যান। যে বয়সে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন, আইন অমান্য আন্দোলন দেখেছেন, কাজী নজরুল ইসলাম তখন গ্রামোফোন রেকর্ডে গান রচনায় বেশি ব্যস্ত। ফলে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত নজরুলের যে দাপট বাংলা কবিতায় ছিল, তখন তা অবসিত হওয়ার পথে, ফলে নজরুল ঘরানা নয়, রবীন্দ্র ঘরানা ও তার বিশেষ বিকাশ যে আধুনিকতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, সেই জটিল রাস্তাতেই পা দিয়েছিলেন সুভাষ। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত শীর্ণদেহী 'পদাতিক' বইটি ছিল কিন্তু বাংলা কবিতার ধারায় অভিনব। এই বইটিতে ছন্দপরীক্ষা মুগ্ধ করেছিল বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। সুধীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসু দুজনের কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা 'পদাতিক' এর বাক্ ভঙ্গিকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সুভাষের তখন মাত্র একুশ বছর বয়স। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রোত্তর লেখকদের মধ্যে পাঠক সমাজে তখন পরিচিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তরুণ বয়েসে সেই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবেন, সে তো বিস্ময়কর।

আমাদের দেশে সম্প্রতি চালু হয়েছে কবির রাজনৈতিক চরিত্র বিচার, এমন কি চরিত্রহননও। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখনকার বাংলা প্রদেশে বহু কংগ্রেস সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেক হয়ে জেলেও গেছেন—এরকম কত জনের কথা বলব? রাজনীতির অভিধা দিয়ে কি সাহিত্যিকের বিচার হয়? আসলে কবি ও শিল্পীদের সৃজনশীল অভিজ্ঞতা পাবার জন্যে বহু বহু বিষয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কিত হতে হয়। কবি রিলকে তাঁর 'মালটি লরেলব্রিগ' রচনাটিতে কবিকে কি কি জানতে হয় তার একটা তালিকাও দিয়েছিলেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতার মঞ্জুষা গড়ে দিয়েছিল তার সাংবাদিক হিসাবে দেশ দেখা। এ পর্যন্ত আমরা পুঁথিপত্রে যে দেশ দেখেছি সে বড় রমণীয়। বড়লোকদের বাংলা। পুকুরভরা মাছ, গোলাভরা ধান, ক্ষেতভরা ফসল, গোয়ালভরা গরু এবং দেশময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে ধরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই দেশই দেখালেন—হিমালয় যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা। কিন্তু অতি দুঃখী সম্পদচ্যুত শোষিত অজস্র নিম্নবর্গীয় মানুষ, তাদের নিয়েই বাংলা। তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিল ও শুদ্ধ কর্মী দিয়ে গড়া যাঁরা রাজনীতিকেও মনে করেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার গণনাট্য সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন এসবই ছিল বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর অসংগঠিত রেনেসাঁস আন্দোলনের সংগঠিত উত্তরাধিকার। কমিউনিস্ট নেতা পূরণচাঁদ যোশী একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য অন্নসংগ্রহের প্রয়োজনে শিল্পী সাহিত্যিকদেরও ভারতে নানা অঞ্চলে পাঠিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের, সে ছিল সাধারণ মানুষ ও লেখক শিল্পীদের পরস্পরের দিকে হাত বাড়ানোর সময়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একসময়ে ভূমিকা ছিল যেমন সংগঠকের তেমনি কবিতায় ছিল দেশপ্রেম সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং দেশের তাবৎ সংগ্রামের পক্ষে ভাষণ। পরবর্তীকালে একটি রচনায় উনি বলেছিলেন "সমাজকে বাদ দিলে কবিতার অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু তাই বলে সমাজকে মেনে নিলেই কি সব সমস্যার নিরসন হয়? ভাব মাত্রই বাস্তবের প্রতিফলন। এটা স্বীকার করলেই কি সঙ্গে সঙ্গে সব সত্য করতলগত হয়?' সুভাষ তো 'পদাতিক' বেরোনোর পর আপাদমস্তক রাজনীতিতে ডুবে থেকে, কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে তিনি রাজনীতির আসরে ঢুকেছিলেন, ফলে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি পার্টিসদস্যদের কাছেই বেশি আমল পেয়েছেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সত্যি সত্যিই সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয় ওঠা ছিল তার পরে। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি হয়ে ওঠার তখন তাঁর কাছে সত্য হয়ে উঠেছে সব শূন্যতাকে বক্রোক্তি দিয়ে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং আত্মস্থ হচ্ছে মানুষের সব কিছু মহিমা। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' এরপর 'যতদূরেই যাই, 'কাল মধুমাস'—এ পৌঁছে ১৯৬৬ সালের দিকে উনি লিখেই ফেলেছেন—

"লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়, চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর, আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে; দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে। জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুল ভ্রান্তি অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো; শিশিরবিন্দুর শান্তি ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে হাত নেড়ে বলে : বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য একবার তুমি তাকাও আকাশে।"

কিন্তু ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্রের বদল হলো। তারা স্বাধীনতাকে মেনে

নিলেন না। ঐ পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আড়াই বছরের জন্য জেলখানায় বন্দী ছিলেন। সে জেলখানাও ছিল তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশ্ববিদ্যালয়। অজস্র সংগ্রামী ও সংস্কৃতিসেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয় উর্দু কবি পারভেজ শাহীদির সহযোগিতায় চিনে নিলেন তিনি উর্দু শায়েরী, পড়লেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ প্রভৃতিদের। অর্থাৎ কবিতা শুধুমাত্র আলোকিত টেবিলেই পড়ার বিষয় নয়, কবিতা রণক্ষেত্রে গেয়, কবিতা প্রতিমুহূর্তের জীবনচারণার সঙ্গে সংযুক্ত পঙ্‌ক্তিও। জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করে ১৯৫২ সালে সুভাষ চলে গেলেন বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে সস্ত্রীক মজুরদের মত জীবন কাটাতে। তখনই অনুবাদ করতে শুরু করেন নাজিম হিকমতের কবিতা। অর্থাৎ যা দেখছি অনুভব করছি সংগ্রামে বিকশিত মানুষকে বুঝছি, তারই প্রকাশ হয়ে উঠেছে কবিতা। নিজের কবিতা সম্পর্কে নাজিম হিকমত বলেছেন, 'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত.....। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না.....।....কবিতার গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি অস্বীকার করেন না।.....যা বানানো নয় কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত বিচিত্র একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা।' সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'অগ্নিকোণ'-এর কবিতাগুলিতে (১৯৪৮) এই ভাষা বৈচিত্র্যের পরীক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ করার ভেতর দিয়ে লোকমহিমার ভাষাও আবিষ্কার করলেন তিনি। ঢের পরে পাবলো নেরুদার কবিতা অনুবাদ করার সময় সুভাষের কবিতায় লোকমুখের অনাড়ম্বর শব্দ যা তথাকথিত কবি ঘরানার নিরুপিত ছন্দোনৈপুণ্যে প্রকাশিত নয়—বরং যে শব্দগুলো মিলে অন্তর্মনে ঘটে যায় নির্জ্ঞানে পদচারণা—তাই হয়ে উঠলো স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মিশিয়ে ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলা। যেমন—

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে। (ফুল ফুটুক না ফুটুক)

আবার ছড়ার ছন্দেও বাজিয়ে তোলা স্মৃতিময়তা—যেমন

একটি বার দৌড়ে এসো
ও নদী, ও স্মৃতি—
ঘরের এই দেয়াল ধরে
দাঁড়াও না, লক্ষ্মীটি! (জলছবি)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার উৎস ও বিকাশ বিষয়ে আমাদের মতামত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'-এ তরুণ কবিদের প্রথাসিদ্ধ প্রেমের কবিতা একটিও নেই। সেটি ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

কবিতার বিশিষ্টতা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র ইঙ্গিত করেছেন তাঁর কৈশোরে টাইফয়েড এমন কিছু স্নায়বিক অবস্থা ঘটিয়েছিল যার ফলে প্রথম তারুণ্যে নারী আসক্তি কবিতায় ধরা পড়েনি। রমাকৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক দলের নেতারা এমনই নীতিনিষ্ঠ ছিলেন যে সেই শুকনো সন্ন্যাসীরা নারী আসক্তি পছন্দই করতেন না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মানুষ সম্পর্কে আশ্চর্য সততা, কবিতায় মিথ্যা না বলার সাধ ও সাধনা এবং আপন অভিজ্ঞতা যা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অস্বীকার না করা তাঁকে দিয়েছে এক শালপ্রাংশু চারিত্রিক মহিমা। বাংলা কবিতায় বক্তব্য ও প্রকরণে এনেছেন তিনি নতুন স্বাদ ও রং—যা আমাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হাজারবছর ধরে লালিত হতে হতে বর্তমানে পৌঁছেছে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ বহন করেছিল মাত্র কয়েকজন তাঁর কবিতাপ্রিয় মানুষ। অনেকে দেশবাসী জানতেন না জীবনানন্দ কে? কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে জানতো তো দেশবাসীর অনেকেই। কিন্তু তাঁর অন্তিমযাত্রায়, যারা কবিকে শুধু রাজনীতির অভিধায় চিনতে চায়, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার ফলে শেষ বিদায় জানানোটাও রবীন্দ্র পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির বরাতে জুটলো না। ভালোই হোলো। আসলে রাজা রাজত্ব আসে যায় কিন্তু কবিরা ঢের দিন থেকে যান। রাজ্য ও রাষ্ট্রপরিচালকেরা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার থেকে গ্রামীণ দফাদার পর্যন্ত নিয়ে এক রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলে। তাদের সঙ্গী নানা রাজনৈতিকদলের ক্ষমতালোভী কেষ্টবিষ্টুরাও। অন্যদিকে আছে পুরুষ নারীর প্রেম, প্রকৃতি মনস্কতা, নরনারীরা সংসার যাত্রা, চাষ আবাদ, নানা কাজকর্ম, উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় সাপেক্ষ নানা একক ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পৌর সমাজ বা সিভিল সোসাইটি। রাজনৈতিক সমাজ বা পলিটিক্যাল সোসাইটি চায় কবিকে তাদের অনুগত কবিতা লেখাতে, তারা চায় রাজকবি ও বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের ভিন্নদিকে, পৌরসমাজ চায় তার আপন প্রতিমুহূর্তে জীবনের সঙ্গী হিসেবে সুখে দুঃখে বেদনায় আনন্দে কবিকে, যিনি ভবিষ্যতেরও পথে দিশারী।

কে বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমের কবি নন? গাছপালা লতাপাতা সংগ্রাম দেশ বিদেশের নানা মানুষ আরণ্যক ও গৃহপালিত জীবজন্তু ইত্যাদি সবাইকে নিয়েই তো তাঁর ভালোবাসা। তাঁর 'যাচ্ছি' কবিতাটিতে তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞান পূর্ণভাবে রয়ে গেছে। 'যাচ্ছি'তে যাদের ছেড়ে যাচ্ছেন বা যেতে চাচ্ছেন তাঁর মধ্যেই তো রয়ে গেছে—

'ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি

ও পথ
যাচ্ছি

পুতুল
যাচ্ছি
শপথ
যাচ্ছি
ও ছায়া
যাচ্ছি
ও মায়া আসছি
ও মিউ....

ও বাংলা ভাষা
ও রবি ঠাকুর
নিকট ও দূর
ও ক্ষুৎপিপাসা
যাচ্ছি

এই তালিকাটি যথেষ্ট দীর্ঘ। তাকে 'কাস্তে হাতুড়ি যাচ্ছি'—সবই রয়েছে। আর এই ভালোবাসা থেকেই সৃষ্টি হয় কবিদের এক আলাদা জগৎ যা বাঁধাগৎ-এর বাইরে।

ইট কাছ খিদে তেষ্টার গায়ে গা দিয়ে
মাটির পায়ে পা বাধিয়ে
কবিদের আছে
আলাদা একটা জগৎ—
স্বপ্ন যেখানে মাথা উঁচু করে বেড়ায়
মাঝখানে শুধু দুই-দিক বাঁচিয়ে
বসে থাকা কাঁটাতারের বেড়ায় বাঁধিগৎ।

কেননা কবির ভালোবাসাতো ফুরোয় না, যদিও চলে যাওয়ার মতো নিরাসক্তিও আপ্লুত হয়ে থাকে অজস্র আসক্তির মধ্যে যাকে ছেড়ে যেতে হয়। এতো আর আমাদের "নধর্মঃ নচার্থঃ নকামঃ নমোক্ষঃ/চিদানন্দ রূপম শিবোহম শিবোহম।" নয়।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে বলা হলো কবির কাজ পৌর সমাজে মর্মউন্মোচন এবং সংস্কৃতিসাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব—এ সত্য আমাদের বারবারই গুলিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। আমাদের দেশেও বামপন্থী রাজনীতিকরাও বোঝাতে চান। এমনকী রবীন্দ্রনাথও নাকি পৌরসমাজকে দূরে ঠেলে রাজনৈতিক সমাজে কেষ্টবিষ্টু হতে চেয়েছিলেন। যতক্ষণ তিনি কোনো রাজনৈতিক মতবাদের নিরিখে তাদের পক্ষাবলম্বনের মত কিছু একটা না দেখাতে পেরেছেন ততক্ষণই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কবি হয়ে ওঠেন নি। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী পৌরসমাজ ও বিশ্বপৌরসমাজের ওপরে বিশ্বপ্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সমাজের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছেন ও তার বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছেন, আমাদের দেশেও একদল মানুষ তা

করেছেন অপছন্দ। দেশের ভেতরেও রাজনৈতিক সমাজ বিষয়ে সমালোচনাও আমাদের দেশে এখনও খুবই বিরূপতার বিষয় হয়ে পড়ে। দলীয় বামপন্থা বা দক্ষিণপন্থা যখন রাজনৈতিক সমাজকেই মুখ্য করে তুলে পৌরসমাজে গণতন্ত্রের চ্যুতি ঘটাতে চায় তখন আমরা পেয়ে যাই কবির আসল চরিত্র। কবি নামধেয় ব্যক্তিটি কি আদতে সমাজ ঐতিহ্যে শাসকমুখিতায় অনুগত? নাকি, স্বাধীনতার পক্ষেই সে এমন সৈনিক যে রাজনৈতিক সমাজের উল্টোদিকে সিভিল সোসাইটিতে মানবিক বিকাশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংকীর্ণ দলীয়তা থেকে ধীরে ধীরে বাঁধন খুলতে খুলতে কীভাবে আপন জাতির বিবেকে পরিণত হয়েছিলেন, সেইটিই আমাদের বিচার্য। প্রসঙ্গত আমরা উল্লখ করছি এই বিশেষ কবিতাটি—

মাথায় পট্টি, গলায় লেত্তি
সমান করে ভাঁড়ামি
কাটে ফোড়ন আপনি মোড়ল
এক ভুঁইফোড় সোয়ামী

যার খায় নুন তার গায় গুণ
নইলে নিমকহারামী
যাকেই দেখে শুধায় তাকে
বলোতো বাবা কার আমি?

এই যে বিদ্রূপ, আসলে এক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধেই আত্মযন্ত্রণারই প্রতীক। কেননা এক সময় যাদের আপনজন মনে হয়েছিল, পরে কি এক কারণে যখন ঘর ভেঙ্গে গেল তখন এক জেলখানার বন্দিদশা থেকে আর এক বন্দিদশায় পড়তে হয়। এ কমরেডের সঙ্গে ও কমরেডের। তত্ত্বের শুকনো খড় খস খস করে মাথায়।

কে আজ কোথায় আছি কোন্ দিকে
কোন্ তরফে—যেই বলা,
এমনি প্রকাণ্ড একটা ঢেউ
ছুটে এস
দুহাতে দুজনেকে তুলে
দিল এক প্রচণ্ড আছাড়
সামনে দেয়াল শুধু,
লোহার গরাদে ধরে
বাইরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার
চেয়ে দেখি, আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে।

নিজেদের জালে বন্দী : নিজেদেরই তৈরি করা জেলে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সারা জীবন তাই সত্যের সঙ্গে ঘর করলেন। যদি সত্যিই কেউ

বলে, তিনি মানুষকে ভালোবাসা ছেড়ে দিয়ে বিপুলভাবে আত্মমগ্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ হয়ে পড়েছিলেন তাহলে খুব ভাল হবে। তিনি তো আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দিনগুলোকে একটু চোখে চোখে রাখতে, যাতে

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
আগুনের মধ্যে না পড়ে।

প্রত্যেক কবিই তো মানবিক মূল্যবোধের নিষ্কাশিতরূপ কোনও আদর্শ বিমূর্ত প্রতীকের সঙ্গেই যুক্ত করে রাখেন। সুভাষের তা ছিল কবির মার্কসবাদ চচা। অর্থাৎ রসহীন তত্ত্বই জীবনের কাপালিক ব্রত নয়। এক অনিবার্য আশা 'জোয়ান মদ্দ অন্ধকারের কাঁধ সরিয়ে দিলেই মানুষ দেখতে পাবে 'সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান'—তার ততক্ষণইতো 'উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার' সময়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মার্কসবাদ সাধনা ছিল এইটাই। শুধু লাল সন্ধ্যামনি ফুটিয়ে যাওয়া। এখন ভাবতো বিপ্লবের জন্য নিবেদিত প্রাণ ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, আলেকজাণ্ডার ব্লক ('দ্য টুয়েলভ', 'দ্য সিডিয়ান' লিখেছিলেন যিনি) সার্গেই এসেনিন—এঁদের কবিতা কি ইয়েলেতসিন-এর রুশদেশে পড়া হতো? আসলে যারা সাহিত্যরসপিপাসু এবং যারা পৃথিবীর বদল চান সদর্থকতায়, তাঁরা তো পড়বেনই , চর্চাও করবেন। বিশ্বকবিতায় রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই (১৯১৭) বিপ্লবমুখীনতার চর্চা হয়েছে। বহু আন্দোলনও হয়েছে। লড়াইটা ছিল রাজনীতি এবং অর্থনীতির শোষণভিত্তিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে শোষণহীনতার অবস্থান গ্রহণ। ফলে একটা বিকল্প রাজনীতিকে ধারণ করেছিল বিকল্প সংস্কৃতি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জীবনে বাছাই করতে হয়েছিল প্রথমে কবিতার সঙ্গে রাজনীতিও। সে রাজনীতি ছিল দলীয়। তাঁর দল ও ছিল খুব ছোট তখন। তবু যখন 'পদাতিক' লিখেছেন, তাঁর পাঠক সমাজ ছিল সংকীর্ণ আলোকবৃত্তের দীক্ষিত ও আধা দীক্ষিতরা এবং কবিতার গঠনমনস্ক কাব্য অনুরাগীরা। এঁরা সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের। সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দে এদের ত্যাগ করে শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গী হয়েছিলেন। হতে গিয়েও এই শ্রমিক কৃষকদের একদল তাত্ত্বিক নেতা তাঁকে অপছন্দও করেছেন। আবার তরুণকুলের মধ্যে তিনি যথেষ্ট আদৃতও হয়েছেন। আমাদের তো মনে হয় একদল তাত্ত্বিক তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন নিছকই পার্টির শ্লোগানকে ছন্দোবদ্ধ করা এবং শুধুমাত্র সেচ্ছাস্বেকের ভূমিকা নেওয়ায়। কবি আবার তত্ত্ব নিয়ে কী বলবে? ফলে ঐ 'ভূতের বেগার' (১৯৪৫) বইটি প্রকাশ থেকেই পাওয়া যায় তাঁর প্রিয় পার্টির নেতৃত্বের কবির ওপর বিরূপতা। এমনকি তাঁর পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নানা কেষ্ট বিষ্টুও ছিলেন তাঁর বিরোধী।

দ্বন্দ্বটা এসেছিল সম্ভাব্য ভারতীয় বিপ্লব নিয়ে দুটি বিকল্প নিয়ে দুটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর দাক্ষিণ্যে। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবের সময় থেকেই ছিল ঐ দুই লাইনের দ্বন্দ্ব। একদিকে ছিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে জাতীয় বিপ্লবীদের মিত্রতা সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করা। দ্বিতীয় বিকল্প পথটি ছিল কেবলমাত্র বামঐক্যের ভেতর দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবকে জয়ী করা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' ছিল কিন্তু দ্বিতীয় লাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে সহজেই তাঁর মনে হয়েছিল যে কবিতা ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিন রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু পার্টির মুখপাত্র স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ওঠাটাই তাঁর জীবনের অনন্য বিপ্লবী সাধনা হওয়া উচিত। কিন্তু সাংবাদিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ দেখার অভিজ্ঞতা তাঁকে তার শুধুমাত্র অন্ধ পার্টি অনুগত্যের রণনীতি ও রণকৌশলে বেঁধে রাখেনি। ঐ চল্লিশ এর দশকেই পার্টির নানা গণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর ব্রজন শুরু হয়। তিনি নিছক বামপন্থী থেকে রূপান্তরিত হতে থাকেন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবীতে। আমরা তো লক্ষ্য করতেই পারি দক্ষিণও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জনগণের স্বাধীনতার লড়াইকে জয়ী করার ইচ্ছা তাঁর ছোট্ট কাব্যপুস্তিকা 'অগ্নিকোণ'-এ ধরা পড়েছে। অথচ তারই সঙ্গে ভারতে কৃষিবিপ্লব অঙ্গীভূত করা ছিল। পৃথিবীর এই গ্রাম অঞ্চলে কবির ভূমিকা ছিল একদিকে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভেতরে 'বুক দুরদুর করা বেইমান সামন্তপ্রভু'দের উৎখাত করা। অবধারিতভাবে এই কমিউনিস্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী রণনীতি ও রণকৌলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ভারতে প্রজাতন্ত্র গঠনের পর কৃষিকশ্রমিকদের মৈত্রী প্রত্যক্ষভাবে গড়বার জন্যে শ্রমিকদের সঙ্গে বাস করতে যান। আমাদের মনে হয় বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত কবির শ্রমিকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবার অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল হবার অনুশীলন ও পরিশীলন ঘটে যায়। আমরা লক্ষ্য করব তাঁর কবিতাভাষার যেমন বদল হয়েছে, যে কোনও মানবিক অনুভবই রূপ পেয়ে যায় বিকল্প মানবমুখীন সংস্কৃতি রচনায়। তাঁর কবিতাগুলি হয়ে উঠতে থাকে সমাজতন্ত্রে পৌছবার পূর্বাবস্থায় পিছিয়ে পড়া সমাজে অগ্রণী সমাজভাবনার অংশ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বাছাই করে নিতে হয়েছিল ১৯৬৪ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভাজনের পর বিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় গণতান্ত্রিক রণনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অংশটিকে। ফলে দেখা গেল যাঁরা বিকল্প পার্টি গড়লেন তাঁরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তখন থেকেই অচ্ছুৎ ভাবতে শুরু করলেন। বিশেষভাবে 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। বিকল্প পার্টি থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে আরও বাঁদিকে বিপ্লবের কথা বলতে শুরু করলেন তাঁদের কাছেও

পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে, শোনা,
ক্রুশ্চভের গলায়।

খুবই আপত্তিকর মন হল। পার্টি বিভাজনের পরে কিছুদিন 'পরিচয়' সম্পাদনা করেছিলেন (দ্বিতীয়বার) কিন্তু আর্থিক আস্বাচ্ছন্দ্য এবং 'পরিচয়'—এর পুরোনো ধরনধারণ ছেড়ে দিয়ে ব্যাপক পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের কাছেই অপছন্দ হয়। এমনকি

'পরিচয়'—এর দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য আবার 'পরিচয়' যখন প্রকাশিত হতে থাকে, ঐ দুর্যোগের কালেই তিনি 'আফ্রো-এশীয় লেখক' সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। অনেকের আশা ছিল ভারতে জোট নিরপেক্ষ বিশ্বরাজনীতি ও ভারতে তাঁর দলের জাতীয় গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এক নতুন সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন রচনা করবে। সত্যিই কিন্তু তা হয়নি। ঐ সংস্থার পত্রিকা 'লোটাস' পশ্চিমবঙ্গেও বিক্রি হত না। এমনকি তাঁর পার্টি প্রভাবিত বইয়ের দোকানেও তা পাওয়া যেত না। কিছুদিন তাঁর স্ত্রীর শিক্ষায়তন সুশিক্ষণ-এ সংস্থাটির কার্যালয় ছিল। কিন্তু বাঙালী তরুণ লেখক লেখিকাদের সঙ্গে ঐ সংস্থাটির সম্পর্ক তেমন করে গড়ে না ওঠার ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কার্যকারিতা ঐ সংস্থা গঠনকর্মে তেমন করে আর রইলো না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংগঠক ছিলেন না। বরং সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর ইউটোপিয়ান বহু ধারণা ছিল। তাঁর মনে হত লেখকের কাজ ক্রমশ উন্নততর শৈলীতে উত্তীর্ণ হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ায় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আগে কোনও কোনও জনপ্রিয় লেখককে সাধারণ সম্পাদক রেখেও সঙ্গে নিষ্ঠাবান সংগঠন সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত করা। আমাদের মনে হয় ১৯৬৪ সালের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পার্টির আর সেরকম তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন তত্ত্বভিত্তিক সংগঠনও ছিল না। এমনকি ছিল না জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে ভূমিকা। বরং ছিল বিধানসভা ও লোকসভায় প্রতিনিধিত্বের আকাঙ্ক্ষা। বলতে গেলে দুই পার্টি বিধানসভায় ও সংসদে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিটাই রাজনৈতিক লক্ষ্যের সার সত্য মনে করেছিল। ফলে সংস্কৃতির বিশ্ব থেকে তারা নিজেরা নির্বাসিত করতে শুরু করলেন নিজেদের। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতন ব্যক্তিদের কোনও পার্টিতেই থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। যে পার্টি সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা গড়ে তোলার জন্য প্রাণপ্রাত করেছিলেন সত্তরের দশকের কিছু ছটফটানির পর ঐ দশকের শেষেই তিনখণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখে সে পার্টির কার্যত অবলোপ হয়ে গেল। এখন দেখছি ক্ষমতাসন্ধানী প্রেতদের। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আশি সালে তাঁর খণ্ড পার্টি থেকে নাম খারিজ করে নিলেন। কার্যত ন্যাশনাল ফ্রন্ট হয়ে উঠলেন যেন একা একাই। তিনি মিলিত হলেন সংকল্পবিধৃত মুক্তমনা দলছুট কমিউনিস্টদের সঙ্গে। তাদের না ছিল সংগঠন না ছিল আর্থিক জোর। 'সপ্তাহ' পত্রিকাটিকে বাহন করে তাঁদের মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, সমাজতন্ত্রী বিশ্ব তখন বিধ্বস্ত, বিশ্ব সংগঠনগুলিও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ববিজয়ের জন্য বিশ্বায়নের অর্থনীতিকে সচল করেছে। বিশ্বদখলের জন্য সশস্ত্র আগ্রাসন শুরু করেছে দেশে দেশে, অর্ন্তঘাত ঘটাচ্ছে বিকৃত সংস্কৃতি দিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার' অবসিত হয়ে গেছে যে সময়ে—

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাই বন্ধুদের মাথা;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই।

ভেবেছিলাম মুক্তদেশে বাঁচবেন। লেখাই ছিল তাঁর পেশা—তেমন রগরগে নাটক—নভেল তো লেখেন নি। সংসার চালাবার কাজে ছিল তাই নিত্য অসুবিধা। আর লেখাওতো ছিল জন-জাগানিয়া। ভাড়া বাড়িতে বাসিন্দা সুভাষের ছিল অনেকগুলি কুকুর-বিড়াল পোষ্য। তিনটি দত্তক নেওয়া মেয়ের অবশ্য তিনি অনাড়ম্বরে বিয়ে দিয়ে গেছেন। অতি স্বল্প আয়োজনের জীবন ছিল তাঁর।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের কী শিক্ষা দেন। কবি হিসেবে লোকমুখের ভাষার কাছে ফিরে যাওয়া, ঐ শব্দের গূঢ়তার মধ্যেই আছে জনজাতির গভীর নির্জ্ঞানে উপ্ত জাতীয় সত্য, তথাকথিত ছন্দের সবচেয়ে পারঙ্গম হয়েও আপাত গদ্যের মধ্যেই সুরসঙ্গতির ও চিত্রকল্পের মহিমা উন্মোচন। তাছাড়া কবি স্বভাবের গভীরে মানব কল্যাণের যে ভাবাদর্শ থাকে, তাকেই সারা জীবন ধরে পরিশীলিত করতে করতে নিরন্তর সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজেকেও বারবার পরিবর্তন করা। যেমন নদী বাঁক নেয় সমুদ্রে যেতে। কিন্তু নদী একটি, জলরাশি নিত্যপরিবর্তনশীল। বরং সুভাষ মুখোপাধ্যয়ই বলতে পারেন

"আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালাগাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই।
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই বলতে পারতেন, অর্থকৌলীন্যহীন, সহকর্মীদের কাছে তাড়িত এবং বহুমতের মার্কসবাদীরা যখন তাঁকে খারিজ করছেন অমার্কসবাদী ও দলত্যাগী বলে তখন সেই বাংলা ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট কবি, যিনি বাংলা সরকারের কাছে কোনও পুরস্কারও পান নি, এমনকি পাননি পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কোনও সম্মানীয় ডিগ্রীও, কিন্তু পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, হয়েছেন পদ্মভূষণ এবং বাংলার নানা পুরস্কার ও সম্মান। পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা পুরসভার পুরস্কার।

'ভানুমতীর খেল'টা দেখিয়ে এবার আমি বিদায় হই ঃ
সাদার গায়ে ছিটানো কিছু কালি;
বিষয় আশয় বলতে সেই বুড়োর

আর আছে কি?
এই নিয়েই তো খালি
যত রাজ্যের চাপান আর উতোর।

ইহকালের কাছে তো সেই বুড়ো
পাতেনি হাত :
আপনি মিলেছে যা
তাতেই খুশি, হোক না খুঁদকুঁড়ো
হোক কিছু তার চোখের জলে ভেজা।

ইহকালের ভয় নেই আর বুড়োর
ভয়টা শুধু পরকালের এখন,
পড়েছে দাঁত, গেছে চোখের নজর,
মানে না দেহ আগের কড়া শাসন।

স্বর্গনরক পাপপুণ্য ওসব
দেয় না তাকে টান কিংবা ঠেলা
বেঁচে থাকার প্রত্যহই পরব,
যা দেখে তাই ভানুমতীর খেলা।।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কুমার রায়, অশোক মিত্র ও শঙ্খ ঘোষ

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে

অরুণ মিত্র

সুভাষের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঐতিহাসিক যুগ থেকে। কারণ, মনেও পড়ে না ঠিক কবে আমাদের আলাপ হয়েছিল। যতদূর স্মরণ হচ্ছে—ওর অল্প বয়স, লম্বা চেহারা, বি. এ. পড়ছে—তখন আলাপ হয়েছিল। আমি সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করতাম। 'নিউজ' বিভাগের চাকরি করলেও পত্রিকার নানা দপ্তরে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একদিন দপ্তরে বসে আছি, পাশেই মন্মথ সান্যাল বার্ষিক সংখ্যার জন্য কবিতা নির্বাচন করছেন। খাম ছিঁড়ে কবিতা বের করছেন আর বাতিল কবিতা ফেলে দিচ্ছেন। সেই সব বাতিল কবিতা আমি পড়ছি। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা কবিতা পেয়ে গেলাম—চমৎকার! ব্যঞ্জনাময় প্রগতিশীল চিন্তাধারার কবিতা। নাম—চীন : ১৯৩৮

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

পড়েই আমি মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠলাম। এ কবি যেন আমার বন্ধু হওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছে। কবিতার উপরে দেখলাম কবির নাম সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মন্মথদা মনোনীত করেন নি, অথচ আমার ভাল লেগেছে। অমি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে ডেকে পাঠালাম। এসে দেখা করতেই সব ঘটনাটা বললাম। তারপর অনেক কবিতা পাঠিয়েছে, ছাপাও হয়েছে। কিন্তু প্রথম কবিতা ছাপা হয়নি। আমার আসল নাম অরুণকুমার মিত্র। আমি বললাম এসব বেশি বলো না, তুমি ও 'সুভাষচন্দ্র' সেই নাম সই করা বাতিল হওয়া কবিতাটা আজও আছে আমার কাছে।

ছাত্র অবস্থাতেই সুভাষ সক্রিয় রাজনীতি করত। আলাপের পরে দেখলাম, ছেলেটির কবিতার চেয়েও রাজনীতিতে মন বেশি। তবে, রাজনীতি করতে করতে সভা, সমিতি, মিছিল, রণক্ষেত্রেই দিব্যি কবিতা লিখে ফেলতে পারে। সুন্দর ছন্দের হাত। প্রথম রাজনীতির আবেগ। ভীষণ ভাল লেগে গেল সুভাষকে। সুভাষকে বললাম, কবিতা শোনাতে আসবে মাঝে মাঝে। আমি তখন কালিঘাটে ৩-বি সদানন্দ রোডের বাড়িতে থাকতাম। সুভাষ যাতায়াত শুরু করল। নিয়মিত আসতো। বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কটা বড় অদ্ভুত—আমার ছেলেরা ওকে সুভাষকাকু বলে। আমার স্ত্রীকে সুভাষ বলে শান্তিদি, তবে আমি ওর চেয়ে নয় বছরের বড়—আমাকে ও অরুণবাবু বলে ডাকে।

হঠাৎ একদিন সুভাষ আসা বন্ধ করল। কী ব্যাপার? খোঁজ নিয়ে জানলাম, সুভাষ জেলে গেছে। ও কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিল না সেই সময়। আমি ছিলাম মেম্বার।

আর ও আমাদের পার্টির সমমনোভাবাপন্ন লেবার পার্টির মেম্বার ছিল। ওদের দল চালাতেন একজন মহিলা। সেটা আমাদের খুব আকর্ষণ করতো। সেই নিয়ে সুভাষকে আমরা নানা মজার কথা বলতাম। দেখলাম সুভাষ নেত্রীকে খুবই সম্মান করে, ভালবাসে। একদিন নেত্রীসহ সুভাষরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ভীড়ে গেল।

১৯৫২-র আগে, একদিন আমাদের বাড়িতে এল সকালবেলায়। খুবই লাজুক চেহারা। কিন্তু স্মার্টনেস বজায় রাখতে সুভাষের জুড়ি নেই। যেন কোনও লজ্জাই পায়নি এভাবে আমাদের বলল, আমি বিয়ে করছি শান্তিদি।

শান্তি বলল, আমি জানি।

—আপনি কি করে জানেন?

—আন্দাজ করছি। তুমি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিয়ে করছো।

গীতা আমাদের কাছে বেশ পরিচিত ছিল। কারণ ওর এক 'কাজিনব্রাদার' ছিলেন মোহনানন্দ মহারাজ। তাছাড়া অভিনেত্রী সীতাদেবী ওর দিদি হতো। রেঙ্গুন থেকে ওদের পরিবার কলকাতায় আসে। গীতা সেই বয়স থেকেই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। সুভাষের সঙ্গে বিয়ের আগেই যুব ফেডারেশনের কাজে ইউরোপ ঘুরে এসেছে। ফলে, পার্টিতে গীতা বিখ্যাত মেয়ে। তার সঙ্গে প্রণয়পর্ব সুভাষের—আমরা গোপনে জানতাম। সুভাষ জানতো না বলেই অবাক হয়ে শান্তিকে বলল, গীতাকে বিয়ে করছি আপনি কি করে জানলেন?

শান্তি বলল, আমার ইনট্যুইশ্ন বলছে। হাসতে হাসতে সেদিন সুভাষ নিমন্ত্রণ করে গেল। যাবার সময় বলল, বিয়ে করবার পাঞ্জাবি নেই। সারাদিন শার্ট পরে থাকে, কোনওদিন পাঞ্জাবি পরেই নি। কেনার মতো আর্থিক পরিস্থিতিও নেই। কারণ রোজগার বলতে কিছু ছিল না। পার্টির হোলটাইমার। সেই আমলে হোলটাইমার হিসেব অতি সামান্য কিছু পয়সা পেতো তাতেই সংসার পাতছে। সেই অবস্থায় আমারই একটা লম্বা পাঞ্জাবি দেওয়া হলো। তাই পরে সুভাষ বিয়ে করতে গেল। রেজিষ্ট্রি বিয়ে। আমরা গেলাম। যতদূর মনে পড়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ এসেছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও সম্ভবত।

হেমন্তকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতো। ওরা খুব বন্ধু। ছুটির দিনগুলোয় সারাদিন আমাদের আড্ডা হতো। সুভাষকে নিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষ একবার সভা করলো রবীন্দ্রসদনে। আমাকে নিয়ে গেল বক্তৃতা করাতে। সন্তোষ ঘোষ আর সুভাষ কীভাবে এক হয়েছিল। আজও জানি না। তার আগে সুভাষকে বা আমাদের মতো বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী মানুষদের আনন্দবাজার বয়কট করেছিল। সেই বয়কট উঠল বোধ হয় সন্তোষ ঘোষের আয়োজিত সুভাষ-সম্বর্ধনার মাধ্যমেই। যাই হোক, আমি সেই সভায় সুভাষকে নিয়ে নানা কথা বলছিলাম, হেমন্ত পাশে এসে বলল, কই আমার কথা বলছেন না তো?

আমি বলি, সবুর কর, অত উঁচুতে উঠতে দেরি হবে। তুমি সুভাষের চেয়েও উঁচু। আমি আবার খুবই খর্ব কিনা।

সারা পৃথিবী যখন হিটলারের ত্রাসে কাঁপছে তখন আমাদের মধ্যেও উদ্দীপনা শুরু

হলো। একদিকে লড়াই হচ্ছে, অন্যদিকে আমরা ভাবছি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সুরক্ষিত করতে গেলে হিটলারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের এক করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়লেন। আমরা কলকাতায় সভা শুরু করলাম। বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কি বুদ্ধদেব বসু'র মতো মানুষও 'ফ্যাসীবাদ বিরোধী লেখক-শিল্প সংঘে' এসে যোগ দিলেন। যদিও বুদ্ধদেববাবু কিছুদিন বাদেই কমিউনিস্টদের গন্ধ পেয়ে সঙ্গ ত্যাগ করেন। তবু তখন সবাই একজোট হলাম। প্রথম বিলেত ফেরতদের একটা সম্মেলন হলো। আমরা 'ইন্‌ফিরিওর' টাইপের কমিউনিস্ট ছিলাম (সম্ভবত) তাই আমরা আর সেটায় ঢুকতে পারলাম না। সুভাষ, আমি সাধারণ সভাতেই রইলাম। সুভাষ খুব খাটতো। ও যুগ্ম সম্পাদক ছিল সংঘের। এই সময় ওর সঙ্গে সৌহার্দ বেড়ে গেল। ফ্যাসীবিরোধী সংঘের বৈঠকে নানা আলোচনা হতো। গল্প পাঠ হতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পড়েছিলেন। কিন্তু কবিতা পাঠ হতো না। তাই আমার আর সুভাষের এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা ছিল না। সভা শেষে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতাম। শেষ ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়ে বসতাম দক্ষিণ কলকাতামুখী সভ্যরা—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুভাষ, আমি এরকম আরও কেউ কেউ। ওই নির্জন রাতে ট্রামের চাকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিৎকার করে আমরা গান গাইতাম। সুভাষও গাইতো, ভয়ানক বেসুরো। কিছুতেই ওকে থামানো যেত না। কন্ডাকটর অনেক সময় ওর গান শুনে এত খুশী হতো যে ট্রামের ভাড়া পর্যন্ত নিতো না।

এরই মধ্যে একদিন সুভাষের 'পদাতিক' বের হলো। আমাকে দিয়ে গেল এক কপি। অনেক পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় আমি 'পদাতিকে'র সমালোচনা লিখি। সাহিত্যিক দিক থেকে বিচার করে বলেছিলাম, বক্তব্য ভাল কিন্তু আমার মনে হয় তার বাহনের সঙ্গে যা বক্তব্য তাতে এই ছন্দ গভীরতা রক্ষা করতে পারেনি। মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। ছন্দ অন্যরকম হলে আরও ভাল হতো।—এই সমালোচনা পড়ে ও কিন্তু কিছু মনে করে নি। এটা ওর একটা বড় গুণ। কোনও দিনই অন্যের মতামত, যা ওর অপছন্দের তা শুনে বা পড়েও উত্তেজিত হয় না। যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারে।

চাকরির কারণে এক সময় আমি এলাহাবাদে চলে গেলাম। সুভাষ চিঠিপত্র দিতো। বিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায় সুভাষের কাকার ভায়েরা-ভাই। অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন, এলাহাবাদেই থাকতেন। সেই সুবাদে সুভাষ ওখানে যায়। গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি গিয়ে নিয়ে আসি আমাদের বাসায়। সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফেরে। তারপর কলকাতায় এসে আমরা সুভাষের বাড়িতে অনেকবার উঠেছি। একবার এসে বললাম, সুভাষ আমি বুশশার্ট কিনবো। সুভাষ বলল, আপনি বুশশার্টের কিছুই জানেন না, আমি সব সময় বুশশার্ট পরি, আমি সব জানি। আমি কিনে দেব।—শুরু হলো সঠিক বুশশার্টের সন্ধানে সারা কলকাতা হাঁটা। হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে মনে হচ্ছে কলকাতা শহরটা এত বড় আগে জানতাম না তো। আজ আর বুঝি বাড়ি ফেরাই হবে না, এত ক্লান্ত আমি। সুভাষ দিব্যি খোশমেজাজে রয়েছে। ও ভীষণ হাঁটতে পারে। ওর খুব হাঁটার কথা। ওর কাছে একসময় বলেই ফেলাম,

আর হাঁটতে পারব না। তখন ও পছন্দ করে আমায় বুশশার্ট কিনে দিল। সেই থেকে আর সুভাষের সঙ্গে আমি হাঁটতে বের হই না।

সুভাষের তিন মেয়ে। তিনজনকেই পালন করেছে গীতা ও আর সুভাষ। বড়জন 'পুপে' তো আমাদেরও কোলে চড়ে মানুষ। অমার ছেলেমেয়েরাও সুভাষের কোলে চড়েছে। এখনও সুভাষ এলে আমার মধ্যবয়স অতিক্রান্ত সন্তানকে ডেকে বলে, আয় তোকে কোলে নিই। খুবই সেন্স অফ হিউমার। আমি বলি, সুভাষ তখন মানুষ পাচ্ছে না বলে বেড়াল পুষেছে। খুবই নরম মনের মানুষ। একটুতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দ্বিধা সুভাষের মধ্যে চিরকাল। তার কারণও সম্ভবত এই আবেগের বাহুল্য। নানা সময় রাজনীতির প্রশ্নে এত বিহ্বল হয়ে পড়ে ও যে হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। রাজনীতির বিষয়ে সব সময় মুহূর্তের সত্য বিশ্বাস করলে চলে না। সময় দিয়ে বিষয়টাকে বিচার করতে হয়। সবাই বলল, বাজে, অমনি একটা মতামত বাজে বলে দিলাম, এটা কোনও চিন্তাশীল মানুষের কাজ নয়। সুভাষ সেটাই করে ফেলে। ও মুহূর্তের ঘটনায়, মুহূর্তের সত্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই কারণেই রাজনীতির ব্যাপারে সুভাষ এত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার পরিচয় দেয়। তবে কমিউনিজমের প্রতি ওর দ্বিধা রাশিয়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে চিরকাল।

একবার এলাহাবাদ থেকে ফিরে ওর বাসায় গেছি। রাশিয়ায় তখন ক্রুশ্চেভ হাল ধরেছেন। তাঁর ডিস্‌স্ট্যালিনাইজেশন্‌-এর ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ ক্রুশ্চেভকে জাস্টিফাই করল। আমি মনে করছি ক্রুশ্চেভ কমিউনিজমের ক্ষতি করছেন, ও তীব্রভাবে জানাল স্ট্যালিন ভুল। দেখলাম, ও বদলে গেছে। এই স্ট্যালিনের মৃত্যুতে সুভাষরাই এক সময় কান্নাকাটি করেছিল। পরে আবার গাল দিল, মাও-কে 'ম্যাও' বলল। এসেবই ওর সি পি আই যোগাযোগের ফল। আমাকে 'পরিচয়ে' সেই সময় এই ব্যাপারে লিখতেও বলল। আমি বললাম, না। এটা কেবল সুভাষ কেন, এদেশের কমিউনিস্টদের এই দ্বিচারিতা অনেকেরই আছে। সি পি আই দলটাই সেভাবে চলে। আমার একদম এসব সহ্য হয় না। আরও একবার হয়েছিল সার্ত্রে প্রসঙ্গে। জাঁ পল সার্ত্রে মহাপণ্ডিত, প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, মানব সভ্যতায় তাঁর মনে হয়েছিল যুদ্ধের আগ্রাসন রুখতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কৌশলগতভাবে হাত মেলোনো যেতে পারে। তাই হেলসিঙ্কির বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে তিনি কমিউনিস্টদের সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। ব্যাস, এদেশের কমিউনিস্টদের প্রাণের বন্ধু হয়ে গেলেন সার্ত্রে। তাঁর সারাজীবনের মতামত ভুলে গিয়ে সার্ত্রের কৌশলে পা দিলেন সুভাষরা। 'পরিচয়' আমায় বলল, যেহেতু আমি ফরাসী ভাষা জানি, সার্ত্র পড়েছি, তাই সার্ত্রের উপর আলোচনা লিখতে। আমি বললাম, সার্ত্রে আমার কাছে শ্রদ্ধাশীল মনীষী কেবল কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছেন বলেই আজ যে কোনও প্রকারে তাঁকে কমিউনিস্ট বানিয়ে সস্তা লেখা লিখতে পারব না। পরে আমি সার্ত্রেকে নিয়ে লিখেছি কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ মতাদর্শগতভাবেই বদলে

গেল, এটা বড় আশ্চর্য লাগে। এখানকার বর্তমান কমিউনিস্ট নেতাদের সম্পর্কে রাজনীতির ব্যাপারে আমার আর কোনও আস্থা নেই, সুভাষেরও নেই—তা বলে নিজেকে বদলে মতাদর্শকে গাল দেবো ভাবতেই পারি না। আমাদের মতো দেশের পক্ষে আজও কমিউনিজম ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। অবশ্য সুভাষের অন্য মতামতও থাকতে পারে, আমি পরিষ্কার জানি না। ওর সঙ্গে তো আমি দেখা হলে রাজনীতির কথা বলি না, গৃহস্থালীর কথা বলি। ওদের পরিবারটাকে আমাদের ভারি অদ্ভুত লাগতো। কারণ একই ছাদের নীচে একদিকে সুভাষ ছিল সক্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী আর গীতা জীবনের এক পর্বে এসে শুনেছি এ্যান্টি-কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ওরা কিভাবে দিনযাপন করে এব্যাপারে নানা প্রশ্ন জাগতো। আজ আর বোধহয় এই নিয়ে দু'জনের কোনও সমস্যা নেই। যেভাবেই থাকুক, সুভাষ-গীতা ভালো থাকুক সুখে থাকুক এটাই শেষ পর্যন্ত চাই। রাজনীতির বাইরে আমরা খুবই বন্ধু, খুবই সহমর্মী। সুভাষের সম্পর্কে, সুভাষের কবিতার সম্পর্কে আমার ভালবাসা আজও অটুট। আমার সম্পর্কেও সুভাষের আগ্রহ আছে বুঝি। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর সুভাষ বলেছিল, জীবনানন্দ পরবর্তী সমর সেন আর অরুণ মিত্রের কবিতা ওর ভাল লাগে। জ্ঞাপপীঠ পুরস্কারটাও অরুণ মিত্রকেই দিলে নাকি খুশী হতো। তাই ভাবছি একদিন গিয়ে ওর বাড়ি থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারটা আমার বাড়িতে নিয়ে আসবো।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সুভাষ ও অন্নদাশঙ্কর

সুভাষদার সঙ্গে পথচলা

শঙ্খ ঘোষ

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে, পড়ন্ত এক দুপুরবেলায়, প্রথম দেখেছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁর সঙ্গে অনেকটা পথ হাঁটবার যে সুযোগ মিলেছিল সেদিন, পায়ের ক্ষতিতে অশক্ত হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সেটা। এত দীর্ঘকাল জুড়ে কত-যে পথ হেঁটেছি তাঁর সঙ্গে, কত-যে কথা বলবার কথা শুনবার অবাধ অবকাশ! সাহিত্যজগতে আমার মেলামেশা খুব অল্পই, বড়োদের সঙ্গে তা একেবারেই কম। সেই অর্থে আমার পক্ষে সুভাষদার সান্নিধ্য ছিল সুপ্রসর এক ব্যতিক্রম, আনন্দময় ছিল সে-অভিজ্ঞতা, সহজের নিশ্বাস ছিল তাতে। এই লেখাটিতে আমি তেমন কয়েকটি ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের কথাই শুধু বলব, নির্বাচিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা।

দল

সেটা ছিল বোধহয় ১৯৫৪ সালের এক ডিসেম্বর-সন্ধ্যা। ইডেন গার্ডেনস্-এ মস্ত আকার নিয়ে চলছে কয়েকদিনের যুব-উৎসব। নাচ, গান, নাটক, কবিতা, চারদিক জুড়ে নানারকমের আয়োজন, নানারকমের ছাউনি। অত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সবটাই যে আলো ঝলমল তা নয়, দু-চার জায়গায় আছে কিছু আলোআঁধারি প্রান্ত। অনেকেরই সঙ্গে দেখা অনেকের সঙ্গে কথা, বেশ একটা ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে আছেন সুভাষদা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সুভাষদা বললেন : 'শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে. চলো একটু ওইদিকে যাই।'

মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আলোবিরল জনবিরল একটা অংশে পৌঁছে গেছি, কিন্তু কথাটা আর বলছেন না উনি। অনেকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন : 'তোমার বিষয়ে একটা গুজব শুনছি, সেটা কি সত্যি?

'গুজব? আমার বিষয়ে? কিসের গুজব?

আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে : 'শুনলাম তুমি পার্টি মেম্বারশিপ নেবার কথা ভাবছ?' চমকে উঠলাম শুনে। এবার নীরব থাকবার পালা আমার। কেননা, নিশ্চিত জানি যে উত্তরটা শুনে উনি আশাহত হবেন, আর সে -আঘাতটা আমার দিতে ইচ্ছে করছে না এই সুন্দর সন্ধ্যায়। ইস্কুলজীবন থেকে শুরু করে কখনোই কোনো দলীয় রাজনীতির অন্তর্গত হবার অভ্যাস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। দলীয়তার কথা ভাবলেই একটা দমচাপা অনুভব টের পাই ভিতরে। কিন্তু অন্যদিকে এও ঠিক যে ব্যক্তিগতভাবে একটা রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে আছি বেশ কিছুদিন ধরে, আর সেই সূত্রেই সুভাষদার এতটা কাছাকাছি আছি এই দু-বছর। একজন কমিউনিস্ট লেখক কেমন হতে পারেন, তার মডেল ভেবে চলেছি তাঁরই জীবনযাপনকে, তিনিও অনেকটা স্নেহ করছেন আমাকে। সেই স্নেহপথে হয়তো

এখন তিনি আমাকে টেনে নিতে চান নিবেদিতপ্রাণ একজন পার্টিকর্মী হিসেবেও, গুজবটা তাই যাচাই করে নিচ্ছেন এই নিরালায়।

অনেকটা দ্বিধার পর, ব্যথা দেওয়া হবে জেনেও, বলতেই হলো তাঁকে : 'না, কথাটা ঠিক সত্যি নয়। ও-রকম কোনো ভাবনা আমার নেই। ওটা আমি পেরে উঠব না।'

শুনে, আমাকে অবাক করে দিয়ে, সুভাষদার প্রতিক্রিয়াটা হলো একেবারে উলটো। একটা স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বললেন তিনি : 'সত্যি নয় তবে? খুব ভালো। শোনো, এখন তো নয়ই, লিখতে যদি চাও, পার্টি মেম্বারশিপ নেবার কথা ভেবো না। পার্টির কাজ যদি করতে চাও, তাহলে বাইরে থেকে করো। বাইরে থেকেই অনেক ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। দুপক্ষেই সেটা ভালো।'

'আপনি? আপনি বলছেন এই কথা?'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি। এ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনার আর দরকার নেই। তবে পার্টির কাজে সাহায্য করার কথা ভুলো না কখনো। মানুষের সঙ্গ ছেড়ো না। চলো এখন, ওইদিকে যাই।'

আবার আলোর দিকে চলতে থাকি আমরা। ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াই. নানাজনের সঙ্গে কথা বলবার ভিতরে ভিতরে আমাকে বিঁধতে থাকে সুভাষদার ওই স্বস্তিবোধ, অবিশ্বাস্য ওই পরামর্শ। কেমন করে এটা হলো? কেন হলো এটা?

আমরাও অবশ্য একটা গুজব শুনছিলাম কিছুদিন ধরে। শুনছিলাম যে পার্টির ভিতরে সুভাষদার একখানা বই নিয়ে বিতণ্ডা চলছে খুব। বইটির নাম 'ভূতের বেগার'। মার্কসবাদে দীক্ষা দেবার জন্য সরল করতে গিয়ে সুভাষদা না কি এমন সব তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে তুলেছেন যে জবাবদিহির দায়ে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। এপক্ষে-ওপক্ষে যুযুধান তখন অনেকে। তার সবটাই যে সে-মুহূর্তে টের পাচ্ছি আমরা তা নয়, কিন্তু আঁচ পাচ্ছি কিছুটা। আজ এখন, অনেকদিন পর, সেসব ভিতরকার খবর অনেকটাই আমাদের জানা। এখন 'চিঠির দর্পণে'র সুবাদে আমরা জানি যে 'ভূতের বেগার' নিয়ে 'পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে জোর কাজিয়া চলছে। "বুদ্ধিজীবী" বলে পার্টিতে যাদের হেলাফেলা করা হয়, "ভূতের বেগার"-এর পেছনে তারা সবাই এককাট্টা। ফলে নেতারা পড়েছেন ফ্যাসাদে। এখন আর না পারছেন গিলতে, না পারছেন ওগরাতে।.... পার্টির নিষেধাজ্ঞা থাকায় পার্টির দোকানে বইটি রাখেনি। ভয়ে পার্টির কেউ সে বই কেনেনি। অপছন্দের বই ব'লে পার্টি আঁতুড়ঘরে নুন দিয়ে মারল। ক্ষমতায় না থেকেই এই।'

সেই আলোড়ন থেকেই কি কোনো অশনিসংকেত টের পাচ্ছিলেন তিনি? সেইজন্যই কি আমাকে ওই সতর্কীকরণ? না, কেবল 'ভূতের বেগার'ই নয়, মনে পড়ে 'চিঠির দর্পণে'র একেবারে শেষ কথাগুলিও, যেখানে একজন কমরেডের কথা শুনবার পর 'খানিকক্ষণ আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দুজনে যেন দুই মেরুর লোক। দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছি না।' দুই মেরুর, কেননা একজন কমরেড তাঁকে বলেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করতে, অথচ সুভাষদা সেখানে

প্রতিবাদযোগ্য-দেখেননি কিছু। তখনকার দিনের চলছি 'প্রগতিশীল' কবিতার বিষয়ে সংগত একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন সুভাষদা, পত্রিকায় ছিল তার প্রতিবেদন, আর সে-প্রশ্নকে অনেক কমরেডের মনে হচ্ছিল একেবারেই 'পার্টিবিরোধী সব কথা'।

অশনিসংকেত ছিল হয়তো সেখানেও। অশনিসংকেত ছিল এই মনোভাবে যে 'পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন ধরতে পারলাম, সেদিন খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল? ('হাংরাস')।

দেশ

'এ-দেশ আমার গর্ব, এ-মাটি আমার কাছে সোনা'—লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ-রকম একটা পঙ্‌ক্তি লিখে ফেলাটা তত শক্ত নয় হয়তো, কিন্তু বেশ শক্তই জীবনের মধ্যে ওই কথাটাকে সত্য করে তোলা। বছর চারেক তাঁর সঙ্গে পথেবিপথে অনেক ঘুরবার পর ১৯৫৬ সালে আমাদের বহরমপুরের ক্ষণিক আস্তানায় যখন তাঁকে কদিনের অতিথি হিসেবে পেলাম, কেবলই তখন মনে হতো কথাটা। মনে হতো, ঠিক, এই মানুষটিরই মুখে তো মানায় 'আমার বাংলা'। দেশকে কত আনাচেকানাচে থেকে জানেন ইনি। সারা দিন জুড়ে আমাদের সঙ্গে যেসব ভাবনার কথা তিনি বলেন, বেশির ভাগই হালকা চালে, তার মধ্যে কেবলই মিশে থাকে ভাষা-মানুষ-জীবন-জীবিকা নিয়ে এই বাংলাকে জানবার আর জানাবার এক নিরভিমান আবেগ। আজ দেখছি ওই সময়ের কিছু আগে গীতাদিকে তিনি লিখছিলেন : '...সব মিলিয়ে যে আবেগ প্রকাশ করা যেত তার ছিঁটেফোঁটাও আমি প্রকাশ করতে পারিনি। আমার মুশকিল হয়েছে টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে একটি আবেগের স্রোতে কিছুতেই ভাষাতে পারছি না।' কবিজীবনের নতুন একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে, 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ের কবিতাগুলি লিখবার সূচনাপথে দাঁড়িয়ে, ওই অনিশ্চয়ের আর অতৃপ্তির বোধ স্বাভাবিকই ছিল তাঁর পক্ষে। অথচ আমাদের মনে হতো, সেই আবেগেরই কোনো স্পর্শ আমরা পাচ্ছি, পাচ্ছি কবিতা নিয়ে ভাষা নিয়ে শব্দ নিয়ে থম্‌কে-থম্‌কে-বলা তাঁর দৈনন্দিন কথাগুলির মধ্যে।

সেইসময়েই সুভাষদা আমাদের জানিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য-ইতিহাস লিখবার কল্পনা, নতুন এক সাহিত্যের ইতিহাস। সে-কল্পনায় রসদ জুগিয়েছিলেন নিশ্চয় নীহাররঞ্জন রায়। নীহাররঞ্জন তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' লিখেছিলেন 'স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায়', তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দেশের সেই রূপের মধ্যে যা ধরা আছে 'বিস্তৃত বাঙলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায়'। এরই মধ্যে দেশের মানুষের একটা রূপ তিনি দেখেছিলেন আর ভালোবেসেছিলেন। এই ভালোবাসায় সুভাষদা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, এই ভালোবাসায় 'বাঙালীর ইতিহাস' পড়ে এর ছোটো এক সংস্করণ তৈরি করে ফেলেন সুভাষদা। তাঁর মনে হতে থাকে : সাধারণ মানুষের জীবনের যে ছবি সে-ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তারই পথ ধরে তো নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায় আমাদের গোটা সাহিত্যের ইতিহাস। যায় না? শুধু উঁচুতলার চোখ দিয়েই তো ইতিহাসকে দেখা হয়েছে, আমরা দেখব জনজীবনের

স্তর থেকে। দেখব-শুধু পুরুষদের নয়—মেয়েদেরও চোখ দিয়ে। এসো না কয়েকজন মিলে সেই কাজটা করি। প্রতিমা, এসো তুমি আর আমি দুজনে মিলে লিখব। পারব না? তুমি লিখবে মেয়েদের কথা, মেয়েদের দিক থেকে। আচ্ছা, কাল সকালে বসে একটা ছক তৈরি করা যাবে।

যেভাবে তিনি ভেবেছিলেন, কাজটা সেভাবে করা যায়নি অবশ্য। 'বাংলা সাহিত্যের সেকাল ও একাল' বা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আদি ও মধ্যযুগ' নামে দুখানা ভিন্ন বই লিখেছিলেন ভিন্ন দুই সময়ে, ইস্কুলের পাঠ্যরীতি মেনে নিয়ে সেই লেখা। তাঁর ইচ্ছের যথার্থ পূরণ নেই সেখানে, থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে -ইতিহাসকে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসে, তারই একটা আদল রয়ে গেছে তাঁর নিজের কবিতার মধ্যে। প্রগতিবাদ তার দলীয় তুচ্ছতা ছেড়ে আর শ্লোগাননির্ভরতা ছেড়ে যেদিন সত্যি সত্যি জীবনের দিকে তাকাতে শিখবে, সেদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে জনজীবনের যে ছবি পাবে, সেখান থেকেই তো জেগে উঠবে আমাদের দেশের একটা রূপ, তার ইতিহাস। 'আসলে এখানকার জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছি। বজবজ বলব না, আসলে এই গ্রাম, চটকলের মানুষজন—এদের ওপর অসম্ভব মায়া পড়ে গেছে।' এই মায়া দিয়ে, 'ফুল ফুটুক'-এর পর্যায় থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তৈরি হয়ে উঠছে একটা দেশ। বজবজ থেকে ফিরে আসবার পর যাঁরা ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'শখের মজদুরি', তাঁরা বুঝতে পারেননি ওইসময়ের মধ্যে তাঁর বদলের পরিমাণ। 'ফিরে এলেও, এখন আমি আর ঠিক সেদিনের সে-আমি নেই'—একথা আমরা বুঝতে পারতাম বহরমপুরে তাঁর সেদিনকার সান্নিধ্য থেকে, সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সুখদুঃখকে খুঁজবার আর বুঝবার গরজ থেকে, 'ফুল ফুটুক' থেকে শুরু করে তাঁর কবিতার ভিন্নমুখ এক চলন থেকে, 'লড়াকু সংসার' গুলি যেখানে বিশেষের রূপ নিয়ে অবয়বময় হয়ে দেখা দিতে থাকে কেবলই।

কবিতা

ঘনিষ্ঠতার প্রশ্রয় পেলে যা হয়, অনেকসময়ে তাঁর কবিতার বিষয়ে দু-একটা দ্বিধার কথাও কখনো-বা বলে ফেলেছি সুভাষদাকে। কিছুটা হয়তো অবোধেরই মতো, প্রশ্ন করে বসেছি।

'যত দূরেই যাই' বেরিয়ে গেছে ততদিনে। বেশ খানিকটা হাঁটার পরে দুকাপ চা নিয়ে বসেছি কলেজ স্ট্রিট বাজারের বসন্ত কেবিনে। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ সুভাষদা বললেন : 'জানো, একটা কবিতার কথা ভাবছি।'

এ-রকম অভিজ্ঞতা আগেও ঘটেছে আমার। এই অভিজ্ঞতা যে, যে-কবিতাটা লেখা হয়নি তখনও, তার একটা আভাস বলছেন মুখে, আর আমি শিউরে উঠছি। শিউরে উঠছি ভিন্ন দুই কারণে। অগ্রিম জানতে পারব একটা কবিতার কথা, এই এক রোমাঞ্চ। কিন্তু কী করে লিখবার আগেই বলা যায় লেখাটার বিষয়ে? লেখাটা যদি তাতে রুদ্ধ হয়ে যায়? এই এক ভয়।

কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছি মুখের দিকে, আর সুভাষদা বলে চলেছেন : 'একটা ট্রাম চলে গেলে তারের যে শব্দটা হতে থাকে, সেই শব্দটাকে মনে হয় যেন কেউ "ছি ছি" বলছে। পাশেই ল্যাম্পপোস্টে একটা ছেঁড়া চাটাই ঝুলছে, মনে হয় যেন কেউ ওকে ফাঁসিতে লটকেছে। এইসব নিয়ে কবিতা।'

'আপনি কি এভাবে এগুলো ভেবে নেন আগে থেকে?'

'টুকরো টুকরো ছবি গেঁথেই তো কবিতা। আর সেগুলো তো এভাবেই জমতে থাকে।'

'কিন্তু আগে থেকে বলে ফেললে ভিতরে কোনো অসুবিধে হয় না?'

'কী অসুবিধে? না, অসুবিধে হয় না।'

'একটা কথা বলব? আপনার কবিতায় একটা জিনিস কিন্তু খুব বেশি করে আসে, মানে একটা ধাঁচ। এই যেমন বললেন চাটাইটা ফাঁসিতে ঝুলছে। অলংকারের ভাষায় যাকে সমসোক্তি বলা যায়, তার একটু বেশি ব্যবহার। এর কোনো অসুবিধে নেই? একই ধাঁচে এই বেশি ব্যবহারের?'

'আমি ওসব ভাবি না। ওসব তোমাদের ভাবনা।'

এদিন তবু এই উত্তরটুকু দিয়েছিলেন। অন্য আরেকদিন, হয়তো-বা ভিতরে ভিতরে একটু আহত হয়েই, একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' নামে তাঁর অন্যতম সেরা কবিতাটি ছাপা হয়ে গেছে তখন, তা নিয়ে কথাবার্তাও চলছে অনেক। আমারও যে কত ভালো লাগছে সেই লেখা, সেকথা জানাবার পর কোন্ দুর্মতিতে হঠাৎ বলে বসি : 'কিন্তু কবিতাটার মধ্যে এটা থাকাও কি ঠিক হলো যে ক্রুশ্চেভের গলায় কথা বলছে ভবিষ্যৎ? একেবারে ক্রুশ্চেভ? এ যদি পরে পালটে যায় আবার?

সুভাষদা শুধু জিজ্ঞাসুভাবে একবার তাকালেন আমার দিকে।

আমি বলতে থাকি : 'দশ বছর আগে তো লিখেছিলেন, কমরেড স্তালিন তুমি সুখে নিদ্রা যাও। এখন তো আর সেভাবে বলতে পারবেন না? সেইরকম, ক্রুশ্চেভকেও যদি কখনো বাতিল করতে হয়? তখন এ-লাইনটাকে কীভাবে পড়ব আমরা? বাতিল হয়ে যাবে তো লাইনটাও?'

উত্তর দিলেন না তিনি। একটু পরে চলে গেলেন অন্য কথায়। নিজেকে একটু অপ্রস্তুত লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে নিজের মতো একটা উত্তর অবশ্য তৈরি করে নিয়েছিলাম। ভেবে নিয়েছিলাম ওই ব্যবহারের সমর্থন। আর, অনেকদিন পর, 'চিঠির দর্পণে'র মধ্যে লিখিত বয়ানে পেয়ে গেলাম সুভাষদারও উত্তর, যেখানে স্তালিনের মৃত্যুকালের বর্ণনার পরে কবিতাটির উল্লেখ করে উনি লিখছেন : 'মূর্তিটা মন-গড়া ছিল ব'লে আমাদের সেদিনের সেই আবেগ আর জীবনের জয়গান তো মিথ্যে হয়ে যায় না।'

আবেগের সেই সত্যটাই কবিতার সত্য। বস্তুসত্য পাল্টালেও সে-সত্যের চিরকালীনতার কোনো ক্ষয় নেই।

কথা

১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বিশাল প্রেক্ষাঘরে উপচে পড়ছে লোক, মঞ্চে অনেক গণ্যমান্য, উইংসের পাশে আড়াল করে দাঁড়ানো সুভাষদা। আজ তাঁর সংবর্ধনা।

'যত দূরেই যাই' বইটির জন্য আকদেমি পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে কিছুদিন আগে। আহ্লাদ অনেকের, হতবুদ্ধিও অনেকে। হতবুদ্ধি, কেননা একজন কমিউনিস্টকে কি না দেওয়া হচ্ছে এমন প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান! এ কি ঠিক হলো? আবার, পুরস্কার নেওয়াটাও কি ঠিক হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের? কিন্তু সেসব তর্ক সরিয়ে রেখে আজ আয়োজন হয়েছে এক অভিনন্দনের।

অভিনন্দন একটা প্রথা মাত্র। একটা-দুটো ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায়, পুরস্কার ঘোষণার পর পুরস্কৃতকে নিয়ে তাঁর অনুরাগীজনেরা যে সমবেত আনন্দ প্রকাশ করবেন, সেই সূত্রে তাঁদের হৃদয়ের সমর্থন জানাবেন, এ যেন প্রত্যাশিত আর অবধারিত এক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। প্রথাগত সেসব সভা বিশেষ যে স্মরণীয় হয়ে থাকে, এমনও নয়। কিন্তু, সভার ওই পুঞ্জীভূত ভিড় ছাড়াও, ভিন্ন একটা কারণে একে আমি ভুলতে পারিনি কখনোই।

সভায় যাঁরা এসেছেন, বসবার জায়গা না পেয়ে অনুযোগহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন দূরের গাঁও-গঞ্জের মানুষ। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন কারখানার শ্রমিক, কিংবা অন্য কোনো গায়ে-গতরে খেটেখাওয়া গরিব-গুর্বো লোক। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ভাবছেন এ যেন তাঁদের সম্মিলিত শক্তির কোনো জয়চিহ্ন।

আর মঞ্চে? মঞ্চে গান গাইবেন সুচিত্রা মিত্র বা দেবব্রত বিশ্বাসের মতো মানুষেরা, কথা বলবেন গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবিশ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়েরা, কবিতা পড়বেন শম্ভু মিত্র।

উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সবটাই শুনছেন সুভাষদা, বেশ মন দিয়ে। আসাযাওয়ার পথে অনেকে ওঁকে ব্যক্তিগত সম্ভাষণ জানিয়ে যাচ্ছেন, হাসিমুখে শুনছেন সেসব, মানছেন সেসব। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন শম্ভু মিত্র। সুভাষদার সঙ্গে স্মিত দৃষ্টিবিনিময় করে ঢুকে গেলেন তিনি মঞ্চে। কবিতা পড়বেন এই ঘোষণায় বিপুল করতালিতে ভরে গেল প্রেক্ষাঘর।

শম্ভু মিত্র তখন খ্যাতির পরমতায়। 'রাজা' বা 'রাজা অয়দিপাউস'-এ অভিনয় সম্পন্ন ততদিনে। আর, কবিতা-আবৃত্তির জনপ্রিয়তাতেও তখন চূড়ান্ত তাঁর অবস্থান। 'মধুবংশীর গলি'র ভরাট আর খেলানো গলায় তিনি আবেগভরে শোনালেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিন-তিনটি কবিতা। আরো একবার করতালির মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন মঞ্চ থেকে। আর তার ঠিক পরেই, সুভাষদার একবারে মুখোমুখি।

সভাটি যে আমার বিশেষভাবে মনে থেকে গিয়েছে, তা কেবল ওঁদের এই মুখোমুখি

দাঁড়াবার অভিজ্ঞতাটার জন্য। এক লহমা চুপ করে আছেন শম্ভু মিত্র, হয়তো সুভাষদার পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্যের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু কিছুই উনি বলছেন না দেখে আত্মপ্রত্যয়ে গরীয়ান ভাবে জিজ্ঞেস করলেন : 'কী সুভাষ, ঠিক পড়েছি তো?' আর তার উত্তরে শিশুর সরলতা মুখে নিয়ে বিমল হাসিতে সুভাষদা বললেন : 'ঠিকই আছে, তবে ওগুলো আমি নিজে পড়লে বোধহয় আরেকটু ভালো হতো।' স্তম্ভিত বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে 'ও, তাই বুঝি' বলে শম্ভু মিত্র চলে গেলেন শমীককে নিয়ে, আর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে সুভাষদা আরেকবার হাসলেন।

'এইভাবে বললেন আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কেন? বলাটা ঠিক হলো না? না না, উনি তো খুবই ভালো আবৃত্তি করেন। কিন্তু কী জানো, আমি তো কবিতাগুলি ঠিক ওইভাবে লিখিনি—এমনি এমনি পড়ে গেলেই তো হয়। কথাবার্তাই তো এগুলি।'

সভাটি আমার মনে থেকে গেছে সুভাষদার এই শান্ত অনায়াস প্রতিক্রিয়ার জন্য। তাঁর নিজের কবিতার একটা চরিত্রলক্ষণই সরাসরি এইভাবে জানাতে চেয়েছিলেন বোধহয়। তাঁর প্রিয় কবি নাজিম হিকমত লিখেছিলেন : 'কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা।' আর সুভাষদা লিখেছেন : 'মুখের ভাষায় যে জাদু থাকে, সেটা কবিতায় উঠিয়ে আনতে হবে। শব্দে ফোটে সুরেলা ছবি। বেশি কথাকে কম কথায় আঁটানো, কথায় রং ফলানো, নিরাকারকে আকার দেওয়া, কথায় কথা জুড়ে মানুষকে নিশানা দেখানো—লোকমুখের ভাষার ধর্মই তো এই।'

এই ধর্মের জন্যই, কবিতা পড়াটাও ভিন্নরকম হবে, জাঁকালো আবৃত্তির থেকে বহুদূরবর্তী সেটা—তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরে ময়দানের এক জনসভায় সুভাষদার মুখে 'অগ্নিকোণ' শুনে উদাত্ততার অভাবে বেশ হতাশ হয়েছিলাম মনে পড়ে। বুঝতে পারছি, কবিতাপড়া বিষয়ে সেদিন আমার প্রত্যাশাতেই ছিল ভুল, কেননা সুভাষদার কবিতা তো শুধু কথাই।

কাহিনী

পথ চলতে চলতে প্রায়ই বলতেন : 'জানো, অনকদিন ধরে ভাবছি একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়।'

'উপন্যাস? আপনি লিখবেন? সে তো দারুণ হয়।'

'কিন্তু আমি বোধহয় পারব না।'

'বাঃ, পারবেন না কেন? আপনার এই-যে এত ঘুরে-বেড়ানো, এই- যে পার্টির এত অভিজ্ঞতা, এ থেকে তো কত কিছুই হতে পারে।'

'সে তো রিপোর্টাজ হয়। উপন্যাস কি হয়?'

'উপন্যাসের কি ধরাবাঁধা কোনো হওয়া আছে না কি?'

'নেই? তোমরা আবার বলবে না তো—লেখাটা ভালোই, তবে ঠিক উপন্যাস হয়নি?'

'বললেই বা আপনি শুনবেন কেন?'

কয়েকদিন পর আবারও জিজ্ঞেস করি : 'উপন্যাসের কথা ভাবলেন আর কিছু? কবে শুরু করবেন?'

'নাঃ, ওটা আমার হবে না।'

'কেন, হবে না কেন?'

'দেখো, অনেক ভেবে দেখলাম, একটা ব্যাপার আমার ভালো জানা নেই।'

'সে আবার কী?'

'ওই-যে থাকে না? উপন্যাসে মেয়েপুরুষের একটা ব্যাপার থাকে না? ওটা মনে হয় আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'এর মধ্যে আবার বোঝার কী আছে? আর না-ই যদি বোঝেন তো লিখবেন না সেটা। তা বলে উপন্যাস কেন হবে না?'

'নাঃ, থাক।'

এসব কথাবার্তার প্রায় দু-বছর পর, ১৯৭২ সাল সেটা, একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন :'তোমার খানিকটা সময় হবে? একটা লেখা শোনাব।'

'লেখা? কবে? কখন?'

'কখন সময় হবে বলো। অনেকটা লম্বা সময় কিন্তু। দুপুর থেকে বলতে পারলে ভালো হয়।'

'বড়ো লেখা?'

একটু লাজুক হেসে বললেন : 'উপন্যাসটা লিখে ফেলেছি। তবে, কেউ পড়বে কি না বুঝতে পারছি না।'

'হয়ে গেছে লেখা? কী কাণ্ড! কবে শুনব? কবে শোনাবেন?'

দিনক্ষণ ঠিক হলো। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে যে-বাড়িটির সঙ্গে আমাদের অনেকের ঘন পরিচয়, তার মধ্যবর্তী একটা ঘরের গোল টেবিলের পাশে দুখানা চেয়ার নিয়ে লেখক আর পাঠক, না, কথক আর শ্রোতা। মধ্যদুপুরে এসে পৌঁছেছি, সুভাষদা পড়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে হেঁকে বলছেন 'গীতা, চা', মাঝে মাঝে থমকে গিয়ে বলছেন 'পড়ব আর? একটু একঘেয়ে লাগছে, না?' থামতে দিতে রাজি হই না আমি, সুভাষদার পড়ার সূত্র ধরে ফিরে গেছি বাইশচব্বিশ বছরের পুরোনো দিনগুলিতে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরকার ছবিতে, যা দিয়ে তৈরি উপন্যাসটির কাহিনী। মুখে যে দ্বিধার কথাটা বলতেন, উপন্যাসের মধ্যেই দেখতে পাই সেটা : 'আমার অনেকদিনের শখ একটা উপন্যাস লেখার। কিন্তু আমি মনে মনে জানি আমাকে দিয়ে হবে না। আসলে আমি হচ্ছি হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক।' এমনকী সেই মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়েও তাঁর সেই সংকোচের কথাটা : 'মানুষ জাতের অর্ধেক যে স্ত্রীলোক এবং মানুষ্যজীবনের অর্ধেক যে দেহমনের মিলন, তার তুমি খবর রাখ না। মানুষের যেটা তুমি জান, সেটা অর্ধসত্য।' তবে কি আমর কাছে দ্বিধার কথাটা যখন বলছিলেন, সমান্তরালে তখনই লিখছিলেন এই কথাগুলি?

একদিনে শেষ হয় না পড়া। সন্ধের দিকে জরুরি একটা কাজের তাড়ায় উপন্যাসের অর্ধপথে উঠতেই হয় আমাকে পরের দিনের ভরসায়, সুভাষদা সন্দেহ করেন হয়তো-বা আমার ভালো লাগছে না বলেই পালাচ্ছি। পরের দিন শেষ হলো সেই উপন্যাসের পাঠ, সে-উপন্যাসের নাম হয়েছে 'হাংরাস', যে-উপন্যাস পরের বছরেই বই হয়ে বেরোল সকলের জন্য। পড়া শেষ করে আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে যখন শুনলেন আমার কাছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে এল এটা, নিছক আমার মতো এক পাঠকেরও সেই প্রতিক্রিয়া শুনে খুশি হয়ে উঠলেন সুভাষদা, বললেন 'এই-যে গীতা, শুনে যাও, শঙ্খর ভালো লেগেছে।' 'কী বলছে শঙ্খ?' জিজ্ঞেস করেন গীতাদি। 'বলছে এর মধ্যে আলাদা স্বাদ পাচ্ছে। এই প্রথম না কি একটা মুসলিম পরিসরও এভাবে ফুটছে আমাদের লেখায়।'

ঠিকই তাই। অনেক কিছুই নতুন। তবু বিশেষ করে মনে হয়, বাদশার ওই কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেভাবে একটা অঞ্চল তৈরি হয়ে উঠল এ-উপন্যাসে, সেটা আমার কাছে বড়ো একটা আকর্ষণ। সেইসঙ্গে আরো একটা অভাবের পূরণ হলো এই লেখায়। কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ নিজেরই গরজে নিজেদের বাঁচার তাড়নায় সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে, কোথা থেকে কোথায় পৌঁছয়, তারও তো একটা দলিল এটা। মধ্যবিত্ত জীবনের ছকটার বাইরে সেই দলিলটারও তো ঘুব দরকার ছিল আমাদের।

'পড়বে লোকে?'

'পড়বে না? বলেন কী!'

কতদূর পড়েছে লোকে, তা অবশ্য জানি না ঠিক। এইটুকু শুধু জানি—পরে জেনেছি—যে, যতই দ্বিধার কথা বলুন না সুভাষদা, এই লেখাটির অন্তর্গত কাহিনীকে মনে মনে তিনি লালন করেছেন অতিদীর্ঘকাল। এমনকী 'হাংরাস' নামসুদ্ধই এ-পরিকল্পনার কথা আজ আমরা জানতে পাই 'চিঠির দর্পণে'র পাতাগুলি থেকে। ১৯৫২ সালে ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র লিখেছেন সামনের কয়েকদিনে কী কী তাঁর করে ফেলা দরকার : 'বাংলা কবিতা সংকলনের পরিকল্পনাটা এই কটা দিনে সত্যি সত্যি করে ফেলা উচিত। 'হাংরাস' উপন্যাসের শেষ কাঠামোও ঠিকঠাক করা প্রয়োজন।' ১৯৫২? ১৯৫২ সালেই তবে একটা কাঠামোর কথা ভেবে চলেছিলেন সুভাষদা, যার শেষ রূপায়ণ হতে পারল ঠিক কুড়ি বছর পর ১৯৭২ সালে? পার্টির বিষয়ে যে-প্রশ্ন যে-সমালোচনা 'হাংরাস'-এর মধ্যে থেকে-থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, কুড়ি বছর আগেই তার চিহ্নগুলি কি থেকে গিয়েছিল তবে? 'বরুণবাবুর মতোর সঙ্গে (সাহিত্য হল সাহিত্য, তার আবার উদ্দেশ্য কী?) আমার মত মেলে না। আবার যারা তাঁর সামনে আঙুল নেড়ে বলে সাহিত্য মানেই উদ্দেশ্য প্রচার—তাদের সঙ্গেও ঠিক সায় দিতে পারি না' কিংবা 'আমাদের পার্টিতে যারা গল্প লেখে তাদেরও তাই ঘাড় গুঁজে লিখে যেতে হয় কেবল বীর বিপ্লবী আর সাধুসচ্চরিত্রদেরই কথা'—১৯৭২-এর উপন্যাসের এসব কথার সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায় তাঁর ১৯৫৩ সালের কথা : 'আমরা এতদিন যে আবেগে লিখে এসেছি, তাতে থেকেছে শুধু সংগ্রামের ডাক আর চড়া গলার দাবি। সব বড় বেশি টান-টান, বড় বেশি ধরা-বাঁধা।... সব সময় আমরা মুখ গোমড়া

করে আছি, সবই কেমন এক-রঙা। কথাটা বুঝি অনেকদিন পর কবিতায় এল এইভাবে :

আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই
যে,
সরাক্ষণ হাসতেই থাকব!
আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই
যে,
সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব!
আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয়নি
যে
সারাক্ষণ হাত মুঠো করে রাখব!

এই আবদ্ধতা থেকে মুক্তির কাহিনীই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। মনে পড়ে, 'হাংরাস'-এর শেষ ছিল : 'আমাদের শরীরের আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোনো খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনোটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা। আমি বোধ হয় নেহাত আকস্মিকভাবে তেমনি কোনো খিল খুলে জানতে পেরেছিলাম—কাল, হ্যাঁ, কাল-অনশন ভাঙবার দিনটাতেই আমার জন্মদিন ছিল।'

নানারকম ভাবে ওই খিল খোলাটাই তো কবিতার কাজ। ওই জন্মদিনে পৌঁছনোটা।

১৯৮২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার রবীন্দ্রসদনে সপ্তাহ ও ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা। মঞ্চে সন্তোষ কুমার ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল এবং দিলীপ চক্রবর্তী

কখনো খরা, কখনো বর্ষা

গণেশ বসু

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অবস্থা আভাস চকিতে একটুখানি দিয়েছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। আমিত্বের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। থেকে গেলেন তিনি আবহমান বাঙালির পাঁজরে পাঁজরে। তবে মধুসূদনকেই সঠিকভাবে বলা যায় প্রথম আধুনিক কবি। তিনি খাঁটি বাঙালি, আবার সেই বাঙালিত্ব নিয়েই তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক, বিশ্ব-নাগরিক কবি। আর, আধুনিকতা সর্বত্রসঞ্চারী হ'লো রবীন্দ্রনাথে। আবেগে-যাপনে, মননে-মেধায় রবীন্দ্র-নিকটবর্তী আধুনিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান আজ-ও কি বাঙালি পেয়েছে? গানে-কবিতায়, চিত্রকলা-মানবদর্শনে, গদ্যে-পদ্যে তো বটেই তাঁর ধারে কাছেও কোনো সারস্বত পুরুষ মিলবে না। আজও তিনি 'মুক্তির পথনির্দেশ/চলমান সুন্দর'।

সেই রবীন্দ্রনাথের অপরাহ্নবেলায়, পশ্চিমি হাওয়ার তোড়ে, এ দেশের মাটিতে যে তৃতীয় দফার আধুনিকতার জয়যাত্রা শুরু হয়, বাংলা কবিতায় তার প্রধান ধারা দুটি। একটি জীবনানন্দীয়, অন্যটি বিষ্ণুদৈবত। জীবনানন্দে আবেগতাড়িত মেধা যেখানে প্রবল, সেখানে বিষ্ণু'দে-র মধ্যে মেধাযুক্ত আবেগের প্রাখর্য। এঁদের পাশাপাশি, বেশ কয়েক বছর পরে কবিতা লেখা শুরু করেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে পড়েন আগ্নেয় আইডল। পরবর্তী, আরো পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের কাছে তিনি সুভাষদা।

সেই সুভাষদার সঙ্গে আমার স্মৃতি আলো-আঁধারের কথামালা। তাঁর রচনার অনুরাগী পাঠক আমি বরাবরের। তাঁর কবিতায় নিহিত চেতনায় আজো ঋদ্ধ হই। কবিতায় কোনোদিন কি তিনি সত্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন? মাঝে মধ্যে বক্তব্যে একটু ক্রিটিক্যাল যে হননি তা নয়, কিন্তু সেটাও হয়েছেন হয়তো নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার জন্যে, সাদা চোখে সব কিছু জরিপ করবার তাগিদে। তাই, যে সুভাষদাকে পেয়েছি 'পদাতিক', 'চিরকুট','অগ্নিকোণ', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'দিন আসবে'য়, সেই সুভাষদাকে কি আরো অনুভূতিতীক্ষ্ণ, আরো খোলামেলা, আরো বৃহত্তর-নিবিড়তর তাৎপর্যে পাই না 'যত দূরেই যাই','এই ভাই','ছেলে গেছে বনে','একটু পা চালিয়ে ভাই'—তে? চর্যাপদ অবলম্বনে তাঁর কবিতা যে অধ্যাপনার সময়ে কতবার ব্যবহার করেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। নাজিম হিকমতও যে আমাদের আপন জন হয়ে উঠেছিলেন, সে তো সুভাষদার কৃতিত্বে।

অবশ্য এটা খারিজ করতে পারি না যে, তাঁর প্রথম চারটি কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অনেকটা উপরিতলের রাজনীতির দিক থেকে প্রয়োজনিক কবি, আপন বিশ্বাসে ও সময়ের দাবিতে অবিচল বক্রোক্তিজীবিত, ভাঙনের গানে উচ্চকিত। কিন্তু 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' থেকে যেন ঘটে তাঁর জন্মান্তর। একে নবজন্ম-ও বলা যায় না কি? আবার, 'ছেলে গেছে বনে' থেকে পেয়ে যাই আরেক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। গদ্যও হয়ে গিয়েছিল গীতলতায়

সুভাষিত। কিন্তু রচনার মধ্যে ভাব-ভাবনা প্রকাশে তিনি ছিলেন বরাবরই আপসহীন, ভয়-ডর শূন্য, আপন বিশ্বাসে, লক্ষ্যে দৃঢ়। সেখানে চিড় ধরেনি।

অথচ, সেই সুভাষদার কথা ভাবলেই এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। একই রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে কেন আমার প্রতি নিদারুণ নিস্পৃহ ছিলেন সুদীর্ঘ সময়, কেন যে শীতল ব্যবহার করতেন সৌজন্য বজায় রেখেই, তার উত্তর হাতড়াতে হাতড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, উত্তর মেলেনি।

নিজেকে নিজে অনেক সময় প্রশ্ন করেছি, 'অমৃতে' চাকরি করতাম বলে কি 'দেশ'ভক্ত কবি আমাকে অপছন্দ করতেন? মণীন্দ্র রায়-রাম বসু-তরুণ সান্যালদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতাই কি দূরত্বের হেতু ছিল? অথবা, একবার তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরই উপস্থিতিতে তাঁকে সমালোচনা করেছিলাম দলের রাজ্য সম্পাদকের সামনে, সেটাই কি তিনি ভুলতে পারেননি? তারুণ্যের ঔদ্ধত্য কি প্রাক অগ্রজ কবি প্রসন্ন চিত্তে নিতে অপারগ ছিলেন? পরে ভেবে দেখেছি এই মনোভাবের শিকড় অনেক গভীরে। দলের ভিতরেই ছিল অনেক উপদল, অনুদল, গোষ্ঠী। ছিল বিভাজনের বীজ। একদল পছন্দ করতেন দেশ— 'আনন্দবাজার', অন্যরা সরাসরি না হলেও প্রকারান্তরে 'যুগান্তর' -'অমৃত' -'অমৃতবাজারে'র প্রতি দুর্বল ছিলেন। 'আনন্দবাজারে'র প্রেস থেকে ছাপা হত আমেরিকান রিপোর্টার। এঁদের সুপারিশেই আইওয়া-তে আমন্ত্রিত হতেন কোনো কোনো কবি, বাঁধা ছিল লেখক- সাংবাদিক- অধ্যাপকদের আমেরিকা ভ্রমণ। মিলতো ইনাম-ও। কিন্তু এসব ব্যাপারে টুঁ-শব্দটি কাড়তেন না' 'দেশানুরাগী কমিউনিস্ট কবি-লেখকেরা। অন্যেরা আবার এসব নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না। তাঁরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দিতেন। তা ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পর্কেও এই সুপ্ত শিবির বিভাজনে অনুঘট কাজ করতো বলে আমার ধারণা। 'আনন্দবাজার'-'দেশ'-এর অনুরক্ত পোড় খাওয়া কমিউনিস্ট বা বামপন্থী কবি-কথাকার শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নতুন রীতির দোহাই পাড়তেন। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে তোল্লাই দিতেন দেশ-আনন্দবাজারের আনুসারকদের। এমন কি নৈরাজ্যবাদীদের প্রশ্রয় দিতেও কসুর করতেন না-দলেরই এই শিবিরভুক্ত কবিগল্পকারেরা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনে, চর্চায় আদর্শনিষ্ঠ, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদী দীপেনদা, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত একটি সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি 'আনন্দবাজার'-'দেশ'-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, "মোটামুটি স্বাধীনতার দশ বছর পরে" ৫৬-৫৭ সাল থেকে আমাদের সাহিত্য জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল একটি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী। নাম করেই বলছি 'আনন্দবাজার' এবং 'দেশ' গোষ্ঠী। তাঁরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে বাঙালি সাংবাদিকতার যে-ধরণ-ধারন তাকে বহুল পরিমাণে বদলে দিতে পারলেন। মোটের ওপর আধুনিক বুর্জোয়া জার্নালিজম তাঁরা আমাদের রাজ্যে প্রবর্তন করলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁরা বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষমতাশালী প্রায় সমস্ত লেখককে চাকরি অথবা অন্য কোনও সূত্রে তাঁদের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। একদিক দিয়ে এটা ছিল খুব বড় কাজ।

কারণ সাহিত্যিকরা চিরকালই অর্থের জন্য প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে অভ্যস্ত ছিলেন। দুঃখভোগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। 'আনন্দবাজার', 'পত্রিকাই' বড় সাহিত্যিকদের হয় চাকরি দিয়ে, নয় ফিচার লিখিয়ে, মাসে একটা নিশ্চিত অর্থাগমের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন এই যে 'ফিচার' বললাম, এটা কিন্তু লক্ষণীয়। পত্রিকার, সংবাদপত্রের যে চরিত্র তা ক্রমে ক্রমে পাল্টাতে লাগল। নানা ধরনের চোখ-ঝলসানো, মন-ভোলানো ফিচারের সংখ্যা পত্রিকায় বাড়তে লাগল।" আরো বললেন, "পাশাপাশি আরেকটি মনোপলি আমাদের আছে—'যুগান্তর' এবং 'অমৃত'। বলা যেতে পারে 'দেশ'-এর বি-অথবা, ডি-টিম। তার, পাশাপাশি তো নয়ই, এমনকি বি-টিমও নয়।"

ভাবতে অবাক লাগে, এই দীপেনদারা নিজস্ব লেখায় মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ থাকলেও প্রকাশ্যে কেন যে নৈরাজ্যবাদীদের সমর্থন করতেন বুঝিনি। রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে কাছের লোকদের ডাকতেন সংগঠনের কাজে, মঞ্চ তৈরির জন্য স্বেচ্ছাসেবকের আর সেই মঞ্চকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিতেন কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী, সুবিধেবাদী ও নৈরাজ্যবাদী কবি-লেখকদের। ফলে-অভিমানে হোক, বা উপেক্ষা সইতে সইতে বিধ্বস্ত হয়ে হোক, আদর্শগত দিক থেকে যারা, সহাযোদ্ধা-সহকর্মী, যে সব অনুজ কবি-লেখক সমাজতন্ত্রে ছিলেন বিশ্বাসী, লেখাতেও থাকতেন আস্থাবান, তাঁরা দূরে সরে যেতে থাকেন। বেদনার সঙ্গেই বলা যায়, সুভাষদা-ও ঠিক একই ধরনের কাজ করতেন। দীপেনদার কোটারিই পেয়েছিল তাঁর সহানুভূতি। নিজের লেখায় কোনোদিনই যিনি আদর্শভ্রষ্ট হননি, অথচ ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বন্ধ নির্বাচনে তিনি গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, বিপ্লবী মতবাদ-বিরোধীদের নিয়েই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। তাঁদের ছিঁটেফোঁটা সুযোগ সুবিধেও করে দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। হিতৈষী ও অনুরাগী নির্বাচনে তাঁর এ হেন পক্ষপাত কেন হতো, সেটা বোঝা ছিল ষাটের তরুণ কবি কথাকারদের পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগতো প্রতিষ্ঠিত আদর্শবাদী কবি -কথাকারগণ কি উত্তরসূরি নির্বাচনে বা তাঁদের উৎসাহ-দানে বিভ্রান্ত? অথবা, বিরোধী মতবাদীদের স্বীকৃতিলাভকেই কাম্য, প্রশংসাকেই মোক্ষ বলে মনে করতেন? তাঁরা কি ভুলে যেতেন যে, তাঁদের এ হেন আচরণ দলকেই ভিতর থেকে ফোপরা করে দেয়? অথচ সুভাষদা -দীপেনদাদের আত্মত্যাগের তো কোনো তুলনা নেই।

* * * * *

প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই রাজ্যে বেশিদিন টেঁকেনি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকেও তিষ্টেতে দেয়নি সেই সময়কার কেন্দ্রীয় সরকার। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার, দেশ' হয়তো সিঁদুরে মেঘ দেখছিল, যেমন দেখেছিল ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের পরে। একদিকে স্বপ্নব্রতী নকশালদের তখন জাগরণ ঘটে গিয়েছে। অন্যদিকে দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আকচা-আকচি তুঙ্গে। সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নানান ফিকির খুঁজছিল এ রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী মিডিয়া গোষ্ঠী। নকশালপন্থীদের প্রভাব প্রতিহত করতে, বা খাটো করে দেখানোর জন্য, কিংবা

হলদে-সংস্কৃতির জীবনবিমুখতার প্রসার ঘটানোর তাগিদে শীতের দুপুরে, গড়ের মাঠে ফন্দি এঁটে মুক্তমেলার আয়োজন করেন ব-কলমে ওই মিডিয়াগোষ্ঠী। প্রতি শনিবারে মেতে উঠত একদল উঠ্‌তি কবি-লেখক-শিল্পী। গদ্য পাঠে, ছড়ায় ছড়ায়, নাচে-গানে সাড়ে বত্রিশ ভাজা বিলোনোর ব্যবস্থা। হই-হুল্লোড় চলত। স্বাধীন সংস্কৃতির নামে, গণসংযোগের অছিলায় সে এক বিচিত্র তামাশা। মাঝে মধ্যে অবশ্য দু-একজন সুন্দর গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। আমাদের বন্ধু তুষার রায় বিচিত্র ভঙ্গিতে টেনে টেনে কবিতা বলতেন, ছড়া বানাতেন। কবিতাদি (সিংহ), সুনীলদা (গঙ্গোপাধ্যায়)-রাও যোগ দিতেন, সচেতন থাকতেন উৎসাহে যেন ভাটি না পড়ে। বিস্ময়করভাবে সুভাষদা সেই স্বল্পস্থায়ী মুক্তমেলার কেরিক্যাচার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এ নিয়ে আমি তাঁর উপস্থিতিতেই বউবাজারে দলের দপ্তরে বিরূপ সমালোচনা করেছিলাম। সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সুভাষদাও কি সেই কথা ভুলতে পেরেছিলেন? সম্ভবত, না।

* * * * *

উল্লেখিত ঘটনার কাছাকাছি সময়ে আমার একবার সুযোগ আসে মস্কো যাবার। অনুবাদের কাজ করতে হবে রুশ ভাষাটা সেখানে গিয়ে শিখে নিয়ে। উপযুক্ত জায়গায় যখন আলোচনা হয় সেখানে সুভাষদা, তরুণদা (সান্যাল) রয়েছেন। আলোচনায় আমার নাম প্রথম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু সুভাষদা সেই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে কাঁচিয়ে দিয়ে অন্য একজন সাংবাদিকের নাম বলেন। আমার ব্যাপারে, তিনি না কি বলেছিলেন আমাদের পারিবারিক সংসারের দায় যেহেতু আর্থিকভাবে আমাকে বইতে হয় অনেকটা, তাই মস্কোয় চলে গেলে বছর খানেক আমাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাঁর এই কথায় সারবত্তা খুঁজে পান উপস্থিত মাননীয় কোনো কোনো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কারোরই যাওয়া হয়নি—না আমার, না ইংরেজি দৈনিকের সেই সাংবাদিকের।

ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন তরুণদা। তিনিই আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ঢ্যারা মারেন আমাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয় সুভাষদা। ফলে আমার আর মস্কো যাওয়া-থাকা-অনুবাদকের কাজ করা হ'লো না। দেখা হ'লো না স্বচক্ষে লেনিন-স্তালিন-গর্কি-পুশকিন-মায়াকোভস্কি আনা আখমাতোভা-লেভ ইয়াসিনের দেশ। রেড স্কোয়ার তো বটেই।

* * * * *

আর একদিনের কথাও এখন খুব মনে পড়ে।

আমি ব্রেবোর্ণ রোডের পাশপোর্ট আপিসে বসে আছি। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিক।

বেলা তখন বারোটা সাড়ে বারোটা হবে। আচমকাই দেখলাম সুভাষদাকে। উঠে দাঁড়ালাম, কাছে এলেন তিনি। জানতে চাইলেন তিনি, এখানে কেন, কখন এসেছি।

বললাম, পাশপোর্টের জন্যে।

—কোনো সমস্যা হয়েছে?

—না।

—কাউকে কিছু বলতে হবে?

—না।

—ওঃ!

তারপরে চলে গেলেন সুভাষদা একটি ঘরে, কোনো আধিকারিকের কাছে। আমি তীর্থের কাক হয়ে বসে রইলাম।

ভাবছি, সুভাষদা কেন আমাদের চোখের মণি। কেন তাঁর কাছে থাকে একরকম কলকাতা-মস্কোর মাস্থলি টিকিট। কেন তিনি 'আনন্দবাজার-দেশ' পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রায় ঘরের লোক। কেনই বা রাম বসু, তরুণ সান্যালদের মতো কবিরাই শুধু নন, ষাটের দশকের প্রধান কবিরাও মোটামুটি অনাদৃত, উপেক্ষিত।

একসময় সুভাষদা বেরোলেন। এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমার কাজ এখনো মেটেনি?'

বললাম, 'না'।

কাউকে বলে দেবো?

দরকার হবে না।

ভেবে দ্যাখো।

আমি আর কালক্ষেপ না করেই সুভাষদাকে প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা সুভাষদা, বাংলাদেশের ওপর এমন মর্মস্পর্শী, এত বাস্তব রিপোর্টাজ তিনটিই আনন্দবাজারে দিলেন কেন? 'কালান্তরে' কি একটা লেখাও দিতে পারতেন না?'

সুভাষদা কাঁধে হাত দিলেন আমার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'দ্যাখো, আনন্দবাজার টাকা-পয়সা দিয়ে, যাবতীয় বন্দোবস্ত করে আমাকে লেখার জন্য অনুরোধ করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে, সেখানে অন্য কোথাও এ বিষয়ে লেখা দেওয়া ঠিক হতো না। তাছাড়া, পার্টি তো সব জানতো, তাঁরা তো কেউ লেখার জন্য আমাকে একটিবারও বলেনি!'

টাকাটাই কি আপনার কাছে সব হয়ে গেল?

নাহ্, তবে টাকার প্রয়োজনীয়তা কি অস্বীকার করা যায়? মনে রেখো, আমাকেও তো সংসার চালাতে হয়, ভরণপোষণের জন্য টাকা তো লাগেই!

সত্যিই তো, কবি লেখকেরও যে ঘর-সংসার আছে সে কথা আমরা ভুলে যাই কেন? তাঁদেরও অসুখ-বিসুখ আছে, সন্তানাদির কথাও তাঁদের ভাবতে হয়! আমি আর কথা বাড়াইনি। বরং বলা যায় মুখে আর কথা জোগায় নি!

এক সময় সুভাষদা চলে গেলেন।

* * * * *

অস্বীকার করতে পারি না যে, সুভাষদাকে ঘিরে দলের ভিতরে একটি শক্তিশালী কোটারি গড়ে উঠেছিল '৫৫-'৫৬ সাল থেকেই। এঁরাই ছিলেন দলের নেতৃত্বের কাছে সব

সময়েই প্রিয়পাত্র অর্থাৎ ব্লু-আইড বয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুভাষদা পালন করতেন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব (যেমন আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব)। দীপেনদা বহন করতেন রাজ্যের দায়, জনসংযোগে ছিলেন সর্বত্রসঞ্চারী সুহৃদ। প্রশ্নহীন মিত্রতায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৃষক-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কীর্তিমান কথাকার দেবেশ রায়। অমিতাভ দাশগুপ্তেরও ব্যক্তিগত আনুগত্য পেয়েছিলেন দীপেনদা। এঁরা সকলেই স্ব স্ব রচনায় কমবেশি ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ। ভাষণে ও আলাপচারিতায়ও সেই স্বরের বিচ্যুতি ঘটেনি। তবে বাস্তবে এঁরা পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ ষাটের দশকের কবি' সাহিত্যিকদের বাম-বৈরিতা থেকে দল-বিরোধিতায় উৎসাহই যুগিয়ে গিয়েছেন সুকৌশলে। নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসীদের দিয়েছেন তোল্লাই। কালক্রমে দল যেসব ক্রাইসিস অব আইডেনটিটিতে ভুগতে শুরু করে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা দেয় সেই পরিচিতির সংকট। দলীয় নেতৃত্বের আশ্রয়পুষ্ট এই সুবিধাভোগী চক্র ক্ষমতার মোহে, অলজ্জ অসূয়ায়, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জেরে, তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে ফলিত আচরণের বিষমতায় মানবিক আদর্শকেই ভিতর থেকে ফোপরা করে দেয়।

এ সব সত্ত্বেও, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু বাংলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়-ই থেকে গিয়েছেন, থেকে যান আমৃত্যু। ভষ্যিতেও থাকবেন শ্রদ্ধেয়। হ্যাঁ, আগেও বলেছি, আবার বলছি, তাঁর একটি রচনাও মিলবে না যা তাঁর আজন্ম লালিত-পালিত আদর্শের বিরোধী। যতই তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা করা হোক, অবমাননায় রক্তাক্ত করা হোক, আনন্দবাজার- দেশ-যাদবপুর লবি তাঁকে নানা ভাবে ব্যবহার করুক না কেন, তিনি কখনো মানবমুক্তির রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াননি বা সরে আসেন নি।

সেই সুভাষদার একবার সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম আমি 'ধনধান্যে' পত্রিকার জন্য।

* * * * *

হ্যাঁ, দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে তিনি এসেছিলেন। দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি দিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন আগে আগে। জেনেছিলেন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আনতে চেয়েছিলেন শান্তি, মৈত্রী, সংহতি। মানুষের মুক্তি, শোষণ থেকে মুক্তি, সন্ত্রাস থেকে মুক্তি। চোখ ছিল তাঁর ভবিষ্যতের দিকে। ডেকে বলেও ছিলেন—

জয়মণি, স্থির হও!
হে কালবৈশাখি, শান্ত হও।
এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
দেবনার আকাশগঙ্গা।

সেদিন ছিল তাঁর বসবার ছোটো ঘরখানায় বিপুল বিশ্বের আদল। ডা. শরৎ ব্যানার্জী

রোডের পরিচিত ঘরে পা দিয়েই মনে হয়েছিল গোছা গোছা ধানের শীষের মধ্যে সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। যে হিরণ্যগর্ভ দিন আসছিল মাথায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে তার সেই বলিষ্ঠ হাত-দুখানা দেখতে পাচ্ছিল সেই দিন। আর, তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, ভরিয়ে দিচ্ছিলেন ভালোবাসার সুর, যে সুরে এক হয়ে যায় দেশ আর মা। মা আর দেশ।

ঘরের ভিতরে সেদিন আমরা দুজন। মুখোমুখি। পরনে ছিল তাঁর পরিচিত চেক লুঙ্গি, মুখে পাইপ। মাঝে মাঝে হাত বোলাচ্ছিলেন বাবুইপাখির বাসায়। তাঁর চুল, কবির কথায় বাবুই পাখির বাসা।

কিছু টুকিটাকি কথা হবার পরে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর ছেলেবেলার কথা, বুঝতে চেয়েছিলাম তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রভাব কিছু ছিল কি না।

মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে ছিলেন পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফিরে গিয়েছিলেন ফেলে আসা দিনগুলোয়। স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গিতে থেমে থেমে কথা বলতে শুরু করেছিলেন তিনি। —কবে জন্মেছি জানো? ১৯১৯-এর ১২ ফেব্রুয়ারি। মাঘসংক্রান্তির দিনে, কৃষ্ণনগরে, মামাবাড়িতে। বাবা মারা যান অনেক কাল আগে, মা-ও আমার গত হয়েছেন। বাবা ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর যা রোজগার ছিল, তাতে কোনাদিনই সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। টানাটানি লেগে থাকতো। এমনকি তিনি যখন মারা যান তখনও ভাঁড়ার ছিল ফাঁকা। তবে একটা জিনিস রেখে গিয়েছিলেন বাবা, তা হল সততা। মা যামিনী দেবী।

—তিনি কেমন ছিলেন?

—আমার মা খুব ভালো কথা বলতে পারতেন। তাঁর হৃদয়ও ছিল খুব বড়ো। আর এই মা, আমার মায়ের হৃদয়, বাবার বুদ্ধি হল আমার সাহিত্যের ভিত্।

—বাবা কেমন ছিলেন?

—বাবা ছিলেন বেশ কড়া ধাতের মানুষ। সততা ছিল তাঁর চরিত্রের জোর।

—আর মা?

—তিনি দিতেন আমাকে আস্কারা। বলতেন, রোদে জলে না বেরুলে শক্ত হবি কী করে? মা ছিলেন আমার সত্যিসত্যিই বেশ সাহসী, বেপরোয়াও।

—মা, বাবা ছাড়া আপনার ওপর আর কারও প্রভাব পড়েছিল কি?

—হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদার প্রভাব। রোজ ভোরবেলায় তিনি গীতা পড়তেন, মন্ত্র আওড়াতেন। তুলসীদাসের দোহা পড়েও বুঝিয়ে দিতেন।

—মানুষের প্রতি আপনার এত ভালোবাসা কীভাবে আসে?

—আমার মা ছিলেন খুব মানুষপ্রিয়। তাঁর কাছেই প্রথম শিখি মানুষকে ভালোবাসতে।

—আপনার ছেলেবেলা কীভাবে কাটে?

—আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে লেখাপড়া ছাড়াও গান-বাজনা আবৃত্তি আর খেলাধুলোর ভেতর দিয়ে। সাঁতার কাটা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলাও ছিল রোজকার ব্যাপার। জীবনকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, গাছপালা নদনদী ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা এবং

তা থেকে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। এ সবের মূলেও ছিলেন আমার মা। আমার ভালোবাসার মা।

—লেখাপড়া কোথায় করেন?

—প্রথম লেখাপড়া নওগাঁর মাইনর স্কুলে। তারপর কলকাতায় আমি এগারো বছর বয়সে, ১৯৩০-এ, মেট্রোপলিটান, সত্যভামা, মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনেও পড়ি। মিত্র থেকেই ম্যাট্রিক দি ১৯৩৭-এ। আই. এ. পাশ করি আশুতোষ কলেজ থেকে, বি. এ. স্কটিশচার্চ। গ্রাজুয়েট হবার পরে এম. এ. তে ভর্তি হই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। রাজনীতিতে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ি।

মনে আছে, মাঝে মাঝে আমরা একটু দম নিতাম। কিছুক্ষণ থামতেন সুভাষদা। এই ফাঁকে চা এসেছিল। দুধ ছাড়া চা খেতেন কবি। মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়া কথাও হয়।

—আচ্ছা সুভাষদা, একটু জীবিকার কথা বলবেন?

—আগে একটা প্রকাশন সংস্থায় কয়েক মাসের জন্য আংশিক সময়ের চাকরি করেছিলাম। বেশিদিন টেকেনি সেই কাজ। তারপর লেখাটাই ছিল একমাত্র জীবিকা। সামান্যই পেতাম, তাও অনিয়মিত। সে সময় থাকি আমি বজবজে। পরে কলকাতায় এসে কিছু দিনের জন্য এক ঘন্টা করে সম্পাদনার কাজ করতাম সিগনেট প্রেসে। এ ক্ষেত্রেও জুটত সামান্য। কিন্তু তাও রইল না। থাকলো শুধু বই লেখা আর অনুবাদের কাজ। বেশ কিছুকাল করবার পরে আর ভালো লাগলো না সেই কাজও— ছেড়ে দিলাম। আবার এলাম পুরোপুরি লেখাতে। এর পর বছরখানেক করলাম 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনা। এক সময় কাগজটার আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যায়। সময়টা ১৯৬২-৬৩।

সত্যি কথা বলতে কি, বরাবরই আমাকে স্ট্রাগ্‌ল করতে হয়েছে। আর বরাবরই চেষ্টা করেছি কোনো বাঁধা চাকরি না করে স্বাধীনভাবে থাকার। পুরনো বইয়ে রয়্যালটি কিছু পাই। তা ছাড়া রোজগারের মধ্যে বিদেশ থেকে পাওয়া কিছু অর্থ। অর্থাৎ নানান দেশে আমার যে সব লেখা অনুবাদিত হচ্ছে তার থেকে আসে যেমন কিছু, তেমনি বিদেশে কখনো বেতারে কথা বলেও কিছু কিছু এসে যায় আমার হাতে। প্রসঙ্গত বলি, 'ডাক বাংলার ডায়েরি'টা আবার দ্বিতীয় পর্বে শুরু করছি আনন্দবাজারে।

তবে একটা কথা মনে রেখো, জীবিকার জন্য আজ পর্যন্ত আমি এমন কিছু করিনি যাতে লজ্জা পেতে পারি বা আদর্শকে বাঁধা দিতে হয়। নাহ্, এ ব্যাপারে কোনোদিনই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিনি। ফলে, আর্থিক সচ্ছলতা আমার যেমন কোনোদিন ছিল না, তেমনি আজো নেই। খুব টেনেটুনেই চলে আমাদের সংসার।

—কাব্যজীবন নিয়ে কিছু বলুন।

—আমার কাব্যজীবন বলতে ঠিক কিছু নেই। তা ছাড়া, কবিতা দিয়ে আমার লেখালেখির শুরুটা নয়। আমি গদ্য দিয়ে লেখা শুরু করি। তখন ক্লাশ সেভেন-এর ছাত্র আমি। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছিলাম। 'ঝরা ফুল'। তারও আগে লিখেছি 'চিত্রকর'। দুটো লেখাই গল্পের মতো।

কবিতা লিখতে শুরু করি পরে, বন্ধুদের তাগিদেই। তারপর চলল কবিতাই। শেষে কবিতা লিখতে লিখতে গদ্য লেখা ভুলেই গেলাম। অনেক পরে গদ্য লিখতে শুরু করি ১৯৪২-এ, জনযুদ্ধের সময়ে। পদ্যের ব্যাপারে যেমন মাষ্টারমশাই কবিশেখর কালিদাস রয়ের সাহায্য পেয়েছি তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাহায্য করেন শ্রমিকনেতা গল্পকার সোমনাথ লাহিড়ী।

প্রথম থেকেই আমি সাধারণ পাঠকের স্বীকৃতি পেয়েছি। ভালোবাসাও। তবে 'মে দিনের কবিতা'-ই প্রথম কিছুটা সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এটি বেরোয় প্রথম 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবাসরীয়তে। তখন সম্পাদনা করতেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তারপর 'চীন-১৯৩৮' ছাপা হয় 'আনন্দবাজারে'। এবং এটাই সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল।

—উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন কেন, এতে কি আপনার জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে বেড়েছে?

—আগেই বলেছি, গদ্য দিয়েই আমার লেখালিখি শুরু। আর উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার ছিল সেই ১৯৪৬-৪৭-এর সময় থেকে। এর কারণ হয়তো কবিতার সীমাবদ্ধতা। সব কথা কবিতায় বলে ওঠা সম্ভব নয়। আমি তো নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, নানা পেশার, নানা মাপের ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-বেকারেরও। তাদের কথাই বলতে চেয়েছি উপন্যাসে। আমাকে কেউ ঠিক ঔপন্যাসিক বলে স্বীকার করতে চায় না।

—গদ্য সম্পর্কে আপনার মন্তব্য পেলে ভালো হয়।

—বাংলা সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করবে তার গদ্যশক্তির ওপর। বাংলাভাষাকে এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হবে যার ফলে তার ভেতর দিয়ে সবকিছু জানা আর প্রকাশ করা যায়।

—আচ্ছা সুভাষদা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার কবিতার সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী কবিতার কি কোনো পার্থক্য আপনার কাছে ধরা পড়ে?

—আগেকার কবিতায় বাইরের জগতটাই বড়ো করে ধরা পড়তো, যুদ্ধ-পরবর্তী কবিরা অন্তর্জগতেই প্রাধান্য দিলেন। দ্বিতীয়ত, শব্দ-ছন্দ-ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে যুদ্ধ পরবর্তী কবিরা অনেক বেশি দক্ষ। তবে, আগেকার লেখায় অনেক বেশি প্রাণ ছিল, আর এটার অভাব খানিকটা দেখতে পাই এখনকার কবিতায়।

* * * * *

ন্যাশনাল বুক ট্রস্ট অফ্ ইন্ডিয়ার অনুরোধে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৩-এ। তার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "স্বাধীনতার পঁচিশ বছরের কথা মনে রেখে এমনভাবে কবিতা বাছাই করার চেষ্টা করেছি যাতে বিশেষ করে বাংলার দেশকালের একটা গতিময় বহুবর্ণ ছবি ফুটে ওঠে।" এই সংকলনে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, মনীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, নীরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ যে-৩৪ জন কবির কবিতা তিনি নিয়েছিলেন, তার মধ্যে আমার

লেখা 'সমুদ্র-মহিষ'কেও জায়গা দিয়েছিলেন। সেই সময়ে আমি বার্লিনে। তা সত্ত্বেও, এ এক আশ্চর্য স্বীকৃতি বইকি।

* * * * *

সুভাষদাকে নিয়ে আরো অনেক কথাই হয়তো বলা যেতে পারতো। কিন্তু থামতেও হয় এক সময়। ব্যক্তি-সুভাষকে নিয়ে অনেকেই কটুকাটব্য মন্তব্য করেছেন তাঁর জীবনের অপরাহ্ন বেলায়, কিন্তু তাঁর রচনা থেকে একটি লাইনও কেউ দেখাতে পারবেন না যা আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্র, মানবতাবিরোধী। যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন চল্লিশের দশকে, সময়ের দাবিতে তার ধার হয়তো কখনো কমেছে, কখনো বেড়েছে, কখনে বক্তব্য উপস্থাপনে তির্যকতাও এসেছে, কিন্তু তিনি মানুষের কথাই বলেছেন বরাবর। মানুষের সঙ্গেই থেকেছেন আমরণ। অবশ্য আমার স্মৃতিতে, ব্যক্তিগত সমীকরণে, তিনি ছিলেন কখনো খরা, কখনো বর্ষা।

ঘরোয়া মুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যাসম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং পরিবারের অন্যান্যরা

সুভাষদাকে যেমন দেখেছি

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৮ সাল থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আকাদেমি পুরস্কার পেলেন ১৯৬৪ সালে। বলতে গেলে ঐ 'যতদূরেই যাই' পড়েই আমার মুগ্ধতা শুরু। 'মিছিলের মুখ' নাড়া দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু 'আমি যতদূরেই যাই/আমার সঙ্গে যায় ঢেউয়ের মালা গাঁথা/এক নদীর নাম' 'কাল মধুমাস', 'রুংরুট', 'ছেলে গেছে বনে', যত পড়ি ভাবি কবিতা এমন হয়? দজ্জাল শাশুড়ি বউকে মনে মনে ধমকাতে ধমকাতে যেভাবে জপের মালার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন কখনও থামিয়ে কখনও গলা টিপে, কখনও কাঁথা সেলাই করতে করতে 'শাশুড়ি এফোঁড় ওফোঁড়' হয়ে যায়, গদ্যের গল্প বলার ঢং চিত্রকল্পের মালা বিছিয়ে কখন কবিতা হয়ে গেছে বোঝা যায় না। এর মধ্যে আবছা রহস্য নেই। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা আমরা বুড়োধাড়িরা রূপকথার গল্প শোনার মত নিবিষ্ট হয়ে শুনি, অন্য রাজনৈতিক কবিদের সঙ্গে এখানে তাঁর তফাত, এখানেও তাঁর জিত, স্লোগান থেকে বেরিয়ে এসে যে-কবিতা পাঠককে ক্রমশঃ নির্ভুলভাবে তীরবিদ্ধ করে চোখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিছিয়ে দেয়।

'হেরেছি? তাতে কী?/কখনও যায় না শীত/ এক মাঘে। আছে লড়াইয়ে হারজিত'।

কিন্তু সুভাষদার কবিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক গুণিজন আছেন, আমি কিভাবে প্রথম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই তা জানার জন্যই এই মুখবন্ধ। ১৯৬৪-৬৭ এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছি। সে সময়কার কেনা বইগুলো এখনও আমার কাছে আছে। সেই কবিকে চাক্ষুষ দেখে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দাক্ষিণ্যে। তখন শক্তি ও সুভাষদা দুজনেই ক্ল্যারিয়ন-মেকান বিজ্ঞাপন অফিসে বিজ্ঞাপনের কপি লেখার কাজ করতেন। রাসবিহারি এভিনিউর দেশপ্রিয় পার্কের সামনে সেদিন শক্তি দেখা করতে বলেছিল, অপেক্ষা করছিলাম, আমাকে চমকে দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে হাজির। তখন ওখানে কাফে-ডি-মণিকো নামে একটা রেস্তোঁরা ছিল। সেখানে চা খেতে খেতে আলাপ হল। আমি লজ্জা সঙ্কোচে আর আনন্দের আতিশয্যে জড়সড়। কেমন করে জানাবো ওঁর কবিতা আমার প্রায় নিত্যপাঠ্য! পরে দেখলাম মানুষটি তাঁর কবিতার মতই সহজ সরল স্নেহময়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতই তিনি বলতে পারেন

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।'

কবিতার কথা বাদ দিয়ে আমার সম্বন্ধেই বেশি খবরাখবর নিতে লাগলেন। বারবার করে বাড়ি যেতে বলেছিলেন, শক্তির সঙ্গে একদিন গেলাম। গীতাদির সঙ্গে আলাপ হল, পুপেকে দেখলাম তখনও তোতা—পাপু আসেনি, আর ছিল বাড়িভর্তি কুকুর

 Vol. IV Issue-VIII / ISSN : 2394-4889

বেড়াল-গাছপালা-বই। সর্বদাই অতিথি। কে অতিথি আর কে গৃহস্থ বোঝা যেত না একটা মেলা মেলা ভাব—আমার চেনা কোনো বাড়ির সঙ্গে মিল নেই, অথচ মনে হল এ বাড়িটা আমার সবচেয়ে আপন। সুভাষদা, গীতাদির স্নেহের পাত্র ছিল শক্তি, তাঁদের স্নেহ-প্রশ্রয় পেয়েছি বিপদে সম্পদে—সুভাষদা আমার বিয়েতে এসেছেন সবার আগে বিকেল বেলা, সবার আগে আমার মেয়ে দেখতে এসেছেন মেডিকেল কলেজে, আমার ছেলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তার সুভাষজেঠু। বেলেঘাটার বাড়ি দেখতে এসে সারাদিন কাটিয়ে গেছেন, আমার মেয়ের বিয়ের দিন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে এসেছেন সপরিবারে দুপুরবেলা — আশীর্বাদীর সঙ্গে দু'লাইনের কবিতা— 'এবার খেলার ভূগোলে/তিতি জিতবে দু'গোলে।' বারবার টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া আর বিকলাই-এর দাপটে আমি যখন শয্যাশায়ী, সুভাষদা, গীতাদি এসেছেন সঙ্গে এনেছেন, হাফিজের কবিতার বই, ছবি এঁকে সস্নেহে উপহার দিয়ে কবিতা শুনিয়েছেন বসে বসে, শক্তি তখন কলকাতা ছাড়া। শুধু একবারই তিনি আসতে পারেননি, তাঁর পরম প্রিয় অনুজপ্রতিম শক্তি চলে যাবার পরদিন যখন সকালবেলা সকলে তাকে দেখার জন্য আমার বাড়িতে ভিড় করেছিল—গীতাদিকে তিনি পাঠিয়ছিলেন আমাকে দেখার জন্য। তিনি ছিলেন আমার পরমাত্মীয়। এই বিয়োগ বেদনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে স্মৃতিকথা লেখা যায় না। কথাগুলোকে নিজের পায়ের উপরে দাঁড় করাবার যে পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল তা তো আমার আয়ত্বে নেই।

পার্কসার্কাসে থাকাকালীন যাতায়াত ছিল অনেক বেশি। সুভাষদা-গীতাদির জন্মদিন, বিয়ের দিন... সুভাষদা আবার তিনটে জন্মদিন মানতেন, খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ অর্থাৎ একটা ফসকে গেলে আরেকটা। অনুষ্ঠানের অভাব হত না, বাংলাদেশ থেকে এল কবি অমিতাভ সোহেল, তাকে নিয়ে গেলাম আলাপ করাতে, দেখি সে সুভাষদার বাড়ির লোক হয়ে গেল, আমাদেরই মাঝে মধ্যে ওখানে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের লোক সুধাদি, তার বয়স হয়েছে। চলে যাবে—হল তার 'ফেয়ারওয়েল' উৎসব। এল নানা উপহার সবার কাছ থেকে, তার 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের' ব্যবস্থা করা হয়েছে শুনলাম। আদর্শ তাঁর মুখের কথা ছিল না, তাকে একটানে তিনি জীবনে সামিল করতে জানতেন। সুভাষদার কবিতাই আবার মনে পড়ে—

ওরা ভেবেছিল আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।
আমরা দাঁড়ালাম
ভাঙাকে জোড়া দেওয়া এই সুদূরপ্রসারী মিছিলে
ওরা ভেবেছিল আমাদের কিছুই থাকল না
মুঠো করতেই খালি হাতগুলো আমাদের ভরে গেল।

সুভাষদা খেতে ভালোবাসতেন, তার চেয়েও লোকজন ডেকে খাওয়া দাওয়া নিয়ে হৈ-চৈ করতে ভালোবাসতেন, এবিষয়ে শক্তির সঙ্গে ওঁর মিল ছিল, আরও মিল ছিল যে কোনো মানুষকে একবাক্যে 'খুব ভালো লোক' বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া। আমি আর গীতাদি কত যে হেসেছি একসঙ্গে। সুভাষদা মাছ ভালোবাসেন, মাংসও-সস্তা বলে গোমাংসের

কাবাবও তাঁর প্রিয় খাদ্যের তালিকায় ছিল। জন্মদিনে ফুল নিয়ে গেলেও গীতাদিকে দিতাম-সুভাষদাকে নয়; বলতাম ফুলকে দিয়ে মানুষ মিথ্যে বলায় বলে ও তো আপনার প্রিয় নয়। গীতিদি অবশ্য বরাবরই বলতেন ওটা কবিতার চমক। মনের কথা নয়, উনি খুবই ফুল ভালোবাসেন। জন্মদিনে সুভাষদার জন্য কি নেবো ভেবে একবার শক্তিকে বললাম ঐ বড়মাংসই এনে দিতে। সুভাষদা ভালোবাসেন যেহেতু ওটা রেঁধে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই আর। শক্তির অনেক অনুনয় ওজরেও যাতে রাজি হই নি আগে,—এবারে আমার মুখেই সেকথা শুনে ও যেমন খুশি তেমন অবাক, হতবাকই হয়ে গেল ও শেষ পর্যন্ত।

যখনই যেতাম সকাল/বিকেল/সন্ধ্যে; বাড়ি থাকলে সর্বদাই দেখতাম ইজিচেয়ারে বসে সুভাষদা হয় পড়ছেন নয় লিখছেন নয় গলির ওপরে সুরু একফালি আকাশ দেখছেন মন দিয়ে। মানুষজন গেলে সঙ্গে সঙ্গে লেখা নামিয়ে রাখতেন—তাঁর কাছে আগে মানুষ, পরে কবিতা। আগে জীবন, পরে সাহিত্য। কবিতা এক একজন মানুষের কাছে ভিন্ন বাণী বহন করে আনে কেন, কেন একই কবিতার নানারকম ব্যাখ্যা হয় একদিন জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছে। বলেছিলেন—'দ্যাখো তোমাকে একটা টাকা দেওয়া হল তা দিয়ে তুমি সন্দেশ না চানাচুর না ফুচকা খাবে সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি ঘুরেও আসতে পারো। যতদূর এতে যাওয়া যায় আবার খরচ না করে তুলেও রাখতে পারো। মোটামুটি তুমি তোমার নিজস্বভাবে একে উপভোগ করবে অথবা করবে না। আজও আমার কাছে এটাই সবচেয়ে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা। যে কোন কঠিন বিষয় সহজ হয়ে যেত তাঁর সঙ্গে কথা বললে। মনে ছিল অফুরন্ত স্নেহ, সেই দানে পাত্রাপাত্র ভেদ ছিল না, কার্পণ্য ছিল না। দিনের আলো বাতাস আমরা সহজে পাই তাই তার সঠিক মূল্য বুঝতে পারি না—অভাব হলে দমবন্ধ হয়ে যায়। প্রাণভরা ভালোবাসা বিলিয়ে দেবার জন্য, শিক্ষার আধার হয়ে তাকে অন্যের মনে সঞ্চার করার জন্য এই পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থেকেছেন। আমরা আর কতবার তাঁকে সঙ্গ দিয়ে যেতে পেরেছি! কোনোদিন কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি শেষের সেই কঠিন দিনগুলোতেও; যতবার গেছি ছেলেকে, মেয়েকে-জামাইকে-নাতিকে দেখে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে তাঁর ক্লিষ্ট মুখ। জামাই-এর বিষয় কম্পিউটার জেনে নানাবিধ প্রশ্ন করেছেন সে লিখে জবাব দিয়েছে। নাতি কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নিজের মনে কত কি বলছিলো, শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলেন যেন—গীতাদির দিকে চেয়ে মৃদুতর স্বরে বললেন—অনেকটা শক্তির মতো, তাই না? এবারের সরস্বতী পুজোয় জোর করে অসুবিধা সত্ত্বেও অসুস্থ গীতাদি এই বয়সেও রেঁধে খাইয়ে ছেড়েছেন। খাবার পরে রসিকতা করে বলেছেন সুভাষদা 'থ্যাঙ্কিউ গীতা, চমৎকার খাওয়ালে।'

সুভাষদার বাসে চড়ে মস্কোর দিকে এগিয়ে যাবার গল্প অনেকেই জানেন। একবার আমরা গড়িয়াহাটের রাস্তা থেকে ট্যাক্সিতে তাঁকে ডেকে নিলাম ধর্মতলা যাবেন জেনে, নামমাত্র কাঁধে একটা ঝোলা, নামার সময় কোথায় যাবেন জানতে চাইলে বললেন—'একটু

মস্কো যেতে হবে—এই তো দমদমের বাস এসে গেছে!' নানারকম কলকব্জা কিনতে ভালোবাসতেন সময়ের সাশ্রয় হবে বলে! সোডা বানাবার কল, মাছের আঁশ ছাড়াবার যন্ত্র, আরও কতরকম টুকিটাকি বিদেশ ফেরত নিয়ে আসতেন। হুঁকো-পাইপের সংমিশ্রণে খেতেন হুকাম পাইপ। ঘর জঞ্জালে ভরে যেত গীতাদি রাগ করতেন। একবার আঁশ ছাড়াবার কল আর ট্রাউট ধরার ছিপ দিয়েই দিলেন আমাকে আর বঁড়শির নানা সরঞ্জামের অভাব ছিল না। শক্তিও মাছ ধরার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল খুবই। তবে আমার ছেলে ছিল ওঁর একনিষ্ঠ সঙ্গী। একবারই মাত্র সারাদিন বসে থাকার পর সন্ধ্যের মুখে একটা ফলুই মাছ ধরতে দেখেছি। ওঁদের ছিপে মাছ উঠতে আমি বিশেষ দেখিনি বললেই চলে। এ ব্যাপারে একটি কমিকট্র্যাজেডি ঘটনার উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সম্ভবত ১৯৮৩ সালে ভূপালে ভারতভবন উদ্বোধন উপলক্ষে কলকাতা থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমন্ত্রিত। তিন চারদিন ধরে কবিতা, নাটক, শিল্পকলার বিরাট কর্মশালা। কবিতা পাঠ, আলোচনা, তর্কবিতর্ক সব কিছু হল। মঞ্চে মূল মাতৃভাষায় যে কবিতা পাঠ করবেন কবিরা তার হিন্দী অনুবাদও পাঠের ব্যবস্থা ছিল। সেদিন হিন্দীভাষী কবিরা কবিতাগুলি মিলিয়ে নেবার জন্য যখন হোটেলে এলেন দেখা গেল মাত্র এই দু'জন বাঙ্গালী কবি তাঁদের লেখা নিয়ে যাননি-এ সমস্যা সারা ভারতের আর কোন কবির ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। সুভাষদা মধ্যপ্রদেশের কোনো শহরে তাঁর এক ভক্তের কাছ থেকে ফোনে শুনে কবিতাগুলি লিখে নেবার ব্যবস্থা করছেন আর উপহার দেবার জন্য আমি কয়েকটি শক্তির কবিতার এই নিয়ে গেছিলাম। শক্তি অনুবাদ শুনতে চেয়ে পছন্দ হয়নি বলে ঐ বই থেকে ছোট কয়েকটি কবিতা বেছে নিয়ে বেচারিকে সামনে বসিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিলেন। নিজেদের লেখার প্রতি এই অমনোযোগের ক্ষেত্রেও ওঁদের মিল লক্ষ্য করবার মতো।

এরপর কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে সুভাষদা আর আমরা তিনজন অর্থাৎ আমিও আমার শিশুপুত্র পাঁচমারি বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে পঞ্চবটীতে অর্থাৎ পাঁচটি আলাদা গেস্টহাউস ছিল একই সীমানার মধ্যে, তার মধ্যে একটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুভাষদা আমার ছেলের সঙ্গেই জমে গেলেন বেশি। ওর অঙ্ক করার সময়সংক্ষেপে করার জন্য মস্কো থেকে পাওয়া ক্যালকুলেটর লাগানো হাতঘড়িটা ওর হাতেই ছেড়ে দিলেন। ক্যাসেটের মাপে ছোট্ট টেপরেকর্ডার দিয়ে ওকে ইচ্ছেমত চালাতে দিলেন। আমি আঁতকে উঠে— 'এত দামি জিনিস ওইটুকু ছেলেকে দিয়ে নষ্ট করছেন কেন!' একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন 'কি যে বল, কানে ভালো শুনি না।' প্রায়ই দেখতাম দু'জনের ফিসফাস, আলাদা বেড়াতে যায় আমাদের ডাকে না, ফেরে কোঁচড়ভর্তি আমলকি নিয়ে। একদিন ওদের পরামর্শ শুনে ফেললাম এগুলি নিয়ে কলকাতায় বাজারে বসে ওরা দু'জনে বিক্রী করবে। কিন্তু কথাটা কিছুতেই মা-বাবাকে যাতে বলা না হয় সুভাষদা তাতারকে সাবধান করছেন। এই সেদিনও লিখে কথাটা মনে করিয়ে দিতে সেই শিশুর মতো হাসিতে মুখটা ভরে গেল। বলতাম কত কি এদিক ওদিক দেখার আছে ভোজরাজ মন্দির পাণ্ডব গুহা, ভীমবেটকা সেসব না গিয়ে

এখানে সেখানে ঘোরেন কেন? বলতেন—স্থাপত্যকীর্তি বা জড়বস্তু দেখার চেয়ে মানুষ দেখেই বেশি আনন্দ পাই যে।

একদিন শক্তি আর সুভাষদা পাঁচমারির বড় দিঘিতে মাছ ধরতে গেলেন, সুভাষদা বেড়াতে গেলে মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়েই তখন বেরোতেন, কে জানে কোথায় কি মিলে যায়। ওঁরা বেরোবার সময় বারবার বলে গেলেন, রান্না না করতে, মাছ ধরে আনলে তারই ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া হবে। অত মাছ কি হবে সেই চিন্তাও করছিলেন দুজনে। আমি তো আমার কর্তব্য জানতাম—যথারীতি ডিমের ঝোল, ভাত বানিয়ে তাতারকে খাইয়ে দিলাম—ওকে বেরোতে দিইনি সুভাষদার ইচ্ছা আর ওর বায়না সত্ত্বেও। বেলা দুপুরে রোদে কালো হয়ে ফিরে চান করেই দুজনে খেতে চাইলেন, আমি জানালাম কথা তো ছিল মাছ এলে রান্না হবে, মাছ কই? কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর সুভাষদা বললেন আর মাছ? জেলে যে যেতে হয়নি এই যথেষ্ট—শক্তির মাথা যা গরম! শক্তি আবারও রেগে কিছু বলতে লাগল তারপর আবার—'ভাত কই? খেতে খেতে অনেক জেরার পর জানা গেল, অতবড় দিঘিতে মাছ উঠছে না, একটা লোক এসে ওদের বললো—ভূতে খেয়ে গেছে গতকাল সব মাছ। ভূত তাড়াবার মন্ত্রও নাকি শেখাতে চাইছিলো। ইতিমধ্যে লাঠি হাতে দু'জন কনষ্টেবল এসে তাঁদের মাছ ধরতে বসার জন্য থানায় নিয়ে যেতে চায়। ওখানে একটা লেখাও সে দেখালো 'মছলি পকাড়না মানা হ্যায়'। মাছ ধরতে না পারলেও ছিপ নিয়ে বসাটাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শক্তি তার সঙ্গে ধমকাধমকি করে বলেছে। 'হামলোগ কলাকার হ্যায়'—পুলিশ কঠোরতর—'চোরি করকে মছলি পকাড়না কলকারকা কাম নেহি হ্যায়'। সুভাষদা তাঁর মিষ্টি কথায়—সরকারি অতিথি—পঞ্চবটিতে উঠেছি হিন্দী লেখা বুঝতে পারিনি এইসব বলে তাকে শান্ত করেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

সুভাষদার বাড়িতে জমায়েতে বেশিরভাগ সময়েই হাজির থাকতো সুভাষদার ভাইপো পুনপুন আর ভাইঝি তানি—তানিয়া। চমৎকার গান গাইতো পুনপুন, চেহারায় ছিল সুভাষদার আদল। ওর মুখেই শুনেছিলাম বহুকাল আগে সুভাষদার লেখা 'কেউ দেয়নি উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ'—কবিতার গান। আরও শুনেছিলাম ওদের বাবা-মার বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। সুভাষদার দাদা বৌদির বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিয়ে, সেই সময়কার বিধানে রীতিমত অসামাজিক কাজ। সেই নবদম্পতির অবস্থাবিপাক। তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে ঐ কবিতাটি লিখিয়েছিল। পুনপুন ছিল সুভাষদার অত্যন্ত স্নেহস্পদ পাত্র, কিন্তু প্রায় পনেরো বছর আগে শান্তিনিকেতনে স্ত্রী-পুত্রের কাছে যাবার ব্যস্ততায় পথে রেল দুর্ঘটনায় বড় মর্মান্তিকভাবে মারা যায় সে। গভীররাতে গীতাদি ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে খবরটা দিলেন শক্তিকে। তাকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আনার জন্য যতটা দ্রুত ব্যবস্থা করা যায় করা হয়েছিল। খুব চুপচাপ হয়ে গেছিলেন তারপর। ঠিক মনে পড়ছেনা "এখন উঠেছে কি যে হাওয়া/পরে এসে আগে চলে যাওয়া' কবিতাটি সেই সময়কার লেখা কিনা।

প্রায়ই কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে এধার ওধার চলে যেতেন সাধারণ মানুষদের কাছে থাকতেন, এমনকি আমাদের বাড়ি এসেও কাটিয়ে গেছেন দু/একটা রাত। তাতারের সঙ্গে

বসে দাবা খেলেছেন, স্ক্র্যাবল খেলেছেন গভীর মনোযোগে, ছোটো বলে একটু অমনোযোগ ছিলনা খেলাতে। বলতেন 'দ্যাখো ও এত ভালো খেলছে, আমার ভয় হচ্ছিল হয়তো হেরে যাবো, তাই ভুল করলেও ধরিয়ে দিচ্ছিলাম না।' বলেই তাঁর বিখ্যাত হাসিটা হাসতেন। মেয়ের কাছে কবিতা আর গান শুনতেন, আমার মেয়ে গীতাদির 'সুশিক্ষণ' স্কুলে চার বছর পড়ে প্রতিবার 'সেরা মেয়ে'র পুরস্কার পেতো। ওকে ওঁরা খুবই ভালোবাসতেন। কোন লেখা ভালো লাগে—বড়দের সঙ্গে যেভাবে লোকে আলোচনা করে করতেন। একদিন রাতে সুভাষদার খাবার কথা, তাও শক্তি ফেরেনি, আমার সব লজ্জাসঙ্কোচকে কাটিয়ে সুভাষদা তাঁর নবপ্রকাশিত 'হাংরাস' কেমন লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে বারবার নতুন লেখকের মতো গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন। এই যে সাধারণ মানুষের বোধকে মূল্য দেওয়া তাকে নিজের উচ্চতার কাছাকাছি বসতে দিয়ে আপন করে নেওয়া এই গুণেই তিনি আপামর মানুষের কাছের লোক হয়েছিলেন। তাঁর কাছে সাহিত্য মানুষের চেয়ে প্রিয় ছিল না। কবিতা জীবন বোঝার, নাড়া দেবার অস্ত্র ছিল। পদ্য এবং গদ্যে বারবার আঙ্গিক বা প্রসাধন পালটে তাকে আরো আকর্ষক করে তুলেছিলেন। তির্যক ভঙ্গি ক্রমশঃ গূঢ় আর গম্ভীর সহজ হয়ে এসে যেন পরম মমতায় মানুষের কপালে হাত বুলিয়েছে তাঁর লেখা। এই কৃতিত্ব তিনি সাধারণ মানুষকেই দিয়েছেন—। "আমার লেখায় আমি দেখেছি, যে জায়গাটা লোকে খুব প্রশংসা করে 'এটা দারুণ লিখেছো' সে সব জায়গা আমি দেখেছি আসলে আমার নয়। অন্যের কথা সাধারণ মানুষের কথা। আমি মেরে দিয়েছি।" সেই প্রথম যুগের কবিতায় লিখেছিলেন 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গরু খোঁজা করে।"

কি বিষয়ে যে তাঁর আগ্রহ ছিল না বলা মুশকিল—ভারী প্রবন্ধ, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাংলা হরফের সরলীকরণ—রোমান হরফে বাংলা লিখে অবাঙালীদের কাছে বাংলা ভাষার প্রসার এই সব কিছু নিয়েই খুব সহজবোধ্য ভাষার তিনি লিখে যেতেন শেষ দিন পর্যন্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষদার বন্ধুত্বের কথা অবশ্য সবারই জানা। হেমন্ত এবং শক্তি দুজনেই যে একই গ্রামের, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ু গ্রামের ছেলে সে কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মারা যাবার মাস ছয়েক আগে বহড়ু গ্রামের পক্ষ থেকে ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সুভাষদাও নিমন্ত্রিত ছিলেন। যাবার পথে আমি ছিলাম ওঁদের গাড়িতে। সুভাষদা হঠাৎ বললেন—'আচ্ছা হেমন্ত তুমি চুলগুলোকে কালো রং কর কেন? এমনিতেই তোমার গান সকলে মন দিয়ে শোনে।' হেমন্ত উত্তর দিলেন—'দ্যাখো ভাই তোমরা কবিতা লেখো কালিকলমে, পাঠক/পাঠিকা সেই লেখা পড়ে ছাপার অক্ষরে; পড়ার সময় তোমাদের তো দেখতে পায় না তাই একমাথা সাদা চুল থাকলেও তোমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু একমাথা সাদা চুল নিয়ে কমবয়সী ছেলেমেয়ের সামনে প্রেমের গান গাইলে ব্যাপারটা কি ভালো দেখায়?' দুই রসিক বন্ধু সমানে সমান কথায়।

অনেকদিন আগে জীবনানন্দ সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে গিয়ে সুভাষদার পুরোন এত

তীক্ষ্ণ সমালোচনা পড়ে অবাক হয়েছিলাম। অথচ জানতাম জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় কবি। আলোচনায় অনেকবার কবুলও করেছেন সে কথা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম শেষপর্যন্ত কেন তিনি এমন বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন অগ্রজ এক বামপন্থী কবির নির্দেশ ছিল, পার্টিরও তেমন ইচ্ছাই ছিল। তবে নিজের মত ছেড়ে দিয়ে এমন গান্ধারীর মতো তিনি পরবর্তী সময়ে আর পথ চলেননি।

মতবাদসর্বস্বতা তাঁর মানবিকতাকে কখনই আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাই বার বার তিনি নিয়মের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসেছেন—যা ভালো মনে করেছেন তা করার জন্য বলার জন্য দলের নিয়মের তোয়াক্কা করেননি; এভাবে চলতে চলতে ক্রমশ একলা হয়েছেন। নির্জন জগতের বাসিন্দা হয়েছেন কিন্তু বাঁদিকের বুকপকেটটা সামলে চলতে শেখেন নি।

সুভাষদাকে ঠাট্টা করে বলতাম গীতাদিই কি আপনার 'মিছিলের মুখ?' এমনভাবে 'না-না' বলতেন যাতে হ্যাঁ-না দুটোই বোঝায়। গীতাদির একটা নাটকের জন্যই সুভাষদা লিখেছিলেন একটা কবিতা—'লাবণ্য একবার তুমি চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়।" গীতাদিও সুলেখিকা, কিন্তু সংসার সামলাবার মালমশলা যোগাড় করা আর সুভাষদার মতো বিষয় বুদ্ধিহীন মানুষ আর ক্রমবর্ধমান সংসারের চাহিদা তাঁকে লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেয়নি।

রাজনৈতিক জীবনের বিস্মৃতি ছিল মানুষকে ভালোবাসার জন্য কিছু করার সংগঠনে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের অসুস্থতার সময় নামি-অনামি মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে প্রায় একবছর ধরে তাঁর চিকিৎসার সাহায্য করেছিলেন একথা গীতাদির মুখে শুনেছি। সুভাষদা যাবার পরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইঝি মালবিকা চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতি তাড়িত লেখাতেও তার স্বীকৃতি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে এক সন্ধ্যের আড্ডায় সুভাষদার কবিতা টেপ করতে ইচ্ছা হল। কবিতা পড়া থামিয়ে হঠাৎ বললেন—'কল্পনা করতে পারো মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে জল? আমি দেখেছি।' স্মৃতিকথনে জানলাম অনটনক্লিষ্ট মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্রামের জন্য বাইরে থেকে একটু ঘুর আসার জন্য গীতাদি সুভাষদা মিলে পাঁচজনের একটি দল টাকা তুলেছিলেন; স্নেহাংশু আচার্য থেকে বুদ্ধদেব বসুর মতো ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের কাছ থেকে। সংগৃহীত অর্থ হাতে দেবার পর মানিকবাবু কোনো কথাই বলতে পারেন নি, তিনি ভাবতেও পারেননি এরা সত্যিই কথার কথা না বলে টাকা এনে দেবে—সুগভীর আনন্দ আর বেদনায় তাঁর চোখে জল এসেছিল। কথাগুলি বলার পর ওঁর চোখও শুকনো ছিল না।

পুপে বড় হয়ে যাবার পরে হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখলাম তোতা আর পাপু এসেছে। আমরা খুব অবাক হলাম বারবার এভাবে দত্তক নিতে কখনো দেখিনি শুনিওনি। সুভাষদা বললেন—তোমরাও একটি সন্তান দত্তক নাও না? সন্তান থাকলেই বা। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তেমন সব পরিবারেরই কিন্তু উচিত একটি করে ছিন্নমূল শিশুকে সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে এনে তাকে মানুষ করে তোলা। হারিয়ে যাওয়া অনেকগুলি মানুষকে তাহলে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো সমাজকে।—

আমরা স্তম্ভিত, শক্তি শুধু বলতে পারলেন—'আমাদের যে আপনার মত অত সাহস নেই দাদা।' পরবর্তী সময়ে সুভাষদা আরও তিনটি ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিয়ে তাদের বড় করেছেন নিজের বাড়িতে।

সত্যিই সুভাষদার ক্যানভাস এত বড় ছিল যে সাধারণ মানুষের মাপকাঠিতে তাঁর বিচার করা যায় না। রাজনীতির জগতে সাংস্কৃতিক জগতে, সবচেয়ে বড় মাপের মানুষরা ছিলেন তাঁর বন্ধু অথচ মৃত্যুর আগে শেষ ক'বছর তিনি যেভাবে আর্থিক অনটন আর নিঃসঙ্গতায় একা হয়ে যাচ্ছিলেন ক্রমশ তারও তুলনা মেলা ভার। অনটন আগেও ছিল। মাঝেমাঝেই শক্তিকে বলতেন—একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাওনা। আমরা ঠাট্টা ভেবে হাসতাম। চিরকালের স্বাধীন লেখক চাকরি করবেন? আর চাকরি চাইছেন কার কাছে—যার নিজেরই চাকরি সবসময় টালমাটাল!

সারাজীবন ধরে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন সুভাষদা—সর্বোচ্চ জ্ঞানপীঠ থেকে বিদেশী সোভিয়েট ল্যাণ্ড পুরস্কার, অ্যাফ্রোএশীয় লেখক সংগঠনের সম্পাদক। কিন্তু ছোট সংসারটি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে বিশাল হয়ে উঠেছিল তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অশক্ত দুই বৃদ্ধবৃদ্ধা সকলের সাথে সমানভাবে অন্নপান ভাগ করে খেয়েছেন সঞ্চয় করেননি। এমনকি ফিমার বোন ভেঙে যখন তাঁকে পি. জি. হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগাম অর্থ জমা দিতে না পারার জন্য প্রখর গ্রীষ্মের চড়ারোদে দু'ঘণ্টা গাড়িতে অপেক্ষা করার পর তাঁকে ফেরৎ আসতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যে পর্যন্ত আলোবাতাসহীন একটি ঘর বরাদ্দ করলেও গীতাদি সেখানে রাখতে সাহস পায়নি। এও কি ভাবা যায়! তাঁর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের জন্যই তাঁর চিকিৎসা হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কেউই দায়িত্ব নেয়নি। চিরকালই সুভাষদা সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় স্তম্ভে কখনও আলাদা লেখা তৈরী করে অথবা বইয়ের রয়্যালটির টাকায় রোজগার করেছেন। কিন্তু যতদিন গেছে তাঁর কাগজের লেখা বন্ধ হয়েছে রয়্যালটির টাকা কমেছে। বধিরতা তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। আর রোগব্যাধি থাবা ছড়িয়েছে তাঁর শরীরে। শেষ কয়েকবছর নিজের পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি আর দূরত্বের কারণে যাওয়া হোত না। শরীরের দোহাই দেওয়া সাজে না। সঙ্গে যেতেন শক্তির বন্ধু সুভাষদার প্রিয়পাত্র ডঃ শম্ভুলাল বসাক। কখনো আমার ছেলে, মেয়ে। কিন্তু ডঃ বসাক গাছগাছড়ার ভেষজ উপকারিতা নিয়ে বই লিখছেন, সুভাষদা কি যে খুশি, কেবলই নানা প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে। জামাই-এর কাছে কম্পিউটার, ছেলের কাছে আমলকি ছেড়ে অন্য কি ব্যবসা করছে তার খোঁজ আমার কাছে নতুন কিছু লিখছি কিনা সব খবর নিতেন অদম্য উৎসাহে। কবে কোথায় দু'একটা লেখা তাঁর নজরে পড়েছে সেই থেকে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে গেছেন—অলেখককে লেখক বানাবার চেষ্টাও ছিল তাঁর চরিত্রের সঙ্গেই মানানসই। একটা ঝুলি কাঁধে ফেলে যিনি মস্কো রওনা দিতে পারতেন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে একফালি বারান্দায় বসেই তিনি কালাতিপাত করছেন। এদৃশ্য আমাদের দুঃখ দিলেও সুভাষদা সব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন—প্রতিবন্ধকতা তাঁকে অক্ষম করেনি। বসেই

লিখে গেছেন ছোটদের জন্য 'অক্ষরে অক্ষরে' সহজপাঠের নতুন রূপ আর 'ফকিরের আলখাল্লা'র মত অসাধারণ বই।

'দৈব কৃপণ, মেলে না কো কৃপা, বিধাতা বাম/প্রস্তুত চিতা মরণকামড়ে খুঁজি আরাম' কতদিন আগে লিখেছিলেন। মারা যাবার দুদিন আগে পি. জি.-র জরুরী বিভাগে যখন দেখতে গেছিলাম আন্য ওয়ার্ড থেকে আনা হয়েছিল গীতাদিকে। শীর্ণতর সুভাষদার চুলে তিনি হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর সুভাষদা গীতাদির হাত চেপে ধরে বলছেন—খুব সাবধানে থাকো গীতা।

মস্ত দুর্যোগ আসছে। পায়ের কাছে আমাকে দেখে বললেন 'মীনাক্ষী সাবধানে যেও'। এই ক্রান্তদর্শী কবি আর মানুষকে কি ভোলা যায়? তাঁর কবিতার বইয়ের পাতা ওলটাতে গিয়ে বেরোল—'ভেঙো নাকে। শুধু ভাঙা নয়/মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না/জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে/ঢ্যাঙা নয়।'—সত্যিই কি তাই?

সাহিত্য অকাদেমির ফেলোশিপ গ্রহণকালে

আমার এ গল্পের নায়ক

আলোক রায়

'হ্যাংরাস' (১৯৭৩) প্রকাশের পর একটু চমক লেগেছিল। মনে হয়েছিল 'ম্যাজিক-দেখানেওয়ালা এক হেকিমের ঝুলি থেকে কত কী বোরোচ্ছে।' রিপোর্টাজ, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা আগেই পেয়েছি, অনূদিত উপন্যাসও। এবার পাওয়া গেল মৌলিক উপন্যাস, অবশ্য কবিতাতেই সে উপন্যাসের 'মূল' পেয়েছি আগে—

দাঁতে দাঁত দিয়ে সব বসে থাকা
কিছুতে না-খাওয়া,
সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—
তবু কী আনন্দে, ভাবো
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।
বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে; মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-সুমথকে। (জেলখানার গল্প)

এই কবিতারই শেষ লাইন—'নিজেদের জালে বন্দী; নিজেদেরই তৈরি -করা জেলে।' সম্ভবত এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরে লেখা চারটি উপন্যাসের বীজ। হাংরাস উপন্যাসের রুশ-অনুবাদের (১৯৭৭) ভূমিকায় সুভাষ লিখেছিলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকবার ভেবেছি একটি উপন্যাসে সেই সময়টাকে ধরে রাখব। সেটাই হবে আমার প্রথম উপন্যাস। আমার সামনে তখন নিজের অভিজ্ঞতা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করে তোলার কঠিন পরীক্ষা। বহুবার উপন্যাসটি লেখা শুরু করতে গিয়েও অবধারিতভাবে পিছিয়ে এসেছি, মনে হয়েছে সার্থক উপন্যাস লেখার চাবিকাঠি আমার হাতে নেই।' তারপর বাইশ বছর প্রতীক্ষারপর উপন্যাস লেখা হল (১৯৭২), বিশেষ একটি উদ্দেশ্য মনে রেখে। শুধু হাংরাস নয়, সুভাষের সবগুলি উপন্যাসেই ঘুরে ফিরে এসেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যুগচিত্র, পার্টিভাগের মর্মবেদনা এবং সেই তাগিদ "যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে।" কবিতায় যখন আমরা এরকম লাইন পাই—'গল্পটা অনেকক্ষণ থেকেই বলব বলব করছি', তখন হয়তো মনে থাকে না, সুভাষের কবিতা তাঁর উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি। আর কবিতা বা উপন্যাস, গল্প বা রিপোর্টাজ সব কিছুর মধ্যে আছেন সুভাষ, হয়তো কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে, কারণ সব গল্পেরই নায়ক একজন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "নিজেকে ঔপন্যাসিক বলি না কারণ বানিয়ে লিখতে পারি না। আমার উপন্যাস কতখানি উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উপন্যাসের একটা সুবিধে হল, অনেক কথা বলা

যায়, খুব বেশি আঁটসাট না হলেও চলে। কিন্তু লেখার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।" (দ্র। গ্রন্থপরিচয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহ ২)। অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি উপন্যাস লেখেন, এ কথা মানতে বাধা নেই। তবে কাহিনী রচনা করতে হলে কিছুটা বানাতে হবে, খড়ের কাঠামোর উপর মাটি দিয়ে গড়তে হয় প্রতিমা। কবিতায় সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন 'মেজাজ' কবিতায় "থলির ভেতর হাত ঢেকে/শাশুড়ি বিড় বিড় করে মালা জপছেন; / বউ/গটগট গটগট করে হেঁটে গেল।" শাশুড়ি-বউয়ের চরিত্রের বাস্তব-ভিত্তি থাকা সম্ভব, তারপর বউয়ের সন্তান-সম্ভাবনাও কাহিনীসূত্র অনুসরণে স্বাভাবিক। কবিতার শেষে কিন্তু ছোটগল্পের চমক—"ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :/ কী নাম দেবো, জানো?/ আফ্রিকা—/কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।" উপন্যাসে আর একটু বেশি সংযোজনের দরকার হয়, কারণ শুধু তার বিস্তার বা শিথিল-গঠন নয়, সেখানে অনেক কথা বলতে হয়, যার কিছু অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া, কিছুটা বানানো। যে-কোনও সাহিত্যকর্মের মধ্যে নির্মাণ ও সৃষ্টি লক্ষ করা যাবে। উপন্যাসের গঠন গত দুশো বছরের মধ্যে এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে কাকে উপন্যাস বলব, আর কাকে উপন্যাস বলব না, তা আজ সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাসের গঠন পাঁচরকম বললে ভুল হবে না। খুব সচেতনভাবে তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। হাংরাসে রোজনামচার আদল আছে, অন্তরীপ বা হানসেনের অসুখ (১৯৮৩) অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি-প্রেরিত ইংরেজি পাণ্ডুলিপির ভাষান্তর, কাঁচাপাকাও (১৯৮৯) যেন অন্যের লেখা পাণ্ডুলিপির সংশোধিত/পরিবর্তিত রূপ, কে কোথায় যায় (১৯৭৬) প্রচলিত উপন্যাস-রীতি অনুসরণে কাহিনী গ্রন্থন। কল্পিত লেখকের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার এবং তার মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ—আঠারো-উনিশ শতকে বিলিতি উপন্যাসে দেখা গেছে। এখানে দ্বৈত-লেখকের কথা ভাবা যায়, কারণ মূল লেখকের তৈরি খড়ের কাঠামোতে মাটি আর রঙ জুড়ে দ্বিতীয় লেখক যে সুন্দর মূর্তি গড়েছেন (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) তার একটা নিজস্ব শিল্পরূপ আছে (যেমন, "পরের কথা বলতে গিয়ে অবরে-সবরে যদি নিজের কথা বলার একান্তই কোনো দরকার হয় সেটা আমি নিজের জবানিতেই আলাদাভাবে বলব।") অনুবাদের ক্ষেত্রে সুভাষ যে-সমস্যার কথা বলেছেন, তা আসলে উৎস থেকে মোহানায় পৌঁছনোর সমস্যা। যাকে আমরা বলি বাস্তব বা অভিজ্ঞতা, তা যখন উপন্যাসের অবয়ব লাভ করে, তখন তার মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে—"সত্যি বলতে কী, এ-বইয়ের অনুবাদক না হয়ে আমি যদি ভুতুড়ে লেখক হতে পারতাম, তাহলে আমি যে কী খুশি হতাম বলার নয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হত লেখককে যদি আমি আমার নাগালের মধ্যে পেতাম। তার প্রত্যেকটা কথা আমি বাজিয়ে দেখতে পারতাম। যেখানে যে-ফাঁক-আছে, জেরা করে করে তা ভরে নিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও কি আমার মুশকিলের সম্পূর্ণ আসান হত? একই রেখায় দাঁড়িয়েও আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা একটা বিন্দু। হাজার চেষ্টা করলেও হুবহু এক হওয়া যায় না। বড়জোর খুব কাছাকাছি কোনো সমান্তরালে আসা যায়। এখানে আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে এমন একজনকে, হাত বাড়িয়েও যাকে আমি ঠিক ধরতে

ছুঁতে পারছি না। আমাকে এগোতে হচ্ছে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। এমন এক অনিচ্ছাকৃত দায়ে আমি জড়িয়ে পড়েছি শেষ না করে যা থেকে আমার নিস্কৃতি নেই।" (অন্তরীপ)। অন্যের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, এমনকি নিজের অভিজ্ঞতাকেও পুরোপুরি ধরা যায় না।

কে কোথায় যায় উপেনবাবুর কাহিনী। উপেনবাবুর কাহিনীর মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপ ঘটতেই পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সবগুলি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে কোথাও একটা মিল অছে, উপেনবাবুকে "বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে তিনি তা নন। ভেতরে ভেতরে বেজায় ঢ্যাঁটা। মুখ হাসি হাসি করে আগাগোড়া তিনি শোনার ভান করে গেলেন।" উপেনবাবু এম. পি. নন, এম. এল. এ. নন—উচ্চপদস্ত নেতা-টেতা হলেও বা কথা ছিল। নিতান্তই ঝাণ্ডা-বওয়া লোক। তাও মফস্বলে। পার্টি-অন্ত প্রাণ, তাঁর কাছে পার্টির টান নাড়ির টানের চেয়েও বেশি। তবে শহরের পার্টি-অফিসে এসে তিনি স্বস্তি বোধ করেন না, শহরের কমরেডরা যেন কেমন,—নিজেকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত। দীর্ঘ কারাবাসের পর উপেনবাবু তেত্রিশ বছর ডুয়ার্সে চা-বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছে, নিজে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। আজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পার্টি তাঁকে চিকিৎসার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠাচ্ছে। উপেনবাবু নিজের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নন, তাঁর একমাত্র ভাবনা জীবন-শেষে তীর্থদর্শন। শরীর ভেঙেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকে বেশি ভেঙেছে মন। একদা এক কমিউনে এক ডেনে নুন-ভাত খেয়ে দিনের পর দিন কেটেছে যার সঙ্গে, সেই যদুবাবু আজ দল ভাঙার পর এম. পি। ঘা এখনও শুকোয়নি, সেটা বোঝা গেল যদুবাবুর উক্তিতে, 'আপনারা কি দল বেঁধে দীক্ষা নিতে শুরু করেছেন নাকি?' উপেনবাবুর প্রত্যুত্তরে শ্লেষের সঙ্গে যন্ত্রণাও প্রকাশ পেয়েছে, "দল বেঁধে দীক্ষা দেব কেন? দীক্ষা নিয়ে দল বেঁধেছিলাম। দীক্ষা নিয়েও সবাই কি আর ভক্তিনিষ্ঠা রাখতে পারল। না পেরে তখন ভেঙে বেরিয়ে গেল। তাতেও শেষে হল না। শেষ নিজেরাই ভেঙ্গে চৌচির হল।' বোঝা যায় বিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে 'কে কোথায় যায়', তার সন্ধান করছেন সুভাষ। উপেনবাবু এর মধ্যে নিশ্চয় ব্যতিক্রমী চরিত্র—'উপেনদা রাজনীতিতে বরাবরই কাঁচা। পাবলিক মিটিঙে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা, পার্টি ক্লাস নেওয়ার ভারও ওঁকে ঠিক দেওয়া যেত না। ফলে, যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন। পার্টিতে বাড়লেন না।" অবশ্য এ সব কথা যদুবাবুর মনের কথা, কিন্তু খুব ভুল এমন বলা যায় না—'তাছাড়া কোনোরকম প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে থাকবেন না। ওতে কি হয়? রাজনীতি তো ধুনি জ্বালানোর জায়গা নয়, খেলার মাঠও নয়। তার আসল ব্যাপারই হল ক্ষমতা। শুধু পথ চলাই যথেষ্ট নয়। পথ কাটার ক্ষমতা চাই।" উপেনবাবু সারা জীবন 'রাজনীতি' করেছেন, যদিও তাকে এখন আর আমরা রজানীতি বলি না। পরোপকার আর বিপ্লব এক নয়, এই কথাটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। তাঁর আত্মসমালোচনা হল এইরকম—"বড় বড় কথা মুখে বলি, ছোট ছোট কাজগুলোও নিজেরা করতে ভুলে যাই। আসলে এর পেছনে রয়েছে আত্মপর-ভেদ। এটা আমার, ওটা আমার নয়। এক

সময়ে সমাজে আমি-তুমির ভেদ ছিল না। সবাইকে নিয়ে ছিল একটা বড় যূথবদ্ধ আমরা। মানুষে মানুষে তফাৎ তার পরে এল। এর কাছে ওর নেই—এইভাবে।"

'কে কোথায় যায়' উপন্যাসকে আগে বলেছি উপেনবাবুর কাহিনী। ট্রেনে উপেনবাবুর দিল্লি-যাত্রা, ট্রেনে সেই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে গেছে এক অলৌকিক ঘটনা। একই ট্রেনে সহযাত্রী সদ্য-বিবাহিত একদা-নকশাল সহদেব সরকার আর আত্মপরিচয়সন্ধানী তাতিয়া সোম। সহদেবের সমস্যা, কোলন-বেতারে সংবাদ-ভাষ্যকার হিসেবে তার কাজ 'সোভিয়েত আর তার সাঙাত দেশগুলোর মুণ্ডপাত করা'। সোভিয়েতবিরোধী যে-তথ্যগুলো সহদেব সবান্ধবে লোফালুফি করত, এখন সে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে সেগুলো কোন্ কারখানায় তৈরি। অন্যদিকে পূর্বজার্মানির উপরও আস্থা রাখতে পারছে না (দুই জার্মানির মিলন তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে)। সহদেবের সমস্যা রাজনৈতিক দলের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেখানে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এখন একটা স্কুল-মাস্টারি পেলেই খুশি। সহদেব রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, পারলে তর্ক করতে চায় উপেনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু 'সহহেদব উপেনদার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। একেবারে অপাপবিদ্ধ এক শিশুর মুখ। মহাযোগীর মতো নিরাসক্ত।" ফলে তর্ক জমে না। উপেনবাবু 'ভয়' কাকে বলে জানেন, কিন্তু তিনি ভালোবাসেন বলেই তাঁর মনে ভয় নেই। তিনি সোজাসুজি সহদেব তাতিয়াকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে আহ্বান জানান—

না সহদেব—আমি শুধু চা-বাগান বলে বলছি না। কোলিয়ারিতে যাও, গ্রামে যাও, চটকলে যাও। সব জায়গায় এক ছবি। নতুন ছেলেমেয়ে আসছে কই?

বুড়োদের দোষ নেই আমি বলছি না। কিন্তু তোমরাও একটু নিজেদের দিকে তাকাও। আমরা দূরের চেয়ে কাছেরটা কম দেখব, পোড়-খাওয়াদের চেয়ে অর্বাচীনদের ওপর কম ভরসা করব, সাহস করে ছেড়ে দেওয়ার বদলে সতর্ক হয়ে টেনে ধরব— তো বয়সেরই ধর্ম। তোমাদের বাড়তিটা দিয়ে আমাদের ঘাটতিটা পূরণ করো। ব্যস, তাহলেই তো কাজ ফতে হয়।"

এ পর্যন্ত বোঝা যায়। এমনকি উপেনবাবুর 'স্বদেশি' করতে আসার প্রেক্ষাপট আমাদের কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কিন্তু শিকলিসুদ্ধ উড়ে যাওয়া টিয়াপাখির সন্ধানে বেরিয়ে দেশ ও মানুষ, বন্ধন ও মুক্তিকে চেনা সহজ ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন—দেশটা নিখুঁত না হলেও মায়ের দোষের মতো সেই দেশের দোষকে বড় করে দেখতে পারেন না তিনি। তাঁর মুখে আরও শুনি—"ভুল, ভুল, এই বলে তোমরা এত চেঁচাও কেন? একেবারে নির্ভুল ব্যাপার আমরা যন্ত্রের কাছ থেকে চাই। ঠিক আর ভুল, দোষ আর গুণ মিশিয়ে হবে মানুষ। ভুল না থাকলে কোথায় থাকত উদ্ভাবন? কোথায় থাকত আবিষ্কারের বিস্ময়?' এই বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে উপেনবাবু জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।—"সব যদি আগেভাগে জেনে নেওয়া যায়, বাঁচার আনন্দটাই তাহলে মাটি হয়ে যাবে।" তিনি খণ্ড 'ক্যাপিটাল' তেত্রিশ বছরে দ্বিতীয়বার উলটে দেখবার তাঁর সময় হয়নি। হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে এবার তা পড়বার সময় পাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু

সে সময় আর জুটল না। উপেনবাবু ভবিষ্যৎ জানতে চান না, "পুরো জীবনটাই হল ঠ্যাক ফেলে বেড়ানোর মতো একটা ব্যাপার। কথাটা ঠিক বললাম কি না জানি না। মানে, আমি বলতে চাই—লাগিয়ে দেখা। লেগে গেলে ভালো। না হলে আবার চেষ্টা করা।"

কথাগুলো সহদেব আর তাতিয়ার মনে লেগেছে। দুজনের সমস্যা দু'রকম। সহদেব সত্তরের ঝোড়ো দিনগুলিতে দাবানলে জ্বলেছে, কিন্তু পুড়ে মরেনি, মা আর দাদা তাকে জেল-হাজত থেকে খালাস করে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে থাকতে বাংলায় হামেশাই যে সব কথা সে মুখে উচ্চারণ করত, বিদেশে, সেইসব কথাই ইংরেজি হ্যান্ডআউট থেকে বাংলায় তর্জমা করা আর রেডিওতে বলা, খুবই আপত্তিকর ঠেকল। "রেডিওর এই ভাড়াখাটা কাজটাই তার এতদিনকার সযত্নে লালিত অনেক ধারণার ভিত টলিয়ে দিচ্ছে.[x] পশ্চিম জার্মানিতে ফেরার পথে উপেনবাবুর সঙ্গে ট্রেনে দেখা, আর তার ফলে সহদেব কোথায় যেতে চায়, কোথায় যাবে, তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"তত্ত্বের চেয়েও ঢের বড় জিনিস হল জীবন। উপেনকে দেখো, যতক্ষণ আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করব, উনি তার মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হয় ডুবন্তকে তুলবেন নয় মরবেন। আমাদের হিসেব আর উপেনদার টান। হিসেবের মধ্যে নিজেরটা ধরা থাকে, টানের মধ্যে থাকে ছেড়ে দেওয়া।" তাতিয়াকে বিয়ে করার সময়েও সব ব্যাপারটা ছিল খেলা। তারপর তাতিয়া পারিবারিক জীবনের ইতিহাস, জন্মের কলঙ্ক, অসহায়তাবোধ, সেই সঙ্গে উপেনদার আহ্বান, সব মিলিয়ে সহদেবের 'বদল' সম্ভব হয়েছে, "মানুষ যেমন প্রকৃতিকে বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলায়, সেইভাবে।" তাতিয়া জন্ম থেকে ভালোবাসা পায়নি, পেয়েছে ভয়। "কিন্তু আমার সব গোলমাল করে দিয়েছে ঐ বুড়ো। কেন জানি না, উপেনদাকে দেখে আমার মধ্যে কী যেন একটা ঘটে গেল। তুমি হাসবে। কিন্তু সত্যিই একটা পলকে প্রণয়ের মতো ব্যাপার। অমন করে এ-পর্যন্ত আমি কারো ভেতর দেখতে পাইনি। তুমি আমি আমরা সবাই নিজেদের ঢেকে রেখেছি। নইলে যে ফাঁস হয়ে যাব। এই একজন লোক দেখলাম যার ভয় নেই। ভয় নেই বলেই ভালোবাসা আছে। কাকুতিমিনতি নেই, তার ভালবাসায় আছে জোর। সেই জোরেই পৃথিবীকে সে বদলাতে চাইছে।" উপেনবাবুর অল্পক্ষণের সান্নিধ্যে তাতিয়ার নবজন্ম হয়েছে। সহদেব ও তাতিয়া দুজনেই নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে, "রাগের মাথায় কিছু না করে, ঠাণ্ডা মাথায় সময় নিয়ে লেগে থেকে কিছু করা যায় না।" ইউরোপ যাওয়া আর তাদের হল না, তার দরকারও নেই। তারা আবার ফিরে যাবে, দেশের কাজে লাগবে।

এর মধ্যে ট্রেনের কন্ডাক্টর-গার্ড গিরিজা বা ঢ্যাঙা গির্জার তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না, গোড়াতে তাই মনে হয়। কাহিনীর বাস্তব পটভূমিকে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলার জন্য বুঝি ঢ্যাঙা গির্জার অবতারণা। ফাস্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রত্যেকটি কামরায় মানুষজনকে তার দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের আভাস মেলে তার মধ্যে। কিন্তু ঢ্যাঙা গির্জা নিজই একটা ছোটগল্প, সেটা বোঝা যায় দশম পরিচ্ছেদে এসে। জন্ম, মৃত্যু বিবাহের তিনটি স্বতন্ত্র দৃশ্য পরপর সাজানো হয়েছে। আর তা থেকে যে সিদ্ধান্তবাক্যটি সবশেষে উপস্থিত করা হয়—"ঢ্যাঙা গির্জার কাছে মানুষের ভয় আর সাহসের ব্যাপারটা

বরাবরই খুবই অদ্ভুত ঠেকে", তা উপন্যাসের মূল বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। উপেনবাবুর সঙ্গে ঢ্যাঙা গির্জার সেভাবে কোনও পরিচয় হয়নি সত্য, কিন্তু মৃত্যুর উৎপত্তি নিয়ে যে গল্পটি সে শুনিয়েছে, তা হয়তো উপেনবাবুরও জানা ছিল। অন্তত উপেনবাবুর মৃত্যুর পটভূমি রচনায় গল্পটি সহায়তা করেছে।

উপেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে চ্যাংমুড়ির মৃত্যু নিশ্চয় তুলনীয় নয়। 'কে কোথায় যায়' আর 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' একেবারে ভিন্ন ধরনের উপন্যাস। অন্তরীপ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গলায় এক অজ্ঞাত-পরিচয় লেখকের কথা—"লেখকের নিজের গলা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। আপনারা বাংলায় শুনবেন শুধু দোভাষীর কণ্ঠস্বর। তাকেই লেখকের কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" অন্যদিকে "নামের ব্যাপারে লেখকের মনোভাবটা একটু অদ্ভুত। লেখক তাঁর নিজের নাম তো চেপে গেছেনই, এমনকি যাদের নিয়ে লিখেছেন তাদের কারো নাম তিনি প্রকাশ করেননি।" উপন্যাসের ঘটনাস্থল তালবেতালিয়া বা নবজীবনগড় ঠিক কোথায় অবস্থিত তা আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি কুষ্ঠরোগমুক্ত কিন্তু বিকৃত-অঙ্গ কিছু নরনারী শহরের বাইরে পোড়ো ডাঙা জমিটাতে পাতার ছাউনি বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—'সেরে যাওয়া কুষ্ঠরোগীদের গাঁ'। কিন্তু সেরে গেলেও সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি, সমাজের বাইরে তারা নিজেদের সমাজ গড়ে নিয়েছে, —"বাইরের জগৎটার সঙ্গে আমাদের বনিবনা নেই। মাঝখানে রয়েছে একটা ঘৃণার বেড়া। ওরা আস্ত মানুষ আর আমরা ভাঙাচোরা।" এইভাবে ক্রমশ একটা রূপকের জগৎ গড়ে ওঠে। বিকলাঙ্গ মানুষেরা যেন মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দ্বীপে বাস করে, অথবা দ্বীপ না বলে 'অন্তরীপ' বলাই ভালো—'মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি।; নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে, যাতে ওদের মত ময়লা জল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।" অন্তরীপ হয়ে ওঠে ভাঙাচোরা মানুষের কাহিনী। কাহিনীর একটা বাস্তবভিত্তি আছে, সুভাষ বিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে ভ্রমণের সময়ে বাঁকুড়ার গৌরীপুর কুষ্ঠ-হাসপাতাল ও খেজুরডাঙার আরোগ্যাবাসে যা দেখেছিলেন, যাদের দেখেছিলেন, তাই নিয়ে লেখেন অন্তরীপ (আবার ডাকবাংলার ডাকে বইতে 'মরাডালে ফুল' আর 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর' রচনা দুটিতে উপন্যাসের বীজ মিলতে পারে)। রূপক, কিন্তু রূপকথা নয়। তাই অন্তরীপ উপন্যাসের চরিত্রের কোনো নাম না থাকলেও তারা দেহমনের অধিকারী, রক্তমাংসের মানব-মানবী। শহরের মানুষগুলোদের সঙ্গে তাদের তফাৎ আছে, শহরের মানুষের মতো তারা আত্মপর ভেদটাকে ছোটবড় কাছে-দূরে নানান মাপে বাঁধে না। তাদের মধ্যে আছে স্নেহমায়ামমতা, হয়তো কখনও প্রকাশ পায় ক্রোধ-কাম-মোহ।— "বাইরের জগৎটার সঙ্গে ভয়তরাসের যে-সম্পর্কটা আমরা পাতিয়ে রেখেছি, তার তলায় তলায় কখন কীভাবে যে ঘৃণার বারুদ জমছে আমরা নিজেরাই তা জানি না।" নিরাশ্রয় অন্ত্যজ অচ্ছুত মানুষজনকে নিয়েই যেন গড়ে উঠেছে অন্তরীপ। উগ্রপন্থী পালিয়ে আসা তিনটি ছেলেকে যখন তারা আশ্রয় দেয়, তখন "ওদের শরীরে যন্ত্রণার ঐ দাগগুলোর জন্যেই আমাদের সারা গাঁয়ের লোকের কাছে ওরা আমাদের

একেবারে আপন হয়ে গেল।" সমাজ পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের অথবা শহুরে আত্মকেন্দ্রিক জড়োপাসক মানুষেরা কেউই 'রাজনীতি' করেনা। তবু এই তিনটি ছেলে চলে যাওয়ার আগে তালবেতালিয়া গ্রামে বাচ্চাদের শিখিয়ে গেছে 'বাঁচার জন্য মরতে হল মরব' কিংবা 'দেখো দেখো দিন বদলায়'-এর মতো গান! রূপকের প্রচ্ছদ ভেদ করে নবজীবনগড়ে প্রাত্যহিকের সন্ধান মেলে।

বড়বাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে শহর চলে আসে তালবেতালিয়া গ্রামে। আর অন্তরীপ নয়, এবার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনী যেন পায়ের তলায় মাটি পায়। উগ্রপন্থী ছেলেদের উপস্থিতি প্রথমে খানিকটা প্রক্ষেপের মতো মনে হয়, শুধু বাইরের জগতের কিছু খবর তারা বহন করে এনেছে—"ওরা আসায় এটাও আমাদের জানা হয়ে গেল, যে-জগৎটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে আমরা হেদিয়ে মরছি, সেটাও তো খুব একটা থিতু হয়ে নেই। সেখানেও তো কানা পুতের নানা রোগ। নইলে এমন সব সুস্থ স্বাভাবিক সোনার টুকরো ছেলে জান দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠবে কেন?[x] বড়বাবুর পরিবর্তনের ধারণার সঙ্গে এই ছেলেদের পরিবর্তনের ধারণা মেলে না। বড়বাবুর চেষ্টায় তালবেতালিয়ার চতুর্গুণ জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নয়াবসত, যার নাম নবজীবনগড়। সেই ছেলেগুলো যে-স্বপ্ন দেখে তা হয়তো কোনোদিন বাস্তবে রূপ লাভ করবে না ("ওরা চায় দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজাতে। ওপর ওপর ঝাড়পুঁছ করা মানে পুরনো জিনিসটাকে টিকিয়ে রেখে মানুষের যন্ত্রণা বাড়ানো। স্যাকরার ঠুকঠাক দিয়ে হবে না। ওরা দিতে চায় কামারের এক ঘা।"), অন্যদিকে "বড়বাবুর একটা বড় গুণ, ওঁর স্বপ্নগুলো মাটিতে পা দিয়ে চলে। কিন্তু উনি কতকটা ঠুলি-পরানো ঘোড়ার মতো, শুধু সামনেটা ছাড়া আশপাশুলে ওঁর নজরেই পড়ে না।" ঝুপড়ি ভেঙে সেখানে তৈরি হল ব্যারাকবাড়ি, সরকারি আনুকূল্যে জমি টাকা সব এল। হাজী মাস্টারের পাঠশালায় ছোটদের সঙ্গে বড়রাও মাঝে মাঝে এসে ভিড় করেছে। "এ-কদিনের মধ্যে তালবেতালিয়া জবর বদলে গেছে। এখন আর চায়ের লিকারে দুধ পড়ার মতো করে নিঃশব্দে সকাল হয় না। এখন ভটর ভটর শব্দে রীতিমতো হাঁকডাকের মধ্যে সকাল হচ্ছে।[x] এতদিন তালবেতালিয়ায় বার-দিন-মাস-বছরের হিসেব ছিল না, ঘড়ির সময় মেপে কাজ করার কথা কেউ ভাবেনি। এখন এসেছে 'একটা সময়-ধরার কল', সকলেই যেন ছুটছে, ঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হলেই সবাই নড়েচড়ে বসে, 'প্রাপ্তির একটা করে লক্ষ্য প্রত্যেকেই দাগিয়ে রেখেছে। মুখে লাগাম দিয়ে মন তাদের চাবুক মারতে থাকে যাতে হুস করে সেখানে পৌঁছুনো যায়।" একটা জিনিস বোঝা গেছে, হাজার চেষ্টাতেও আর নবজীবনগড়কে তালবেতালিয়ায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বড়বাবু সেবক সঙ্ঘের স্বামীজির উপস্থিতি বারোয়ারি বিয়েরও ব্যবস্থা করলেন। এতদিন যারা ছিল সমাজের বাইরে, এবার তারা সমাজবন্ধনে বাঁধা পড়ল।

এপর্যন্ত সবই ভালো। কিন্তু নরনারীর পরস্পর টানকে বন্ধনের শিকল পরাতে গেলে জাতি-ধর্মের কথা উঠবে। এতদিন যাদের কোনো নাম ছিল না, পদবি ছিল না, এবার তাদের নাম-পদবির সঙ্গে জাতবর্ণের ভেদগুলো খাড়া হয়ে উঠল। চ্যাংমুড়ির নাম যে

কুলসুম বিবি, এ কথা সে কি আগে জানত! এর পরিণাম, মরলে তাকে কবর দিতে হবে। এর সঙ্গে মিলেছে ভোটের হাওয়া—কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে দুঃখী এত যে মানুষ আছে, তা আগে জানা ছিল না। অথচ কুষ্ঠরোগীর হাত থেকে চা-সন্দেশ নিতে বাধা কাটেনি। সরকার পক্ষের দাবি— তালবেতালিয়া আগে ছিল এক নরক, সরকার সেখানে নবজীবনগড়ের পত্তন করে স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে। অন্যপক্ষের বক্তব্য—এই পচাগলা সমাজটাকে না পালটালে কিছু হবার নয়, দুনিয়া জুড়ে চলেছে তাই নিচের মানুষকে ওপরে তোলার লড়াই, পীড়িতের দল আর নিপীড়িতের দল যদি এক হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই মানুষের কপাল ফেরানোর চাবিকাঠি ঠিকঠাক হাতে এসে যাবে। আর রূপক নয়, রূপকথা তো নয়ই। ভোটের আগেই চারদিকে পোস্টার পড়তে শুরু করেছে—হিন্দুদের পোড়াতে হবে। মুসলমানের চাই আলাদা কবরখানা। বড়বাবুর স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক। আর দ্বীপ নয়, অন্তরীপ নয়, আমাদের চেনা জগৎ, অভিজ্ঞতার জগৎ।

অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের ইংরেজিতে লেখা পাণ্ডুলিপির ভাষান্তর, অন্তত এইরকম একটা ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে উপন্যাসের সূচনায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাসটির জন্য এইরকম একটা প্রকরণের দরকার ছিল। তিনি যে 'বানিয়ে লিখতে' পারেন না, সে কথা একাধিকবার জানিয়েছেন, " মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারিনি।...চাক্ষুষ দেখাশুনো ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প।" উপেনবাবু, কচি, ভাইসাহেবের মতো প্যানসাহেবও তাহলে সুভাষের চেনাজানা মানুষ। তবে উপেনবাবু আর ভাইসাহেব ঠিক পূর্ণায়ত চরিত্র নয়, অল্পক্ষণের জন্য তাদের দেখি (ভাইসাহেবকে তো দেখতেও পাই না), লেখকের রাজনীতি-ভাবনার প্রকাশে চরিত্র সহায়তা করেছে। কচি পূর্ণাবয়ব চরিত্র, তবে তার মধ্যে জটিলতা কম, কচি শেষ পর্যন্ত কাঁচাই থেকে গেছে, উপন্যাসের শেষে তার মুখে শুনি "কেঁচো গণ্ডুষ করেই বোধ হয় আমাকে আবার জীবন শুরু করতে হবে।" একমাত্র প্যানসাহেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ধারায়, সবচেয়ে পরিস্ফুট ও পরিপক্ক চরিত্র।

প্যানসাহেব অবশ্য নায়কের নাম নয়। কুষ্ঠ হাসপাতালে অবসর সময়ে টুকটাক লেখালেখি আর সাহেব ডাক্তারের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য, সবাই তাকে বলত পেনসাহেব, তাই থেকে প্যানসাহেব। সন্ন্যাসীর মতো পূর্বাশ্রমের কথা সে বলতে চায় না, তবু পটভূমি ও স্মৃতিচারণ থেকে যেটুকু বেরিয়ে এসেছে, তা হল—পূর্বজীবনে সে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শহরে সাজানো ফ্ল্যাট, সুশ্রী গোয়ার মেয়ে ঘরণী, শিশুসন্তান। সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত জীবনে চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ। তবে প্যানসাহেব যতই বলুন না কেন, বড়বাবুর কাছে ঘুষ দিতে আসা ঠিকেদারের মতো "ঐ জাতেরই লোক ছিলাম। শুধু আরেকটু ভদ্রস্থ এবং আরেকটু পালিশ করা—তবে হরেদরে একই মাল"—কথাটা সত্য নয়। প্যানসাহেবের ভেতরে আগাগোড়া "ঐ বস্তাপচা সমাজের" বিরুদ্ধে একটা মনোভাব কাজ করে গেছে। সে আয়নায় মুখ না দেখলেও, আত্মপ্রতিকৃতি তার কাছে স্পষ্ট, "আমার

কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ল আর তখন আমি সমাজসংসার ছেড়ে চলে এলাম—এটা কি বিলকুল ঠিক? নাকি কোনো না কোনোভাবে আমি পালানোরই ছুঁতো খুঁজছিলাম। জো পেয়ে গেলাম কুষ্ঠ হওয়ায়।" তা না হলে কুষ্ঠ হয়েছে জানার পর একজন শিক্ষিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট একালে চিকিৎসা না করিয়ে পাঁচবছর অলৌকিক নিরাময়ের আশ্বাসে তীর্থে বা দুর্গম গুহাগুম্ফায় ঘুরে বেড়াবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। "এ-রোগ এখন সহজেই নিরাময়যোগ্য এবং কুষ্ঠমাত্রই ছোঁয়াচে নয়— এসব কথা কস্মিনকালে সে কি কাগজে পড়েনি? দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি জানবে না এবং চিকিৎসা করলে সেরে যাবে, তার যে অনেক উপায়—সেও তো তার করায়ত্ত ছিল। তাহলে?" প্যানসাহেব এর উত্তরে বলে, জীবন ঠিক যুক্তির পথ ধরে চলে না। অথচ জীবনের সবটাই আচমকা ঘটে-যাওয়া-ঘটনা নয়। আসলে দুটো বা একাধিক জীবনের কথা মেনে নিতে হয়—"প্রথম জীবনের চোখে যা নষ্ট হল বলে মনে করেছিলাম দ্বিতীয় জীবনের দৃষ্টিতে তার অন্য রূপ।" একই আমি দুই হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, আর তখন নিজেকে আর কেউ বলে ভাবতে পারা সম্ভব হয়। এগারো বছর আত্মনির্বাসনের পর পুরনো সব মুখ এখন ঝাপসা। তালবেতালিয়ায় সেই ভাঙাচোরা আর তেরাবাঁকা মানুষের মধ্যে প্যানসাহেব নিজেকে আবিষ্কার করেছে—"সমাজ থেকে ছেঁটে-ফেলা দাগী মানুষের এই দঙ্গলটাতে এসে আমার মনে হল এই আমার নিজের জায়গা।" এর পর কানা বিকলাঙ্গ কুচকুচে কালো (মুখটা ঠিক রিলিফ ম্যাপের মতো দগদগে) আদিবাসীদের মেয়ে চ্যাংমুড়িকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করা আর অবাস্তব ঠেকে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত সময়েই ভেবেছেন—"সৌন্দর্য আর ভালো লাগা—এ দুটো কি পরিপূর্ণভাবে এক? ভালো লাগে না এমন সৌন্দর্যও তো আছে। সুন্দর নয়, তবু ভালো লাগে—এমনও তো হয়?" প্যানসাহেবের সঙ্গে এখানে কবির একাত্মতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শুধু সৌন্দর্যভাবনায় নয়, সমাজভাবনাতেও ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।—"একটা সময় গেছে যখন কিছুতেই নিজের মুখোমুখি হতে পারতাম না। একা পেয়ে পাছে পিছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে স্মৃতি। নিজেকে আলাদা করে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখ রেখে আমি তখন স্মৃতির হাত এড়িয়েছিলাম। এখানে আসার পর অনেকের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।" এই যে আত্মবিস্ফার, শ্রেণীবিস্মৃতি, অন্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া—এর জন্য হয়তো তালবেতালিয়ার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু নবজীবনগড় নিয়ে প্যানসাহেবের মনে প্রথম থেকেই সংশয় ছিল। সামনে এগোতে হবে। সেজন্য পরিবর্তন চাই। অথচ প্যানসাহেব কিছুতেই নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। তার কেবল মনে হয় "আমার কিছু পাওয়ার নেই, কোথাও পৌঁছুবার নেই।" তালবেতালিয়া ছিল দুনিয়ার বার। দুজনের এক হয়ে যাওয়াতেই ছিল জগৎজয়ের আনন্দ। তখন মনে হত, দুনিয়ায় যদি আস্ত মানুষ কেউ থাকে তো এই তালবেতালিয়ার ভাঙাচোরা লোকগুলো। কেননা বাইরের ভাগ-আড়ালগুলো রোগের এক ধাক্কায় এখানে ভেঙে গেছে। বড়বাবু অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন "মানুষকে কোনোদিনই একরঙা এবং আগাপাশতলা এক মাপের করা যাবে না।" বড়বাবুর আছে একটা তৈরি জগৎ, তারই ছাঁচে

উনি নবজীবনগড়কে ঢালতে চান। প্যানসাহেবের মনে হয় সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে আবার 'ঐ বস্তাপচা সমাজেরই পাহারাদার' হওয়ার বাসনা অন্যায়। অন্যদিকে কুষ্ঠ হওয়া যেমন তার সমাজসংসার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা 'ছুতো', উপন্যাসের শেষে চ্যাংমুড়ির মৃত্যু তেমনি নবজীবনগড় ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা উপলক্ষ। ভেতরে ভেতরে পালানোর ইচ্ছা কাজ করছিল—"একবার যা ছেড়ে আসি আমি আর কখনও সেখানে যাই না। আমার স্বভাবটা সত্যিই অদ্ভুত।" একে কি স্ববিরোধ বলব! প্যানসাহেব কি বাইবেলের পাতায় সান্ত্বনা খুঁজেছেন—"ঘরে আর সে ফিরবে না,/তার নিজের জায়গায় কেউ আর তাকে চিনবে না।" ঠিক জানি না।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে সুভাষ ও শক্তি

কবি সুভাষ এক সময়ে লাঠি হাতে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

(কমরেড আমাকে চিনতে পারছেন? ভদ্রলোক বললেন— ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় আমি ছিলাম ট্রামকর্মী। পার্কসার্কাসের একটি মেসে আমরা কর্মীরা ছিলাম, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ। বাইরের অবস্থা থমথমে। আপনি কমরেড লাঠি হাতে দরজায় পাহারায় ছিলেন, মনে পড়ছে?)

যত সহজে সুভাষদার কাছে যাওয়া যেত ততটা সহজে তাঁকে নিয়ে লেখা যায় না। ৮ জুলাই ২০০৩ তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের অভিজ্ঞতাগুলি লেখা আরও কষ্টকর, কারণ আমৃত্যু কমিউনিস্ট সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু তো কেবল কবিতা লেখেননি, তাঁর কবিতা ও জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থবোধের সমাজ গড়ে তুলেছেন। সুভাষদাকে আমরা খুব কাছে চেয়ে পেয়েছি বলে শেষ সময়ে তাঁর মূল্যায়নে কি এই অবহেলা।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ থেকে ৮ জুলাই ২০০৩ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আসা এবং যাওয়ার এই মধ্যবর্তী সময়টার সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা এ সময়ে এক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়া বোধ হয় আর কেউ নেই। দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার পরেও আবার পুলিসী নির্যাতন-জেল-অনশন এই সম্পূর্ণ দৃশ্যপটকে সাজিয়ে দিতে পারেন হীরেন্দ্রনাথ, আর কেউ নেই। দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার পরেও আবার পুলিসী নির্যাতন-জেল-অনশন এই সম্পূর্ণ দৃশ্যপটকে সাজিয়ে দিতে পারেন হীরেন্দ্রনাথ, আর ফুটিয়ে তুলতে পারতেন বজবজের শ্রমিক বস্তির বাবর আলি, সলোমনের মা, ব্যঞ্জনহাড়িয়া গ্রামের বামাচরণ সাইনি। কিন্তু সেই সব মানুষ যাঁদের সঙ্গে সুভাষদা অসহ্য দারিদ্র সহ্য করেছেন আর তাঁদের শিখিয়েছেন মর্যাদাবোধ, তাঁরা কিন্তু জানতেই পারলেন না তাঁদের সাথী, তাঁদের গুরু শেষবারের মত চলে যাচ্ছেন। আমাদের অপরাধী বোধের স্তূপ হিমালয়কে ছাড়িয়ে যায়।

তাঁর মৃত্যুর পরে এক এক দিনে দুটো তিনটে করে সভা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে। কোনো দৈনিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে তাঁকে নিয়ে, কেউ কেউ দ্বিধান্বিত ছিল তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করা ঠিক হবে কিনা। এ সবে কিছু আসে যায় না সুভাষদার। পরিব্রাজক আত্মভোলা কবি যেমন করে দারিদ্র উপেক্ষা করেছেন, যেমন উপেক্ষা করেছেন সহযাত্রী নিজের মানুষদের আমর্যাদার উক্তি, হঠাৎ জেগে উঠলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হেসে বলতেন 'দেখ আমি জটায় বেঁধেছি বেদনার আকাশগঙ্গা।'

বেঁচে থাকতেও সুভষদা কম সম্মান পাননি, কিন্তু সব থেকে বড় সম্মান যা এসেছে পাঠক সমাজের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবনকালে আর কোনো কবির এক একটি পংক্তি এমন প্রবাদ হয়ে ওঠেনি যা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে ক্ষেত্রে। একজন লেখক সুভাষদা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জীবনানন্দকে টেনে এনে এক নিঃশ্বাসে বলেছেন 'বরং যখন

বেঁচে ছিলেন, তখনই ছিলেন মৃত।' অতিকথন কখনো অমৃতভাষণ হয়ে দাঁড়ায়।

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মাঝখানে কোনো প্রাচীর না রেখে সুভাষদা মিশতেন অনুজদের সঙ্গে। অনেকের অনেক স্মৃতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ষাটের দশক থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুভাষদার সান্নিধ্য পেয়েছি নানা পরিবেশে। তার বেশিটাই সামাজিক, কিছুটা রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জানলে নিঃসন্দেহে মানুষ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে জানা হয়। তবু কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ তাঁর আনন্দ-বেদনা-নিঃসঙ্গতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবে বলে আমার মনে হয়।

'সপ্তাহ' পত্রিকার দপ্তরে বসে একদিন সুভাষদার সঙ্গে কথা হচ্ছে। তখন বোধহয় পত্রিকার কর্ণধার প্রদ্যোৎ গুহ। সুভাষদার পিঠে একটা ব্যথা আছে অনেকদিনের। উনি বললেন সেই যে পুলিসের লাঠি খেয়েছিলাম, ব্যথাটা সেখান থেকেই। তখন ব্যথাটা বেশ বেড়েছে। চিকিৎসার কথা বলতে সুভাষদা বললেন দাঁড়াও আর কটা দিন যাক। সোভিয়েত থেকে আমার একটা উপন্যাস বেরুচ্ছে, কিছু পয়সা আসবে, তারপর ডাক্তারের কাছে যাব। তাৎক্ষণিক কিছু চিকিৎসার প্রস্তাবে তাঁকে রাজি করানো যায়নি। বিদেশে যাত্রার আগে সুভাষদাকে মাঝে মাঝে বিদেশী মুদ্রার পারমিটের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যেতে হত। আমার কাছে বসিয়ে রেখে যথাসাধ্য ওঁর কাজগুলো করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। সেই দু'-এক ঘন্টা সময় ওঁকে ঘিরে ছেলেদের ভীড় জমত। অনেকে সেই প্রথম সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছে, কেউ কেউ তাঁর পুরানো কমরেড। সেদিন ২৪ মার্চ, '০৩ স্টুডেন্টস হলে সুভষদাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, সুভাষদার সামনে বসে সেই অতীত দিনের কথাগুলো উঠলো। উনি নাম ধরে ধরে এক একজনের খোঁজ নিলেন, যাঁদের অনেকেই আর বেঁচে নেই। ইদানীং তো কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না, কাগজে লিখে লিখে কথা বলা। বলতে বলতে ওঁর মুখে যেমন আনন্দের তেমনি বেদনার ছায়া।

তখন সুভষদা ক্ল্যারিয়নে কাজ করতেন। বছরে দু'একবার তো তাঁকে বাইরে যেতে হত। কর্তৃপক্ষের এটা পছন্দ হচ্ছিল না। সুভাষদা বুঝতে পেরে পদত্যাগ পত্র দিয়ে চলে এলেন। সুভাষদা বলছিলেন—জানো তখন আমার ঘরে মাত্র দিন দশেকের খাবার পয়সা আছে।

অনেক কথা অনেক দৃশ্য এক সঙ্গে মিছিল করে আসে। ১৯৭৬-এ স্টুডেন্টস হলে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সম্মেলন, ইউনিভার্সিটি শতবার্ষিকী হল, সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন, গোর্কিসদনে তাঁর পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঘাটশিলায় বিভূতি জন্মবার্ষিকীতে প্রাণোচ্ছল সুভাষদা। 'পরিচয়' দপ্তরে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন গোপালদা-সুভাষদা-হাবুলদা। এখন যাঁদের জন্মশতবর্ষ পালন করছি। তাঁদের অনেকেই আমাদের সমাজদৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই উজ্জ্বল মানুষদের মধ্যে সুভাষদাও আর কিছুদিন পরে অন্যতম শতবর্ষীয় হয়ে উঠবেন।

স্মৃতিচারণে নানা প্রসঙ্গ এসে যায়। তার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান থাকে, যাকে প্রকাশ না করলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে চেনা হয় না। সুভাষদার এক স্মৃতিসভায় কাহিনীটি

শুনিয়েছিলেন কবি তরুণ সান্যাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল বর্ধমান গেছেন এক সাহিত্যসভায়। সভাশেষে উদ্যোক্তারা ওঁদের হাতে দুটো সেকেন্ড ক্লাশ রেলটিকিট দিয়ে বললেন—সামনের ট্রেনে উঠে যান। গাড়িটি ছিল দূরপাল্লার। সুভাষদা, তরুণ ভিতরে উঠে দেখেন বসবার জায়গা নেই। অগত্যা দাঁড়িয়ে থাকা। সুভাষদা বললেন চলো তরুণ, প্যান্ট্রিকারের চা নিয়ে বসি। ওঁরা তাই করলেন। চা শেষ হতে আর কতক্ষণ। চাপরাশি ঘোরাঘুরি করছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট এবার উঠে পড়ো। গাড়ি ব্যাণ্ডেল আসতে ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় রেলের উর্দি পরা সাদা দাড়ির এক সুদর্শন পুরুষ ওঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন আপনারা উঠছেন কেন, বসুন, কোনো অসুবিধে নেই, সুভাষদার দিকে তাকিয়ে বললেন—কমরেড আমাকে চিনতে পারছেন?

সুভাষদা চিনতে পারেননি। ভদ্রলোক বললেন—ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় আমি ছিলাম ট্রামকর্মী। পার্ক সার্কাসের একটি মেসে আমরা কর্মীরা ছিলাম, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ। বাইরের অবস্থা থমথমে। আপনি কমরেড লাঠি হাতে দরজায় পাহারায় ছিলেন, মনে পড়ছে? এই আমাদের চিরদিনের সুভাষদা। যাঁকে চিনতে তাঁর অন্তরঙ্গ মানুষরাও ভুল করে।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর বক্তব্য রাখছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে অন্নদাশঙ্কর রায়, অজিত পাঁজা, করণ সিং প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে

মানিকের 'অন্ধের যষ্ঠী' সুভাষ

নিশীথ দে

বয়সটা তখন ঠিক কাঁচা বলবো না। উত্তরণের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়ানো এক তরুণ। পদাতিক, অগ্নিকোণ মনকে রীতিমত দোলাচ্ছে। সুকান্ত তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, 'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।' পাশাপাশি ঝড়ের ছবির মত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি....., মাথার ওপর সমুদ্রের সাদা ফেনার মত এক ঝুড়ি চুল। চোখের কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী, একেবারে নির্ভেজাল পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরণের সেই বয়সটা বড় দুরন্ত। কোন কিছুর জন্যে সবুর সয় না। প্রেম, পলিটিকস কিংবা পদ্য লেখা—কোনও একটাকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্যে ছটফটানি। জীবিকা ছিল হকারি। তবু জেদ চেপেছিল কবি হওয়ার। এক হাঁড়ি রকমারি শব্দ আর এক কাঁড়ি দাঁড়ি, কমা, বিস্ময়সূচক চিহ্ন নিয়ে পাতার পর পাতা এলোপাথাড়ি লিখে মনটাকে ভরাট করি। তারপর একদিন ডজন খানেক কবিতা নামক লেখাজোখা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণ কলকাতার শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়িতে।

তখন বুক দুর দুর করছে কি জানি হয়ত মেজাজ বিগড়ে যাবে। সাত সকালে এ কি বেয়াড়া আবদার! আর কি কোন কাজ নেই। এই সব ছাই—পাঁস পড়তে হবে! সময়ের নাম নেই। পদাতিক, অগ্নিকোণ পড়েই কবিতা লেখার ইচ্ছে হল!

না, সে সব কিছুই নয়। পরনে পাজামা আর ফতুয়া পরা পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বেরিয়ে এলেন। বেঞ্চিতে পাশে বসে বললেন, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। পাতার পর পাতা ওল্টালেন। জ্বর হলে সত্যিই ঘাম দিয়ে ছেড়ে দিত। এ কথা সে কথার পর বললেন, তুমি তো হকারের নাকি ক্যানভাসারের কাজ কর। রোজ কত রকমের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কত নতুন অভিজ্ঞতা হয়। সেই সব নয় লেখো না কেন? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছো? আগে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়বে। তারপর দেখবে কবিতা পড়তে ভাল লাগবে। পড়তে পড়তে এক একটা আলাদা আলাদা ছন্দ মনকে টেনে নিয়ে যাবে।

সালটা ঠিক মনে নেই। পঞ্চাশের দশকে গদ্য কবিতা লেখার ধুম পড়ে গিয়েছিল। আসলে ছন্দ নিয়ে ঝামেলা এড়িয়ে শর্টকাটে বাজিমাৎ করা হুড়মুড় করে কবির সংখ্যা বেড়ে চলল। আমি নিজেকে আধুনিক কবি মনে করে কি কাণ্ডই না করেছি। এখন ভাবলে নিজের গালে দুটো ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করে। পারিনি জানাজানি হবার ভয়ে। বলতে গেলে তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা রীতিমত গোগ্রাসে খাচ্ছি। ওই সময় সোমনাথ লাহিড়ীর কলিযুগের গল্প বেশ খানিকটা রুমালে ফেলে দিল। অনেক পরে শুনেছিলাম সেই লাহিড়ীই (ওই নামেই পার্টিতে পরিচিত) একরকম জোর করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে রিপোর্টাজ

লিখতে রাজি করান। লাহিড়ী তখন পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক। নাম ছাপানোর সম্পাদক নন। যেমন 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক বলে নাম ছাপা হত জ্যোতি বসুর আর সম্পাদকের সব দায় দায়িত্ব ছিল ভূপেশ গুপ্তর। লাহিড়ী 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক মানে একটা টিম। সেই টিমে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়—লাহিড়ীর সঙ্গে সম্পাদনার কাজ করতেন। কিন্তু আসল ভূমিকা ছিল বাকি সব কাজে—কাগজ ভাঁজ করা পর্যন্ত।

এ সবই শোনা কথা। সেই একবারই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। তারপর থেকে নিজেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছি অনেকদিন। একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। চিনতে পারলে যদি ক্লাসে মাষ্টার মশাইয়ের মত পড়া ধরেন—কি হল এখনও কবিতা লেখো না কি? গদ্য কবিতা? গদ্য কবিতারও ছন্দ থাকে। পদ্য কবিতার চেয়ে গদ্য কবিতা অনেক কঠিন।

অপরাধ বিজ্ঞান নাকি বলে, অপরাধী নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না। সেই ভয় আমাকে তাড়া করে বেড়াতো। আচ্ছা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো কবি! তাহলে তাঁর তো সাহিত্যের সীমানা টপকে রাস্তার রাজনীতি, শ্রমিক কর্মচারীদের মিছিলে সাঁওতালীদের নাচের তালে তালে পা মেলানোর এত তাগিদ কেন? পার্টির ডাকে, শ্রমিক সংগঠনের ডাকে যেখানে মিছিল সেখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন? মিছিল কেন এত টানতো। প্রতিবাদী মানুষের মিছিলে মিশে যাওয়াই যেন তাঁর জীবনের পরম প্রাপ্তি।

অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি। না, না খুব ঘনিষ্ঠভাবে নয়, কাজ থেকেও নয়, দূর থেকেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার আছে বিস্ময়। কবিদের পদচারণার একটা সীমানা তো থাকে। কবিরা তো একটা অন্য জগতে ডুবে থাকে। সেটা শুধু কবিদেরই জগৎ। কবি মন ছাড়া সে জগতের অন্তরে কেউ ঢুকতে পারে না। কিন্তু এ কেমন কবি! দল ছাড়া কবি!

কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এদিন কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকে সিঁড়িতে পা রাখতেই চোখ গিয়ে পড়লো সেই বাঘের দিকে।

মানিকবাবু তখন টালিগঞ্জের পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে এসে উঠেছেন বরানগরে বনহুগলির মোড়ে ভাড়া বাড়িতে। পৈত্রিক বাড়ি বিক্রির টাকা ছেলেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন। কিন্তু বাবার দায়িত্ব কেউ নিতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত বাবার সব দায় নেন মানিকবাবু। নিজের ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের দরিদ্রতম লেখক।

বনহুগলিতে দু কামরার ভাড়া বাড়ি। ছোট ছোট ঘর, একফালি রান্নাঘর। পাড়ার ছেলেদের খেলার মাঠ। তার চারদিকে দোতলা-একতলা বাড়ি। তারই একটা একতলা বাড়ির ভাড়াটে। তিনধাপ সিঁড়ি ভাঙলে মানিকবাবুর লেখার ঘর, বৈঠকখানা, শোবার ঘর সব মিলিয়ে ঘরের বারো আনা। বাকি চার আনা চটের আড়াল করা। চৌকিতে শোয়া বৃদ্ধ পিতা। ঘরে ছোট্ট একটা টেবিল আর হাতল ছাড়া রোগা একটা কাঠের চেয়ার। টেবিলে একধারে এক রাশি বই, কাগজ। ওই টেবিল-চেয়ারই মানিকবাবুর সাহিত্য সাধনার একমাত্র

সহায় সম্বল। বন্ধু-বান্ধব, সম্পাদক-প্রকাশক, পার্টির নেতা-কর্মী, অতিথি কেউ এলে মানিকবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—কোথায় বসাবেন ওদের!

চৌকির ওপর বিছানায় একরাশ বই, কাগজ, পত্র-পত্রিকা, ওষুধের শিশি, গামছা, গায়ের চাদর ছড়ানো-ছিটোনা। মানিকবাবু নিজেই সব পাঁজা-কোলা করে চৌকির তলায় ঢুকিয়ে বিছানার চাদরটা ভাল করে পেতে দিয়ে বসার জায়গা করে দিতেন।

সেদিন দুধাপ সিঁড়ি উঠতেই মাথায় সমুদ্রের শ্বেতশুভ্র ফেনার মত এক ঝুড়ি চুল দেখেই বুঝেছিলাম, এ সেই বাঘ। আমি নিঃশব্দে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। ধরা পড়ে গেলাম। মানিকবাবুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ডাকলেন, আরে তুমি যাচ্ছো কোথায়? না, না পরে এলে হবে না। ভেতরে এসো।

অনেকটা আসামীর মত। মানিকবাবু বললেন, সুভাষ দেখে রাখো এই হল নিশীথ। এর কথাই বলছিলাম। নিশীথ আমার অনেক কাজ করে দেয়। সকালের দিকে দুটো টিউশনি করে। বেলা তিনটে থেকে একটা নস্যি কোম্পানির ডেলিভারিম্যানের চাকরি। সামান্য মাইনে। আমি নিশীথের হাত দিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেব। তোমাদের যদি কিছু পাঠাবার থাকে ওর হাতে দিও।

দেখলাম, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বার বার আমার দিকে তাকালেন। না, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। না, চিনতে পারেন নি।

কথা ফুরোবার আগে মানিকবাবু বললেন, সুভাষ তোমাকে কিন্তু একদিন আসতে হবে। নিশীথদের একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে শ্যামলী। প্রত্যেক রবিবার ওদের ঘরোয়া বৈঠক হয়। নিজেদের লেখা পড়ে, নিজেরাই আলোচনা-সমালোচনা করে। মাঝে মাঝে বড় সাহিত্যিক-কবিকে ধরে আনে—আলোচনা শোনার জন্যে।

সুভাষদার অজান্তেই যেন কবিতার লাইন বেরিয়ে এল, বাঃ খুব ভাল তো।

মানিকবাবু বললেন, সুভাষ শুধু ভাল বললে হবে না। একদিন 'শ্যামলী'র বৈঠকে আসতে হবে।

আসবো। রথ দেখা, কলা বেচা দুইই হবে। আপনার খবর নিতে তো আসতেই হয়। 'শ্যামলী'র কবি লেখকদের সঙ্গেও আলাপ হবে।

তারপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। দু একদিন অন্তর আসেন সুভাষদার স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ছে উনি কাছেই স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকরি করতেন। বাড়ি ফেরার পথে মানিকবাবুকে দেখে যেতেন। বেশির ভাগ সময়েই শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতেন।

মাননিকবাবুর চিকিৎসা করতেন ডাঃ কেদারনাথ চক্রবর্তী বেশ দীর্ঘকায়। বরানগরে ইমিউনিটির সামনে চেম্বার। মাঝে মাঝে মানিকবাবুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতাম।

একদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মানিকবাবুর ডাক্তার সম্পর্কে আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর শুনলাম, ওরা কাউকে কিছু না জানিয়ে ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সব জেনে নিয়েছেন। মানিকবাবুর কাছে পার্টির

লোক বলতে আসতেন সেকালের প্রখ্যাত আইনজীবী অতুল গুপ্ত, তিন গল্প লেখক এবং পার্টির হোলটাইমার প্রদ্যোৎ গুহ, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী আর ননী ভৌমিক। প্রদ্যোৎদা পরে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড এবং প্রফুল্লদা 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতেন। ননী ভৌমিক সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে যান। একদিন সোমনাথ লাহিড়ী এলেন। লাহিড়ীর পৈত্রিক বাড়ি ছিল বরানগরে মুন্সির মাঠের কাছে। আর মাঝে একটা পুরনো অস্টিন গাড়িতে আসতেন তিন বাঁড়ুজ্জের একজন, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সে তারাশঙ্করবাবু মানিকবাবুর চেয়ে দশ বছরের বড়। থাকতেন টালা পার্কে।

সবচেয়ে দূর থেকে আসতেন, দক্ষিণ কলকাতার শরৎ ব্যানার্জি রোড থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সারাদিন-রাত কাজ। তখনকার দিনের পার্টির হোলটাইমার। সাহিত্যচর্চা, সাংবাদিকতা, আন্দোলনের রিপোর্টাজ, মিটিং-মিছিলে যোগ দেওয়া, অসুস্থ কবি-সাহিত্যিকদের খোঁজ-খবর নিতে ছুটোছুটি, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা তোলা—সব দায় সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। সেই চল্লিশের দশক থেকে চলছে তো চলছেই।

শুনেছি, সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অথচ প্রতিটি কবিতা আগে শোনাতেন সুভাষদাকেই আর সুভাষদার কাছে সবচেয়ে আপনজন সুকান্ত। প্রায় প্রতিদিন হাজার কাজের মধ্যেই অসুস্থ, রোগশয্যায় শায়িত কবি, পার্টির কমরেড, হোলটাইমার সুকান্তর বিছানায় একপাশে গিয়ে বসতেন। শেষ দিন পর্যন্ত সুকান্তকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে দেখিনি। সুকান্তের কমরেড, সেই সময়ের হোলটাইমার, 'সপ্তাহ' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীর পূর্বসূরী তৃপ্তি গুহর কাছে অনেক গল্প শুনেছি। বয়সের অনেকটাই তফাৎ, তবু তৃপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সম্পর্ক ছিল।

সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখলাম, মানিকবাবুর অন্ধের যষ্ঠি। অনেকেই আসেন অসুস্থ মানিকবাবুকে দেখতে। অনেকেই খবর নেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় না এলে, অন্তত স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে না পাঠানো পর্যন্ত কেমন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটান, টেনশনে থাকেন। অন্যদের প্রতি অভিযোগ, অনুযোগ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রীতিমত দাবি জানানোর অধিকার, অভিমান, বাকি সব কিছু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টি সদস্য হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চার বছর পর—১৯৪৪ সালে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সব কাজকেই পার্টির কাজ, একজন কমিউনিস্টের দায়িত্ব, কর্তব্য মনে করতেন। মানিকবাবুও তাই। তফাৎ হল, মানিকবাবু কোন নেতার সমালোচনা করতে ছাড়েননি। মানিকবাবুর পৃথিবীটা ছিল অনেক বড়, কমিউনিস্ট পার্টির বাইরেও। কমিউনিস্ট বিরোধীদের কাছেও সমান শ্রদ্ধা পেয়েছেন। পরিমল গোস্বামী, প্রাণতোষ ঘটক, সাগরময় ঘোষ আরও অনেকে মানিকবাবুর খবর নিতেন, দেখতে আসতেন।

মানিকবাবুর সংসার চালানোর সব দায় ছিল তাঁর কলমের। লেখাই তাঁর একমাত্র জীবিকা। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করানোর কথা উঠতেই প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। কিছুতেই না। তা হলে লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। সংসার চলবে কি করে? তার ওপর হাসপাতালের

খরচ, ওষুধ, ইনজেকশন, আরও কত খরচ কে যোগাবে এত খরচ! অনেকেই মানিকবাবুকে বোঝালেন, আপনার জন্যে ফাণ্ডে টাকা তোলা হবে! কোন চিন্তা করবেন না।

কাকাবাবু ও জ্যোতিবাবু বোঝালেন, আপনাকে সুস্থ হতে হবে। সে জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আপত্তি করবেন না। কাকাবাবু খবর পাঠালেন, পার্টির মিটিং এ যাচ্ছেন। দিল্লি থেকে টাকা তুলে আনবেন। তবু মানিকবাবু মন থেকে রাজি নন।

ইতিমধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব রকম প্রস্তুতি চালালেন। শেষ পর্যন্ত সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আগের মত অরাজি হতে পারলেন না। যতদূর মনে পড়ে সুভাষদা সেদিন বলেছিলেন, লেখার ক্ষমতা কেড়ে নিলে লেখকের আর থাকলটা কি! হাসপাতালে বিশ্রাম হবে, চিকিৎসাও হবে সেই সঙ্গে লেখালেখিও চালিয়ে যাবেন।

মানিকবাবু শুধু বলেছিলেন, একটু ভেবে দেখি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর কোনো কথা বলেন নি। এরপর বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি তর্কের লড়াই চললো। দেখলেন, সুভাষের প্রভাব শুধু তাঁর ওপর নয়, স্ত্রীর ওপর অনেক বেশি। ঠিক প্রভাব নয়, আস্থা। তবু ভাবলেন, যতদিন বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করা যায়। শরীরের উন্নতি হলে নিশ্চয় আর হাসপাতালে যেতে হবে না। এটাও বুঝলেন, ডাক্তার যেভাবে চিকিৎসা করাতে বলছেন তাতে খরচ অনেক বেশি। অথচ...

এরপর সুভাষ-দেবী-গীতা একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন। জিনিসপত্র নিয়ে সোজা উঠে বসলেন ট্যাক্সিতে তারপর হাসপাতালের চারতলার কেবিন। বেশ খোলা মেলা। নানান পরীক্ষা, ঘড়ি ধরে ডাক্তার নার্সদের সেবা শুশ্রুষা। বিশ্রামের অঢেল সুযোগ। সেই সঙ্গে লেখার কাজটা ভালই চালাতে পারেন।

দিন কয়েক পরে বুঝলেন, জেনে শুনে সুভাষরা মোটা টাকা খরচের ঝুঁকি নিয়েছে। কীভাবে টাকা তুলছে কে জানে জমাও দিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় নেতারা কি করলেন! মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করতেন। কিন্তু প্রায় প্রতিদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়-গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতেন, সব দুঃখ যেন কর্পূরের মত উবে যেত।

সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আরও কত বিখ্যাত-অখ্যাত লেখক, পার্টিকর্মী, প্রতিবাদী মানুষ, অন্যায়ের সঙ্গে আপস বিরোধীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। পার্টি ভাঙার পর রাতারাতি বিপ্লববাদীদের নেকনজরে পড়েছিলেন। বিপ্লববাদীরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চারদিকে মেটাল ডিটেকটর বসিয়েছিলেন সংশোধনবাদী রোগাক্রান্তদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সংশোধনবাদী ছিলেন। কেননা থেকে গিয়েছিলেন সি পি আইতেই। কিন্তু সেখানেও একদিন মেটাল ডিটেকটর বসলো। সেটা ১৯৭০ সাল।

সিপি আই এর রাজ্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জি আগস্টের 'সপ্তাহ' কাগজে লিখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক 'ডাক বাংলোর ডায়েরী' শিরোনামার রিপোর্টাজ লেখার সময় হঠাৎ পার্টির মধ্যে একটা মত এত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে পার্টি সদস্য হিসাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কাজ পার্টি বিরোধী, পার্টি শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ

তুলে শাস্তি দাবি করতে থাকে। এবং হাজার চেষ্টা করেও তাদের বোঝানো যায়নি যে কি লেখা হয়েছে সেটাই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়, কোথায় লেখা বেরিয়েছে—সেটা নয়।

গোপাল ব্যানার্জি আমারও দীর্ঘদিনের শ্রদ্ধেয়। সিনেমা যেমন জ্যোতির্ময় রায়ের মত অনেক বলিষ্ঠ লেখককে টেনে নিয়ে গিয়ে সাহিত্যের ক্ষতি করেছে, তেমনি গোপালদার মত কৃতিছাত্রকে রাজনীতিতে জুড়ে দিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষতি করেছে।

গোপালদা লিখেছেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই বিতর্কের পুরে সময়টাতেই তিনি (সুভাষদা) ছিলেন নিরুত্তাপ। ওই ধারাবাহিক আর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও কিন্তু আর পার্টির সদস্যপদ রিনিউ করেন নি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিচারকরা আজ ক্ষমতায় আসীন। কমিউনিস্ট নেতারা, যাঁরা নিজেদের জনগণের নেতা বলে হাজির করেন, তাঁরা জানতেও পারেন নি ক্ষমতার আস্ফালনই তাদের একঘরে করেছে। দুই কমিউনিস্ট পার্টিই চোখ কান খুলে রেখেছিল কে কোনদিকে যায়, কার নিশ্বাসে কেমন শব্দ। ধর্মনিরপেক্ষতার বোরখা পরে চোখ রাখছে সন্দিগ্ধ মন, জনদরদী মুখোশ পরে খুন-সন্ত্রাসের রাজনীতি নিয়ে কারা প্রতিবাদের স্পর্ধা দেখাতে চাইবে। কেউ বামপন্থী, কেউ মার্কসবাদী, কেউ সৎ, নিষ্ঠাবান বিপ্লবীর মুখোশ পরে নিজেদের অপকর্মের সাফাই গাইছে আর চোখ রাখছে কারা পার্টির চেয়ে মানুষের মিছিলে পা মেলাচ্ছে বেশি। দেরি না করে ফতোয়া জারি করেছেন, লোকটা আর বামপন্থী নয়। মিছিলের মানুষগুলো হাসে, পুঁজিপতিদের সেবাদাসরা জেনে রেখো মুখোশের আড়ালে তোমাদের আসল চেহারাটা আর লুকোতে পারবে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কালের তরুণ কবি তরুণ সান্যাল সুভাষদার সেই কথাগুলো তাঁর লেখায় কবিতার মত সাজিয়ে দিয়েছেন, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলতেন, এক সময় রাজপুত্ররা কমিউনিস্ট হত। এখন কমিউনিস্টদের ছেলেরা রাজপুত্র হতে চায়।'

কেউ অপেক্ষা করেছেন, কেউ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, লোকটা বামপন্থী বৃত্তের বাইরে চলে গেল। এক কথায় কমিউনিস্ট জাতিচ্যুত। আর সে জন্য বাম সরকারের কোনো পুরস্কার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্যে জোটেনি। সুভাষদা শেষ কয়েক বছর কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। শুনতে পেলে হয়তো বলতেন, বিচারপতি এবার তোমার বিচার করবে জেনো এই জনতা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা বলতেন, আলাপ করতেন, বক্তৃতা করতেন অবিকল কবিতা পাঠের মত। মিছিলে পা মেলাতেন কবিতার ছন্দে। মানুষকে ভালবাসার তাগিদেই কবিতা লিখতেন। যেখানে অনেক মানুষ নির্ভয়ে প্রতিবাদ জানাতো সেই মিছিলকেও ভালবেসে ছিলেন। জীবনের অনেকটা সময় মিছিলে কাটিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের মিছিল। কোন রাজনীতির রং দেখার সময় পান নি। কোন্ রাজনীতির মুখ ভার হল জানতে চান নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকবেন প্রতিবাদ মিছিলে সামিল মানুষের মধ্যে।

সুভাষ কাকার স্মৃতি

আহম্মদ আলি

বাদশা হারুন-আল-রশিদ প্রতি রাতে ছদ্মবেশে প্রজাদের জানালার পাশে কান পাততেন তাদের সুখ দুঃখের কাহিনি শুনতে। ভোরের আলো ফোটার আগে ফিরে যেতেন মহলে। বাদশা প্রজার অভাব দূর করার চেষ্টা করতেন।

এক মানব দরদী কবি বজবজের চটকলের মুসলিম শ্রমিক অধ্যুষিত গ্রামে এসেছিলেন, তাদের দিন গুজরানের কাহিনি শুনতে-দেখতে-শোনাতে। আজ তাঁর শেষ দিন—যেন বনবাস পর্ব শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা।

একটা লজঝোরা লরির আধবয়সি চালক চেয়ার-টেবিল, কাঁথা-কম্বল, বাক্স-পেঁটরা থরে থরে সাজিয়ে নিয়েছে। লরিতে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। কিন্তু ঐ যে চারচৌকো কাঠের সিন্দুকের মতো গীতা পিসির শখের গ্রামোফোনটা রাখার জায়গা হচ্ছে না। দেখে শুনে পিসি বললেন—তোর ঘরে রেখে আয়। পরে সম্ভব হলে নিয়ে যাবি। না পারলে তুই ওটা নিয়ে নিস। গ্রামোফোনটা ঘরে রেখে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। পিসি কাকাকে রাখতে যাচ্ছি। লরি চলছে—বজবজ-বাটা-তারাতলা হয়ে ঢুকে পড়ল নিউ আলিপুরে। তারপর এ রাস্তা ও রাস্তা এ পথও পথ করে গিয়ে পৌঁছোলো যেখানে কবিতার সেই গাছটা পাথরে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা বাড়ানো বাহুর ছায়ায় মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে লরিটা দাঁড়িয়ে পড়লো। ইঞ্জিনটা বিকট শব্দ করে পাড়া জাগিয়ে শরীর ঝাঁকিয়ে নিথর হয়ে গেল।

বুঝলাম এসে গেছি। এখান থেকেই এক মানবদরদী পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় উনিশশো বাহান্ন সালে একদিন সকালে আট ইস্টিশান পেরিয়ে ব্যাঞ্জনহেড়িয়ার বড় পুকুর ধারে দেখেছিলেন 'পাগল বাবর আলির চোখের মতো আকাশটা।' দেখেছিলেন মিছিলে সালেমনের মাকে। ঘর-সংসার স্বামী পুত্র কন্যা সামলে শহিদ প্রতিভা পাঠশালার নিরক্ষর বয়স্কা ছাত্রী কবিরনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন 'একটু সুখের মুখ দেখবে বলে চুল সাদা করে বসে আছে আহমদের মা'।

ফকির মহম্মদ খান রোডের বড় পুকুরের ধারে আম আঁশফল গাছের ছায়ায় একটুকরো বৈঠকখানা। পেছনে দু'খানা মাটির ঘর। তার সামনে রান্না ঘর। মাত্র কয়েকদিন এসেছেন। গরমের সময়। এখানকার মতো তখন ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক ছিল না। জানালা খুলে রাত্রে ঘুমোচ্ছেন। গভীর অন্ধকার রাত। পিসির ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন জানালার গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতের বালাটা টেনে খুলে নিতে চাইছে। যেন বলতে চাইছে—দেবী, আপনি নিজেই তো সোনার প্রতিমা। এই স্বর্ণবলাকা আপনার হাতে বেমানান, ওটা আমায় দিন। পিসি কাকাকে ডাকলেন—সুভাষ দেখো তো কে আমার হাত ধরে টানছে। কাকা ঘুমের ঘোরে উত্তর দিলেন ঘুমিয়ে পড়ো কাল সকালে দেখবখন। এবার একহাতে ধাক্কা দিয়ে বললেন দেখো না হাত ছাড়ছে না। এবার যেন সম্বিত ফিরল। উঠে পড়লেন চোরকে

Vol. IV Issue-VIII / ISSN : 2394-4889

বললেন—এই কি হচ্ছে? হাত ছাড়ো ছাড়ো বলছি, নইলে খুব বকে দেব। সেদিন কাকার কাছে বকা খেয়ে লজ্জা পেয়ে সেই যে পালিয়েছে আর কোনদিন ওমুখো হয়নি।

পিসির লেখা 'কাল অন্যদিন' গল্পের মূল পাণ্ডুলিপিটা চুরি করে এক লাইন পড়ে ফেলেছিলাম—ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল সন্তান পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই'। তাই বুঝি বজবজে এসে কলকাতা থেকে আট দশ দিনের একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। সুভাষ কাকার কবিতা 'মিছিলের মুখ' কবিতার আদ্যক্ষর নিয়ে নাম দিয়েছিলেন 'মিমু'। কণ্ব মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা, অনসূয়া প্রিয়ংবদা। সুভাষ কাকার পালিতা কন্যার প্রথমটি মারা গেলেও বর্তমান চারটি। কাকার দুটি জামাই বাঙালি, একটি পাঞ্জাবি আর একটি মুসলিম। বেশ আছে ওরা।

বজবজে থাকাকালীন কালিপুর ইস্কুলে ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রদের দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখার সময় এক অভিভাবক বারবার বাধা দেওয়ায় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করায় সুভাষ কাকা খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমার জীবনে এরকম রাগতে কখনো দেখিনি। সম্ভবত কমল পাল এসে কাকাকে সরিয়ে নিয়ে যান।

লিখতে লিখতে পা ছাড়াতে কিংবা ব্যাগ হাতে বাজার যেতে যদি দেখেন বাচ্চারা খালে ছিপ ফেলছে তাহলে হয়ে গেল। মাথায় উঠল বাজার করা। বাচ্চাদের কাছ থেকে ছিপ নিয়ে বসে পড়লেন। এমন পাগল কাকাকে নিয়ে পিসি কোনওদিন অভিযোগ করেননি। কবিকে কবির পথে ছেড়ে দিয়ে বয়স্ক বউ-ঝিদের নিয়ে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ প্রতিভার নামে শহিদ প্রতিভা পাঠশালা গড়লেন কবিরনের বাড়িতে। গড়লেন প্রতিভা পাঠাগার, কিশোর-বাহিনী, সমবায় সমিতি। আন্তর্জাতিক শিশু দিবস করলেন ঈদগাঁয়ের মাঠে। মোহনবাগানের সনৎ শেঠ কিশোর বাহিনীকে একটা ভলিবল খেলার নেট দিয়ে গেলেন। সেই বলেই প্রথম ভলিবল খেলা হল ঈদগাঁয়ের মাঠে। এভাবেই আস্তে আস্তে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে ভালবাসা, স্নেহ মমতার শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন।

সুভাষ কাকা বজবজ ছেড়ে গেলেও যোগসূত্র রয়ে গেল। একটা সময়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে রবিবার সকালে যেতাম, সন্ধেয় ফিরে আসতাম। ঘরে ফেরার সময় জবরদস্তি টাকা গুঁজে দিতেন পরের সপ্তাহে যাবার রাস্তা খরচ হিসেবে।

এক রোববার বিশ্বরূপা থিয়েটার হলে সীতা মুখোপাধ্যায়ের 'সাঁকো' দেখার পাশ দিয়ে গেলেন। আমরা সবাই যাব। সুভাষ কাকা লিখতে বসেছেন। বারবার তাগাদা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। এই উঠছি, এই যাচ্ছি করে কাটাচ্ছেন, আমরাও কাকাকে ফেলে যেতে পারছি না। অবশেষে এলেন কাকার বাবা ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়। বললেন, 'কালো কখন যাবি? তোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে'। এবার যেন কথাটা শুনলেন—বললেন, না না আমি কোথায় যাব। আমার ভীষণ কাজ। উত্তর শুনে একঘর লোক থ।

আমি বসে আছি—সুভাষ কাকা 'সন্দেশ' পত্রিকা দপ্তরে ঢুকলেন। দেখে মনে হল বেশ মনমরা। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বিষাদের হাসি হেসে বললেন, ভেবেছিলাম জীবনে

প্রথম বিদেশ যাব। তা আর হল না। হাজার খানেক টাকার জন্যে আটকে যাচ্ছে। এখান থেকে বোম্বাই যেতে পারলে সাজ্জাদ জাহির (উর্দু কবি) সাহেব আমার মস্কো যাবার টিকিট তৈরি রেখেছেন। কি যেন কারণে পরপর তিনদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। কার কাছে এতো টাকা চাইব। সব শুনে বললাম, আমি বাড়ি যাচ্ছি। না আসা পর্যন্ত আপনি অফিসেই অপেক্ষা করবেন, বলে চলে এলাম বাড়ি। পাশের বাড়ির এক দাদা তার চাকরি জীবনের গচ্ছিত সম্বল সার্ভিসের টাকা এক সন্ধ্যায় আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন এতো টাকা আমার ঘরে রাখতে ভয় করে। তুই তোর নামে ব্যাঙ্কে কিংবা বড় পোস্ট অফিসে রেখে দে। আমার মেয়ের যখন বিয়ে দেব তখন তোর কাছ থেকে চেয়ে নেব। সেই জমা টাকা ধার নেবার লক্ষ্যে ঘরে ফেরা। দাদার অনুমতি যেন মুখ থেকে বার হবার অপেক্ষায় ছিল। পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে ছুটলাম 'সন্দেশ' অফিস। সুভাষ কাকা মাথা গুঁজে কাজ করছেন। চুপি চুপি ঢুকে কাকার লেখার ওপরে ঝপাস করে ফেলে দিলাম। টাকাগুলো দেখে আঁৎকে উঠলেন। এমন ভাব আমি যেন ধর্মতলার বাসে পকেট মেরে টাকা এনে দিচ্ছি। টাকা জোগাড়ের ঘটনা বললাম। এই টাকা ধার নেওয়ার কথা আমি কোনওদিন কাউকে বলিনি। সুভাষ কাকার পেটে সহ্য হল না। আমাকে পাশে সরিয়ে রাজা দাশগুপ্তের ক্যামেরার সামনে গড় গড় করে বলে দিলেন।

মস্কো থেকে ফেরার সময় আমার মায়ের জন্য আনলেন কাজাকাস্তানের চুড়ি; আমার জন্যে চিনে তৈরি একটা পেন। তার ক্লিপে চিনা ভাষায় কি যেন লেখা। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় বুক পকেট থেকে ব্যাগে ঢুকে পড়েছে।

পাঁচের বি, শরৎ ব্যানার্জী রোডে যখন তখন যেতে পারিনা। মাঝে মাঝে ছুটে যাই। গেলে কে কেমন আছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। চড়িয়াল বাজারের বা রাস্তাঘাটের কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা জেনে নিতেন। কাকার শরীর খারাপ শুনে ছুটে গেলাম। পেছনের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন? সেই সুপরিচিত হাসি হেসে বললেন, আমি খুব ভালো আছি। বুকে হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, এই বুঝি আপনার ভালো থাকা। রোগা হয়ে গেছেন, গায়ের রংটা কেমন যেন মরে গেছে। বলতে বলতে গীতাপিসি সামনে এলেন। কাকা বললেন, গীতা আহমদকে কিছু খেতে দাও। আর আমার সেই কলমটা ওকে দিয়ে দাও। আমাদের অঞ্চলে একে একে পাড়ার নাম ধরে কে কেমন আছে জানতে চাইলেন। পাড়ার কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। সব শেষে বললেন আরামবাগ থেকে আমার জন্যে পতাকা বিড়ি এনে দিস। পতাকা বিড়ি নিয়ে যে সন্ধ্যায় কাকার বাড়ি গেলাম তার দু'দিন আগে শেষবারের মতো হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন। বাড়ি ফাঁকা। আজ কেউ জিজ্ঞেস করল না বজবজের কথা। গ্রামের প্রতিবেশির কথা। কবির দ্বিতীয় জন্মভূমির ভালবাসার মানুষদের কথা। অন্তিম যাত্রার আয়োজন করে হসপিটাল থেকে ফিরলেন বিদায় নিতে। কমরেড, আমি যাচ্ছি। 'ও পথ আমি যাচ্ছ—ও গাছ আমি যাচ্ছি।'

উৎস : আমাদের বজবজ, শারদীয় ২০০৮

পদাতিক কবির অন্তিম যাত্রা

বাসুদেব গাঙ্গুলী

৮ জুলাই, তখন সকাল পৌনে আটটা। হঠাৎ ফোন এল দিলীপের। দিলীপ অর্থাৎ আমাদের সপ্তাহ পত্রিকার দিলীপ চক্রবর্তী, সে দুঃসংবাদটা জানালো—বাসু, সুভাষদা মারা গেছেন আজ সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। তুই এক্ষুনি বেলভিউ নার্সিং হোমে আয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় গুরতর অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালের 'ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে' ছিলেন। তাঁর স্ত্রী গীতাদি (বন্দ্যোপাধ্যায়)ও অসুস্থ হয়ে ওই হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে আছেন গত কিছুদিন। আমরা দেখতে গিয়েছি, নিয়মিত খোঁজও রাখছি। পিজি হাসপাতালের সার্জন-সুপার দেবদ্বৈপায়ন চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে কথাও বলেছি। তাঁরা কেউ-ই সুভাষদার সম্পর্কে তেমন আশাব্যঞ্জক কিছু বলতে পারেননি। তাঁর হার্ট খারাপ, কিডনিও খারাপ। তবে তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এই চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। সুভাষদা প্রথম জীবনে ছিলেন সিপিআই দলের সর্বক্ষণের কর্মী। পরে লিখে রোজগার। কিন্তু কখনও নিজের কথা বলে হাত পাতেননি। মাথাও নত করেননি। এখন এত টাকা পাওয়া যায় কোথায়? তিন মেয়ে, তাঁদেরও আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই। কিন্তু এর মধ্যে তাঁরা যতটুকু পারছে, করছে, আর চোখের জল ফেলেছে। সুভাষদার অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী কেউ কেউ এসেছেন, তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অমিয় দেব, কবি শঙ্খ ঘোষ, দে'জ পাবলিশার্স-এর সুধাংশু দে, সুভাষদার স্নেহভাজন প্রণব বিশ্বাস এমনি আরও কয়েকজন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকুইবা।

কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র প্রমুখও সুভাষদার অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে এসেছেন এবং অর্থ সংগ্রহে কিছু উদ্যোগ দিয়েছেন। কিছু করেওছেন।

আমাদের ক্ষমতা সামান্য, আমরাও উদ্যোগ নিয়েছি। ৫ তারিখ রাত্রে খবর পাওয়া গেল, সুভাষদার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। তাঁকে ২/৩ দিনের মধ্যে ইন্টেনসিভ ইউনিট থেকে ছেড়ে এবার জেনারেল বেডে দেওয়া হবে। কথা হল 'উডবার্ন ওয়ার্ডে' গীতাদির পাশের কেবিনেই সুভাষদার জন্য ব্যবস্থা হবে। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক এবারের মতন সুভাষদা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরবেন। সঙ্কর্ষণ রায়চৌধুরী, দিলীপ এবং আমাদের মধ্যে কথা হল। ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ-এর কর্মীরা ৮ জুলাই সন্ধ্যায় গিয়ে কিছু টাকা ওঁর মেয়েদের হাতে চিকিৎসার জন্য দিয়ে আসবে। কিন্তু এর মধ্যে কি ঘটল? সুভাষদাকে বেল-ভিউ নার্সিংহোমে কে আনল? দিলীপই বলল, ও জেনেছে ৭ জুলাই রাত্রে সুভাষদার শরীরের অবনতি ঘটে। ওঁর মেয়ে এবং জামাইয়ের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে,

ওখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা এবং নার্সিং-এ ত্রুটি হচ্ছে। তাঁকে ঠিকমতন ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে না। শুশ্রূষা হচ্ছে না এবং খাবার দেওয়া হচ্ছে না। অবস্থা দেখে তাঁরা মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। ওঁরা হাসপাতালে আসেন এবং 'বণ্ড' দিয়ে সুভাষদাকে পিজি থেকে ছাড়িয়ে এনে বেলভিউ নার্সিং হোমে গত রাত্রে ভর্তি করে। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পদাতিক কবি বাংলার গর্ব সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বেলভিউ নার্সিং হোম

আমি থাকি সোনারপুর, দিলীপ থাকে দমদম। আমরা প্রায় একই সঙ্গে বেলভিউ নার্সিং হোমে গিয়ে যখন পৌঁছেছি, তখন সকাল ৮টা ৪৫মিনিট। ইতিমধ্যে সেখানে এসে গিয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, শিক্ষাবিদ অমিয় দেব, সুভাষদার বন্ধু জলিমোহন কল, কবি দিব্যেন্দু পালিত, দে'জ প্রকাশনীর সুধাংশু দে, প্রসূন বসু, প্রণব বিশ্বাস, এমনি আরও অনেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ভাষাশহিদ স্মারক সমিতির রতন বসু মজুমদার, সজল রায়চৌধুরী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাবোধি সোসাইটির অনিল সরকার প্রমুখ। সুভাষদার অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা কী? এরা কেউ জানেন না। গণদর্পণের ব্রজ রায় এসে জানালেন সুভাষদার মরদেহ দাহ হবে না। এটি মেডিক্যাল কলেজে যাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে। এটি তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল। এই মতে তিনি সুভাষদার স্বাক্ষরিত কাগজপত্রও দেখালেন। বেলভিউ নার্সিংহোম চত্বরে তখন বেশ ভীড়। অনেক অল্পবয়স্ক তরুণরাও রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র, রাজীব দেব, সোনালি গুহ, মালা রায় প্রমুখও আছেন। দিলীপ এবং আমি উদ্যোগ নিয়ে ভীড়ের মধ্যে সুভাষদার মেয়ে, জামাইদের খোঁজ করলাম। কৃষ্ণকলি ওরফে পুপে, আর তাঁর স্বামী প্রদ্যোৎ এর সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের কাছেই দিলীপ জিজ্ঞেস করল, সুভাষদার অন্তিম যাত্রা সম্পর্কে তোমাদের কী সিদ্ধান্ত? পুপে একগাল অভিমান নিয়ে বলল, বাবার দেহ কোনও সরকারি গাড়িতেও যাবে না, রাজ্য সরকারের কোনও জায়গাতেও রাখা হবে না। বাবা 'বারবার' অসুস্থ হয়েছে, এত কষ্ট করতে হয়েছে, একবারও তো কেউ খোঁজ করেনি। এর মধ্যে একজন তরুণী বলে উঠল, ওঠা ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখান থেকে তাঁর দেহ ভবানীপুর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বাড়িতে, তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হবে। রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কেন? দিলীপ জিজ্ঞেস করল অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে।

তাহলে কোথায় থাকবে?

সরকারি জায়গায় না রাখলে, অন্যত্র রাখা হোক, যদি মেডিক্যাল কলেজে দেহদান করা হয়, তাহলে কলেজ স্কোয়ারে। অন্য কোথাও হলে কার্জন পার্কে, ভাষা উদ্যানে সুভাষদা কিছুক্ষণ থাকুন, ভাষা উদ্যান উদ্বোধন তো তিনিই করেছিলেন। আর যদি কোথাও না হয়, সুভাষদার দেহ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোডে তাঁর বাড়িতেই সকলের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য

রাখা হোক। পুপে বলল, যা ঠিক করার মা করবেন। মা পিজি হাসপাতালে। তিনি এখনও এই খবর জানেন না। ও জানালো, বোম্বে থেকে মাসি এসেছেন। তিনি ওখানে গেছেন। পিজি হাসপাতালে ডাক্তারকে দিয়ে এই খবর জানানো হবে। এর মধ্যে জানা গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোর থেকেই এখানে ছিলেন, তিনিও গেছেন পিজি হাসপাতালে, ডাক্তারকে ধরে গীতাদিকে ছুটি করিয়ে আনতে। বেলভিউ নার্সিংহোমে ভীড় বাড়ছে। দূরদর্শনে খবর হয়েছে। খবর শুনে যে যেভাবে পারছে আসছে। সমস্ত 'মিডিয়া'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত। বেলভিউ নাসিংহোম চত্বর, অলিন্দ, সিঁড়িতে ভীড়। এরমধ্যে বড় অংশই মনে হল তৃণমূল সমর্থক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরই মধ্যে গাড়ি করে অসুস্থ গীতাদিকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপরে উঠে গেলেন। ভীড় ঠেলে উপরে ওঠা কষ্টকর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী জলি কল সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শেষ দেখা দেখতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে পারলেন না। শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, সৌরীন ভট্টাচার্য প্রমুখরা এক কোণে নীরবে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভীড় ভেঙে আমরা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় সদলে এলেন, মিডিয়া তার পেছনে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ 'ইলেকট্রনিক মিডিয়া'র লোককে উপরে যেতে বাধা দেওয়ায় তাদের যাওয়া স্থগিত। খবর এলো সুভাষদার মরদেহ দান করা হবে না, কেওড়াতলায় দাহ হবে; তাঁর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিগঞ্জের 'সুশিক্ষণ বিদ্যালয় এবং তাঁর বাড়িতে মরদেহ কিছুক্ষণ রাখা হবে, এরপরে এটি সাহিত্য আকাদেমিতে কিছুক্ষণ রাখা হবে। আমরা ওপরে ৬০৪ নং কেবিনে যাওয়ার মুখেই শুনি 'বাংলা আকাদেমি' নয় কারণ ওটা নন্দন চত্বর। অতএব ওই দেহ রাখা হবে 'সাহিত্য আকাদেমি', তারাতলায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘরের সামনে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে সাহিত্য আকাদেমির কেউ আছেন? উত্তর না পাওয়ায় তিনি বললেন, তাহলে নেই। ঠিক আছে 'সুশিক্ষণ' হয়ে সুভাষদার দেহ যাবে তাঁর বাড়িতে। এরপরে কেওড়াতলায়। তিনি উপস্থিত মদন মিত্র এবং অন্যান্যদের বললেন, কাঁচের গাড়ি ঠিক করার জন্য। অথচ ওই সময়ে রামকুমারবাবু সহ সাহিত্য আকাদেমির কর্তাব্যক্তিরা নিচে সুভাষদাকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁদেরকে একথা কেউ জিজ্ঞেস করল না। অসুস্থ গীতাদি হয়তো জানালেনই না, নীচে অমিয় দেব, জলিমোহন কল, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখও দাঁড়িয়ে আছেন।

অনন্তশয়নে কবি

আমরা ভিড় ঠেলে ৬০৪ নং ঘরে ঢুকলাম। শেষদিকে কবি গুরুতর কষ্ট আর যন্ত্রণা ভোগ করার পর তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু মনে হয় তাঁর মুখে স্নেহ মাখানো হাসিলাগা। মাথার কাছে বসে আছেন গীতাদি। পাশে তাঁর নাতনি মিউ আর অন্যান্যরা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর অন্যরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একটি পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে। পাঞ্জাবির গায়ে লেখা তাঁর কবিতা 'যাচ্ছি'।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চোখ তুলে আমাদের দেখলেন গীতাদি। অসুস্থ শরীর, ক্ষীণকণ্ঠ। এরই মধ্যে বললেন, দিলীপ, 'যাচ্ছি' কবিতাটা বল। সুভাষদার কবিতার বই খুলে দিলীপ পড়ল, 'ও মেঘ/ ও হাওয়া/ ও ছায়া/যাচ্ছি ও বাংলা ভাষা/ও রবি ঠাকুর/নিকট ও দূর/ ও ক্ষুৎ পিপাসা/যাচ্ছি'.../....'ওআঁকা, ও লেখা/ ও কুহু/ও কেকা /যাচ্ছি' সুভাষদা বিদায় নিচ্ছেন। দীর্ঘ কবিতা, পড়তে পড়তে দিলীপের গলায় কান্না ভেসে আসছিল। এ সময়টা সকলে চুপ ছিলেন। এক সময়ে পড়া শেষ হয়। নীরব গীতাদির চোখে জল। এরপরে বললেন, 'পাথরের ফুল' কবিতাটা...। দিলীপ পড়ল, 'ফুলগুলো সরিয়ে নাও/ আমার লাগছে, এবার ওর গলাটা কিন্তু স্পষ্ট। ও পড়ছে 'ফুলকে দিয়ে/মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলার বলেই/ফুলের ওপর কোনওদিনই আমার টান নেই। তার চেয়ে আমরা পছন্দ/আগুনের ফুলকি—/যা দিয়ে কোনওদিন কারও মুখোশ হয় না।' একসময়ে ওর পড়া শেষ হল। খানিকক্ষণ নীরবতা। গীতাদি বললেন, সুভাষের মরদেহে শুধুমাত্র আমার দেওয়া একটি লাল গোলাপ রেখো। অন্য মালাগুলি সরিয়ে অন্যত্র রেখো। আমার মনে হল, নেহরু মারা যাওয়ার পর সুভাষদার কবিতার লাইন,

'আমার প্রিয় রং লাল/আমার প্রিয়ফুল গোলাপ
আমি লড়ছি লাল-গোলাপের জন্য।'

হঠাৎ কে যেন বাইরে চীৎকার করে বলল, দাদা ফুল দেবেন না, ফুল দেবেন না। দিদি বারণ করেছেন।

ইতিমধ্যে দরজা ঠেলে ঢুকলেন গন-দর্পণের ব্রজ রায়। তিনি হাতের কাগজ দেখিয়ে গীতাদিকে বললেন, সুভাষদা মরদেহ দান করেছেন। সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর আছে আপনার ও আপনার বড় মেয়ে কৃষ্ণকলি রায়ের। কিন্তু এখন তাঁর মরদেহ দাহ করার কথা উঠছে কেন? গীতাদি বললেন, হ্যাঁ আমি স্বাক্ষর করেছি, কিন্তু পরে আমরা মত বদলেছি। সুভাষদার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায়, আমাদের ভালো লাগেনি। পরে অবশ্য আমরা এ বিষয়ে গীতাদিকে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁর বক্তব্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং চিনমোহন সেহানবশীশ দু'জনেই তাঁদের মরদেহ মেডিক্যাল কলেজে দানের কথা বলে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করেছিলেন। উমা সেহানবীশ এবং গীতাদি উভয়ে এই দুই ক্ষেত্রে সাক্ষী। কিন্তু মরদেহ দানের বিষয়ে উমা সেহানবীশ এবং তার মনে নানাবিধ প্রশ্ন ওঠে। যাঁরা তাঁদের মরদেহ দান করেছেন, দান করার পর যেভাবে এঁকে রাখা হয় তাতে অসম্মানও হয়। এটি সহ্য করা যায় না। এছাড়া অন্যান্য প্রশ্নও আছে। যে কারণে চিনমোহন সেহানবীশের দেহ উমাদি দান করেননি। দাহ হয়েছে। গীতাদি সুভাষদাকে এ বিষয়টি বলেছেন, গীতাদির মতে প্রকৃতি থেকে পাওয়া দেহ, প্রকৃতিতেই মিশে যাক। এ নিয়ে তাঁদের তর্কও হয়েছে। শেষে সুভাষদা অবশ্য বলেছেন তোমরা যা ভালো বোঝ কর। আমি তখন থাকব না। বিনয় চৌধুরীর মতন শ্রদ্ধেয় নেতার মরদেহ নিয়ে বিভিন্ন কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কানেও এসেছিল। এতে তিনি একসময় গুম হয়েও গিয়েছিলেন।

১২ টা নাগাদ, কথা ওঠে এবার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। সেই অনুযায়ী তৈরি হল। একদল তরুণ, সঙ্গে মেয়র এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ নিচে নামিয়ে আনলেন। শবদেহ নেওয়ার কাঁচের গাড়িতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ রাখা হল। এবার দ্রুততার সঙ্গে গাড়ি চলল সু-শিক্ষণ হয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকজন বিদগ্ধ মানুষ। রাজ্যের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং নন্দগোপাল ভট্টাচার্য যখন বেলভিউ নার্সিংহোমে এসেছেন, তখন কাঁচ ঢাকা মরদেহ নেওয়ার গাড়িতে সুভাষদাকে রাখা হচ্ছে।

৮ জুলাই ১২টা নাগাদ 'পদাতিক' সুভাষদা তাঁর বাড়িতে শেষবারের মতন এলেন। এলেন বললে ভুল হবে, কাঁচে ঢাকা গাড়িতে তাঁকে নিয়ে আসা হল। দূরদর্শনে খবর রটেছে। অনেকেই ছুটে এসেছেন কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। বড় রাস্তা থেকে সুভাষদার ঘর-সাড়ে তিনফুট চওড়া প্যাসেজ দিয়ে যেতে হয়। ওখানে তখন মানুষে ভর্তি। রাস্তায় মানুষ। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মৃণাল সেন, দেবেশ রায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব প্রমুখ।

রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সিপিআই নেতা নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, সিপিআই সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার, ইউসিপিআই দলের রাজ্য সম্পাদক সঙ্কর্ষণ রায়চৌধুরী প্রমুখও সেখানে দাঁড়িয়ে। সুভাষদার মরদেহ কাঁচের গাড়ি থেকে নামানো হয়। একদল তরুণ তাঁর দেহ কাঁধে নিল, মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক সৌগত রায়, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা মদন মিত্র প্রমুখ সুভাষদার মরদেহ নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরের বিছানায় রাখলেন। আশেপাশের দরজায় মানুষের ভীড়। সুভাষদার বাড়িতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ভীড়। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তাঁরা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তাঁর পালিতা কন্যারা। ফুঁপিয়ে কাঁদল কণিকা। গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে সুভাষদার সমস্ত শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছে।

গীতাদি অসুস্থ। চারঘন্টা ছুটিতে। তাঁকে পিজি হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছে। অসুস্থ গীতাদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, ভীড় ঠেলে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। তাঁকে ঘিরে আত্মীয়-স্বজনদের ভীড়। ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। সুভাষদার ঘরে ভীড়, ভীড় বাইরের প্যাসেজে, রাস্তায়। দূরদর্শন আকাশবাণীর সংবাদ বুলেটিনে সংবাদ শুনে তাঁর গুণগ্রাহীরা যেভাবে পারছেন আসছেন।

ইতিমধ্যে অনেকেই এছেসেন, রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার, অধ্যাপক অরুণ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য, মানব বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়, পার্থ বসু, কালান্তরের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সরকারে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অফিসার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র, শিল্পী মৈত্রেয়ী মজুমদার এমনি আরও সব চেনা মুখ। তবে সেদিন ওখানে অচেনা মুখের সংখ্যা যেন বেশি।

সুভাষদা শুয়ে রয়েছেন, বুকে তাঁর গীতাদির দেওয়া একটি মাত্র লাল গোলাপ। গায়ে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবী। যাতে লেখা তাঁরই কবিতা 'যাচ্ছি'। সুভাষদা যেন হাসছেন। অনেকেই ভীড় ঠেলে ফুল হাতে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ঘরের বাইরে একটি চেয়ারে 'কাগজে লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলি'। ফুল নিয়ে গেলে কয়েকজন তরুণ বলে উঠছে 'ফুল দেবেন না দাদা ফুল নিতে চাননি।' নীরবে সকলে ফুল বাইরে চেয়ারে রাখছেন। শেষবারের মতন নমস্কার জানিয়ে আসছেন। ঘটনাটা হঠাৎ একবার মেয়রের চোখে পড়ল, তিনি অবশ্য বললেন, আপনারা ফুল শরীরে ছুঁইয়ে পাশে রেখে দিন।

'মিডিয়া'র ভীড়। তারা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নিতে ব্যস্ত। অনেকে শোকে কথা বললেন না। প্রতিক্রিয়া দিলেন না। আবার কয়েকজন যেন উপযাজক হয়েই প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যস্ত হলেন। সুভাষদা যে তাঁদের কত কাছের মানুষ তা বলায় ব্যস্ত হলেন। দীর্ঘদিন এঁরা কিন্তু সুভাষদার কাছে যাননি। দিলীপ আর আমি বিস্ময়ে এগুলিই দেখছিলাম। ইতিমধ্যে মোবাইলে ফোন। মোবাইলে অনেকেই ফোন করছেন। যাঁরা আসতে পারেননি। তাঁরা জানতে চাইছেন। কবি তরুণ সান্যাল নিজে অসুস্থ। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার ফোন করছেন। কিন্তু এবার ফোন ঢাকা থেকে। ঢাকার জনৈক সাংবাদিক দিলীপকে খুঁজছে। আমি দিলীপকে দিলাম। ওরা জানালো সুভাষদার মৃত্যুতে ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি ছিল তাঁরাও শোক প্রকাশ করেছে। তাঁরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভুলবে না। ওদিকে থেকে বোধ হয় খবরের জন্য দিলীপের কাছে সুভাষদার অন্তিম যাত্রার বিস্তারিত খবর চাইছিল। দিলীপ তা বলল। ওরা জিজ্ঞেস করল পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি এসেছিলেন? দিলীপ বলল না, তবে তাঁর দপ্তর থেকে ফুল পাঠিয়েছেন। ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন বোধ হয় এই মোবাইল ফোনের কথাবার্তা খেয়াল করছিলেন। জনৈকা মধ্যবয়স্কা রমণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর নিজেই বললেন মুখ্যমন্ত্রী আসেননি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব তো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য'র ভাইয়ের ছেলে। সেদিক থেকেও তো তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে লোক, রক্তের আত্মীয় না হলেও আত্মীয়। তারই তো সুভাষদার চিকিৎসা থেকে সব কিছুর দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। হায়রে.....

আমরা কোনও কথা বললাম না, শুনলাম। দিলীপ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, কবি সুকান্ত থেকে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, একদা সুভাষদা এদের চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ নিয়ে অনেকের কাছে গিয়েছেন।

তখনও মানুষ আসছে। আমি লক্ষ্য করলাম বিরাটি, নিউ বারাকপুর অঞ্চলে আমার কিছু পরিচিত মানুষ, তখন এসেছেন। বাংলাদেশের উদিচীর সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম এবং তার স্ত্রী লায়লা ইমাম এসেছেন। সুভাষদা তাঁদের কাছে যশোহরের বিড়ি চেয়েছিলেন। সেই বড় এক কার্টুন যশোহরের বিড়ি তারা কালই পেয়েছেন। ভীড় ঠেলে সুভাষদাকে শেষ

শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা এক কোণায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ব্যাগ থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে দিলীপের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলেন। লায়লা ভাবীর চোখে তখন জল।

এর মধ্যে খবর এল সুভাষদার মরদেহ এখন কেওড়াতলায় নিয়ে যাওয়া হবে। মরদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁচ ঢাকা গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে। তখন ২টা বেজেছে। কথা ছিল তিনটা পর্যন্ত এখানে মরদেহ থাকবে। হঠাৎ সময় এগিয়ে আনা হল কেন? এর উত্তর কেউ দিয়ে পারল না। একজন বললেন, গীতাদিকে হাসপাতাল থেকে মাত্র ৪ ঘন্টার জন্য ছেড়েছে, বোধা হয় সে কারণে। তিনি শেষ বিদায় জানিয়ে যাবেন হয়তো।

কথা বলতে না বলতেই দেখি একদল তরুণ সুভাষদার মরদেহ নিয়ে কাঁচঢাকা গাড়িতে রাখছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা কাঁদছেন। দূরে শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, সৌরীন ভট্টাচার্য, দেবেশ রায় প্রমুখ মাথা নিচু করে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে। মিডিয়ার ঠেলাঠেলি শুরু হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালি গুহ অসুস্থ গীতাদিকে ধরে কাঁচ ঢাকা গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধা ড. ফুলরেণু গুহ প্রায় আলুথালু অবস্থায় ওখানে এসেছেন। ভিড় ঠেলে তাঁকেও গাড়ির কাছে আনা হল।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ভীড় ঠেলে দিলীপ ওই কাঁচের গাড়ির সামনে। সুভাষদার দেহ গাড়ির মধ্যে—তাঁকে ছোঁয়া যাবে না, পায়ের কাছে গাড়ি ধরে দিলীপ আবৃত্তি করছে, ওর বুক চিরে যেন কথা বের হচ্ছে।

'ও মেঘ/ও হাওয়া/ও রোদ/ও ছায়া/যাচ্ছি'

লক্ষ্য করলাম গীতাদিও আবৃত্তি করছেন ওই কবিতা।

ও পথ যাচ্ছি/পুতুল যাচ্ছি/শপথ যাচ্ছি

ও ছায়া যাচ্ছি/ ও মায়া আসছি/ও মিউ...

আমার পাশে দাঁড়িয়ে জনৈকা মধ্যবয়স্কা মহিলা। বোধহয় সু-শিক্ষণের শিক্ষিকা। তিনি চোখ বুজে আবৃত্তি করছেন, 'পাথরের ফুল'।

পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুকে একটি লাল গোলাপ নিয়ে, হেঁটে নয়, কাঁচের ঢাকা গাড়িতে শুয়ে রওয়ানা দিলেন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে।

কেওড়াতলা শ্মশানে

সুভাষদার মরদেহ শরৎ ব্যানার্জী রোড থেকে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে যাত্রা শুরু হলে আমরাও ছুটলাম কেওড়াতলায়। দিলীপ, সংস্কর্ষণ, দীপ্তি এবং আমি। আমরা যখন শ্মশানে গিয়ে পৌঁছুলাম তার আগেই অনেকে সেখানে এসে দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক সৌগত রায়, মালা রায় সহ মেয়র পরিষদের সদস্যরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর দেহ নিয়ে রেখেছেন বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে। সুভাষদার জামাই এবং পালিত কন্যারাও রয়েছেন, এখানেও এসে দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, প্রণব বিশ্বাস, প্রসূন বসু, সুধাংশু দে প্রমুখ। তখনও মানুষ শ্মশানে আসছে তাঁদের প্রিয় কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। দেখলাম কবি জয় গোস্বামী, কবি

গণেশ বসু, কবি জয়দেব বসু, শিল্পী বিষ্ণুপদ দাশ, লেখিকা কৃষ্ণা দত্ত তাঁরা ভীড় ঠেলে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন। অনেকে আসছেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন। একদা সুভাষদার সহকর্মী বর্ষীয়ান সাংবাদিক উৎপল ভাদুড়ি এসেছেন সপরিবারে, ইন্দু নন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, মলয় দাশগুপ্ত এসেছেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমবায় কর্তৃপক্ষ এলেন সদলে প্রায় ছুটতে ছুটতে। তাঁরা শেষ শ্রদ্ধা জানালেন। এমনি অনেকে এসে বৈদ্যুতিক চুল্লীর দিকে ছুটতে লাগলেন।

একসময়ে আমরাও উঠলাম। দিলীপ, সঙ্কর্ষণ, দীপ্তি, আমি এবং আরও অনেকে। বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে ভীড়। স্বয়ং মেয়র এবং মেয়র পরিষদের সদস্যরা ওই জায়গা সামলাচ্ছেন। আমাদের দেখে বিধায়ক সৌকত রায় নিজে ভীড় ঠেলে ভেতরে যেতে সাহায্য করলেন। আমরা প্রণাম করলাম। পদাতিকের পা শেষবারের মতন স্পর্শ করলাম।

তিনটা নাগাদ তাঁর দেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রবেশ করেছে। সুভাষদা লিখেছিলেন, তাঁর পছন্দ আগুনের ফুলকি—যা দিয়ে কোনও দিন কারও মুখোশ হয় না। সুভাষদা এখন আগুনের ফুলকির মধ্যে।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম, তার দেহ সম্পূর্ণভাবে পঞ্চভূতে বিলীনের জন্য। শ্মশান চত্বরে বিভিন্ন কোণায় জটলা। অনেকে তখনও আসছেন। শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেবরা দাঁড়িয়েই আছেন। আমরা একটি কোণ দেখে বসলাম।

কারও কিছুই ভালো লাগছে না। দিলীপ সুভাষদার কবিতা পড়া শুরু করল। ও পড়ছিল আস্তে। কে যেন বলল, একটু জোরে বলুন ভাই। পাশে ভীড় হল। 'যাচ্ছি', 'পাথরের ফুল', 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি' এমনি সব কবিতা পড়ল। 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি'র শেষ লাইনগুলি হল 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি/অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েও/তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো।' সুভাষদার মুখে স্নেহ মাখানো হাসির কথা মনে পড়ল আমার।

একজন এসে খবর দিল। দাহ শেষ হয়েছে। সুভাষদা পঞ্চভূতে বিলীন হলেন। আমরা উঠলাম। ফিরে আসতে আসতে দিলীপকে জিজ্ঞেস করলাম—তুই অতক্ষণ সুভাষদার পায়ের দিকে কি দেখছিলি? এবারে ও বলল, 'পদাতিকের পা দেখছিলাম।' তারপর বলল, এখন অনেকে কাঁদছেন, কিন্তু সুভাষদাকে নিয়ে ডান-বাঁয়ে মিলে সকলে কী করল বল। আমার আসলে সুভাষদার পা দেখে তার 'ল্যাং' কবিতাটি মনে পড়ছিল। তোর মনে আছে, ওই কবিতার শেষ পংক্তি।

'হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং।'

উৎস : সপ্তাহ, ১১-১৮ জুলাই, ২০০৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে—

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'পদাতিক'

বুদ্ধদেব বসু

দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে-সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভোগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এই ঈর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

অবশ্য এ-সম্মান কারও ভাগ্যেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, হওয়া উচিতও নয়। বাংলাদেশের যুবক কবিরা যে এমন অল্প সময়ের বয়োকনিষ্ঠতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আমাদের সকলের পক্ষেই এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। যুগান্তকারী প্রতিভা হয়তো শতাব্দীতে একটির বেশি জন্মায় না, এবং প্রত্যেক শতকেও জন্মায় না, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিশ্রমী ও বিবেকবান কবির সংখ্যা বাড়ছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও অনতিবিলম্বে তরুণতমতার গৌরব হারাবেন; তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাবার এইটেই সবচেয়ে শুভ লগ্ন।

অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তিনি এখন কবিকনিষ্ঠ। কিংবা নিছক এ-কারণেও নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে-পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনও আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ-কথার সাক্ষ্য দেবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না; কোনই অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিল। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে করি।

তাঁর কাব্যের এই দুটি লক্ষণের মধ্যে প্রথমটি নঙর্থক, এ-আপত্তি স্বীকার্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে একটি বাঙালি ছেলে যে বয়ঃসন্ধি সময়েও প্রেমের কবিতা লিখলে না, এ-ঘটনাকে সম্পূর্ণ নঙর্থক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কুড়ি বছর আগে, দশ বছর আগেও এটা সম্ভব হ'তো না। এতে বোঝা যায় যে সময় বদলাচ্ছে। কেউ যেন মনে না করেন আমি এমন ইঙ্গিত করছি যে প্রেমের কবিতা না-লেখার মধ্যেই প্রশংসনীয়

কিছু আছে; বরং আমি এটাই আশা করব যে কোনও সামাজিক অবস্থাতেই প্রেমের কবিতা লিখতে আমরা ভুলবো না। আমি বলতে চাই যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতি একটি সামাজিক লক্ষণ হয়তো দুর্লক্ষণ। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হ'য়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।

কবিতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার ঝোঁক রবীন্দ্রনাথে দেখা গেছে বারবার, আর রবীন্দ্রনাথের পর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই তিনজন কবি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু প্রকৃতির উদার মুক্তি থেকে মনুষ্যসমাজের সংকীর্ণতায় তাঁরা নেমে আসেননি; যতীন্দ্র সেনগুপ্তের মতো কটুভাষী কবিও প্রকৃতির বর্ণনায় ও বন্দনায় মুখর। 'কল্লোল'-যুগের যেসব কবিতায় বাংলা সাহিত্যের হাওয়া-বদলের খবর পাই, তাদের যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্য ছিল যে—মুক্তি, তা ব্যক্তির, সমষ্টির নয়। তার ঐতিহাসিক পটভূমিতে ছিল ইউরোপীয় রোমান্টিকতা ও প্রকৃতিবাদ, আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন অভিনব, আর তাঁর কাব্যে প্রেম কিংবা প্রকৃতির পরিবর্তে কোন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, সে আলোচনা এখন সহজ হবে। তিনি অভিনব শুধু একই কারণে যে সমর সেনের পরে, এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, কোনও বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য-কোনও সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই। তিনি স্পষ্টই বলেন :

কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি;
যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

শ্লোকটি বড়ো বেশি সহজ, কথাটা বড়ো বেশি স্পষ্ট; কবিতায় একটু বাঁকা ক'রে বললেই ব্যঞ্জনা হয়। কিন্তু এ-কথা এমনি সরল ও স্পষ্ট ক'রেই আমাদের নতুন কবিদের মধ্যে কোনও একজন ঘোষণা করবেন, এ-প্রত্যাশা আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের পক্ষে অন্যায় নয়। বাংলা কবিতায় এই ধরনের অনুভূতি সমর সেনের ক্ষুদ্র রচনাগুলিতেই আমরা প্রথম পাই; আমাদের কাব্যজগতে যে-আন্দোলন তিনি আনেন তার ফল এতদূর গড়িয়েছে যে এখন শক্তিশালী আধুনিক কবিদের অনেকেই সমাজবিপ্লবের আগমনী গাইছেন। কিন্তু সমর সেন নিজে মোহমুক্ত বুদ্ধিজীবির ভূমিকাই বরাবর বজায় রেখে আসছেন; সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও দুরূহ উল্লেখের সাহায্য ছাড়া বিষ্ণু দে-র মন কাজ করে না; আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় জ্যামিতির প্রস্তাবের মতোই ন্যায় সম্মত কবিতাসমূহে ধ্বংসোন্মুখ আভিজাত্যের যে-ছবি পাওয়া যায়, তা তিনি অভিজাতের মতোই ঠাণ্ডা মেজাজে দেখেছেন ও এঁকেছেন। সর্বনাশ যে আসন্ন—এমনকি উপস্থিত—এ-বিষয়ে সকলেই সচেতন; আর এই সচেতনতার ফলে

নৈরাশ্য ও বিদ্রূপই হয়েছে এ-যুগের কবিতার প্রধান দুটি সুর। কিন্তু এ সর্বনাশই যে নবীন সমাজকে প্রসব করবে, এই বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে এমনই জ্বলন্ত যে তিনি ব্যাঙ্গনিপুণ হ'য়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ দিয়েছে তা আশার উল্লাস।

তবু জানি ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে-যুগে নতুন জন্ম আনে
তবু জানি
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে ভস্ম হবে।
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। ('ঘরে-বাইরে' সমর সেন)

এই বিশ্বাসে 'পদাতিক' আগাগোড়া উদ্দীপিত; তার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক কাব্যের নৈরাশ্য থেকে বেঁচে গিয়েছেন।। সাম্যবাদই মানবজাতির ধ্রুব বা ঈঙ্গিত লক্ষ্য কিনা সে-বিষয়ে তর্ক তুলবো না এখানে; ধরে নেওয়া যাক যে কাব্যে বিশ্বাসের মূল্য নৈতিক নয়, শিল্পগত। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কবি জীবনকে বিশেষ—একটি ভঙ্গিতে দ্যাখেন বলে তাঁর কাব্যগুলি রসাত্মক কিংবা আবেগবাহী হয়ে উঠতে পারে সহজে, এবং শিল্পের সংক্রমণ-ক্ষমতা প্রবল ব'লে তখনকার মতো নাস্তিক পাঠকের মনেও সে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়—বিশ্বাসী কবির এই পর্যন্ত লাভ। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী পাঠকের পক্ষে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগের কোনও বাধা না থাকে, তাহ'লে সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকের পক্ষেও 'পদাতিক' উপভোগ্য হ'তে পারে না তা নয়।

বিশ্বাস যেখানে প্রবল, প্রকাশের ঝোঁক সেখানে সরলতার দিকে। 'পদাতিক' খুলে প্রথমেই পড়ি ঃ

প্রিয়, ফুল খেলিবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আজ স্বপ্নের সেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া ('মে-দিনের কবিতা')
'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি-ত্রিশঙ্কুকে।...
আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চড়তে চাই না এরোপ্লেনে,
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।। ('সকলের গান')

এ-সব চটুল ছন্দ শুনিয়েই সত্যেন্দ্র দত্ত একদা আমাদের মন মজিয়ে ছিলেন, কিন্তু সুভাষের এ-ধরনের রচনাগুলিতে একটি Lite আছে যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এসব ছন্দ

প্রায়ই এলিয়ে পড়তে চায়, একঘেয়েমির দুর্মুল্যে এদের মেদুরতা কিনতে হয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে যুক্তাক্ষর ছড়িয়ে সুভাষ এদের বাঁচিয়েছেন। এ-কবিতা দুটি আমার নিজের খুব পছন্দ নয়, কিন্তু এ-দুটি পড়ে মনে হয় যে 'জনগণের কবি' হবার প্রায় সমস্ত উপাদান এই তরুণ কবির আছে। অতীতের যেসব কবির সঙ্গে পাঠক সমাজের যোগ ছিল প্রত্যক্ষ, তাদের কথনভঙ্গিতে একটি অকুণ্ঠিত ঋজুতা পাওয়া যায়, কেননা সাধারণ লোক নিয়ে গঠিত একটি শ্রোতৃমণ্ডল মনের সামনে রেখেই তাঁরা লিখতেন। কবিতাকে বক্তৃতা বা কথকথার কাজে লাগাতে তাই তাঁদের লজ্জা ছিল না, বরং আনন্দ ছিল। শ-র 'ক্যাণ্ডিডা' নাটকের কবি যখন বলেন 'All poets speak to themselves, the world only overhears', তখন আধুনিক সমাজে কবির অবস্থার বর্ণনা করেন তিনি, কিন্তু যে-সমাজে কবির শ্রোতা ছিল জনসাধারণ, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নয়, সে-সমাজে কবি নিজের মনে গুনগুন করতেন না, বেশি চেঁচিয়ে সকলের শোনবার মতো করেই কথা বলতেন।

'পদাতিকে'র অনেক কবিতায় এই উচ্চস্বর, এই বক্তৃতার ঢং ধরা পড়ে। দ্রুত ছন্দে, সহজ কথ্যভাষায় কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ না-ক'রে বক্তব্যটিকে একেবারে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য ঃ

'সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছনে ফেলে
সব চেয়ে দ্রুত ট্রেনে ক'রে আজ
এখানে আসা
—আসানসোল।' ('আসানসোলে')

'এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সারি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি
কামারশালে?' ('এখানে')

'জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও...
দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা, বন্যার ঢেউ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই। (চীন ঃ ১৯৩৮)

নিছক কান দিয়ে শুনলে এ-সব কবিতা ভালো লাগবে; এদের আগাগোড়াই— এমনকি জাপানি বোমাবর্ষণের বর্ণনাতেও—শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার— এমনকি বেপরোয়া ফূর্তির—সুর; এ যেন বৃহৎ জনসভায়, বা 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা বলেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি; যে-ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি তার সুমিতি।

তবু, বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট কবিতায় জনপ্রিয়তা গুণ থাকা এতই দুরূহ যে চড়া গলা শুনলেই আমাদের সন্দেহ জাগে। নজরুলের উচ্চস্বরকে শেষ পর্যন্ত ভাবালুতায় অধঃপতিত হ'তে তো দেখলুম। সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে ফিরতেই হয় স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর দিকে, জটিল কলাকৌশলে, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায়, যদি তিনি কবি হিসেবে নিজের পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনা করেন।

'জনগণের কবি' হতে যাওয়ার এই বিপদ সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনবহিত নন। 'পদাতিকে' রয়েছে সরলতার পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসংকোচ, উচ্চ ঘোষণার পাশে-পাশে ব্যঙ্গের চাতুরী, ধ্বনির বিচ্ছুরিত আভা। সমসাময়িক অনেক কবির কাছেই তিনি পাঠ নিয়েছেন—বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে—কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারও অক্ষরের উপর মকশো-করা নয়; এত অল্প বয়সে যে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়।

বিশিষ্ট কলাকৌশলের যিনি অধিকারী তাঁর কাব্যচর্চা দুই কারণে সার্থক, কেননা তিনি যে শুধু নিজে ভালো কবিতা লেখেন তা নয়, নিজের ভাষার সমগ্র কাব্যকলাতেই অন্তত অল্প একটু পরিবর্তন ঘটান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে অভিনবত্বের কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি তা তাঁর কাব্যে সবচেয়ে গৌণ জিনিস, কারণ বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য দায়ী কবি নিজে নন, দায়ী তাঁর সামাজিক পরিবেশ। প্রসঙ্গের সরসতা পারদধর্মী; বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ মানুষের মনে এত ঘন-ঘন ওঠা-নামা করে যে শুধু বিষয়বস্তু নিয়েই কথা হ'লে এক যুগের সাহিত্য অন্য যুগে প্রায়ই পড়া যেত না। উদাহরণত, অনায়াসে কল্পনা করা যায় যে সাম্যবাদেই যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সাম্যবাদ হবে সাহিত্যের একটি নীরস বিষয়, কেননা, সেটা আর প্রার্থনীয় থাকবে না, হয়ে উঠব নিতান্ত বাস্তব। কালসংকটে যে-কোনো একটি সমাধানের ইঙ্গিতে অনেক পাঠকেরই মন নেচে ওঠে, কিন্তু সেটা অসাহিত্যিক কারণে। অনেক সময় কোনও ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে আমরা এও ভুলে যাই যে বিষয়ের দ্বারা কবিতা হয় না, কলাকৌশলই শব্দসমাবেশকে কবিতায় রূপান্তরিত করে, এবং কলাকৌশল বিষয় নিরপেক্ষ। শুধু বিষয়বস্তু দিয়ে কবিতার—বা যে-কোনও শিল্পের—বিচার করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে; কেননা শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয় মহিমা লাভ করে তা নয়, উপরন্তু একই বিষয় কোনও পাঠকের চোখে মহৎ, আবার অন্য কোনও পাঠকের চোখে দৃষ্য! এই কারণে কলাকৌশলের আলোচনা ভিন্ন কবিতার সমালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে শুধু বিষয়ের জন্য আমি আজ 'পদাতিকে'র প্রশংসা করতে বসিনি। যে-বিশ্বাসের কথা আগে বলেছি তা এই তরুণ কবির রচনায় শুধু সদিচ্ছা বা শুকনো নীতির রূপে প্রকাশ পায়নি, তাতে তিনি সরসতার সঞ্চার করতে পেরেছেন। তার উপর কলাকৌশলেও নৈপুণ্য লক্ষণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত, ছন্দ নিয়ে এই ৩২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানারকম পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন; নতুন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে তাঁর এই ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহ'লে বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনও পরিণতি তাঁর কাছে আশা করা অন্যায় হয় না।

তিন মাত্রা ও পয়ার, দু-রকম ছন্দেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওস্তাদ। পয়ারে তাঁর হসন্ত শব্দের ব্যবহার আমার রীতিমতো আশ্চর্য লেগেছে। পয়ারে যুক্তবর্ণকে আমরা একমাত্রা ধরি, কিন্তু হসন্তের পরে স্বরান্ত শব্দকে আলাদা মূল্য দিয়ে থাকি, এই নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, 'কল্কিতে' কথাটি নিঃসন্দেহে তিন মাত্রা হ'লেও 'কলকাতা' সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান, 'জল নিতে' লিখতে গেলে তাকে চার মাত্রায় মূল্য না-নিয়ে উপায় থাকে না। হসন্তের পূর্বে স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে বলবার যে-নিয়ম বাঙালির উচ্চারণে মজ্জাগত, তার সাহায্যেই এ-অসংগতি মানিয়ে যায়, এবং ভেবে দেখতে গেলে এই নিয়মের উপরেই পয়ারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উচ্চারণের স্বাভাবিক ঝোঁক বিকৃত না-ক'রেও পয়ারে হসন্তের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার সম্ভব। কয়েক বছর আগে পদ্যে একটি নাটিকা লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' কথাটা অনায়াসে তিন মাত্রায় জায়গা পায়—

'দেখা দিল কলকাতার আরো এক কাল'

এই পংক্তি স্বচ্ছন্দে পয়ারে স্থান পেতে পারে। বলা যায়, 'কলকাতার' শব্দটির 'ল ও 'কা' অদৃশ্য, কিন্তু শ্রুতিগম্য যুক্তবর্ণ রচনা করেছে এবং পংক্তিটি হঠাৎ যদি খটকা লাগায় তার কারণ এই যে ছন্দ পড়বার সময় আমাদের চোখের অভ্যাসকে ভুলতে পারি না। তারপর থেকে এ-ধরনের পরীক্ষা এখানে ওখানে করেছি, কিন্তু প্রথা-পথ থেকে বেশি দূরে সরতে সাহস পাইনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তীদের অনুশাসন ভ্রুক্ষেপমাত্র না-ক'রে হসন্তের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন ঃ হসন্তকে কখনও দিয়েছেন একমাত্রার গৌরব, কখনও বা পাশের স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে দিয়েছেন এঁটে ঃ ফলে তাঁর পয়ারে চলাফেরার একটি নতুন রকমের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। বিশেষত, বাক্যগুলিতে গদ্যের ছাঁচে ঢালাই করতে, ও বিদ্রূপ জমাতে, এ-কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। ২৩ পৃষ্ঠায় 'অতঃপর' নামে যে-গদ্যাকৃতি কবিতাটি রয়েছে, তার তর্কাতীত সাফল্যের মূলে এই কৌশলই রয়েছে ঃ

অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয়নি গত দুই তিন সনে
বিপদ একাকী নয়কো!
দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত পা সব হিম।

এতৎসত্ত্বেও হয়তো...
আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার?

ধনীদের তো পোয়া বারো
বিশেষত,—ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধি। ('অতঃপর')
গোলদিঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে।....
বসন্ত সত্যই আসবে? কী দরকার এসে? ('আলাপ')
অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে ('আলাপ')

এই পংক্তিগুলিতে 'খাজনা', 'নয়কো', 'হাত-পা', 'আসবে', 'অনেকদিন', 'খিদিরপুর', 'গোলদীঘির', 'কী দরকার' 'ধনীদের তো', 'ভারতবর্ষে', 'একচেটিয়া' কথাগুলি লক্ষণীয়। হসন্ত গেঁথে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী স্বরের প্রসঙ্গে, শুনতে খারাপ তো হয়নি, বরং মুখের কথার মতোই অবাধ গতিতে বিদ্রূপ হয়েছে ধারালো। 'হাত-পা সব হিম', 'ধনীদের তো পোয়া বারো', 'ভারতবর্ষে একচেটিয়া' এ-ক'টি সংযোগ খুবই দুঃসাহসী ও মৌলিক, —কোনো-না-কোনো তরফ থেকে আপত্তি না-উঠলে অবাক হবো। কিন্তু, 'ধনীদের পোয়া বারো', 'দুশ্চিন্তায় আমাদের হস্তপদ হিম', 'বিশেষত—ভারতে একচেটে নেতা গান্ধি' এ-রকম লিখতে গতানুগতিকের মনরক্ষা হ'তো, কিন্তু কবিতার মানরক্ষা হ'তো কি?

এ-রকম উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে—

'ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা
নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি...
হাজরা পার্কে সভা কাল
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন-দিবস; লাল-পাগড়ি মোতায়েন'

কিন্তু তাই বলে এ-কথা বলা চলে না কবির মনোযোগ হসন্তের সংশ্লেষণেই আবদ্ধ, বিশ্লিষ্ট ব্যবহারেও তিনি অকুণ্ঠিত।

'বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না...'

এখানে 'প্রত্যহ' আর 'লাগবে না' চার মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মোটের উপর হসন্তের উভয় রীতি নিপুণভাবে মিশিয়ে এই তরুণ কবি পয়ারের এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছেন।

তিন মাত্রার ছন্দ আঁটোসাটো, নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা, তাকে খেলানো শক্ত, কিন্তু এ-যন্ত্রেও সুভাষ তাঁর নিজের একটি সুর লাগিয়েছেন। নিপুণ কারিগরি ধরা পড়েছে তিনমাত্রায় যুগ্মস্বরের ব্যবহারে, তাছাড়া পংক্তিপ্রান্তিক যুক্তবর্ণে, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেননি ঃ

'রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি।
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি।' ('রোমান্টিক')

'কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন্ মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বলা এ দিনশেষে।' ('বধূ')

এ-সব কবিতা যে মিলবর্জিত তা কানে বোঝা যায় না, চোখের সাহায্য নিলে তবে ধরা পড়ে। ছন্দের গতিই এমন যে মিলের কাজ আপনিই সম্পন্ন হচ্ছে, এমন কোনও অভাব নেই যা মিল পূরণ করতে পারতো।

৩১ পৃষ্ঠায় 'কিংবদন্তী' নামে আট লাইনের যে-গদ্য আছে তার ছন্দের প্রতি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই.

চলছিল এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার।

এখানে তিন মাত্রার ছন্দকে পুরো বারো মাত্রা না-ক'রে এগারো মাত্রায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, শেষের কথাটা তাই একটু টেনে পড়বার ঝোঁক হয়, তাছাড়া হসন্ত শব্দ বেশি আছে ব'লে বেশ একটা দ্রুত রকমের দোলা জেগেছে।

এ-ছন্দের জাত অবশ্য নতুন নয়, এগারো মাত্রাও অভিনব নয়, এ-বইয়েরই ২৮ পৃষ্ঠায় এর আর -একটি উদাহরণ রয়েছে, যা অতি পরিচিত :

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গেরামে;
বার-বার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে। ('ধাঁধাঁ')

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হসন্ত শব্দের আধিক্যের জন্যই 'কিংবদন্তী' সুরটা হয়েছে আলাদা, আমার কানে তো নতুন শোনালো।

'পদাতিকের'র প্রায় সব কবিতাই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'বধূ' ও 'প্রস্তাব'। এ-দুটিতে ব্যঙ্গের লঘুতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আবেগ, কোথাও দু-ই হয়েছে রূপান্তরিত।

শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।
চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান। ('প্রস্তাব)

ঠাট্টাটা এমন যে আমরা যারা কোকিলের দিকেই কান ফেরাবার পক্ষপাতী, তাদের পক্ষেও বিস্বাদ নয়। 'বধূ'তে আছে সরল গ্রাম্য-জীবনের আর আধুনিক নগরজীবনের প্রতি তুলনা। দুটি সুরই একসঙ্গে বাজছে; মধুরের সঙ্গে রূঢ়কে, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে কৌশলে জড়ানো হয়েছে ব'লে পদে পদে অপ্রত্যাশিত চমক লাগছে; কবিতাটির সম্পূর্ণ ইঙ্গিত গ্রহণ করতে হ'লে অন্তত দু-বার পড়তে হয়।

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দু'ধারে ফেলে ছায়া,

প'ড়ে মনটা বিশেষ একটি সুরে বাঁধা হয়, বিশেষ একরকমের প্রত্যাশা জাগে, কিন্তু সে প্রত্যাশা চূর্ণ হয় তার পরেই যখন পড়ি :

ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।

এটা Sublime থেকে ridiculous-এ আসবার দৃষ্টান্ত নয়, দুই বিপরীত জগতের সংঘাত ঘটিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করা হ'লো।

ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে

গ্রামের খাসা জীবন ছাড়তে হ'লো, এদিকে শহরও নির্মম, নিঃসুখ :

বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।

ঠাট্টার সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘশ্বাস, স্পষ্ট শোনা গেলো।

একটা কথা বলা দরকার। এ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'কে ব্যঙ্গ করা হয়নি, তাকে বিশ-শতকীজীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিষয় এক, নামও এক, রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে, তবু—কিংবা সেই জন্যই—এটি সত্যিকার মৌলিক রচনা হতে পেরেছে। এই কবিতাটিকে বলতে ইচ্ছে করে মাষ্টারপীস, অন্তত এটি যে একটি 'tour de force', সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য একটি 'tour de force' 'অতঃপর' কবিতাটি। এর ছন্দের কথা আগেই বলেছি; এর বিষয় ভারতের ইতিহাসের পালাবদল; কথা খরচ হয়েছে কম, অথচ সব কথাই আছে। জমিদারি ও মহাজনিতে আয় কমে যাচ্ছে, তার উপর—

বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশ বিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম—পৈতৃক বলাও চলে।

কিন্তু তবু আশা আছে ঃ

...মহাশয়,—জমিদারি যায় যাক। বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

বিষয়টিতে নূতনত্ব নেই— কবিতায় তা থাকা বোধ হয় উচিতও নয়— কিন্তু নূতনত্ব আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথনভঙ্গিতে, তাঁর সংকোচনের ক্ষমতায়। এই বিষয়েই আরও দু-একটি কবিতা পাওয়া যাবে 'পদাতিক'; সাময়িক প্রসঙ্গকে, এমনকি সংবাদপত্রের তথ্যকে আবেগের তাপে গালিয়ে নিয়ে সুভাষ তাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।

'নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা' ('নারদের ডায়েরি')

আবার, 'বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।' ('নির্বাচনিক')

'বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী।' ('নির্বাচনিক')

কিংবা

'তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়।' ('পদাতিক')

এমনও নয় যে এই তরুণ কবি বেঁকিয়ে ছাড়া কথা বলতে শেখেননি। মাঝে মাঝে এমন এক-একটি ছবি তিনি তুলে ধরেছেন যা এমনকি জীবনানন্দ দাশকে মনে করিয়ে দেয়, যাঁর সঙ্গে এঁর সব বিষয়েই দুস্তর ব্যবধান—

সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হ'লো কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ! ('বিরোধ')
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্নের নদী। ('পদাতিক')

অপরাহ্নের এই নদীটিকে আমরা সহজে ভুলবো না।

১৫ পৃষ্ঠায় কবি কিছুটা সরল ও গদ্যময়ভাবে ঘোষণা করেছেন : 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ'। আর শেষ কবিতার শেষ পংক্তি দুটিতে :

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমারে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই।

অতএব তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই। কবিত্বশক্তিও তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ। তবু, এখানে আরম্ভ মাত্র। 'পদাতিকে' দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি : প্রথমে, সরল, চড়া গলার কবিতা, যা 'জনপ্রিয়' হবার দাবি রাখে, অন্য দিকে জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু-দিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিসেবেই, কবি হিসেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হতে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?

উৎস : কালের পুতুল, ১৯৪০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবি ও কর্মী

জগদীশ ভট্টাচার্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি হিসাবে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন তাঁর পদাতিক চিরকুট, অগ্নিকোণ, ফুল ফুটুক লেখা হয়ে গেছে তখন তিনি বলেছেন ঃ

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

চলমান জীবনের পথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াই যে কবির কাম্য তিনি একই সঙ্গে কবি এবং কর্মী। কাজে ও কথায় এই একঘনতা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য। চিরচলিষ্ণুতাই তাঁর কবিমানসের স্বভাব ধর্ম।

পদাতিক, চিরকুট, অগ্নিকোণের কবি যখন 'যত দূরেই যাই' লেখেন তখন তাঁর স্বরান্তর লক্ষ্য না করে পারা যায় না। গ্রন্থের নামকবিতায় তিনি বলেন :

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই।
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।

হতাশার মালা-গাঁথা এক নদী, আর নিকোনো উঠোনে সারি সারি লক্ষ্মীর পা যাঁর চলার সঙ্গী তাঁরই মুখে শুনতে পাই দীক্ষিতের গান—

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার
আত্মদানের; স্বপ্ন একটি—পৃথিবী গড়ার।

জীবনের পথে সুভাষ যতো এগিয়েছে, এই কড়ি ও কোমলেই তাঁর স্বপ্ন ও সংকল্প গড়ে উঠেছে।

কেউ কেউ বলেন, সুভাষ সমকালীনতাকেই তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু

ব্যর্থ জীবনের প্রতি সমবেদনায় তিনি কত গভীরে অবগাহন করতে পারেন 'ফুল ফুটুক' গ্রন্থের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কাব্যের এটি একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

(২) আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক পদযাত্রার দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কবির ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১-তে 'জল সইতে', ১৯৮৩-তে 'চইচই-চইচই', ১৯৮৫ তে 'বাঘ ডেকেছিল' এবং ১৯৮৯-এ 'যা রে কাগজের নৌকা'। ১৯৮৯-এ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার যে ষষ্ঠ পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার শেষ কবিতা হল 'বাঘ ডেকেছিল' গ্রন্থের 'টানা ভগতের গান'। টানা ভগত একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। কবির এই আদিবাসী চেতনা সুভাষ কাব্য-রসিকের নতুন প্রাপ্তি। অবহেলিত, সভ্যতার আলো থেকে নির্বাসিত এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই সুভাষ নতুন আলোর সন্ধ্যান পেয়েছেন। 'টানা ভগতের গান' কবিতায় বলছেন :

মাটির পেট থেকে সব কথা
আজও বার করা যায়নি
আরও কত পাথরের হাতিয়ার
হাড়ের অলংকার আর মাটির তৈজস
মুখের আরও কত কথা
খোদাই করা আরও কত অক্ষর
অন্ধকার থেকে আলোয় আসার প্রতীক্ষায়।

তাই আলোর প্রত্যাশায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন :

সন্ধ্যের পর শহরময় আলো নিভে গেল,
অন্ধকারের কালো পর্দায়
তবু আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে
জবাকুসুমসংকাশং সেই মহাদ্যুতিকে খুঁজি
শক্তিকে যে বেঁধে রেখেছে
অঙ্গারের মধ্যে।

অর্থাৎ আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই আছে অঙ্গারের মধ্যে বেঁধে রাখা মহাদ্যুতিময় শক্তি। সভ্যতার প্রত্যন্তবাসী এই শক্তিচেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েই কবি বলেছেন:

হেঁকে আজ বলুক সবাই
মানুষ আমার ভাই!
বন্ধ কর ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না।

'বদলাচ্ছে দিন' কবিতায় সুভাষ বলছেন, 'দুনিয়া ছিল কাল যেখানে,/আজ আর/সেখানে

নেই।' 'খুলে যাচ্ছে দরজা জানলা/বন্ধ কবাট/সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।'

সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি জাগাতে হলে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবির সুভাষিত—সবার উপরে মানুষ সত্য—অচল হয়ে গেছে। মানুষ নয়, চাই মনুষ্যত্ব। সুভাষ তাই বলেন ঃ

সবার উপর আজ সত্য
মনুষ্যত্ব।

এই মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস রেখে 'আজকের গান' দিয়ে কবি তাঁর সত্তরপূর্তির কাব্য শেষ করেছেন। বলেছেন :

কাজে কথায় সমান হ-ভাই
ডাক দিয়েছে গুরুর গুরু
লম্বা চওড়া বলিস কী ছাই
কর এখনই যজ্ঞ শুরু।
যেখানে হয় সবাই সমান
সবার জন্যে সকলের টান
সেখানে হাত আপনি বাড়ান
আল্লা-হরি-মারাংবুরু।

কবির 'আজকের গান'-এ আল্লা হরির সঙ্গে যোগ দিয়েছে আদিবাসী জনের অধিদেবতা মারাংবুরু। কবির ভবিষ্যতের গানে আশা করব সর্বজনীন মানবপ্রেম মনুষ্যত্বের মহিমায় সর্বত্রচারী হবে।

(জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়, এর উদ্যোক্তা ছিল 'সপ্তাহ' পত্রিকা ও এলাহবাদ ব্যাঙ্ক ওয়ার্কাস ইউনিয়ন। এই সভার সভাপতি হিসেব ড. জগদীশ ভট্টাচার্য এই বক্তব্য রেখেছিলেন।)

উৎস : সপ্তাহ, ১৪-২১ মার্চ, ২০০৩

জ্যোতির্লোক থেকে নিসর্গ প্রকৃতি ছুঁয়ে সাধারণের

তাপস বসু

১.

শিল্পীর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে। ছবি আঁকিয়ে কিংবা স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে Imagination বা কল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক। পৃথিবীর তাবৎ শিল্প-নির্মাণের ক্ষেত্রে যেসব চমৎকারিত্ব—নান্দনিকতা যুগান্তকারী আখ্যা পেয়েছে তার মূলেই আছে স্রষ্টার স্বাধীন চিন্তা। শিল্পের শিরায় শিরায় যেমন উত্তেজনা থাকে কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। কবিও শিল্পীর মত ভাবেন তারপর লেখেন। এ শুধু ফরাসী দেশেই নয়, তাবৎ কবি-শিল্পদের ক্ষেত্রে এটাই সত্য। এই সূত্রেই কবিজনেদের চিন্তায়-ভাবনায়-কল্পনায় অর্থাৎ Imagination সব কিছুই উঠে আসে স্তরান্বয়ে জ্যোতির্লোক থেকে মৃত্তিকা ভূমিষ্ঠ হয় সব কিছুই। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী—নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও কল্পলোকের বাসিন্দা। তাঁর কল্পনায় ইহলোক-পরলোক, জ্যোতির্লোক প্রকৃতির ফুল-ফল সর্বোপরি মানুষের হাসি-কান্নার দোলা মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞা-মনন ও সহজতা পাশাপাশি উপস্থিত থাকে। তুলনায় জীবনানন্দের কল্পনা, চিন্তা-ভাবনা অনেক বেশি আত্মনুসারী, ব্যক্তিক; অবশ্যই সুগভীর মননঋদ্ধ। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ক্ষেত্রে সংরূপ লালিত হয় অনিবার্যভাবেই। জীবনানন্দের অনন্ত নক্ষত্রবীথি কিম্বা অগণন শবের মধ্যে পূর্ণিমা-অমাবস্যা, চন্দ্র-সূর্য যেমন থাকে তেমনি বোধহীন উদ্বন্ধনে যাওয়া 'আট বছর আগের একদিন'-এর লোকটিও থাকে। এ সেই জ্যোতির্লোক থেকে মানবলোকের ক্রমপরম্পরায় পৌঁছানো। রূপসী বাংলার কবিতাগুলিতে প্রকৃতির অজর অমর রূপময় ছবি উঠে আসে, জীবনানন্দের প্রায় প্রতি কবিতায়। অর্থাৎ অরণ্যানী ফল-ফুল-নদী-খাল-বন সব মিলিয়ে এক অসাধারণ অনুভব।

বৈষ্ণব কবিজন বা রবীন্দ্রনাথের এবং জীবনানন্দের ক্ষেত্রে যা Cosmic Imagination, উত্তর রৈবিক কবিদের ক্ষেত্রে সবসময় তা যে দেখা মিলেছে এমনটি বলা যাবে না। তবে প্রসঙ্গটি শিল্পীজনের মতোই কবিজনেরা এড়িয়ে যাননি, যেতে পারেননি, যাওয়া সম্ভবও ছিল না। এর জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়া দরকার পড়ে না, কিম্বা প্রকৃতির পাঠ নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিভূতিভূষণের মত বনে-বাদাড়ে ঘুরতে হয় না, কিংবা কমিউনিস্ট কবিদের মতো জনগণের সঙ্গে মিছিলে সবসময় হাঁটতে হয় না। অন্তরমুখীন ভাবনা থেকে অন্তরচেতনায় তার আসা-যাওয়া চলে, চলতেই থাকে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের এতগুলো কথা বলতে হলো।

২.

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) বাংলা কবিতায় চারের দশকের কবি অর্থাৎ ওই সময় থেকে তাঁর কবিতা লেখার সূচনা। তারপর গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়েই তাঁর লেখা

থেকেছে সচল। তাঁকে সামনা-সামনি দেখা, মুখোমুখি বসে কথা বলা কিংবা নানা অনুসঙ্গে তাঁর কাছাকাছি যাওয়া;—এসব কিছু থেকে বিশ্ব নাগরিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার দুটি কথা বলার থেকে যায়। (ক) তিনি সুপুরুষ ও সুভাষী। (খ) তিনি যা বলেন, যা করেন তা স্পষ্টভাবেই বলেন এবং করেন। কোন কৃত্রিমতা বা লুকোছাপা থাকে না।

সুভাষের ব্যক্তি জীবন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে পথ চলা। উত্তরকালে সতীর্থজনের আচার-আচরণে-কমিউনিস্টদের রাজ্য শাসনে, কথা ও কাজের ফারাক থেকে ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনার চরম বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতার মধ্যেই রেখাপাত করেছে নানাভাবে। তা নিয়ে গবেষণা-মূল্যায়ন চলতেই পারে। তবে সেক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা বা আবছায়া অন্ধকারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ থাকে না। 'পদাতিক' (১৯৩৮-১৯৪০) থেকে 'ছড়ানো ঘুটি' (২০০১) পর্যন্ত একের পর এক কাব্যগুলির সঙ্গে নিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা দেখতে পাই, 'মে দিনের কবিতা' লিখতে তিনি ব্যস্ত, সালেমনের মা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন, মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, লাল টুকটুকে দিন দেখবার আশায় প্রবলভাবেই তৃষিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক অপেক্ষা অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত, দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিজের ছায়া দেখে স্তম্ভিত, মধ্যসত্তাভোগী ফড়েদের প্রতি ধ্বনিত ধিক্কার পূর্ব এবং উত্তর পক্ষের মধ্যে সংঘাতে বিদীর্ণ হওয়া। কিন্তু কবি সুভাষ তখনও পুরোপুরি কবি হয়ে ওঠেনি। তিনের দশকে একেবারে অন্তিমে কিংবা চারের দশকের শুরুর দিনগুলিতে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছেন। একজন আদর্শবান কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিকদিবস পয়লা-মেকে সামনে রেখেই সূচনা করেছেন তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী। 'মে-দিনের' কবিতা'টি ২০ বছরের এক যুবকের কাছ থেকে সাবলীলভাবেই আমরা পেয়ে গিয়েছি অকৃত্রিম আবেগ-ভালোবাসা রাঙানো অনুভবে;—

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।।"

পুরো কবিতাটি এক কথায় অনবদ্য। সমকালের বহুমুখী আন্দোলন, বিপর্যয়, বিভ্রান্তি এবং মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রত্যয় দীপ্তিতে প্রসঙ্গত আমরা পাঁচটি স্তবকে অবশিষ্ট চারটি স্তবকে কয়েকটি লাইন অবশ্যই তুলে ধরবো;—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
* * * * * * * *
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

* * * * * * * * *

বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।

* * * * * * * * *

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"

একদিকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা অন্যদিকে বাংলার আনাচে-কানাচে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের আর্তনাদ পাশাপাশি আসন্ন মন্বন্তরের চীল-চীৎকার সময়কে যেমন আচ্ছন্ন করেছে বিভিন্ন গণমুখী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, কবি হৃদয়ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে সমর্পিত প্রাণকে বাজি রেখেছে, তাই তিনি ভয়ডর হীন। ভাবী জয়োল্লাসের অনেকটাই উল্লাসিত তাই তিনি বলে উঠতে পারেন;—

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না"

এ যেন সহযোগী, সতীর্থ, সহযোদ্ধা সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মায়া, মোহ থেকে বাস্তবের রক্ততটে টেনে আনার এক চৌম্বক আহ্বান;—

"আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?
ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী;
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।"

এই কবিতার শেষ স্তবকে জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় কমিউনিজমের আদর্শ এবং সাম্যবাদের সার্বিক লক্ষ;— এইভাবে এগোলে আমরা প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আগুন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠতে দেখবো ক্রমপরম্পরায় সুভাষের পরবর্তী নানা কবিতায়। প্রসঙ্গত, আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাবো জ্যতির্লোকের কথায়।

৩.

সুভাষ পদাতিক কবি হয়েও চাঁদ-জ্যোৎস্না-মেঘ-বৃষ্টির কথা ভুলে যাননি বরং জ্যোতির্লোকের এই বিষয়গুলি রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের মতো বহুবার ব্যবহৃত না হলেও উত্তপ্ত আন্দোলনের পাশেই তাদের প্রসঙ্গ টেনে আনা। 'সকলের গান' কবিতায় 'কুয়াশা কঠিন বাসর', 'আকাশের চাঁদ', 'আগ্নেয় গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি', 'রোমান্টিক' কবিতায় 'অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য', 'জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎধান্য', 'রাত্রি রাত্রিরই পুনরুক্তি', 'চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি' অনায়াস ভঙ্গিতেই উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের সঙ্গে

এ প্রসঙ্গে সুভাষের পার্থক্য কাব্য—ভাষার, জীবনানন্দের অব্যবহিত পরবর্তীকালে বা সমসাময়িক কালে অবশ্য কবিজনের উপমা-অলংকারের, শব্দের নিটোল ব্যবহারে জ্যোতির্লোকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, তবে তা প্রকাশ পায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আদলে। নবযুগের আন্দোলন প্রসঙ্গ সরাসরি জীবনানন্দ, সুধীনন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিতায় তুলে ধরেন না, যা করেন ব্যাপ্ত চরাচরকে অনুভূতির মধ্যে টেনে আনে। সুভাষের কবিতার মতো ওঁদের কবিতায় আন্দোলনের আবেগ সরাসরি উঠে আসে না। বরং মর্মান্তিক যন্ত্রণা মেধার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের 'বোধ', 'আট বছর আগের একদিন' 'মানুষের মৃত্যু হলে', 'তিমির হননের গান' ইত্যাদি কবিতায় আমরা তা প্রত্যক্ষ কবি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উঠপাখি', 'যযাতি' বিষ্ণু দে'র 'জলদাও', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' এরই সমগোত্রীয়।

সুভাষের 'পদাতিক' কাব্যের 'নির্বাচনী' কবিতায় ফাল্গুন অথবা চৈত্রের বাতাস কীভাবে দিক বদলায়, নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী কীভাবে উঠে আসে, বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গু স্বপ্নে অশরীরি, 'পদাতিক' শিরোনামের কবিতায়—'প্রতিবেশী চাঁদ নয়তো অনাত্মীয়/রামধনু রং দেশেও জমাবো পাড়ি' কিংবা 'লালমেঘ গুহা পাবেন না হয়তো খুঁজে' অথবা 'চাঁদের চোখেতে পরুক অন্ধছানি' বা 'ফাল্গুনি কবিরা/অর্ধেক চাঁদের মতো কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে'— এই সব দৃষ্টান্ত আমরা পরপর তুলে ধরতে পারি।

৪.

প্রথম দিকের কবিতায় জ্যোতির্লোকের কথা যতটা বেশি ধরা দিয়েছে, শেষের দিকে ততটা নয়, এবার অরণ্যানির প্রসঙ্গে যাবো। অরণ্যানি বলতে সুভাষের কবিতায় প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশকে আমরা বোঝাতে চাই। সুভাষ আন্দোলনের কারণে নানাস্থানে গিয়েছেন। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন। চটকলের বস্তিবাসীর সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাণিত হয়ে তিনি উত্তরকালে দুই চিহ্নিত কবি শক্তি-সুনীলের মতো বনে-বাদাড়ে বা সমুদ্রে-পাহাড়ে যাননি, যাওয়ার তেমন সুযোগও হয়নি। কিন্তু তাঁর কবিতায় প্রকৃতি অনুপস্থিত থাকেনি। চন্দ্র-সূর্য, পূর্ণিমা-অমাবস্যা, গ্রহ-নক্ষত্র সুভাষের কবিতায় যেমন উঠে আসে তেমনি ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বাসন্তী বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। পদাতিক কবিতায় সুভাষ সোজাসুজি তাঁর অরণ্যে পদচারণা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এইভাবে;—

'এখানে' কবিতায় প্রকৃতির স্পর্শ আছে যথেষ্ট;—

"এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের পায় সারি সারি সব
চিমনি চূড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিক—

খাড়া করে কান কাস্তের শাণ
শুনেছ নাকি
কামারশালে
* * * * * * * *
ঊর্মিল ভুঁই হাঁটে বনহীন
তেপান্তরে;
সরু সরু ঘাস, শিরে বুঝি তার
শিশির জলে
দুই দিকে দূর বালুদের দেশ'
মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে পায়ে পায়ে রাখে
চিকন রেখা....

পরের কবিতাতেই সমকালীন প্রেক্ষাপট প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামীণ জীবনের আবহকে তুলে ধরেছে কবিতাটি। অবশ্যই সেখানে প্রকৃতি আছে, আছে পির্যস্ত জীবনের ভয় ভীতি। অবশ্যই কবি সুভাষের বহু ব্যবহৃত অন্ধকারের প্রসঙ্গ—যা থেকে তিনি উত্তরণ চান—যাকে বাক্যে—চিত্রকল্পে এ অন্ধ্য কারের কথা নানাভাবেই উঠে আসে। জীবনানন্দের অন্ধকার সেখানে বড় বেশি ব্যক্তিক (individual) এবং অবশ্যই রোমান্টিক—যেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্ধকারের ছবি থেকে সামাজিক বিষয় জন্ম নেয়—'আরও একটা দিন' শীর্ষক কবিতায় অন্ধকার ও আলোর ছবি আমাদের চৈতন্যে আগামী দিনের স্বপ্ন বুনে দেয় সমতলে'—

"দুপায়ে রাস্তায় কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে
এইমাত্র চলে গেল
আরও একটা দিন।
মাথার ওপরে টিন
শব্দ করে
মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে।
সজনে গাছে ডাল ধরে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা।

জলায় এবার ভালো ধান হবে—
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে

সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।"

'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'দিনান্তে' কবিতায় অস্তাচলগামী সূর্যের ছবি কবি নিজস্ব রীতিতে তুলে ধরেন। সূর্যাস্তের চিত্রকল্পটির মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে এক টালমাটাল সময়পর্ব মূর্ত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর কালোবাজারী—মজুতদার—দুরবৃত্তায়ন, অন্যদিকে চীন-ভারত যুদ্ধ, প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু-র মৃত্যু, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতানৈক্য, ভাঙনের অনিবার্য ইঙ্গিত ধরা পড়েছে 'রক্তগঙ্গা', 'দুর্ধর্ষ ডাকাত','সরেজমিন তদন্ত', 'পুলিশের কালো গাড়ি'—ইত্যাদি ছবিতে। বিপরীতে এসেছে 'ভয়চকিত হরিণী'-র উপমা—

"পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোন দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো
রাস্তার মানুষের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল
সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল
সন্ধ্যা।
আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়লো
অন্ধকার।
পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মতো
আমাকে জড়িয়ে ধরল
হাওয়া।।"

বিখ্যাত কবিতা 'পাথরের ফুল' এই কাব্যেরই অন্তর্গত। তিনটি পর্বে বিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতা এটি। যদিও কবিতার শুরুতে বা শেষে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এটি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত। কবিতাটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ে আমরা বুঝতে পারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের ট্রাজিক পরিণতি সুভাষ সংশ্লিষ্ট কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন। বন্ধু-সতীর্থ মানিকের অসময়ে চলে যাওয়া, প্রবল অর্থকষ্টে দিনাতিপাত, প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়া ইত্যাদি কবিতাটিকে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছে।

এটিকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণ জ্যোতির্লোকের ইতস্তত প্রকাশ এবং প্রকৃতির টুকরো টুকরো ছবি,—

"রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কীভাবে সকাল হয়,
আমার দিনমান গেছে
অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে।
আমি এক দিন, এক মুহূর্তের জন্যেও
থামিনি।
জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।"

কবিতাটি শুরু হয়েছিল অন্তবিহীন ক্ষোভের তীব্র দহনে। সেই দহনের দীপ্তি ছড়িয়ে আছে সমগ্র কবিতায়,—

"ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।"
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল জমতে জমতে পাথর।
পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
* * * * * * * *
ছেলেটা আমার
পুটুলি পাকিয়ে বসে।
বোকা ছেলে আমার,
ছি, ছি এই তুই বীরপুরুষ?
শিতের তো সবে শুরু—
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে?

এই শীত-শৈত্য জন্ম নেয় ছলনা—প্রতারণা—আত্মপ্রবঞ্চনা-বিশ্বাসহীনতা থেকে। নৈরাশ্য, হতাশা আমাদের শ্লথ করে, খর্ব করে। কবি তাই ফুলের থেকে ফুলকিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন,—

"ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
তার চেয়ে আমার পছন্দ

আগুনের ফুলকি—
যা দিয়ে কোনদিন কারো মুখোশ হয় না।"

এইভাবেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি জীবনের প্রথম পর্বে ('কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয় ১৯৬৪তে, তার পূর্ব পর্যন্ত) সংগ্রামী চেতনায় শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনের নানা ছবি, নানা দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে কখনও সচেতনভাবে কখনওবা অচেতনভাবে নিসর্গ প্রকৃতি এবং জ্যোতির্লোকের হাত ধরেছেন। তাতে এক বৃহত্তর বোধের আততি প্রকাশ পেয়েছে। যা সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অবশ্যই স্বতন্ত্র করেছে। তাঁর কবিজীবনের আরও দুটি পর্ব আছে—একটি বিভাজিত কমিউনিস্ট পার্টির সি পি আই অর্থাৎ মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা এবং অপরটি সি পি আই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনে ডাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এ আই সি পি-র অন্তর্ভুক্তি। এই দুই পর্বে রচিত কবিতাগুলির মধ্যেও আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গটির কম বেশি উপস্থিত আছে। তার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তী পর্যায়ে করা যেতে পারে।

মাটি ছোঁয়া প্রকৃতির সঙ্গে আকাশে সূর্য-চন্দ্র ঢাকা মেঘেদের ঘন ঘন যাওয়া আসায় চমকে ওঠে বিদ্যুৎ—তারই আলোয় সংগ্রামী মানুষ খুঁজে নেয় চলার পথ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখ ও মুখোশকে নেয় চিনে, শাণিত কাস্তে ফসল কাটার প্রহর গুণতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন নীতিকে বিনষ্ট করতে পারে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। তাদের শ্রম ও সুচেতনাই পারে সমস্ত 'আগাছা' উপড়ে ফেলতে;—

"মেঘে মেঘে তারা চকমকি ঠুকে
পথের নিশানা করে।
বজ্রের সুরে বেঁধে নেয় গলা। হাঁকে—
দিন এসে গেছে, ভাই রে—
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে, ভাই রে—
বিদেশিরাজের প্রাণভোমরা কে
নখে নখে টিপে মারবার।
দিন এসে গেছে।

লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
ফেলবার।
দিন আসে ভাই—
কাস্তের মুখে নতুন ফসল
তুলবার।" (অগ্নিকোণ)

সুভাষের বিখ্যাত-বহুপঠিত-বহুশ্রুত একটি কবিতা—'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'লাল টুকটুকে দিন'। কবিতাটির মধ্যে প্রকৃতির আবরণ ও আভরণের চমৎকার প্রয়োগে উঠে এসেছে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা। মিছিল—বহু মানুষ পায়ে পায়ে হেঁটে যায় দিনের বেলায় খর মধ্যাহ্ন রোদ্দুরে মাখামাখি হয়ে। ফিরে আসে দিনের শেষে, অন্ধকারে—ভাঙাচোরা ঘরে 'পিলসুজের আলোয়'। সংগ্রামের ঊর্মিমুখর এই প্রেক্ষাপটেও সুভাষ যে তৎপরতা দিয়ে প্রকৃতিকে ধরবার এবং ব্যবহার করার সাহস দেখান কিংবা প্রকৃতির বিষয়কে অবলম্বন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সংগ্রামের প্রেক্ষিতকে নিয়ে তরতরিয়ে এগোন—তা আমাদের উজ্জীবিত-উদ্দীপিত করে।—

"তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ।
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো করে বসে আছে পিলসুজে।
দিনের দূর ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা ঠা রোদ্দুরে পাইনি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি
তুমি স্বপ্ন?
না তুমি মায়া?" (লাল টুকটুকে দিন)

এই কাব্যের 'সুন্দর' কবিতাটিতে রূপের ব্যবহার অতুলনীয়। সূর্য কবিতাটির প্রধান বিষয়। সূর্য ও সূর্যে প্রতিভাত সৌন্দর্য কবি সুভাষের কাছে তখনই পূর্ণয়াত হয়ে ওঠে, যখন চটকলে ছুটির ভোঁ বাজার পর 'মাথায় চটের ফেঁসো' জড়ানো শ্রমিকদের 'উত্তোলিত দুই বাহু সংগ্রামী ইস্তেহার সংগ্রহের জন্য ঢেকে দেয় অস্তরবির রশ্মি আভাকে;— তখনই সূর্য ও তার আলোকদীপ্তি সত্যিকার সৌন্দর্য ও পূর্ণশক্তি লাভ করে,—

"যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ইস্তেহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।"

অথচ, যেসব চিরন্তন বিষয় সৌন্দর্যের উদ্দীপক—তা সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ-শক্তি-চেতনা বিভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। 'উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গ'—এই শব্দবন্ধে সংঘবদ্ধ

শক্তি—সংঘবদ্ধ চেতনার দীপ্তি ক্রমশ হয়ে ওঠে, আর এই সংগ্রাম অবশ্যই সংগ্রাম সত্য—নিত্য। তাই তা সুন্দর সৌন্দর্যের নতুন বোধ ও বোধির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। এটি সুভাষের বেশ অনবদ্যতা।

তাই দমকা হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচল, 'বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম' যা 'মুক্তোর মতো জ্বলছিল'— তার থেকেও সত্য হয়ে উঠলো সংগ্রামী বাহুর উত্তোলিত বাহুর আড়ালে থাকা সূর্য—ছড়িয়ে পড়া সূর্যরশ্মি।

এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে কলকাতা মহানগরীর পথে ঘাটে সন্ধ্যায় নেমে আসা ছবিটির সঙ্গে বয়স্ক আইবুড়ো মেয়েটি এবং শান বাঁধানো ফুটপাথে গজিয়ে ওঠা কচি কচি পাতায় অনাদরে 'কাটখোট্টা' গাছটিকে যুক্ত করে দেয়, মিলিয়ে মিশিয়ে এক লয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় বিপর্যস্ত জীবনায়নকে। আশাভঙ্গের ছবিটি নির্মমভাবে কবি সুভাষ তুলে ধরেন শৈল্পিক সততায়। কিন্তু কবিতাটি শেষ হয়েছে অস্তিবাদে, নৈরাশ্যে নয়—প্রবল আশায়-প্রদীপ্ত প্রভায়। যে সব চিত্রকল্প এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে মহানগরের বুকে তুচ্ছ—তাচ্ছিল্যে জেগে থাকা প্রকৃতি-সাধারণ মানুষের বিবর্ণ জীবনের ছবি কবির কলমে কখনো উজ্জ্বল করেছে, কখনোবা বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। বৈপরীত্যে—মিলনে যে ছবি তাতে দুঃখ থেকে উত্তরণই যে লক্ষ তা প্রকাশিত এই কবিতায়;—

"লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ গলির এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাতপাঁচ ভাবছিল
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ; পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি;
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।।"

এই ছবিটি নির্মম বাস্তবতায় মাখামাখি হলেও প্রকৃতির বিনষ্টির ছবি জ্যোতির্লোকের হাত ধরে উপস্থিত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ দৈনন্দিনের কবি

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কবিতার নির্মাণে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে যেমন ট্রান্সডেনডেন্ট বা সাহিত্য, কন্টিনজেন্ট বা ইতিহাস আবার কেবলমাত্র সেই সময় বা রাজনীতি থাকে, তেমনি থাকে চিহ্নক বা শব্দ লিখিত ইমেজ, চিহ্নিত অর্থ এবং রেফারেন্ট, বাস্তব জগৎ। কবিতায় যে অর্থ সঞ্চারিত তাকে প্রচলিত অর্থে সত্য হতে হবে এমন কথা নেই, এটি 'textually produced, contextually deferred'. আর কথিত ও অকথিতর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অর্থের বহুস্বর ধ্বনিত হয়। আর অর্থের বহুত্বতে কবিতা যে নিজেকেও ছাপিয়ে গিয়ে অন্য অর্থের দিকে অগ্রসর হয় তখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা, শক্তির আভাস আসে। কবিতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া যে চিরন্তন মানুষের ধারণা তাও রূপান্তরিত হয়ে বদ্ধতার বিপরীতে চলে যেতে পারে। একই শব্দ : একই উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন বার্তা নিয়ে আসে সময়ের সঙ্গে কবি ও কবিতার নতুন ডায়ালগে। একটি সময়ে লেখা কবিতা, কবির চেতন-অবচেতনে সময় যে রসায়ন ঘটায় তার প্রকাশ। ঐ সময়ের রসায়নে, পাঠক এর যে অর্থ নির্মাণ করে, কবিতা যে অর্থ সঞ্চারিত করে, অন্য সময়ে বা স্থানে তার মেসেজ বা বার্তা পৃথক হতে পারে। একই উপমা-চিত্রকল্প, মেটাফর-মেটোনিমি অন্য অর্থ আনতে পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও তাই। এখানে ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ফেরা-পরিবর্তন, শিবির ত্যাগ বিবেচ্যই নয়, বিবেচ্য তাঁর কবিতা ঐ পুনরুৎপাদনের, পুনঃসৃষ্টির ক্ষমতা রাখে কিনা। কবিতা-ইতিহাস-রাজনীতি, শব্দ-অর্থ-বাস্তব জগৎ যেভাবে তাঁর কবিতায় ধৃত, তার উত্তরণ কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে?

কবিতার মেসেজ সময়ের, ইতিহাসের পর্বান্তরে কেমন পাল্টায় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে-সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হত বুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?"

কবিতাটি যখন লেখা হয়েছিল, তখন এর অর্থ ছিল, সকলের গান—মিলিত অগ্রগতির আহ্বান। কিন্তু আজকের আন্তর্জাতিক ও এ-দেশীয় ইতিহাসে মনে হতেই পারে কবিতাটিতে ব্যঙ্গ তীব্রভাবে আছে। অর্থাৎ যে প্রত্যয়, যে বিশ্বাসের ভূমিতে কবিতাটির জন্ম, আজকের শূন্যতায়ই হয় তাকে নিতান্তই একরৈখিক একটা উচ্চারণ মনে হবে, নচেৎ এর নতুন অর্থ নিষ্কাশিত হবে। আমাদের কাছে কবিতাটির জোর ঐ দ্বিতীয় কারণে। এর বাচনভঙ্গী, এর

উপমা সবই যেন দেখায় এক অন্য অর্থের জগৎকে। অর্থাৎ বাইরের বাস্তব কবির চৈতন্যে যে নির্মাণ ঘটিয়েছিল, তার কবিতায়ণে সেই জোর ছিল যাতে সময় পাল্টালেও কবিতাটি অন্য অর্থে জেগে ওঠে। 'লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা'—'উল্কি' শব্দটার মধ্যেই যেন বর্তমান সময় এসে যায়, যেমন স্বস্তিকা, যেমন স্যাফ্রন। তৃতীয় লাইনে, আর এক প্রক্রিয়ার কথা : কোন সংশয় থেকে, চৈতন্য থেকে আসায়িক, হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে দলে টানা। 'আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি? ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া"—এই লাইনদু'টিতে যান্ত্রিক এক বদ্ধতায় বিদ্রূপই যেন বাজে। কবিতাটির নতুন জন্ম এভাবে হয় বিশ শতকের শেষ পাদে এসে। আবার জুতোটার ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কাব্যের প্রতিপক্ষে যখন মন বাধা হয়, তখনই কাব্য আসে ইতিহাস-রাজনীতির চিহ্নক-চিহ্নিতের অর্থের বিস্তারে :

"রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সর্বহারাদের বস্তি।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এই নানা অর্থের সঞ্চারে, বার্তার নানামুখিতায় শৈল্পিক মায়ায় বাস্তবজাত, আবার বাস্তব থেকে পৃথক। ঐ difference তাঁর কবিতাকে স্ব-মর্যাদায় স্থিত করেছে। বলা যেতে পারে, হৃত এক অভিজ্ঞতারই যেন কবিতায় প্রতিফলন ঘটছে। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসের অংশ হয়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অবশ্যই কবিতার সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিজের সঙ্গে ও সময়ের সঙ্গে লড়ছেন। আবার কোনো কোনো আবেগের কবিতার রূপ আজও এক অর্থই বহন করছে, কারণ সময় কোন পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে আনতে পারেনি। ইতিহাস সেই বাস্তবকে আরও প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

"শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন;
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু
শবের গলিত গন্ধ ছোটে।
খরসূর্য মাথার উপরে।
ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,
শূন্য পেটে চাষাবাদ চুপ
কারখানায় পাড়ায় কুলুপ।"

এই সময়েরই তো ছবি। 'গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে ভল্লার তীরের স্পর্শ'—এ উচ্চারণ আজ নিশ্চয়ই অন্য মানে আনবে : কবিতাটির প্রাথমিক জেসচারে অন্য অর্থ ছিল। কিন্তু আজ যখন দেশটি নতুন করে বিক্রয় করে দেওয়া হচ্ছে, যখন প্রয়োজন নতুন স্বাধীনতা যুদ্ধের তখন 'আজকের তুরঙ্গ ইতিহাসের দেশপ্রেম বল্গা ধরে'—রা চিত্রপ্রকল্প নতুন বার্তা

আনে। 'এদেশ আমার গর্ব/এ মাটি আমার চোখে সোনা/আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা'—এই উক্তির অন্তর্নিহিত আবেগ এখনও একই অভিঘাত আনে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঐ সময়-ইতিহাস ও ব্যক্তির উচ্চারণে গতিময় থাকে। নানা কবিতাই পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ উল্লেখ নির্দিষ্টভাবে সময়-লগ্ন। সুভাষ কবিতাতে সময়কে এভাবে আনতে ভয় পেতেন না। তার ফলে, সময়ের বিপরীতে তাঁকে হয়তো আজ দাঁড়াতে হয়, একটি বিশেষ সময়-বৃত্তের চাপ, আবেগ পরবর্তী সময়ে উধাও হয়ে যায়, অথচ কবিতার শরীরে এরা প্রত্যক্ষভাবে লেগে। সুভাষ এই প্রত্যক্ষতার সীমায় কাটান চিত্র-মমতায়, চিত্রকল্পে আর উচ্চারণের দৈনন্দিন কথ্যপ্রবাহে। কবিতার ভাঁজে ঐ দৈনন্দিনের গল্পকে গেঁথে দেন। 'মেজাজ'—এর মত কবিতা তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন : শাশুড়ী-বৌ-এর প্রাত্যহিক কাহিনীর এই চেনা গল্প সুভাষের হাতে কবিতা হয়ে ওঠে ছোটগল্পের মোচড়ে : বলছে 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।... কী নাম দেবো, জানো? আফ্রিকা। কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।' এই দৈনন্দিনের গল্প, দৈন্যশূন্যের ভাষায়, কবিতায় জড়িয়ে নিল ইতিহাসকে, রাজনীতিকে, আবার সাহিত্যের আকাশকেও।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কীর্তিই এখানে, তিনি কবিতাকে দৈনন্দিনে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা এমনিতে সাদামাঠা, কিন্তু কবিতার নির্মাণে জটিল। যে কোন কবিই জানেন কবিতার ভাষা প্রাত্যহিক মুখের ভাষা নয়, এ এক স্বতন্ত্র নির্মাণ। সংযোগের মুখের ভাষা তাই কবিতা নয়, কিন্তু এই ভাষার ডায়ালগে একটা অস্তিত্বের সঙ্গে আরেকটি অস্তিত্বের সংঘাতে কবিতার চাপা বিদ্যুৎ থাকে। কবি তাকেই নিজের চিহ্নকে চিহ্নতায় রূপান্তরিত করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এখানে তিনি দৈনন্দিন ঐ ভাষা ও বাস্তব থেকে কবিতায় আসেন না, কবিতাকেই নিয়ে যান ঐ দৈনন্দিনে। আমাদের কবিতার জগতে ও ইতিহাসে এভাবে দৈনন্দিন কদাচিৎ এসেছে : হয়তো এতে ছায়া ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রচেষ্টা। এখন কিন্তু যাকে গদ্য-কবিতা, স্প্রাংচিদম বলে তা নয়। এর পুরো জগৎটাই মৌখিক উচ্চারণের ছন্দে ও ছন্দঃস্পন্দে নির্মিত :

"ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায়না হাওয়া।
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে ক্ষিধে করতে। পাঁচিলে বেড়াল দিচ্ছে ডন।
কেননা আলসেয় কাক। গাল হাত দিয়ে ভাবছে একা বোকা হাবা—
হায়, মেয়েটির আজ পাকা দেখা। পাত্র কিনল মেড-ইন লণ্ডন।

গল্প-সম্পর্ক মিলিয়ে ছবিটার চতুর্থ লাইনে গল্পের কবিতা বা কবিতার গল্প। এরপরও ছবি : 'দমকল পুরুত গেল ঘন্টা নেড়ে'—চিত্রকল্পনাটিতে কবিতার আকাশ। মেয়েটির বিবাহের অনুষঙ্গে পুরুতের উপমাটি অব্যর্থ। দমকল। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই চোখের জলের মত। হায়, আজ পাকা দেখা। গল্প, দৈনন্দিনের এই বেদনা কবিতায় শরীর

পাচ্ছে এমনভাবে যেন contextually deferred. টেকসটে যা বলছেন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যা বলছেন না। যেন দৈনন্দিনের জীবন, যা আছে তার মতই যা নেই—এর তাৎপর্য। আর শেষে এসে স্রষ্টা কবিতার বেদনায় ভেঙে পড়ে—'অমনি পাকা গিন্নি পৃথিবীটা শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল—ছেই-ছেই-ছেই।' সমগ্র বাক্যটি যাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলবেন ব্যাকরণ সম্মত, তাই। আর ছেই-ছেই-ছেই—এ তো একেবারে দৈনন্দিন উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে-র মত মহৎ কবি এসেছেন তাঁদের অমিত কীর্তির পাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই অবনত, কিন্তু তাঁরাও কবিতাকে কবিতার শুদ্ধতায় রেখে এভাবে দৈনন্দিনে আসেননি। দৈনন্দিনের ঊর্ধ্বের কোন কল্পনায় সুভাষ আন্দোলিত নন—তাঁর কাছে রাজনীতি-বিপ্লব-কবিতা সবই দৈনন্দিনের অন্তর্ভুক্ত আর এখানেই বৈপ্লবিক। বাংলা কবিতার পরম্পরাতেও এক প্রতিবাদী স্বর :

"আমি আমার ভাবনাগুলোকে
চামচে ক'রে নাড়তে থাকব—
অন্য কোনো টেবিল থেকে তুমি শুনো।"

এই চায়ের কাপের চিত্রকল্পে সময় আসে, চায়ের কাপের সামনে বসে থাকা মানুষটার হাতের দু'আঙুলে স্মৃতি। ঐ কাপের মধ্যে চা-আসলে সময়।

"তারপর
যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে সময়।"

সমগ্র দৈনন্দিনের ছবিতে এই দু'টি লাইন ঐ জগতকে মেনেই কবিতাকে আনে : প্রথম তিন লাইনের ছবিটি সময়ের আধার হয়ে উঠতে থাকে। ঐ ভাবনার নড়াচড়া ছেড়ে, সময় জুড়িয়ে গেলে মানুষটা উঠে চলে যাবে, কোথায়?

"যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া
যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি।"

এই আশ্চর্য প্রেমের কবিতাটিতে দৈনন্দিন কবিতা কেমন প্রবেশ করে, দৈনন্দিন কেমন কবিতা হয় : প্রথম তিনটি লাইনের স্তবকের দৈনন্দিন ছবি কেমন তৃতীয় লাইনের স্তবকের শেষে এক ভয়ঙ্কর কবিতার দিকে ধাবমান, ঠিক যেমন আমাদের প্রত্যহ, প্রত্যাহিক জীবনযাপনই হয়ে ওঠে তীব্র আবেগময়, দুন্দুভির হাওয়ায় বেজে উঠতে চায় কোন মুহূর্তে। পাশের টেবিল থেকে ভাবনার নাড়াচড়া যে দেখছে, সেই ঐ প্রকৃতি তথা ইতিহাসের উৎক্ষেপকে দেখবে। 'তোমার' দূর থেকে দেখার এই ব্যঞ্জনায় দৈনন্দিনই ইইতহাস হয়ে ওঠে। এদিক থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধু আধুনিক নন, আধুনিকোত্তরও বটে।

যে কথাটি বলতে চাইছি সেটি হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতাকে আবিষ্কার করেন, টেনে বের করেন প্রাত্যহিক দৈনন্দিন আপাত তুচ্ছতায়। তিনি দেখাতে পারেন, কবিতা কোন উচ্চমানের বিশেষ ব্যাপার নয়, তন্ত্রমন্ত্রের মত বিশেষ ভাষাও নয়। কবিতার ছন্দ আসলে মানুষের দৈনন্দিনের ভাষাতেই আছে। সুভাষ তাই নিতান্ত কবিতাহীন দৃশ্যতেও কবিতাকে পেয়ে যান :

"ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উটকো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে করে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মত
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল।"

এ দৈনন্দিনকে কবিতা করা নয়, কবিতাকে দৈনন্দিনে নিয়ে আসা। আর পরপর ছবিগুলিই কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে—সুভাষের কবিতার ডমিন্যান্ট ছবি। কখনও প্রত্যক্ষ বর্ণনা, কখনও উপমা-চিত্রকল্পে। আর ঐ দৃশ্যগুলি থেকেই আস্তে আস্তে অন্য মাত্রা সামনে আসে। কলের চুঁইয়ে পড়া জল শব্দ করছে, ঐ চ্ছলাৎ চ্ছলাৎ শব্দের মধ্যেই আর একটি ছবি :

"মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটি মন্থর ট্রাম।

ঝড়ের সুর ও মন্থর ট্রামের বৈপরীত্যে একটা আপাত স্বাভাবিক অবস্থার আড়ালের আবেগটি আসে—জল চুঁইয়ে চুঁইয়েই পড়ে ঝাঁঝরিতে। এই কলের জলের শব্দই যেন অন্য আর এক জলকে আনে : স্তব্ধ পাহাড়ে/চ্ছলাৎ চ্ছলাৎ চ্ছল/ এক অদৃশ্য ঝর্ণার শব্দ। মিছিল তো এ পথ দিয়েই যাবে—কবিতার শেষ ছত্রের এই চূড়া ঐ শব্দ ও স্তব্ধতার, ধ্বনি ও দৃশ্যের ধাক্কাধাক্কিতে এল। এ শুধু শুদ্ধ কবিতাই নয়, এ তো চালচ্চিত্রও। দৈনন্দিনের মধ্যে যেখানে ক্লান্তি পৌণপুনিকতা সবাই দেখে, কবিতার জগতে, শিল্পের জগতে মুক্তি চায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেখানে কবিতাকে বসান দৈনন্দিনে, ঐ প্রত্যহের জগতই তাঁর কাছে কবিতা।

কিন্তু, কবিতা যেহেতু কেবল একজন ব্যক্তি লেখে না, সময়-ইতিহাস-পারিপার্শ্বিক-শ্রেণী লেখে, রাজনীতি-অর্থনীতি লেখে, সেহেতু দৈনন্দিনের ঐ কবিতার প্রবহমানে থাকাটা কেবল কবির উপর নির্ভর করে না। দৈনন্দিন থাকা মানে বাইরের বাস্তবকেই বিষয়ী করে তোলা। সময়ের বক্রতায়, রাজনীতির শূন্যচারিতায়, শ্রেণীর ক্রম বিকৃতিতে, ঐ বাস্তবের ওপর ক্রমশ 'আমি' কবিব্যক্তিত্ব এসে যায়—নিজেই তখন বিষয়ী হয়ে ওঠেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। যে সুভাষ ইতিহাসের কণ্ঠস্বর অন্য ব্যক্তির মধ্যে শুনতে পেয়েছিলেন,

তিনিই ঐ দৈনন্দিনকে 'আমি'-র মধ্যে আনেন, কারণ ওই দৈনন্দিনে আর তিনি কবিতা পান না। তাই বলে ওঠেন :

"আমার প্রত্যেকটা চাল
পাখি পড়ানোর মতো ক'রে বলে দিতে চাইবে।...
আমার খেলাটা, দোহাই
এখন থেকে আমাকেই খেলতে দিন।"

যিনি বলেন, আসমুদ্র হিমাচল আমার বিশ্বাসের জমি, আমাকে কথায় ভুলিয়ে যে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, তিনিই আবার সংশয়ে দুলে ওঠেন :

"এ অন্ধকারে
কেউ যদি আমাকে আলো দেখায়
আমি তার হাত মুচড়ে দেব।
কেননা
অপরিচয়ের এই অন্ধকার
এখন আমার বন্ধু।"

যে কবি নিজের কাজ বলতে বোঝেন, কথাগুলোকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাতে, স্থির ছবিকে হাঁটাতে, তাঁকে কেউ কবি বলুক তা তিনি চান না, কেবল :

"আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাকটরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।"

তিনিই দৃশ্যে এখন দেখেন, ফুটপাতে খড়ির দাগ মোছেনি এখনও। তাঁর মনে হয়, 'রাস্তার ঝাঁঝরির মুখে বিড়বিড় বিড়বিড় জানিনা কে আউড়ে যাচ্ছে কিসের মন্তর।' যে কবি একদিন মিলিত অগ্রগতির ডাক দিয়েছিলেন, তিনি আজ আহ্বানের কোন উত্তর পান না। অনেকটা রাস্তা উজিয়ে তিনি এলেন পড়ন্ত বেলায়, কিন্তু চেনা মানুষদের দেখেন না, উঠোনে এসে একা লাঠির ঠকঠক আর গাছের পাতার শব্দ।

"কই, এসো হে—
ঘরে ফেরা পাখির কলরবে
দূরাগত শাঁখের আওয়াজে
দিনাবসানের আজানে
আমার সেই ডাক
আর কাউকে না পেয়ে

মাথা নিচু ক'রে
আবার আমার কাছেই ফিরে আসে।"

এই আমার কাছে আমার ডাক ফিরে আসার এক ট্র্যাজিক সময়ের কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন। দৈনন্দিনের এই বিষন্নতাই ধরে দেন এই কবি। দৈনন্দিনের যে ভালবাসায় তিনি পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-শোষণ, সেই ভালবাসাই তো নেই—'কারণ, যারা ক্রীতদাস আমি তাদের কখনই ভালবাসি না।' এই, আমি সে কারণেই সুভাষের কবিতার জগতে ক্রমশ প্রাধান্য পায়। একশো আমির আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়র কথা বলেন, কিন্তু এটাও জানেন :

"প্রতিশ্রুত কয়েকটা রেখা ছাড়া
এখন আমার হাতে
সত্যি বলতে
আর কিছুই নেই।"

এই দৈনন্দিন প্রত্যয়ের 'আর কিছুই নেই'—এর বিষাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ক্রমশ জড়ায়। রাস্তার ছোট ছোট গর্তে জমানো চোখের জলের ওপর 'লাফাতে লাফাতে সময় চলে গেল।' এই সময়ের লাফিয়ে যাওয়ার মধ্যেও তিনি আনন্দ খুঁজে পেতে চান, জীবনকে ভালবাসায় নিবিড়ভাবে ধরতে চান। কিন্তু আর 'আমাদের হাত-মিলানো গানে'র সমূহ স্রোত নেই, 'ভাতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর'—এর বিশ্বাস নেই। এখন দৈনন্দিনের কবি 'আমার' কথা বলেন :

"আমার শোবার ঘরে একে একে এসে পড়া অশেষ মোটা রকমের রাত্রি,
বলিদান নিয়ে জ্বলন্ত যে তার হৈ চৈ,
আমার মধ্যে যতটুকু ঋষিদৃষ্টি আছে তারা চাইছে, ম্লান মুখে,
আর নানা বস্তুর একটা ঠোকাঠুকি চলেছে কিন্তু তাদের ডাকে
কোনো সাড়া মিলছে না,
এক ক্ষান্তহীন আন্দোলন, আর নাম নিয়ে এক বিভ্রাট।"

এই বস্তুর ঠোকাঠুকি, কোনো সাড়া না পাওয়া, মোটা রকমের রাত্রি এসে পড়া আমার শোবার ঘরে—সময়ের জটিল আবর্তে এভাবেই দৈনন্দিনের জগৎ ভেঙে যায়। নাম নিয়ে বিভ্রাট এক বিপ্লব অভিজ্ঞানেরই সংকট। আমার মধ্যে যতটুকু ঋষিদৃষ্টি আছে—'আমার' ও 'ঋষিদৃষ্টি' শব্দ দু'টি লক্ষণীয়। কাব্যকৃতিতে এরাই ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকে। বলিদান শব্দটিতে একটা ক্রিটিকই যেন গড়ে উঠতে চায়। দৈনন্দিনের কবিতার জাগরণ এভাবেই তির্যক হয়ে যায়, অথচ যে ভালবাসায় ঐ দৈনন্দিন এসেছিল তা কিন্তু থেকেই যায়। কবিতাটি পাবলো নেরুদার অনুবাদ, কিন্তু একজন কবির অনুবাদও আসলে তাঁরই নিজের স্থান ও সময়ের উক্তি। নাজিম হিকমতের অনুবাদক যখন এ কবিতা অনুবাদ করেন তখন

বোঝা যায় তার নিজের কাব্যকৃতিতেও অন্য মুখ দেখা দিয়েছে। কবিতা-ইতিহাস-রাজনীতি এভাবেই জড়ায় অন্যভাবে আবার সুভাষের কবিতায়। চিহ্নক-চিহ্নিত, বাইরের বাস্তবকে টেকসটে আনে আগের মতই—কিন্তু যেহেতু সময়-বাস্তব মোটা রকমের রাত্রিতে নিমজ্জমান সেহেতু আসে আমি, আমার। প্রতিশ্রুত কয়েকটি রেখা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখতে পান না। সেই ছোট পাখিটার মতই তার মনে হয়, 'কে জানে ব্যাধ পেতেছে ফাঁদ ছড়ানো কোন দানায়।' লাল উল্কির চিহ্ন বা সাইন আজ তার প্রতীকী উজ্জীবন হারিয়েছে, তাই এই অমেয় ভালবাসার কবি হৃদয়ের লাল ডাকবাকসের কথা বলেন, চিঠির নাম-ঠিকানা নেই, কিন্তু তিনি বসে আছেন, কালবৈশাখী ঝড়ের আশায় : 'ভালবাসা বাড়াচ্ছে যার হাত নীলকণ্ঠ পাখির বাসায়।' ঐ ভালবাসাই আবার হয়তো দৈনন্দিনের কবিতাকে নিয়ে আসবে। শূন্য যে শূন্য নয়, এ বোধে কবি এখনও স্থিত :

"লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর
শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়; চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,
আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে, দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে
সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরে আমরা প্রত্যেকে।
জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি,
অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো, শিশির বিন্দুর শান্তি
ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
হাত নেড়ে বলে : বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে।"

নারী : কবি সুভাষের কবিতায়

তরুণ মুখোপাধ্যায়

সিমোন দ্য বোভোয়ার The Second Sex গ্রন্থে তিনি কীভাবে নারী নিজেকে নির্মাণ করে, তার তত্ত্ব ও তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে ওঠে নারী'। "কিংবদন্তী" পর্যায়ে তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্য—'নারী হচ্ছে মাংস, মাংসের সুখ ও বিপদ। নারীর জন্যে পুরুষও যে লিঙ্গ ও মাংস, তা কখনো ঘোষিত হয়নি।' (দ্বিতীয় লিঙ্গ/অনুবাদক : হুমায়ুন আজাদ) আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন—নারী—

> সে প্রতিমা, ভৃত্য, জীবনের উৎস, অন্ধকারের শক্তি; সে সত্যের আদি নৈঃশব্দ, সে ছল, গুজব ও মিথ্যাচার; সে শুশ্রুষাকর উপস্থিতি ও মায়াবিনী; সে পুরুষের শিকার, তার পতন, সে সব কিছু পুরুষ যা নয় এবং পুরুষ যা কামনা করে,.....(তদেব/পৃ. ১২৬)

এ প্রসঙ্গে আমরা প্লেটোর কথা বলতে পারি। তিনি Timaens গ্রন্থে বলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্বে আছে তিনটি প্রত্যয়—Receptive principle (গ্রহীতা বা ধারক), Generative Principle (উৎপাদী), এবং Thing generated (উৎপাদ)। যথাক্রমে বলা যায়, প্রথমটি মাতৃরূপ, দ্বিতীয়টি পিতৃরূপ এবং তৃতীয়টি সন্তান-স্বরূপ। জুডিথ বাউলার এজন্য নারীকে বলেছেন, সে চেতনাগ্রাহ্য ও পুরুষের ধারণার মূর্তরূপ—'Specular feminine'. (দ্র. বস্তুরূপের পুনর্পাঠ/সম্মিত চট্টোপাধ্যায়/সংকলন : দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ/সম্পাদনা : নন্দিতা বাগ্‌চী ও অতসী চ্যাটার্জী সিন্‌হা)।

নারীকে নিয়ে তাই পুরুষের ভাব ও ভাবনার শেষ নেই। তাকে ঘিরে লেখা হয় কবিতা, গান; আঁকা হয় ছবি। নারীকে ঘিরে পুরুষ বিকশিত হয়; আবার তার অভাবে শূন্যতায়, বিষাদে, অবসাদে ক্ষয় হয় তার। বোভোয়া বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' গ্রন্থে বোভোয়ার ভাবনা ও বক্তব্যকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে দেখতে পারি।—

১। পুরুষ নারীর মধ্যে অপরকে খোঁজে প্রকৃতিরূপে এবং সহচর সত্তারূপে।

২। পুরুষ নারীকে শোষণ করে, নারী পুরুষকে চুরমার করে, পুরুষ নারী থেকে জন্ম নেয় এবং নারীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে; নারী তার সত্তার উৎস।

৩। জননী, স্ত্রী ও ভাবরূপে নারী প্রকাশ করে প্রকৃতির সার;.....এদের প্রত্যেকে ধারণ করে দ্বৈত মুখাবয়ব।

৪। কামে পুরুষ আলিঙ্গন করে প্রিয়াকে এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় মাংসের অপর রহস্যে।.....একটি নারী পাওয়া হচ্ছে তাকে জয় করা;

৫। পুরুষ নারীর মধ্যে আবার দেখতে পায় উজ্জ্বল নক্ষত্র ও স্বপ্নাতুর চাঁদ, সূর্যের আলো, কৃত্রিম গুহার ছায়ানিবিড়তা,.....উদ্যানের গঠিত গোলাপ হচ্ছে নারী।

বোভেয়ার এত দেখেছেন, মা হচ্ছে নারীর উন্নীত বিশুদ্ধতর রূপ। সমাজে ও পরিবারে নানা প্রথা, বিধিবিধানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নারী হয়ে ওঠে মা—'শুভর অনন্য প্রতিমূর্তি।'

দেশে দেশান্তরে কালে কালান্তরে নারী নানা বিশেষণে ভূষিতা। সুন্দর সে, পবিত্র সে, রহস্যময়ীও। নারী সেই স্বর্গীয় করুণা ও প্রেরণা—যে দান্তেকে স্বর্গের পথে নিয়ে যায়; প্রেত্রার্ককে ডাকে কবিতার সমুচ্চ শিখরে। খ্রিস্টিয় প্রার্থনাগীতি বলে,

> .....অতিশয় মহৎ কুমারী, তুমি উর্বর শিশির,
> আনন্দের ফোয়ারা, করুণার প্রণালি, প্রাণময় জলের
> কূপ যা শীতল করে আমাদের অনুভূতির উত্তাপ।
>
> (দ্র. দ্বিতীয় লিঙ্গ/পৃ. ১৫০)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদী হলেও নারীর এই তত্ত্ব ও ভাবরূপকে মান্য করেছেন। তাঁর কবিতার নারী বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

১৯৪০ এ 'পদাতিক' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর বুদ্ধদেব বসু সাদরে অনুজ নবীন কবিকে অভিনন্দন জানান। বলেন, এই প্রথম কোনো বাঙালি যুবক কবি প্রেমের কবিতা না-লিখে কবিজীবন শুরু করলেন। আমরা জানি ১৯৩৯-এ সুভাষ লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হন। বিশ্বনাথ মুখার্জি ও বিশ্বনাথ দুবের কাছে মার্ক্স-এঙ্গেলস—লেনিনের রচনার পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জানা যায়, কলকাতার ৫০ নম্বর নেবুতলা লেন ভাড়াবাড়িতে কবি থাকতেন মা-বাবা-তিন কাকা, ঠাকুর্দা এবং দাদা-দিদির সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ, মায়ের আদর, শাসন, কথা, শব্দ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করত। যা-ই তো প্রতিটি ছেলের মনে নারীচেতনার জন্ম দেয়। তবু কেন সুভাষ সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে যত উৎসুক, নারী নিয়ে তাঁর এককণা আগ্রহ দেখা গেল না? বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রর লেখা থেকে জানা যায়, প্রথম যৌবনেই সুভাষ টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। বয়ঃসন্ধির কিশোর স্মৃতি, স্বর ও দৃষ্টি ক্ষীণতায় ভোগেন। যৌন অনুভূতিও বিকশিত হয় না। (দ্র. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা/সম্পাদক-শঙ্খ ঘোষ, সৌরীন ভট্টাচার্য, অমিয় দেব প্রমুখ)। হয়তো এটা বাস্তব। তবে স্বয়ং কবি তাঁর নারীভাবনা নিয়ে যা বলেছেন, তাও মূল্যবান।

> .....জীবনের যে সময়টাকে বলা যেতে পারে 'রোমান্টিক পিরিয়ড' অর্থাৎ যে-সময়ে ব্যক্তিজীবনে নারীকে নিয়ে ভাবার, কল্পনা করার অথবা নারীসঙ্গ পাওয়ার, সে সময়টাই রাজনৈতিক জীবনের তাগিদে নারীসঙ্গ এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। প্রেম করে সময় নষ্ট করার সময় নেই, এটাই ভাবতাম। (দৈনিক বর্তমান 'চতুষ্পর্ণী'/২৩মে ১৯৯২)

তবে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের সময় পাশাপাশি থাকা ও কাজ করতে গিয়েও বন্ধুত্ব হয়। স্কটিশ চার্চ কলেজ পড়ার সময়ও 'অনেক মেয়েই যেচে আলাপ

করতে চাইত। আমি এড়িয়ে যেতাম।' যে লক্ষ্য নিয়ে তাঁর চলা, তা থেকে বিচ্যুত হতে চাননি। তবে পি. সি. যোশীর বক্তব্য 'যারা বিপ্লব করবে, তারা গৃহীও হবে' কথাটি তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল। কেমন মেয়ে তাঁর পছন্দ? তাও প্রাগুক্ত লেখায় জানিয়েছেন—

'.....লড়াকু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মেয়েরাই আমার মনকে টানে। মেয়েদের এই বৈশিষ্ট্যই আমার বেশি প্রিয়। সৌন্দর্য বা চেহারা সেভাবে মনকে নাড়াতে পারে না। এটা হয়েছে ছোট বেলা থেকে আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব দেখে।' (তদেব)

মা-কে জীবনের সর্বত্র অনুভব করেছেন, মা তাঁর কাছের; বাবা দূরের। মায়ের রঙ কালো বলে গঞ্জনা পেয়েছেন। সেটাও কবিকে মর্মাহত করেছে। তাই তাঁর কবিতায় 'কালো রঙের মেয়েদের এই অপমানের ছবি আমি আমার কবিতায় কিছু এঁকেছি', বলেন, মায়ের কথা বলার ধরণ তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তবু রোমান্টিক, প্রেমিক তিনি নন। তাঁর স্বীকারোক্তি—

> '.....ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের পর্যায় সেভাবে না-আসাতে মেয়েদের নিয়ে রোমান্টিক কবিতা ও আমার তেমন নেই।.....। তারুণ্যে প্রেমের সময় ছিল না। তাই রোমান্টিক আচ্ছাদনে মনকে জুড়ে প্রিয়তমা নারীকে খুঁজতে বেরনো আর হয়নি। তবে অনেক নারীর অনেক গুণই জীবনের বিভিন্ন স্তরে ছাপ রেখে গেছে।' (তদেব)

এই নারীদের মধ্যে আছেন তাঁর মা, বোন, স্ত্রী, বান্ধবী, রাজনৈতিক নেত্রীও। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যে সব নারী আছেন তাঁরা সংগ্রামী, প্রতিবাদে মুখরা, দুঃখের আগুনে দগ্ধ কিন্তু অপরাজিতা।

লড়াকু মেয়েই কবির অন্বিষ্ট। তাই 'সুন্দর' ও 'মিছিলের মুখ' কবিতা দুটিতে তেমনি মেয়েকে পাই। যে-মেয়ের মুখ মিছিলে কবি দেখেন, যার

> মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
> আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত;
> বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
> আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।'

ফসফরাসের মতো সেই উজ্জ্বল মুখ 'নিষ্কোষিত তরবারির মত/ জেগে উঠে আমাকে জাগায়', কবি বলেন।

অন্যদিকে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে যায় মুখে শ্রমবিন্দুজল 'মুক্তোর মত জ্বলছিল? আকাশ উদ্ভাসিত করে সে যখন হাসল, তখন তাকে সুন্দর মনে হয়। চটের ফেঁসো জড়ানো শ্রমিকদের মাঝখানে উত্তোলিত বাহুর প্রতিবাদে 'দমকা হাওয়ায় একা একা' আঁচল উড়িয়ে যখন যে আসে তখনই তাকে কবির 'আশ্চর্য সুন্দর' মনে হয়। তার এমনই নারীর হাতে পৌঁছে দেন 'নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার' যাতে 'মস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা' দুটি হৃদয়ের মধ্যে সেতু রচনা করতে পারে।

এরই পাশে তিনি যখন এক নাগরিকা বধূ-র কথা বলেন, তখন স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের গ্রাম্য মধূর প্রতিতুলনা মনে জাগে। পল্লী প্রকৃতি, পিতৃগৃহের স্নেহের নীড় ছেড়ে আসা বধূ শহরে নিজেকে একা ও অসহায় ভাবে। অন্তরাত্মা পিপাসিত হয় একটু জলের জন্য, ছায়ার জন্য।

> বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল্‌।
> পুরোনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
> কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল?

সুভাষের বধূ কলসী কাঁখে যায় জলের কলে, তার 'হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা', যে-চাঁদের আলোয় গ্রাম্যবধূর বাল্যজীবন মনে পড়ে, নাগরিকার মনে জীবন যুদ্ধর ছবি ভাসে। পাওনাদারের ভয় জাগে, তাকে একা ফেলে প্রিয়তম উধাও। সেই বিপন্নতায় এই নারীর খেদোক্তি—

> সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
> লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।

'বাসি মুখে' কবিতায়, অভাবী ঘরের বৌয়ের দেখা পাই, যে ভাবে' 'কাল ও উনুনে আঁচ পড়বে না?'

'একটি লড়াকু সংসারে' আবার ফিরে আসে লড়াকু নারীর অন্য ছবি। কবির চেনা পার্টিকর্মী বামাচরণ সাইনির দারিদ্র্য পীড়িত সংসার এখানে কাব্য রূপ পেয়েছে। তাঁর মা-স্ত্রী-নাতনি মিলে অভাবের সংসারে কীভাবে বাঁচে তা দেখতে পাই। নেভানো উনুন; মাসের শেষ কিস্তি মেলেনি; রেশনের থলি শূন্য। মা :—

> মেজো নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে
> সারাদিন লাইনে কয়লা কুড়িয়ে
> একটু পরেই বুড়ি ফিরবে।

অন্যদিকে,

> কোনরকমে কোমর বেঁকিয়ে
> খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়
> এবাড়ির আসন্নসম্ভবা বউ।

'সালেমনের মা' কবিতার পিছনে কবির বজবজে বাসের অভিজ্ঞতা পাই। জোলা পরিবারের জামাই পঞ্চাশের অকালে পাগল হয়। বৌ সালেমনকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসে। সেখানেও অন্নবস্ত্রের অভাব। শোনা যায় পরে সে বিয়ে করে। মেয়েকে নতুন স্বামী প্রত্যাখ্যান করে। তাই মা-কে সে খোঁজে :

> বাবরালির মেয়ে সালেমন
> খুঁজছে তার মা-কে

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি
সালেমনের মা?

এক আকালের সামনে দাঁড়িয়ে মা-কে খোঁজার ব্যাকুলতা এখানে পাই।

মনকে ঘিরে কবির আবেগ জন্মভূমি-ভাবনায় মিশে গেছে 'কাল মধুমাস' কাব্যে :

'আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মা-কে
—কখনো মুখ ফুটে বলিনি।'

তাই দেশের জল-মাটি-গাছ যা-ই ছুঁয়ে দেখেন, বলেন—

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই
হে জননী,
তুমি। (জননী জন্মভূমি)

আবার 'ফুল ফুটুক' কাব্যে বলেন,

মা, তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো
মর্মন্তুদ চিৎকারে, মাগো, আকাশ মাথায় করে
(মা, তুমি কাঁদো)

১৯৫৪ তে কবি আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় যান। কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র তখন পাকসেনাদের অত্যাচারে লাঞ্ছিতা হয়ে ঢাকার সরকারি জেলে বন্দিনী। যাঁকে গোলাম কুদ্দুস 'স্তালিন-নন্দিনী' বলে সম্মান জানিয়েছিলেন। সুভাষ লিখলেন 'পারুল বোন' কবিতা এক আপোসহীন নারীর জয়গাথা।—

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার।

তার পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকারে বলেন,

সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার?

রূপকথার নতুন নির্মাণে সংগ্রামী নারীকে মর্যাদা দেন কবি। যেমন, 'মেজাজ' কবিতায় কালো বৌয়ের নারীত্ব ও মাতৃত্বকে প্রতিবাদে গরীয়সী করেন।

১৯৫৭-তে 'ফুল ফুটুক' কাব্য থেকেই কবি সুভাষের মন বিদ্রোহী হয়। দলীয় আদর্শ, যান্ত্রিক জীবনযাপন তিনি মানতে পারেন না। কলের পুতুল হতে অস্বীকার করেন। কবি ও শিল্পীর স্বাধীনতা চান। যা নিয়ে আজও কমিউনিষ্ট দলে তাঁকে নিয়ে অশ্বস্তি, মতান্তর। তো 'ফুল ফুটুক' কাব্যে তিনি এক কালো কুচ্ছিৎ আইবুড়ো মেয়ের গল্প বলেন। প্রজাপতি উড়ে তার গায়ে বসলেও, বিয়ে হয় না। মায়ের কালো রঙের গঞ্জনা কবি ভুলতে পারেননি। শান বাঁধানো ফুটপাথে কাঠখোট্টা গাছে তখন কচি কচি পাতা। 'লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত' আকাশ। আর গলিতে 'রেলিঙে বুক চেপে ধরে' সাত-পাঁচ ভাবে 'এক কালো কুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'। চোখে তার অকাল বসন্তের ছায়া—'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত'। তখনি চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এস বসে এক 'লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি'। রঙিন স্বপ্ন দেখা যে তার নিষিদ্ধ। তাই দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়। ইচ্ছে ও কামনাকে গলা টিপে মারতে হয়। কালো কুশ্রী কুমারী মেয়ের যন্ত্রণায় হয়ত রক্তপলাশ ফোটে।

'কাল মধুমাস' কাব্যের 'কাছে দূরে' কবিতায় পাই কবির রোমান্টিক মনের অভিসার। ট্রেন খালি করে যে মেয়েটি নেমে গেল, তার 'মুখখানি যেন ভোরের শিউলি'। হাওয়ায় তার বুকের আঁচল উড়ে উড়ে যায়। আর 'তার দুটি আঁখি খঞ্জন পাখি/দূরে কাছে ঘুরে নাচে'। নেচে ওঠে কবির হৃদয়। রাজনৈতিক ভাবনা প্রসঙ্গে বলা হলেও সাক্ষাৎকারে (The Telegraph, 12 July,1992) সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন, তাঁর প্রিয় শব্দ 'ভালোবাসা'। তাঁর নারীভাবনায় এই ভালোবাসা মিশে আছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

If a poet would work politicaly he must give himself upto a party, and so soon as he does that, he is lost as poet–He must did fare-well to his free spirit, his unbiased view, and draw over his ears the Cap of bigotry and blind hatred. The poet, as a man and citizen, will love his native land, but the native land of his poetic powers and poetic action his the good, noble and beautiful, which is confiend to no particular provience or country.

... Remember the politican will devour the poet. His song will cease.

Goethe/Conversations with Eckermann.

'আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত অভিব্যক্তির সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু।'

কবিতার কথা/জীবনানন্দ দাশ

কোনো কবির প্রথম আবির্ভাব হতে পারে তৎক্ষণাৎ নন্দিত, যেনো এই কবির জন্যেই পাঠকের অন্তরাত্মার ছিলো তৃষ্ণার্ত প্রতীক্ষা, তাই দীর্ঘ দাবদাহের পরিসমাপ্তি ঘটালো যে আগন্তুক মেঘ, তাকে অভিনন্দিত না কোরেই বা উপায় কি? আবার লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো কবি স্ববলে ভাষা-পথ খনন কোরে চলেছেন, কিংবা কর্ম বসানে চিরদিনের মতন আড়ালে চলে গেছেন অন্তত দেহগত ভাবে, কিন্তু তাঁর আত্মহনন-জাত শব্দ যেনো ক্ষরিত বেদনাগুচ্ছ বা বিষাদপ্রবাহ, আমাদের সত্তায় হিমশীতল স্পর্শ রেখে যাবার সাধনা কোরে গেছে, অপেক্ষা কোরছে তা কোনো মরমী পাঠকের দ্বারা আবিষ্কৃত হবার জন্যে। খুব নিচু স্বরে, বেদনার্থ হিম-সম্প্রপাত, বা ঈষৎ ক্ষোভ বিতৃষ্ণা ও বিষাদ অবিরল ধ্বনিত হবার জন্যে অপেক্ষমাণ।

দুধরনের প্রতিভার দেখা পেয়েছি আমরা, যেখানে প্রথম আবির্ভাবেই সচকিত পাঠক; অভ্যর্থিত অভিনন্দিত পাঠকের দ্বারা; কেউ বা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেলেন হয়তো সমস্ত জীবনকাল, পরে আবিষ্কৃত হলেন এক অনন্য পরিণত কবিরূপে; তাঁর আছে সূচনাপর্ব, খননকাল, পরিণামমুখী প্রবাহ; তিনি প্রথমোক্তের মতন অভিনন্দিত না হয়েও একই বৃত্তে পরিক্রমণশীল ছিলেন না কখনো; হলেন না তৃপ্ত আমৃত্যু বদ্ধজলায় সন্তরণশীল কোনো দেবতাত্মা; তিনি গভীর, ক্ষুব্ধ, প্রশ্নকাতর ও গতিশীল, অনুভব-হৃদ্য সম্ভাবনাময় হয়েই

দেহান্ত হলেন একদিন, লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত হলেন।

সূচনায় যিনি সশঙ্ক, আত্মপ্রত্যয়হীন, পরনির্ভর, আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই যিনি ব্যক্তিত্বের অনন্যতায় নিজস্ব ভাষা ও আঙ্গিক দেখাতেই অন্যমাত্রায় দ্যোতিত কোরলেন কবিতাকে তিনি জীবনানন্দ দাশ। তারপরই অবিরল অনুসন্ধান, নিরন্তর অতৃপ্তি তাকে শুধু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে; নিজেকে অন্ধঅনুবর্তন করেননি আর। তাঁরই চয়িত শব্দ 'মনোবীজরাশি'কে তিনি শিল্পের আমোঘ উত্তীর্ণতায় দিলেন পৌঁছে। একক তাঁর এই অভিযান, লক্ষ কোরলেন কেউ কেউ, তাঁর থেকে অধিকাংশ পাঠকই চোখ ফিরিয়ে রইলেন।

এই পর্বে পর্বে উত্তরণের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয়, আর সমকালীন বিষ্ণু দে-ও তুলিতে হতে পারেন তাঁর সঙ্গে। বায়রনের আবির্ভাবমাত্রই অ্যালার্মিং ঘন্টা বাজলো। নিঃসঙ্গ রোগজীর্ণ কীটসের বেলায় কান পেতে থাকতে হলো তাঁর গভীর শান্ত উপলব্ধির, ইন্দ্রিয়সচেতন বিষাদজনিত অনুভূতির মৃদু স্বরক্ষেপণ শুনবার জন্যে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অনেকটাই বায়রণের সোচ্চার আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমৃত্যু রোমান্টিক বুদ্ধদেব বসুও, চরিত্রে, রুচির বিপরীত মেরুচারণায় ভিন্ন জগতের হয়েও, আবির্ভাবমাত্রই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন সুভাষকে :

'অভিনন্দন তাঁকে আমরা জানাবো, কিন্তু তা শুধু এই কারণে নয় যে তাঁর কবিতা অভিনব, যদিও তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনো আদর্শেই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' আমার এ-কথার সাক্ষ্য দেবে।"

১৯৪০ এর এই আলোচনা, মনে রাখতে হবে সুভাষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কেটেছে; বেরিয়েছে একের পর একটি কাব্যগ্রন্থ, তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি কখনো; কি লিখছেন পড়েও দেখা হয়না আর; একজন অগ্রণী কবিরূপে স্বতঃসিদ্ধ তাঁর ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা তাঁর পূর্বগামিনী হয়নি আর। এর কারণ কি শুধু পর্বে পর্বে এগিয়ে যাওয়া তুঙ্গ অনুভূতি, কল্পনাপ্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয় ও গভীরতা-অনুসন্ধানী শক্তি নাকি, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, যার পুরোভাগে থেকেছেন দীর্ঘদিন, লিখেছেন রাজনৈতিক বক্তব্যকে কাব্যগত কোরে, জুগিয়েছেন মিছিলের মুখে ভাষা; চটকদার রঙিন আর অভিনব এক কথনরীতি, যা পাঠমাত্রই অর্থবোধক, উচ্চারণমাত্রই বীরত্বব্যঞ্জক, লক্ষ্যভেদে শত্রুপক্ষ অনায়াসে বধ্য, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে শাণিত বলেই শত্রুমাত্রই নাজেহাল?

কোনো কোনো কবি সময়ের সৃষ্টি; অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁদের কবিতা অস্ত্র হিসেবে, শুধু অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহারের উপযোগী, এমনকি শত্রুবিনাশে পারঙ্গম। নজরুল ইসলাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে আছেন। আছে রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু কবিতা যা সাময়িকভাবে দেশের পরিস্থিতির প্রতিবাদরূপে রচিত ও কার্যকরীও বটে; কিন্তু সামগ্রিক রচনার তুলনায় তার সংখ্যা নগণ্য। নজরুলের নগণ্য নয়; নজরুল বাঁশকে বাঁশী কোরে তোলেননি, বাঁশীকেই বাঁশরূপে ব্যবহার কোরেছেন বা কোরতে চেয়েছেন

বলা যায়। আমার মনে হয়েছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নজরুলের যোগ্য উত্তরসাধক, যদিও কাব্যকলায় অনেক বেশি দক্ষ ও নিপুণ। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'যে কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয়-বস্তু আছে বলে মনে করি।'

বাস্তবিকই তাই। সুভাষ কখনই ভিড় থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের দিকে তাকাননি; তিনি নিয়েছিলেন আসন্ন বিপ্লবের চারণের ভূমিকা, যেখানে নির্জনতা উপলব্ধির স্থান নেই, নেই সমকালকে ভবিষ্যতের ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দেবার তাড়না; তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ একটি সামাজিক বিবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরমাত্র। তাঁর ইচ্ছেটা সৎ, প্রকাশকলাও চটকদার, কিন্তু কবি যেখানে দ্রষ্টা হয়ে ওঠেন, যেখানে সমগ্র অসঙ্গতির মধ্যে বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গতির সাধক, গভীর সহানুভূতিতে দ্রব হন তুচ্ছ বেদনাদীর্ণ মানুষের জন্যে; তিনি নিজে উপলব্ধি করেন তা এবং অনুরণন তোলেন শব্দে, সুভাষ তার ভাষা বোঝেননি কোনোদিনই। তিনি প্রথম থেকেই (Skilled poet) উদ্ভাবক মাত্র, তার পরিচয় তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়ানো।

হয়তো যে টালমাটাল সময়ের মধ্য দিয়ে এসেছেন তিনি, তাঁর দুইচোখেই তার উপরিতলের ঢেউগুলোর উপরে বিচরণ কোরছে; ঘটনা থেকে দূরত্বে আসীন হতে সময় পাননি তিনি; তাই ঘটনাপুঞ্জ তাঁকে পদ্যরচনায় প্রাণিত কোরেছে; যে প্রয়োজন ছিল উপলব্ধির সারাৎসার, অনুভূতির নিবিড় সান্দ্রতার, তার অভাব মিটিয়েছেন শব্দচয়ন ও ছন্দ-রচনার যাদুকরী দক্ষতা নিয়ে; আর আমাদের পাঠকবর্গ ছন্দের তাল ঠোকাকেই মস্ত গান বলে ধরে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থেকেছেন; প্রশ্ন করেননি, কবিতা কোথায় সুভাষের? কই ভাষার অতীত সেই ভাষাতীতের ইঙ্গিত? যদি তাঁরা একবারের জন্যেও সে প্রশ্ন উত্থাপন কোরতেন, তাহলে স্বভাবতই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপকার হতো, হতো তার বিবর্তন যা পরিণতিমুখীন বাঞ্ছিত এক পরিণাম।

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লালউল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানা হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,.....

এক নিছক ছন্দে বেঁধে দেওয়া চটকদার ভাষণ; হয়তো বিশেষ এক পরিস্থিতিতে খুব জরুরিও ছিলো বটে এ জাতের সোচ্চার আহ্বান, কিন্তু অচিরেই এরই অসারতা হাঁ-মুখ মেলে ধরে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন দিবস; লাল পাগড়ি মোতায়েন
আতঙ্কিত অত্মরাত্মা; ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়াড়ী;
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন।

এই অংশ কি বলে দেয় না, এখানে কিংবা সমগ্র পদ্যটিতেই শুধু চটকদার ভাষার কারিগরি দেখি আমরা? সমকালের মধ্য দিয়ে কিভাবে ছেঁকে নিতে হয় এমন একটি

অনিবার্য সত্য যা পরিবর্তিত সময়েও ধ্রুবতা হারাবে না, তেমন গুণ কি এ জাতের উচ্চারণে সম্ভব?

তবুও আমাদের ভালো লাগে 'পদাতিকে'র ছন্দোবদ্ধ উক্তিগুলিকে, সেখানে সময়ের নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার উল্লেখ আছে, আছে কবির প্রতিক্রিয়া; সর্বোপরি জনসাধারণের মধ্যে যে পক্ষ সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে, পক্ষে পরিবর্তনের, তাদের জন্যে খুব জরুরি কিছু শিখে নেবার পরামর্শ আছে যখন। পদাতিক, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে পড়তে বসে মনে হয়, এতো যাঁর প্রথম থেকেই শব্দসচেতনতা, এতো যাঁর ছন্দের উপর আধিপত্য, কেনো তিনি কবিতা বলতে বুঝলেন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকেই, বুঝলেন চমক আর ব্যাঙ্গের নিপুণ প্রয়োগ-কৌশলই কবিতা; কেনো তিনি স্থির ও সুনিশ্চিত এক উপলব্ধির গভীরে অবগাহন কোরলেন না সমসময়কেই অনুভব করার প্রয়োজনে। খেদ থেকে যায় মনে।

আমি মনে করি Eloquence is heard, poetry is overheard. এও জানি কবিতা কখনো, বিষ্ণু দে-র ভাষায়, সংবাদ মূলত' কাব্য। কবিতা সংবাদ দেয়, তবে বড়োই অগোচরে, অনুভব-বিদ্ধ অন্তরঙ্গ এক ভাষায়; জানিয়ে দেয়, বিতর্ক তোলে না; উচ্চারণ করে, ঘোষণা করে না। জন স্টুয়ার্ট মিল Eloquence বলতে বাগ্মিতা বুঝিয়েছেন মনে হয়, যার থেকে কবিতা অন্তেবাসী।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে (১৯৫৮) শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে যে ঋদ্ধদীর্ঘ আলোচনা করেন, তার তুল্য শ্রদ্ধাযুক্ত আলোচনা আমি খুব কমই পাঠ করেছি। রবীন্দ্রনাথ-কথিত সমালোচনাকে পূজা কোরে তোলার এক মহৎ প্রয়াস দেখেছি অমলেন্দু বসুর আলোচনাগুলিতে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : কবিতা পাঠকের কারবার (সমালোচকেরও, কারণ সমালোচক তো পাঠকই, বিচারশক্তিসম্পন্ন পাঠক) আসলে সৃজনোত্তর রসবস্তু নিয়ে, তাঁর নিংসশংসয় চরম প্রশ্ন : সৃষ্টি বস্তুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা, কবির প্রাক্-সৃজন অনুভূতি শেষ অবধি শিল্পায়িত হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কাব্যের প্রেম বা রাজনীতি সাধারণ প্রেম বা রাজনীতিই থেকে গেলো। আর যদি শিল্পায়িত হয়ে থাকে তাহলে কাব্যের প্রেম আর সাধারণ প্রেম ভাবনা নেই, হয়েছে এক সাধারণ রসবস্তু।

বিষয়বস্তু হতে পারে সমাজব্যবস্থা, হতে পারে রাষ্ট্রনীতি, তার সমালোচনা, হতে পারে একক কবির অনুভূত প্রেম বা প্রকৃতির সান্নিধ্য-মুগ্ধতা থেকে উৎসারিত, যে কোনো বিষয়ই কবির পক্ষে জরুরি হতে পারে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কোথায় আমাদের পৌঁছে দিয়েছে, তাই বিবেচ্য। শিল্পগত দক্ষতা তো সুভাষের প্রশ্নাতীত, কিন্তু তাঁর কবিতা গভীরতর বোধে পৌঁছে দিতে পারে না আমাদের। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' বা 'গান্ধীজী' দুটো কবিতাই রচিত। পাঠক পাঠমাত্রই অনুভব কোরবেন দেশ-কাল-সন্ততির কোন্ ব্যাপ্ত চেতনায় পৌঁছে দিয়েছেন কবি আমাদের। ক্রোধ নয়, দাহ; ঘৃণা নয়, সহানুভূতি; ধিক্কার নয়, অনুতাপ ভাষাকে কিভাবে সংরক্ত কোরে তোলে, কিভাবে নিছক ঘটনাপুঞ্জকে চিরসত্যে বেঁধে দিতে হয়, তা উক্ত দুটি কবিতাই অনায়াসে তুলে ধরবে।

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু পদাতিকের সুভাষের প্রভূত প্রশংসার পরে লিখেছেন—"....সুভাষের কবিতাগুলি কোনো নাটকীয় পরিবেশ বা কাঠামো নেই, সেগুলি আত্মকথা মাত্র। যে সুরে এই আত্মকথা মানাতো তার চেয়ে অনেক চড়া সুরে তিনি বলছেন। বলার ধরন পলিটিকাল ডেমাগগির ধরন। রাজনৈতিক বক্তা দিনের পর দিন একই কথা নানা মঞ্চে বলতে বাধ্য হন। একই কথা বারবার বলতেও হয়; বলার সময় মৃদুকণ্ঠ হলে চলবে না, বেশ আত্মসচেতন ভাবে কণ্ঠস্বর মেলাতে হবে। প্রতিবার বলার সময় নিজের ভিতরে তাৎক্ষণিক আবেগের সৃষ্টি কোরতে হয় যাতে সে আবেগ শ্রোতৃমণ্ডলীতেও পৌঁছোয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দিয়ে থাকেন কিনা অথবা শুনে থানেক কিনা জানি না, তবে তাঁর অনেক কবিতায় পাচ্ছি গণবক্তৃতার rhetorical declamatory style-অতি অলঙ্কৃত স্ফীতকণ্ঠ বচনশৈলী, সেটাই যেন 'পদাতিকে'র পরপর্যায়ী কাব্যের প্রকাশশৈলীতে দাঁড়িয়েছে।'

মনে পড়ছে জীবনানন্দের সেই সতর্কবাণী : অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবিপ্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই—কিংবা এই সব রয়েছে। কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন—কবির নয়।

মহৎ কবি ও পূজারী-সমালোচক একই বীক্ষণ ও উপলব্ধিতে পৌঁছোন কবিতার প্রতি দায়বদ্ধতায়।

১। বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখব দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।
এ দেশ কাড়তে যেই আসুক
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক
তৈরী এখানে কড়া চাবুক,
চলেছে কুচকাওয়াজ

২। ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহী সেনা জাগে।
অস্ত্রাগারের দ্বার খুলে তারা
জনতার পাশে দাঁড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ের আওয়াজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে মাটি।
ছত্রভঙ্গ দস্যুর দল
আগুনে আগুনে রাজ্য পুড়িয়ে দিয়ে
লেজ তুলে ছোটো জাহাজে আকাশযানে।

যেখানে সেখানে এই পর্ববিন্যস্ত 'ইলোকোয়েন্স'; এখানে শব্দের ধ্বনিগত সৌন্দর্য উপভোগ্য, কিন্তু শব্দ দিয়ে নৈঃশব্দের দরজা খুলে দেবার মন্ত্র নেই। সমকালীন, বড্ড বেশি সমকালীন সুভাষ; আর সময় তো বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত; নতুন সমস্যা নিয়ে আসছে, তৈরী হচ্ছে সংকট ও আবর্ত; কবি যদি তার অন্তর্গত শোণিতপ্রবাহকে স্পর্শ করতে না পারেন, শুধু মেটান তাৎক্ষণিকের দায়, তবে পটভূমি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্যও হারাতে থাকে, হারিয়ে যায়।

একথা মানতে হবে, চিত্রকল্প রচনায় সুভাষ অসাধারণ দক্ষ; সেইসব বাক্‌প্রতিমায় আছে টাটকা, ঝাঁ-চকচকে ভঙ্গি যা সুভাষেরই, যেমন

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়,
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।

টান টান গদ্যের লক্ষভেদী উপস্থাপনা, একটি ছবি, শুধু ছবিই নয়, একটি প্রতীকী দ্যোতনা ব্যঞ্জিত হলো এখানে। কিন্তু তবু গভীর অন্তঃসঞ্চারী কোন ভাবনাপ্রবাহে কিংবা চেতনার কোনো স্ফুলিঙ্গ কি জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দেয় আমাদের? সুভাষের সীমাবদ্ধতা এইখানেই। যে-কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত কবিতা তো আত্মহননজাত উপলব্ধির সারাৎসার; সেখানে পেত্রার্কা-বন্দিত to unburden sad heart বা বেদনার্ত হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তি বা মোক্ষণ থাকে; শুধুই যা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ বক্তব্যের চটকদার উপস্থাপনা, হোক না তা যতোই জরুরি, কবিতার অনুরক্ত পাঠকের তাতে প্রয়োজন কি?

'কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ-সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়।'

জীবনানন্দ দাশ/কবিতা প্রসঙ্গে

সুভাষের মধ্যে বিশ্বাস প্রত্যয়ে পরিণত হতে পারেনি; তিনি 'চরম' বলে উদ্দেশ্যকে জেনেছেন, সেই 'চরম' বিশ্বাসেও নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স চেতনার মুকুরের ভিতর দিয়ে ফলিয়ে দেখাতে পারেননি; ফলত বক্তব্য ব্যঞ্জিত হয়নি, পায়নি সুদূরবাহী তাৎপর্য; যা বলেছেন ইংঙ্গিত থাকলেও তাতে ব্যঞ্জনা নেই; ব্যতিক্রম থাকলেও সামগ্রিক চরিত্র এইরকমই।

বউ বলছে : 'একটা সুখবর আছে।
পরের কথাগুলো এতো আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা; মা কান খাড়া করলেন
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে
'কী নাম দেবো জানো?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'

এই কবিতার অংশটিতে গল্পের কাঠামো আছে, সংলাপ আর সংকেত আছে এখানে, কিন্তু সমস্ত ভাবনাটাই একটা আদর্শকে ঘোষণা কোরবার উচ্চকিত আয়োজন; আসেনি উপলব্ধজড়িত হয়ে, হয়নি অনুভূতিরঞ্জিত; অথচ নাটকীয়তার ঈষৎ প্রলেপ উপভোগ্য কোরে তুলেছে কবিতাটিকে।

এরকমই সুভাষ, ঠিক এইভাবেই একমাত্রিকাতায় কথা বলেন, যেনো বক্তব্যটা ভীষণ পীড়ন কোরছে, ছটফট কোরছে আত্মপ্রকাশের জন্যে; বলে ফেলতে পারলেই দায়মুক্ত; ফলে তাঁর 'সমসাময়িকতা' ইতিহাসচেতনায় পরিণত হয়নি; ইতিহাসবোধ মর্মে পরিচ্ছন্ন কালচেতনারও জন্ম দিতে পারেনি। যে আবেগস্পৃষ্ট হয়ে কবি সুকান্ত হাহাকার করেন, তাতে আত্মবিযুক্তি নেই, যেমন আছে সুভাষের; সুভাষের বিযুক্তি পরম প্রকট, বড়ো অহংকারী, যেনো জনতার পক্ষে লড়াইয়ের সেনাপতিত্ব করেই তাঁর দায় শেষ, জনতার প্রতিদিনের ক্লিষ্ট জীবনের সুখ-দুঃখ-মৃত্যু, ধর্মচেতনা, একাকিত্ব প্রেম, বিষাদ, বিরক্তি, বিষণ্ণতা, পরাজয়ের বেদনা, জয়ের আনন্দের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ নেই। সুকান্ত কিন্তু নিজেকে জনতায় মেশান আন্তরিকভাবে:

আমার যৌবন কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।

সুভাষ নিজেকে পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেন বলেই বেদনার অংশী হন সোচ্চারে ঘোষণা কোরে। তাঁর কবিতা আমাদের বুদ্ধিকে সজাগ করে, ভাষাকে টান টান পায়ে দাঁড়াতে শেখায়; কিন্তু নিবিড় একাকিত্বের পরম উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে পারে না; সময়ের দায় মেটাতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি, আজ সময়কেও মূল্য দিতে ভয় পান এমনই এক ভয়ংকর পরিণতির মুখোমুখি এই কবি, এখনো এই সময়।

ক্ষতপ্রবণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

সুমন গুণ

না কি বলেন
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভাবছি।

একটা গাড়ি কিনব?
না কি একটা বাড়ি?

আমার মতে, গাড়িই ভালো—
না কি বলেন, বাড়ি!

বাড়ি হলেও মন্দ হয় না
কিন্তু দেখুন, গাড়ি—

কত সুবিধে। মনে করলেই
ডায়মরডহারবার
কিংবা ধরুন, উইকেন্ডে রাঁচি!

নো মশা, নো মাছি।
তেলের ব্যাপার তা অবিশ্যি,
গাড়ির বেলায় ঐ
একটাই যা মুশকিল।
সেদিক থেকে বাড়ি থাকলে
খরচা নেই, থাকলেও সামান্যই।

বরং বাড়ি ভাড়া দিয়ে
সেই টাকায় গাড়ি
চড়া যায় বেশ মনের সুখে
আমি বলি কি,
তার চেয়ে কি ভালো নয় কেনা

একই সঙ্গে বাড়ি এবং গাড়ি'?

এই কবিতায় কবির কোনও মন্তব্য নেই। বক্তা যিনি, তাঁর ভাষ্যে গোটা কবিতাটি কথা বলেছে। এমন কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আরও আছে। যেমন 'রসুই', 'আরো ছো' ইত্যাদি। কোথাও কবি একটু এগিয়ে, কোথাও দূর থেকেই শুনছেন যেন; ব্যঙ্গে, মন খারাপে, কৌতুকে, কখনও উল্লাসে সাড়া দিয়েছেন।

উল্লাস আছে এই কবিতাতেও। সম্পদের উল্লাস, বিত্তের উল্লাস, উদ্বৃত্ত প্রাচুর্যের উল্লাস। ১৯৭৯ সালের 'একটু পা চালিয়ে ভাই' বইয়ের এই কবিতা লেখার সময় এই উল্লাসে যে-অশ্লীলতা, তা আজকের তুলনায় বেশি লক্ষণীয় ছিল এইজন্য যে বিত্তের, সম্পদের কুক্ষিগত অধিকারে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় তখনও এত খোলামেলাভাবে শুরু হয়নি। আজ এই কবিতার স্বগত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে যে-দ্বিধা ও জড়তা রয়েছে তা একটু অতিরিক্ত মনে হলেও হতে পারে। একই সঙ্গে বাড়ি আর গাড়ি কেনার অধুনা-সুলভ সিদ্ধান্তটি নিতে যে এই কবিতার শেষ লাইন পর্যন্ত আসতে হল, তাতেই বোঝা যায় প্রগতিশীল আন্দোলনের মসনদপ্রাপ্তির পরেও ব্যসনসর্বস্ব বেঁচে-থাকার ফণা ততটা লকলক করে ওঠেনি, তখনও। তাই সেই সময়ের আগে-পরে লেখা নানা কবিতায় দেখা যায় সুখী গৃহকোণের থাবা-বাড়ানো মোহের বিরুদ্ধে কথা; চালচিঁড়ে, হুঁকোতামাক আর মাছ ধরার জাল নিয়ে জল সইতে যাবার তাগিদ, উড়ে-যাওয়া আলোর নীল পাখির জন্য বিষাদ, শূন্য খাঁচার হাহাকার। কবি দেখছেন উঁচুমহলে কঙ্কে পাবার জন্য বোবা-কালা হয়ে থাকছে সবাই, গলায় বগলস দেওয়া লোম-ওলা প্রভুভক্ত কুকুর বাড়ছে রাস্তায়, এখন যুদ্ধপরাঙ্মুখ স্বয়ং কৃষ্ণ, দুর্যোধনের সশব্দ উল্লাস চারদিকে। বিষাদময় ব্যঙ্গে জ্বলে ওঠে তাঁর কবিতা :

'উঁচু উঁচু পেল্লায় বাড়ি
আহা-হা, তা
উঠবেই তো!
আমাদেরও ওঠার পালা
এল এবার;
যা করবার
তাড়াতাড়ি!
তাড়াতাড়ি!

আর এর পরের কথায় কবিতাটি লাফ দিল একরোখা কবিতার চিরকালীন পংক্তিতে, দিগন্তের দিকে ফলা উঁচু করে থাকা ভঙ্গিতে, কৌতুকের স্বরেই জানিয়ে দিল :

'যার নেই চাল, যার নেই চুলো
তাদের চোখে
বাড়িগুলো
তা একটু ফুটবেই তো!

এটা সারা বিশ্বের প্রতিবাদী কবিতার একটি সশস্ত্র ধরন, বহমান অসহায়তার কথা বলাই এখানে যথেষ্ট নয়, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান না জানালে কথা শেষ হয়

না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মায়াকভস্কির মতোই, আগুনে কবিতার ভেতরেও স্বরান্তর রাখতেন। প্যালেস্টাইনের কবি মাহমুদ হারবিশ লিখেছিলেন একেবারে সরাসরি :

'মানুষকে ঘৃণা করি না আমি,
অন্যের বিত্ত কেড়ে নেবার ইচ্ছেও নেই আমার,
কিন্তু, মনে রাখুন, খিদে পেলে
আমার ওপর চেপে বসে আছে যে, আমি
তার মাংসই তো খাব'

যদিও মায়াকভস্কি বা নেরুদার লেনিন বা স্ট্যালিনকে নিয়ে লেখা কবিতার মতোই সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও একমুখী কিছু কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণভাবে এই তিনজন কবিই স্মরণীয় হয়ে আছেন সাদা কথা সিঁড়ি বানিয়ে পাঠককে দিগন্তের দিকে পৌঁছে দেবার ক্ষমতার জন্য। মনে পড়ছে মারিও ভার্গাস লোসা এক সাক্ষাৎকারে নেরুদার উদ্দামতা নিয়ে উচ্ছ্বাস জানিয়েও তাঁর স্ট্যালিনপ্রীতিমুখর কবিতা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন।

'না কি বলেন' কবিতায় এই দ্বিতীয় পরতটি নেই, পুরো কবিতাটিই সদ্যোত্থিত এক ভোগী মানুষের অঙ্ক কষার কৌশলে লেখা। একটা ব্যাপার খেয়াল করলে বোঝা যাবে, মানবতাবাদী কবিতার অনেকগুলো প্রবণতার একটা হলো নাটকীয়তা। নাটকীয় বিন্যাসে কথার নানা মোচড় রাখা যায়, ভেতরে ভেতরে অনেকগুলো স্তর খেলানো যায়, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, কথাবার্তার স্বাভাবিক উচাটনকে ব্যবহার করা যায়। এই কবিতায় একজন মানুষেরই দ্বিধাজড়িত লালসার অন্ধকারময় অনিশ্চয়তাকে শব্দে শব্দে ধরে রাখা হয়েছে। 'ডায়মণ্ডহারবার' শব্দেই আছে এক অবৈধ উপভোগের সফেন ইশারা। মুশকিল হল, গাড়ি কিনলেই তো মিটছে না, তেলের হিসেবটাও করতে হয়। প্রতিরোধহীন উপার্জনের সিঁড়িতে তো সবে পা পড়েছে, সবদিক না ভেবে উঠতে গেলে যে পিছলে যেতে হবে, সে ভাবনাটাও আছে। তাই বিকল্প ভাবতে হচ্ছে বাড়ির কথা। বাড়ি ভাড়া দিয়ে ভাড়ার টাকায় গাড়ির খরচ তুলে আনার মধ্যে যে অসম্পূর্ণ বিত্তের দৈন্য প্রকাশ পেল, তার দিকে আলো ফেলাও এই কবিতার আরেকটি লক্ষ্য। তার পরেই আবার, উদ্বাহু হয়ে উঠল মদিরাময় বাসনার শিখা, বাড়ি গাড়ি দুটোই চাই, এই কামনায় থিতু হল মন।

মনোমোহিনী অর্থনীতির পাকে আমরা, ভারতবর্ষের মানুষ এখন দ্বিধাহীনভাবে জড়ানো। এখন আর গাড়ি বাড়ি করার বাসনা নিয়ে কটাক্ষ দূরের কথা, কথাই হয় না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নব্বই সালের আশেপাশে প্রকাশিত বইগুলোর কবিতায় এই লতিয়ে ওঠা ভোগচেতনার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময় আক্ষেপ আছে, কৌতুকের ছোবল আছে, বিপন্নতা আছে, বিপর্যয়ের ইশারা বোঝানো আছে। 'ধর্মের কল' কবিতায় সরাসরি বলেছেন :

'সময়টা সুবিধের নয়

কিছু না ক'রে
যে পারে সেই হাতিয়ে নিচ্ছে
খোলা মঞ্চে
চোখের পর্দাটুকুও না ফেলে
বহুরূপীরা
ঘড়ি ঘড়ি নিজেদের রঙ বদলাচ্ছে
কার হাত, কিসের হাততালি
কিসেরই বা জয়জোকার
মুখ দেখে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না'।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই নিরাভরন ধরনটিই তো বিলাসপ্রবণ, কূট, সন্দিগ্ধ বাজারী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিপুণ প্রতিবাদ। সারা জীবন এই সাধাসিধে কিন্তু আত্মসচেতন কলম অক্ষত রেখেছিলেন তিনি।

দেখেছেন
'বাড়ির পর বাড়ি রে ভাই
গাড়ির পর গাড়ি
আপনজনে পরের ধনে
চালাচ্ছে পোদ্দারি'।

মুখের ভাষায় নানা রঙ মিশিয়ে ইশারা বদল করেছেন তিনি অনেকবার। অনেক শব্দকে আলাদাভাবে সূচ্যগ্র করে লক্ষ্যভেদী করে তুলেছেন। 'ছিল নাকো কপর্দকও, তেমন লোকও/লাল হয়ে আজ হচ্ছে আমির' যখন বলেন তিনি, তখন 'লাল' শব্দটির দ্বিত্ব অলক্ষ্য থাকে না। 'কেডা রে' কবিতায় আবার ফিরে এসেছে সেই আক্ষেপ :

'বাড়ি। গাড়ি। অঢেল টাকা
প্রাচুর্য আজ দিয়েছে ঢাকা
সাবেকের সেই দৈন্য'।

'দৈন্য' শব্দে যে দীনতা নেই, সাবেক আদর্শবোধের সমাধির দিকেই যে আঙুল তুলছেন কবি, তা না বললেও চলে। কমরেডের সঙ্গে জেলখানার গল্প বলার স্মৃতি উশকে ওঠে পাঠকেরও, ভাঙা গাল, একেবারে রোগা টিঙটিঙে খাটো ধুতি, মার্কামারা খাকির হাফশার্টে সেই কমরেড মনে পড়িয়ে দেন পুরনো দিনের কথা। একই জেলে থাকা, সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা টিয়ার গ্যাসের জন্য, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—সমারোহময় দিনগুলি মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রভাত-মুকুল-সুমথকে। কিন্তু আজ

সবাই নিজেদের জালে বন্দী, নিজেদেরই তৈরি করা জেলে। আজ রেলিঙের আগুন-রঙের শাড়িগুলো পাট ক'রে আলনায় তোলা। রাস্তায় মাঞ্জা দেওয়া সব সুতোই লাটাইয়ে গোটানো।

'না কি বলেন' কবিতায় আত্মসর্বস্ব আয়োজনের যে উগ্রতা, তার সঙ্গে সারা রাস্তা ধৈর্য ধরে মড়া টপকে টপকে হাঁটার স্বাচ্ছন্দের মিল আছে। দুটোই আমাদের সময়ের পরাস্ত সহমর্মিতার কথা বলছে। বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম, গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না। এমন কাউকেই আমরা দেখছি না, যার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াতে পারি।

অথচ একটা সময় তো ছিল, যখন মনে হত, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'। শান-বাঁধানো ফুটপাতেও পাথরে পা ডুবিয়ে, কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসত চিরহরিৎ গাছ। সারাটা উঠোন জুড়ে অন্ধকার নাচাতে নাচাতে ঘরনি উঠোনে উঠে আসত। পেছনে ফিরে তাকালে এখনও দেখা যায় সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে গর্জমান সমুদ্র, দেয়ালে গুলির দাগ, ভাঙা স্লেট, ছেঁড়া জুতোয় ছত্রাকার রাস্তা, পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত। সেই মুখর সময়ে মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নীচে যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন।

কিন্তু 'না কি বলেন' কবিতায় বলা লোভ এখন সর্বগ্রাসী। এই শতাব্দীর সূচনায় ছাপা 'ছড়ানো ঘুঁটি' বইয়ের কবিতায় কবিতায় ছড়ানো গুলজার এই মজলিশি সময়ের চিহ্ন। কবির চোখের সামনে আমাদের ভালোবাসার শতাব্দী মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আকাশে উৎক্ষিপ্ত নিশান এখন সাপের ফণার মতো হিস্ হিস্ শব্দ করে উড়ছে। এই নিশানকে কখনও মনে হচ্ছে যেন ফাঁসি যাওয়ার ভঙ্গিতে ফাঁকা মাঠে অসহায় একা এক ঝোলানো পতাকা। দলিত লুণ্ঠিত স্বাধীনতা। শহিদেরা বেদিতে পুতুল হয়ে বসে আছে। 'কানামাছি' কবিতায় একটু ঘুরিয়ে বলছেন :

'সময়টাকে পেয়েছে এখন
পেঁচোয়
এক-পা যেই এগিয়ে যায়
অমনি দু-পা
পেছোয়'

'না কি বলেন' কবিতায় বলা গাড়ি বাড়ি করার বাসনা বিদ্ধ হয়েছে দু শতক পরের এই বইয়েও। এবার একেবারে সারসরি ঃ

'হাতিয়ে জমি, বানিয়ে বাড়ি
করছে টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি
কতক সাদা কতক কালো'

অন্ধকার এই সময়ে, তবুও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সামনের দিকে তাকানোর নাছোড় প্রবণতা এড়াতে পারেননি। সারা জীবন বিশ্বাস করেছেন অশুভ যা-কিছু তার শেষ হবে। মানুষ সমবেতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই সময়কে, সমাজকে। সেই 'পদাতিক' থেকেই তাঁর 'মিলিত অগ্রগতি'তে আস্থা, জানিয়েছিলেন, 'একাকী চড়তে চাই না এরোপ্লেনে'। অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে দ্বিতীয় বসন্তের প্রতীক্ষা করেছেন শুরু থেকেই। জীবনের শেষ পর্বেও, মাছের গন্ধে ছোঁক-ছোঁক-করা বেড়ালভর্তি এই সময়েও ধরে রেখেছেন এই বিশ্বাস:

'রাত্রিশেষে জমে উঠবে
এ মাটির কোল-আলো-করে
নতুন উৎসব'।

অথবা,

'একটা শুধু উলটো প্যাঁচেই হবে
দিনের পালাবদল'

অপূরণীয় এই বিশ্বাসের দাপটে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সারা জীবনের কবিতা আলোকিত।

মানবিক চৈতন্যের কবি

দিলীপ চক্রবর্তী

মেঘ, হাওয়া, রোদ, ছায়া এসবের কাছ থেকে 'যাচ্ছি' বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিদায় নিয়েছে। শুধু মেঘ-হাওয়া নয়, তিনি তাঁর 'যাচ্ছি' কবিতায় গরু-মহিষ, ধানের শিষ, জানালা-দুয়ার, জলদি-আস্তে, হাতুড়ি, কাস্তে, রবিঠাকুর, বাংলাভাষা, বই ও খাতা, আঁকা ও লেখা, কুহু ও কেকা, সমকাল, দেশ, আড়ি ও ভাব, প্রণাম ও আদাব, চশমার খাপ, পায়ের ছাপ, কুল ও তেঁতুল, ঠিক ও ভুল, চীনে বাদাম, পোস্টকার্ড এ সমস্তের মায়া কাটিয়ে 'যাচ্ছি' বলে চলে গিয়েছেন। কিন্তু 'যাচ্ছি' বললেই কি যাওয়া যায়? তাঁর 'যাচ্ছি' কবিতার শেষ লাইন হল 'ও মায়া আসছি/ও মিউ...'।

সত্যি সত্যি কি মানুষ একেবারে চলে যায়? সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই 'আজ আছি কাল নেই' কবিতায় বলেছেন 'বাংলা ভাষায় এই এক মাধুর্য/ আসছি ব'লে/স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায়/নাকি আমরা আদতে যাই না/আসি/নদী যেমন আসছি ব'লে/ নাচতে নাচতে/মোহনায় ছুটে যায়। আবার বৃষ্টি জল হয়ে/চক্রাকারে ফিরে আসে উৎসে/তেমনি কি? কী জানি।'

এই গ্রহের ৮৪টি বর্ষা, শীত-বসন্ত অতিক্রম করার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এখন তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বহু সংবাদপত্রে চর্চা শুরু হয়েছে। তাঁর স্মরণসভাও হয়েছে অনেক। শুধু এ বাংলাতে নয়, ওপার বাংলাতেও। এমনকী যাঁরা তাঁর প্রতি অতীতে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাঁরাও এই কবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, বাংলার গর্ব, একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কম নয়। কবিতা, উপন্যাস, রিপোর্টাজ, ভ্রমণ, প্রবন্ধ, জীবনী, অনুবাদ সাহিত্য এমনি কত কী তাঁর সৃষ্টি। ৮০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। কিন্তু তাঁর এই লেখার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। মানুষের কথা তিনি লিখেছেন, এমন কী প্রকৃতিও তাঁর কলমে এসেছে মানুষের আভরণ হিসেবে। বাংলার হাট-মাঠ-ঘাট, পথ-ক্ষেত-খামার, সাধারণ মানুষের ঘর-গৃহস্থালীর কথা, কলকারখানায় খেটে খাওয়া মানুষের কথাবার্তা, মানুষের চলিত কথা তাঁর কাছে এমনভাবে রূপ পেয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কখনও হয়নি। হতাশায় ভেঙে পড়া মানুষ, আশায় উদ্দীপ্ত মানুষ, নতুন সভ্যতার জন্য অগ্রসর হওয়া মানুষ, লড়াকু মানুষ, প্রতিবাদী মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, তাঁর রিপোর্টাজে, সাহিত্যে, কাছে উঠে এসেছে। এই মানুষ কিন্তু কল্পনার নয়। 'পদাতিক' হিসাবে তিনি এঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে এঁদের সঙ্গে থেকে এদের চরিত্রকে উঠিয়ে এনেছেন, তাঁর সাহিত্যে তাঁর কাছে। বাস্তবের এই মানুষগুলির প্রতি তাঁর মায়া। এই মায়াতে তিনি বাঁধা ছিলেন, তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

সৎ থাকার শিক্ষা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা প্রয়াত ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বৃটিশ সরকারের আবগারি বিভাগের দারোগা। বাবার বদলির চাকুরী, সে কারণে বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি গিয়েছেন, সুভাষের শৈশবও কেটেছে তাই বিভিন্ন জেলায়। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি আর মানুষ, শিশু সুভাষের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। পরিবার থেকেই তিনি শৈশবে শিক্ষা পেয়েছেন কোনও প্রলোভনে মাথা নোয়াতে নেই। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেও নেই। 'কাল মধুমাস' কবিতায় তিনি তাঁর শৈশবকে উল্লেখ করে এক জায়গায় বলেছেন—

'খেতালচাষিরা আসত পাট্টা নিতে;
তখন সামনের মাঠে পা ফেলা যেত না।
ঘটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে জল দিতাম আমি আর দাদা।
শুধু শুক্‌নো ঐটুকু পানিতে
কী করে যে মিলে যায় খোদাতালার এত দোয়া
—সেটা ছিল ধাঁধা।
কিছুতে নিতাম না হাতে গুঁজে দিলে কেউ লেজেঞ্জুস।

আবগারি-দারেগা হয়ে বাবার যে নামডাক এত—
দাদা বলত কী জন্যে বল্ তো?
কারণ, নেন না বাবা ঘুষ।
জল দিয়ে লজেঞ্জুস
এক রকম ঘুষ।'

কৈশোরে উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর মনে দাগ কেটেছে। তরুণ বয়সে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংস্কৃতির রূপান্তর আর সভ্যতাকে অগ্রসর করার জন্য মার্কসবাদী দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গায় বিপর্যস্ত মানুষকে দেখে তাঁর মন কেঁদেছে, মানুষের সংগ্রাম তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে। এ সমস্তই তাঁর সাহিত্যে ধরা পড়েছে। ঘুষ, প্রলোভন, অন্যায় আর দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করেননি তিনি কখনও, আর যত গণ্ডগোল এখানেই। একদা তাঁর সঙ্গী এবং 'কমরেড'রা এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায়। শাসন ক্ষমতায় আছে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। কিন্তু অন্যায় কমেনি, আর্তমানুষ এখনও আর্ত। দেশের বেকারের সংখ্যা কমেনি। শ্রমজীবী মানুষের একটি অংশ নতুন করে কর্মহীন হচ্ছে। তাঁর কথায় বংশ পরম্পরায় কলকাতার শানবাঁধানো পাথরে মাথা কুটে যারা কলকাতাকে বড় করেছে, তাঁরা কলকাতা থেকে বিদায় নিচ্ছে। শহরতলি থেকেও বিদায় নিচ্ছে। বস্তা বস্তা টাকা, তাঁদের মাথা গোঁজার জায়গা, পার্ক ময়দান, জলাভূমি সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে।' এই অবস্থা দেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেন, 'পার্টিতন্ত্র নিজেকে কায়েম করেছে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে। ভোট দিয়ে হয়কে নয় করা যায়। কিন্তু কার ভোট কে

দেয়? সব বুঝেশুনেও লোকে ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। কেননা জোর যার মুলুক তার। নিজেদের লোক ঢুকিয়ে পুলিশ আর প্রশাসনকে করা হয়েছে পার্টির ডান হাত। সেই সঙ্গে গ্রাম শহরের কায়েমী স্বার্থকে লাই দিয়ে চলেছে বাঁ হাতের কারবার। এর কোনও বিকল্প না পেয়ে লোকে আজ দিশেহারা। এ অবস্থায় কিছুই কি করার নেই?

পার্টিতন্ত্র বনাম বামপন্থা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তাতে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের শাসন কর্তারা ক্ষুব্ধ হলেন। একদা যাঁরা 'ডানঘেঁষা' ছিলেন, কাব্যে, সাহিত্যে মানুষের সুখ-দুঃখ-সংগ্রামের কথাকে নিচে ফেলে 'হৈ-হুল্লোড়-আড্ডা'র দর্শনকে তুলে ধরেছেন, রাতারাতি তারা সরকারি প্রশাসনের সু-নজরে আসার জন্য নিজেদের বামমনোভাবাপন্ন বলে ঘোষণা করলেন, আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থান 'বামপন্থার বিপরীত মেরুতে' বলে তারা মন্তব্য করতেও পিছপা হলেন না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখে 'পার্টিতন্ত্র' আর বামপন্থা এক নয়। 'পার্টিতন্ত্র'কে তোসামোদ করলে তাঁর অবস্থান নিশ্চয়ই থাকতো রাজসভার সভাকবি হিসাবে। আর্থিক কষ্ট অবশ্যই তাঁর থাকতো না। কিন্তু পদাতিক কবি, প্রতিবাদী কবি এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসার কবি হিসাবেও তিনি থাকতেন না। তাঁর অবস্থানও নিশ্চয়ই বদলে যেতো। কিন্তু তাঁর অবস্থান বদলায়নি বলেই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন, 'এই যদি হয় আসল চেহারা/রাষ্ট্রীয় হিন্দুত্বর/হেঁকে বলি তাকে পাজির-পা-ঝাড়া/যমে নিক তোকে, ধুত্তোর/সমানে গুঁতোয় ধর্মের ষাঁড়ে ত্রাহিরব জাতিসত্তায়/মহাভারতকে তুলে নিয়ে ঘাড়ে/হাঁকে রাম-নাম সত্ হায়।'

মায়ের মন

মায়ের মন নিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরিচিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হলে তিনি যেমন তাঁদের চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনি তাঁর পরিচিত হাজং আন্দোলনের নায়ক ললিত হাজং, শশীন চক্রবর্তী প্রমুখের চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁর সাহিত্য আকাদেমি'র পুরস্কারের টাকার একটি অংশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বজবজে শ্রমিক বস্তিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দীর্ঘদিন, বাস্তবের বাবর আলি, সালেমন কিংবা আহমদ উঠে এসেছে তাঁর কাছে। এই শ্রমিক অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল আমৃত্যু। শ্রমিক আন্দোলন বিভাজন হয়েছে, তাঁর প্রভাব পড়েছে বজবজেও। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের আপনজন, নিজের মানুষ। মৃত্যুর আগে কবি সুভাষ হাসপাতালে ভর্তি, রাজ্যের মন্ত্রীরা তাঁকে দেখতে যাননি, বজবজের এই শ্রমিকেরা কিন্তু হাসপাতালে এসেছেন তাঁকে দেখতে।

মায়ের দরদী মন নিয়েই তিনি প্রতিবাদী মানুষের পাশে, আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অতীতে ষাটের দশকে পুলিশী সন্ত্রাস আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন, ৭০-৭১ সালে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ কিংবা পুলিশের গুলিতে তরুণরা হত

হওয়ার পর তিনি ব্যাথাতুর হয়েছেন। অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র নকশাল দমনের নামে যে ভাবে গুলি করে তরুণদের হত্যা করেছে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে, 'আমার যখন এল বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়স/ ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে/ ছেলে গেছে বনে/ আমি তবু পদাতিক, হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিক/ কাছে এসো রত্নাকর, দূর হটো বাল্মিকী' কিংবা 'একদল বাইরে থেকে ওসকাচ্ছে/ একদল ভেতরে থেকে ভাঙছে/বলির বাজনায়/আর জয় জোকারে/রক্ত মাখা খাঁড়াগুলো/উঠছে আর পড়ছে।/উঠছে আর পড়ছে।' আবার ৯০-এর দশকে যুব-কংগ্রেসের মিছিলের গুলিতে ১১ জন তরুণের মৃত্যুর পরেও তিনি এই ব্যাথাতুর মন নিয়েই আঁতকে উঠেছেন, লিখেছেন 'রাস্তা/রক্ত/রাস্তা/রক্ত' এক দুঃসহ ব্যথা।

অতীতে যেমন জগদ্দলে, বজবজে সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এই কালপর্বে নিখোঁজ শ্রমিক ভিখারি পাশোয়ানের খোঁজে হুগলীতে যেতে কিংবা কানোরিয়ার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি।

পদাতিকের কাছে মার্কসবাদ

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলা তিনি দেখেছেন, দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতায় বিধ্বস্ত ভারত। দেখেছেন সংগ্রামী মানুষ। মার্কসবাদ কথার অর্থ যেকোনওভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা তিনি বোঝেননি। মার্কসবাদ একটি সৃজনশীল দর্শন। সৃজনশীলভাবেই একে প্রয়োগ করতে হয়। মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটায়। সভ্যতাকে অগ্রসর করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়। কবি সুভাষ তাঁর লেখায়, কবিতায় সারাজীবন সমাজবাদের এই মানবিক মুখই খুঁজেছেন। এ কারণেই সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর ঘরের দরজা খোলা রয়েছে সবসময়। যতক্ষণ পায়ে শক্তি ছিল, ঘুরে বেড়িয়েছেন পদাতিক হয়ে সর্বত্র। জলপাইগুড়ি, কিংবা মেদিনীপুর অথবা বাঁকুড়া, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ অথবা চট্টগ্রাম। সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তাঁর সখ্য। তাদের ঘরে থেকেছেন, পান্তাভাত খেয়েছেন। মজা করে বিড়ি খেয়েছেন। এই তো কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার কয়েকজন তাঁকে বাঁকুড়ার বিড়ি পাঠালে কি ভয়ানক খুশি হয়েছেন।

আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না তাঁর কোনদিনই। কলকাতায় থাকতেন এক সাধারণ ভাড়াবাড়িতে, অথচ ইচ্ছে করলেই তিনি হতে পারতেন সরকারের সভাকবি। অথবা বড় বেসরকারি পত্র-পত্রিকার স্থায়ী সেবাদাস। তাহলে আর্থিক কষ্ট থাকত না তাঁর কোনওদিনই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনদিনই তিনি পাত্তা দেননি। তাঁর এই চলা এবং মানুষকে দেখা, এর মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা কাব্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা।

অনন্য রিপোর্টাজ

বাংলা সাংবাদিকতায় তাঁর অনন্য সংযোজন 'রিপোর্টাজ', 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় তাঁর লেখা রিপোর্টাজগুলি সাংবাদিকতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'আমার বাংলা', 'ডাকবাংলার ডায়েরী' কিংবা 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'—তাঁর এই রিপোর্টাজের

বইগুলি বিদগ্ধ মানুষের মতে একমাত্র হেমিংওয়ের লেখা রিপোর্টাজের সঙ্গেই তুলনীয়।

২১ বছরের সুভাষ তাঁর প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'-এর প্রথম কবিতায় 'চিমনির মুখে শোনা সাইরেন-শঙ্খ' লিখে বাংলার শ্বাশত শিল্পকে এনে হাজির করেছিলেন। এরপর তাঁর বহু কবিতার বহু পংক্তি প্রবাদ হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' কিংবা 'ফুলগুলো সরিয়ে নাও/ আমার লাগছে' অথবা 'তোমার রাজাগুলোকে সামলাও হে/নইলে এই কিস্তিতেই মাত যে!', 'ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে' অথবা 'একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে' ইত্যাদি।

বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের চলিত ভাষাকে কবি সুভাষ ছন্দে এনে তাঁর কাব্যে রূপ দিয়েছেন, এ বিষয়েও তিনি প্রথম। বাংলা কাব্যের ভাষা হবে পৃথক বলে যে সমস্ত কবি অতীতে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, কবি সুভাষের কবিতার পর তাঁদের এই আপত্তি আর টেঁকেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন বাংলা কবিতার নাড়ির যোগ ছিল বাস্তব জীবনের মধ্যে, বিশেষ করে মাটি ঘেঁষা মানুষের মধ্যে, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। এই অনুভব থেকেই তাঁর 'চর্যাপদ চর্চা'। 'চর্যাপদ' গ্রন্থের ভূমিকায় 'তর্জমার পেছনে' শীর্ষক লেখায় কবি সুভাষ তাই লিখেছেন, 'বাংলা কবিতার গোড়া বাঁধা হয়েছিল বাস্তব জীবনের মধ্যে। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তার ছিল নাড়ির যোগ। চর্যাগান তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আধুনিক বাংলা কবিতা সেই পদকর্তাদেরই উত্তর শরিক'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই অনুভূতিটি বুঝতে সক্ষম হলেই, তাঁর কাব্য এবং সাহিত্যে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াকু মানুষ আর বাস্তব জীবনের সংগ্রামী মানুষই কেন বারংবার এসেছে এটি অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

শুধু কাব্য কেন? বাংলা গদ্য? নিছক সংবাদের সঙ্গে মানসিক অনুভূতিগুলি মিশেল করে চলিত ভাষায় লেখা 'রিপোর্টাজ'। বিশ্বের দরবারে ইংরেজি ভাষায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জন রীড প্রমুখ সাংবাদিকেরা রিপোর্টাজ লিখে স্বনামখ্যাত হলেও, বাংলা সাংবাদিকতায়, শুধু বাংলা সাংবাদিকতার জন্য বলাটাও সঠিক নয়, ভারতের কোনও ভাষাতেই 'রিপোর্টাজ' বিষয়টি ইতিপূর্বে ছিল না। চল্লিশের দশকে বামপন্থী পত্রপত্রিকাতেই 'রিপোর্টাজ' লেখা প্রথম শুরু হয়। বাংলা সাংবাদিকতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এটি প্রথম শুরু করেন, সে সময়কার কমিউনিস্ট নেতা পি. সি. জোশী, ভবানী সেন, নৃপেন চক্রবর্তী এবং সোমনাথ লাহিড়ীর উদ্যোগে এবং নির্দেশে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ তাঁর অনবদ্য বাংলা গদ্য তাঁর সাহিত্যগুণে নূতনত্ব সৃষ্টি করে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গদ্যের প্রশংসা করেছেন নীহাররঞ্জন রায়, অনন্নদাশংকর রায়, গোপাল হালদার প্রমুখ। গোপাল হালদার একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সুভাষের বাংলা গদ্য অনবদ্য। আমার মতে বর্তমান সময়ে সবচাইতে আকর্ষণীয় গদ্য লেখে সুভাষ।' আর ১৯৮২ সালে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক সম্বর্ধনা সভায় কবি সুভাষের বাংলা গদ্যের সপ্রশংস উল্লেখ করে মজা করে বলেছিলেন, এতদিন ধরে বাংলা

গদ্য লিখছি, মাঝে মাঝে মনে হয় যদি সুভাষের বাংলা গদ্য চুরি করতে পারতাম। কিন্তু করিনা, কারণ ধরা পড়ে যাব। ওই রকম সহজ সাবলীল গদ্য একমাত্র সুভাষই লিখতে পারে।'

এই সাবলীল অথচ গভীর বাংলা গদ্যেই সুভাষ রচনা করেছেন উপন্যাস, 'হাংরাস', 'কে কোথায় যায়', 'কমরেড কথাকও', 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' প্রভৃতি। এই অনবদ্য বাংলা গদ্যেই তিনি যেমন রিপোর্টাজ লিখেছেন যা পরে 'আমার বাংলা', 'ডাক বাংলার ডায়েরী', 'আবার ডাকবাংলার ডাকে', অথবা 'ক্ষমা নেই'। তেমনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী, 'যখন যেখানে', 'যেতে যেতে দেখা', 'ভিয়েতনামে কিছুদিন', 'অগ্নিকোণ থেকে ফেরান' প্রভৃতি। তাঁর আত্মজৈবনিক লেখা 'ঢোল-গোবিন্দের আত্মদর্শন', 'ঢোল-গোবিন্দের মনে ছিল এই' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর এই অনবদ্য গদ্য পাওয়া যায়। তাঁর অনূদিত পদ্য কিংবা গদ্য, বাঙালি পাঠকদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথেছে তাঁর সহজ ভাষায় অনুবাদের গুণে। তাঁর অনুদিত গদ্যগ্রন্থ রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ, চে গেভারার ডায়েরী, ডোরাকাটার অভিসারে, অনাফ্রাঙ্কের ডায়েরী, কিংবা তমস অথবা তার অনুদিত কাব্যগ্রন্থ পাবলো নেরুদার কবিতা, নাজিম হিকমতের কবিতা, আমাদের মনকে নিশ্চয়ই টানে।

লেখা নিয়ে বিতর্ক

আবার এই সহজ বাংলায় লিখতে গিয়ে তিনি অনেক সময় তাঁর পার্টির নেতাদের বিরাগভাজনও হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর 'ভূতের বেগার' বই প্রকাশিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে তুমুল বিতর্ক ওঠে। পার্টি নেতৃত্ব হুলিয়া দেন মার্কসবাদ কি এতই সহজ! 'সারপ্লাস ভ্যালু'—কে সহজ করে লেখা? এটি হবে না। ওই সময়ে সিপিআই দলের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন জ্যোতি বসু। মোজাফ্ফর আহমেদ্, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত, প্রমুখ নেতৃত্বে আসীন। কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গোপাল হালদার, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ মিলিতভাবে পার্টি নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। বিতর্কও হয়। কিন্তু নেতৃত্ব তাঁদের সিদ্ধান্তে ওই সময়ে অটল ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্যই বইটি আবার প্রকাশিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেকবার। ১৯৬৪ সাল সিপিআই দলে ভাঙন হয়। এই রাজ্যে অধিকাংশ সিপিআই সদস্য সিপিআই (এম) দলে যান। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সি. পি. আই দলেই থাকেন। তাঁকে নিয়ে প্রচারিত হতে থাকে 'শোধনবাদী' কবি।। কাদাছোঁড়া এবং কুৎসাও রটনা করা হয় তাঁর নামে। তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলা হল 'কলকাতার হ্যামলেট'। একদা একসঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, তাদের অনেকের কাছ থেকে এই কুৎসা শুনে তাঁর অনেকসময় ক্ষোভ হয়েছে, অভিমান হয়েছে। তাঁর 'আজ আছি কাল নেই, 'হিংসে', 'দুয়ো', 'ল্যাং' প্রভৃতি কবিতায় হয়েছে তারই প্রতিফলন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আবার বিতর্ক ওঠে সিপিআই দলে ১৯৭৭ সালে। তদানীন্তন সিপিআই দলের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন, 'বিগত ৭০-এর দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ

শাখার মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক বিরোধের দরুণ একটা জটিল পরিস্থিতি চলছিল। তখন আমি রাজ্য শাখার সম্পাদক। ওই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে একটি ঘটনায় আমি দারুণ সংকটের সম্মুখীন হই। লেখাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। ওই সময় তিনি গ্রাম বাংলায় ঘুরে আবার রিপোর্টাজ লিখতে শুরু করেন। সেগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। হঠাৎ পার্টির মধ্যে একটা মত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে; যে পার্টি সদস্য হিসাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আনন্দবাজারে লেখা পার্টি বিরোধী এবং পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তুলে ওই মতাবলম্বীরা তাঁর শাস্তি দাবি করতে থাকে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের বোঝানো যায় না যে কী লেখা হয়েছে সেটাই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়, কোথায় লেখা সেটা নয়। তারা কিন্তু লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও অভিযোগ তোলেন না। ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজ্য পরিষদের সভায় উত্থাপিত হয়। যা হোক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের ফলে তারা বিষয়টি নিয়ে আর এগুতে রাজি হয় না। ভাবতে অবাক লাগে এই বিতর্কের পুরো সময়টাই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নিরুত্তাপ। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এরপরে সিপিআইতে আর সদস্যপদ নবীকরণ করেননি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ সিপিআইতে থাকলেন না। এর জন্য তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক হিসাবে এখনও আমি গভীর অনুতাপ ও আক্ষেপ করি।'

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। রাজসভার কিছু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সময়েও মন্তব্য করেছেন তাঁর অবস্থান 'বামপন্থার বিপরীতে'। আবার সরকার অনুগৃহীত কিছু 'অবোধ' মন্তব্য করেছেন, ১৯৬০ সালের পর সুভাষ মুখোপাধ্যায় পচা শামুকে পা কেটেছেন। এঁদের মন্তব্য বা কথা নিয়ে বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়। কারণ তাঁরা সত্যি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুধাবন করেননি। আমার মতে তাঁরা সত্যিই অবোধ। সিপিআই নেতা বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় মন্তব্য করেছেন 'যৌবনের প্রারম্ভে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কসবাদের প্রতি যে আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন আমৃত্যু তা অটুট ছিল। কারণ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও লেখা আমি পড়িনি। বক্তব্যও শুনিনি।'

কিন্তু বিতর্কটি হওয়া উচিত অন্যভাবে। একজন কবি কিংবা সাহিত্যিককে বিচার করা হবে কিভাবে? তিনি কতটা মার্কসবাদী, 'খাঁটি আগমার্কা' অথবা 'ভেজাল মেশানো' এইভাবে? তাহলে রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর থেকে আশাপূর্ণা দেবী এঁরা তো মার্কসবাদী ছিলেন না। তাহলে কি এদের সৃষ্ট সাহিত্যের কোনও মূল্য নেই?

শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই দেখা যায় সেই দেশের রাজা কিংবা সরকার তার গুণগ্রাহী অবোধদেরই পছন্দ করে। এমনকী কমিউনিস্ট দেশেও। সাম্প্রতিক চীনের কবি আই চিং এর ঘটনাই উল্লেখ করা যাক। তিনি চীনের নেরুদা বলে পরিচিত। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চীনে তিনি সুপরিচিত কবি। এরপরই তিনি আক্রান্ত হলেন। তাঁকে আখ্যা দেওয়া হল শোধনবাদী। গ্রেপ্তার করে পাঠানো হল শুয়োরের খামার দেখভাল

করতে। ১৯৬৮ সালে অবশ্য চীনের সরকার তার ভুল শুধরে মুক্তি দিলেন। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়াতেও পস্তারনায়েক সহ অনেককে এরকম তকমা দেওয়া হয়েছিল শোধনবাদী বলে। পরে তারা রেহাই পেয়েছেন। আমাদের দেশেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আক্রান্ত হবেন এতে আর বিচিত্র কী?

তাঁর পাওয়া পুরস্কার

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার কবি। বাংলার নদী, পাহাড়, শঙ্খ থেকে আলপনা, বাংলাভাষা এবং মানুষ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও পুরস্কার তিনি পাননি। রবীন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, কোনওটাই নয়। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটাই তাঁকে কোনও সাম্মানিক ডি-লিট দেয়নি। এমনকী বাংলা আকাদেমির সদস্য হওয়ার জন্যও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে পুরস্কার কিংবা তিরস্কার কোনটাতেই তাঁর আক্ষেপ নেই। কারণ, সাহিত্য আকাদেমি, কবীর, মির্জাতুরসনজাঁদে (তাজাকিস্তান), সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার, লোটাস (আফ্রো-এশিয়া লেখক সংঘের পুরস্কার) এবং আমাদের দেশের সাহিত্যের সেরা পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ' তিনি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়েছে। আবার জীবনের বেশ কয়েকটা বছর মতাদর্শের জন্য তাঁকে কারাগারে আটক থাকতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় পুরস্কার বোধ হয় তাঁর জনপ্রিয়তা। গত ছয়দশক ধরে তাঁর কলম যে ফসল সমসাময়িক প্রজন্মকে দিয়েছে তার গুরুত্ব অসীম। তিনি কলম কখনও বন্ধক রাখেননি। যা লিখেছেন মনের তাগিদে, আর বিশ্বাসে, আর নিজস্ব বিশ্বাসে, মাথা উঁচু করে।

কবি সুভাষ কি তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন? একথার উত্তরে সুভাষ নিজেই বলেছেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে কতগুলি নিয়ম। সেই নিয়ম সম্পর্কে সজাগ হওয়া। আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে যতটুকু বুঝতে পারি সেইটুকুই আমার বিশ্বাস।' অতএব বিশ্বাস হারানোর কথা উঠছে কেন? রাজনৈতিক চেতনা ও মানবিক চৈতন্যের কবি হিসাবে সুভাষ তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেছেন। মানবিক থেকেছেন বলেই 'বেদনার আকাশগঙ্গা'কে মাথায় বেঁধে বজবজের শ্রমিক বস্তির চোখে পিচুটিপড়া ছোট্ট মেয়ে 'সালেমন' থেকে 'বাবর আলি', দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়া বুড়ি, আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত মুষ্টিযুদ্ধ শাণিত হাত, মিছিলে দেখা মুখ উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। টানা-ভগৎদের প্রার্থনা শুনে 'কাঁধে চড়া ভূতেদের' ঠ্যাং ধরে টানার জন্য, চোখ ট্যারা ভূতেদের চুল ধরে টানতে আর কেটে পড়া ভূতেদের নড়া ধরে টানতে বলেছেন। তাঁর বিশ্বাস 'সবার ওপরে আজ সত্য/ মনুষ্যত্ব' —এইকথা বলে যেমন উল্লেখ করেছেন, আবার সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িক শক্তি আর ধ্বংস মুখর রাষ্ট্রশক্তিকে উপহাস করে শেষ জীবনেও লিখেছেন, "নিজেকে খুব সেয়ানা ভেবে/উঁচিয়ে ধরে সঙ্গীন/অবিশ্বাসীর হাসি হাসছে/বেকুব/বদলে যাচ্ছে দিন/জানে না সে, এক নদীতে দুবার/দেওয়া যায় না ডুব"।

আধুনিক, সংবেদনশীল, মানবিক সুভাষ জীবন সায়াহ্নেও সংগ্রামী জীবনের, আর মানবিকতার জয়গান গেয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবিশ্ব:মার্ক্সবাদ বনাম মানববাদের দ্বান্দ্বিকতা

মিষ্টু রায় সামন্ত

মহত্তম মানুষ উত্তর পুরুষের জন্য অর্ঘ্য বহন করেন, আনেন জীবনের বার্তা—তারা বাস করেন অনাগতে, সেই অনাগতকে প্রস্তুত করেন সকলের জন্য। যে জীবনকে তারা ব্যক্ত করেন সে জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত নয়, দুঃখ সেখানে সৃষ্টির আগুন—সুভাষ মুখোপাধ্যায় বোধহয় তেমনি এক কবি যিনি দুঃখ আগুনে সৃষ্টিধারাকে জীবনমুখী করেছেন।

বাংলা কবিতার ভাবে এবং রূপে পরিবর্তন সাধিত হল উনিশ শতকে। পূর্বের অধ্যাত্ম বিশ্বাসের স্থান নিল যুক্তি বুদ্ধি বিশ্লেষণী বোধ। ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদ কিংবা ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের আপাত জটিল অথচ শাশ্বত কিছু সত্য মানব মনে নব অভিজ্ঞানের জন্ম দিল। রুশ বিপ্লবের মারাত্মক অভিঘাতে সমাজতাত্ত্বিক নব বীক্ষণ শ্রেণি বিভক্ত মানব সমাজের শ্রেণি সংঘাত তথা অর্থনীতির নব নব অভিমুখ উন্মোচিত হল। ব্যোদলেয়ার কিংবা র‍্যাবোর বদান্যতায় অসুন্দরের ধারণা এবং সভ্যতার অন্তরঙ্গ অসুখ পরবর্তী সাহিত্যের পথরেখা নির্দেশ করল। এহেন সমাজতাত্ত্বিক, দেহতাত্ত্বিক মনোবৈজ্ঞানিক অভিঘাত বাংলা কবিতাকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পশ্চিমী চেতনার সম্মিলিত বোধে উত্তরিত করল।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সংকটবোধ ও নৈরাশ্যচেতনা, প্রেমেন্দ্র মিত্রে অস্ত্যার্থক সমাজদৃষ্টি, অমিয় চক্রবর্তীর বৈচিত্র্যময় প্রাকরণিক বোধ, অধ্যাত্ম বিশ্বাস সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চেতনা সম্পন্ন, বিষ্ণু দের সাম্যবাদী শিল্পমন, জীবনানন্দের বাস্তবের বিবর্ণতায় অস্তিত্বের নিমগ্নতা বোধ; রবীন্দ্র উত্তরকালীন আধুনিকতার বোধকে সম্প্রসারিত করল।

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আবর্তসংকুল করে তুলল। রুশ বিপ্লব পরবর্তী সাম্যবাদী চেতনা বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করল। ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করতে স্থাপিত হল 'প্রগতি লেখক সংঘ'। তিরিশের কবিরাও চল্লিশের দশকে সমাজ রাজনীতি মনস্কতাকে কবিতায় রূপায়িত করতে দ্বিধান্বিত হননি। চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা সর্ব অর্থেই সমাজ রাজনীতির বোধ জারিত। নাটকে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা, কবিতাতেও সাম্যবাদী স্বরটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠা, পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদের দ্বান্দ্বিক বিন্যাসের প্রেক্ষাপটটি বাংলা কবিতায় নব সুরের আমদানি করল। তিরিশের কবিদের সাম্যবাদী চেতনার ব্যক্তিক অনুভবলোক চল্লিশের কবিদের সমবায়ী সংঘ শক্তির উপলব্ধিতে পর্যবসিত হল। শ্রেণি সংগ্রামের রাজনৈতিক ভাষ্য; কবিতার প্রত্যক্ষ বিষয় হিসাবে উঠে এল অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, মনীন্দ্র রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসুদের কবিতায়।

মধ্যবিত্তের সামাজিক নৈরাশ্য, রাজনৈতিক হতাশা—নব জীবন ভাষ্যের মধ্যে দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরালে সর্বভারতীয় রাজনীতি বামপন্থী চেতনাকে লালন করতে লাগল। মার্কসবাদ এমতাবস্থায় যে তরুণ কবিদের আকর্ষণ করবে তা আকস্মিক কিছু নয়। যদিও রবীন্দ্রোত্তর কবি নজরুলের কবিতায় মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে সাম্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছে, কখনো বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় যখন 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের সঙ্গে সমানুভূতির প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয় তখন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বীক্ষণটি নির্দিষ্টভাবে অনুসরণ না করেও সাম্যময় পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর হয় কবি মন। কলকাতার কবিরা তিনের দশক শেষ হবে অনেক আগেই মার্ক্সীয় শ্রেণি বিপ্লবের তত্ত্বে মনোযোগ দিতে শুরু করেছেন। সভ্যতাভিমানী এবং সংস্কৃতি অভিমানী কোনো কোনো কবি (সুধীন্দ্রনাথ) উপনিবেশের অকৃতার্থ বিবর্ণ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে 'জনতার জঘন্য মিতালি' বা 'পতঙ্গের সাম্যবাদ'—শব্দ বন্ধের ব্যবহারে মধ্যবিত্তের আত্মম্ভর আভিজাত্যের বোধকে ব্যহত করে, জনগণের দাবিকে প্রবলতর করে তোলেন। মার্ক্সীয় অর্থে যা নাকি শ্রেণি জ্ঞান তা আমরা পেয়ে গেলাম সমর সেনের কবিতার প্রত্যক্ষতার তীব্রতায়। বিষ্ণু দের কবিতায় শক্তির অবক্ষয় নয়, শক্তির রূপান্তর। যে রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতা 'পদধ্বনি' কবিতার বিষয়। যা নতুন সামজিক শক্তির অভ্যুদয়কে মার্কসীয় ইতিহাস জ্ঞানে অনিবার্য বলে মনে হয়েছে।

বাংলা আধুনিক কবিতার তাত্বিক পটভূমিকা সৃষ্টিতে মার্কসবাদের অবদান ঠিক কতটা দেখা যাক———

প্রথমত : কবিতার ভাষায় এল ঋজুতা ও তির্যকতা।

দ্বিতীয়ত : সকল কবিতাই এক অর্থে নাট্যকবিতা। কবিতার তৃতীয় স্বরে এক নতুন ডাইমেনশন এল।

তৃতীয়ত : কাব্য বিষয়ে প্রেম বিরহ ব্যক্তিগত বাসনা-বর্জিত সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি জোরালো হয়ে ওঠে।

চতুর্থত : সাম্যবাদী বাঙালি কবিদের বাক্যশৈলীতে এনে দিয়েছে গতিবেগ। পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন থেকে বাক্যের এই সচল তীক্ষ্ণতার জন্ম।

পঞ্চমত : মার্কসীয় বাস্তববীক্ষা থেকে কাব্যের ভাষাজ্ঞানও নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেননা এযুগের কাব্যভাষা ফ্রয়েড—এর মনসমীক্ষা এবং মার্ক্সের ইতিহাসজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে। যুগের স্পন্দনকে আত্তীকৃত করতে কথ্যভাষার মধ্যে অকৃত্রিম কাব্যভাষার বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছে।

ষষ্ঠত : কবিদের ব্যবহারে প্রতীকের বাহুল্য জীবনমান্য হয়ে ওঠে মার্ক্সীয় বিশ্বভাষাকে অবলম্বন করে।

সপ্তমত : মার্ক্সীয় তত্ত্ব যত কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সংহত হয়েছে কবিতাও তত

আত্মানুসন্ধান পরিহার করে বক্তব্যপ্রধান উদ্দেশ্যবাদী হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্ট ঘোষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত সামান্য কিছু কবিতা লেখা হলেও ক্রমশ প্রকৃত বামপন্থা যা মানুষ সম্বন্ধীয় ভাবনা, জীবনের সংকট সম্বন্ধে অনুভূতি, নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের চেতনা এবং তা উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা—তাই পরিসর বিস্তৃত করতে চাইল মার্কসবাদী দর্শনে আস্থাশীল কবিদের কবিতায়। এভাবেই মার্ক্সবাদ কবিদের মানবীয় জল মাটি শিকড়ের সন্ধানে অক্লান্ত করে তোলে।

বাংলা আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বরক্ষেপণের বিশিষ্টতার কথা স্মরণে রেখেও কবির জনগণের স্রোতে বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ, দীর্ণ জগতে একই সাথে বাঁচার লড়াই জিততে চান তখন দেখা দেয় কবির শাশ্বতবোধের প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা। আবার এই সমালোচকেরাই কবির বীক্ষণকে দ্বিধা বিভক্ত করে কোনো কোনো কবিতাকে বিক্ষিপ্তভাবে সজাগ আত্মবীক্ষণের নিদর্শন বলে প্রশংসা করেছেন এর আঙ্গিককুশলতা, নাগরিক চাতুর্য ও বাগভঙ্গীর লক্ষ্যভেদী দক্ষতাকে।

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর অ-বামপন্থী দৃষ্টিকোণ দুটি বিশিষ্ট কারণে 'কবিতা পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে তাকে সাদর আতিথ্য প্রদান করল। যে বিশিষ্টতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল প্রছন্নভাবে কবি সুভাষের মার্ক্সবাদী দর্শনটি—

প্রথমত, তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেম বা প্রকৃতির কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না।

দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্য রচনায় তার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে করেছিলেন বুদ্ধদেব।

সক্রিয় রাজনীতির সমান্তরালে কবিতার চর্চাকে কমিউনিস্ট পার্টি পেটিবুর্জোয়া সুলভ বলে মনে করতেন। তাই 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে চাঁদ, ফুল, কোকিল, বসন্ত, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্রুপ লক্ষ্য করা যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মার্কসবাদী দর্শনের সামাজিক দীক্ষা এ সময়েই সম্পূর্ণ হয়েছিল তা লেখকের যবানিতে স্বীকৃত————

——"আমি যখন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়েছি এর কিছু আগেই আমার প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছে—'পদাতিক'। সাহিত্যে কিছুটা খ্যাতি হয়েছে আমার। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশন আমাদের সংগে কখনই একজন খ্যাতনামা লেখকের ব্যবহার করে নি। একজন সাধারণ ছাত্র কর্মী হিসাবেই দেখত.....ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বড়দের টুকিটাকি ফাই ফরমাস পর্যন্ত খাটতাম। এই সবের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী অভিমান আটকাতে পেরেছিলাম। ছোট কাজও শ্রদ্ধার সংগে করতাম। পোস্টার লেখা পোস্টার সাঁটা, স্ট্রীট

কর্ণার করা, চাঁদা তোলা—এসবই করতাম। এই সবের মধ্যে দিয়েই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম।"[১]

অরোম্যান্টিক মানসিকতার পোষণ সংঘটিত হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্র কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অন্তর্নিহিত আধুনিক তীব্র ব্যাঙ্গ বা শ্লেষাত্মক চিত্রকল্পের ব্যবহারের। মরীচিকা, মরুশিখা ও মরুমায়া'র কবি যতীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি মনকে সঞ্চারিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, সর্বোপরি সমর সেন কাব্যপ্রতিমা বিন্যাসে কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অতিরিক্ত, বাংলা গ্রামীন ও নাগরিক কৃষক কিংবা শ্রমিক সকলের প্রতি প্রবল সমবেদনাবোধ সুভাষের মধ্যের চেনা গণ্ডী অতিক্রমী মরমী জনগণের চিরায়ত মানবের আনন্দ বেদনা, স্বপ্ন কল্পনার, আশা আকাঙ্ক্ষার, তিক্ত মধুর রসে নিজেকে জারিয়ে তত্ত্ব থেকে সত্যের পথগামী হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিসত্তা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শরীরে প্রেম কামনা, আশ্লেষের জৈবোচিত বিষয়ের ক্ষীণ উপস্থিতির আরো একটি গূঢ় কারণ হিসাবে অনেকেই সুভাষের টাইফয়েডের প্রাবল্যে প্রায় স্মৃতি, শ্রবণ ও স্বর, দৃষ্টি হারাতে বসা শিশুর শারীরিক অক্ষমতার কথা বলেছেন তেমনি কমিউনিস্ট বৈপ্লবিক মানসিকতার কারণে পরিচিত পরিমণ্ডলের জীবনাচরণের সহজ ছন্দ বিচ্যুত সুভাষ মুখোপাধ্যায় নির্মমভাবে, নিরুপায়ভাবে বাধ্য হয়েছিলেন পেটিবুর্জোয়া দুর্বলতা ত্যাগ করার জন্য। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দিনযাপনের জৈব প্রয়োজনগুলি বিসর্জন দিয়ে কৃচ্ছ সাধনে ব্রতী হতে। তাই চাঁদ, ফুল, কোকিল, বসন্ত সম্বন্ধে তির্যক ব্যঙ্গই বর্ষিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। কেননা— 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।'

—জীবনবোধের এহেন তীব্রতর জাগর বাস্তবতাকে সংহত ভাষায় সুসংবেদ্য করে তুলেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আপন মৃত্তিকালগ্ন বহুমানবের অবগাহিত অভিজ্ঞতার দ্বারা, অকপট আন্তরিকতার গভীরতায় আবেগার্দ্র ভাবাতুরতার বদলে শুকনো অথচ জীবনরসে টইটম্বুর এক সহজ ভঙ্গিমা সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ কিংবা বুদ্ধদেব বসু থেকে তাকে পৃথক করে দিল। চল্লিশের কবিতায় যে যান্ত্রিক তত্ত্বমাত্র সংবাদ হিসাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, সেই তথ্যই সুভাষের কবিতায় সংকেতের সাহচর্যে কাব্য হয়ে ওঠে।

গ্রন্থ সমালোচনার সূত্র ধরে পরিবর্তিত পৃথিবীর যে চিত্র কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে উঠে এসেছে—

"পৃথিবীর চেহারা দ্রুত বদলাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আজ বিভিন্ন প্রশ্ন চিহ্নিত পৃথিবী কেবল দার্শনিক জিজ্ঞাসাতেই সম্পূর্ণ নয়, আমাদের জীবনের একেবারে গোড়ায় সে তার নিষ্ঠুর লোমস হাত বাড়িয়েছে। আমরা এতদিন বুঝেছিলাম বৈরাগ্যই জীবনের একমাত্র ব্রত....। ইতিমধ্যে কী এক দুরূহ কারণে যুদ্ধ বাধলো। এতদিন অহিংসাকে সার জেনেছিলাম। এবার দেখলাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে উদ্যত সঙ্গিনের বিজ্ঞাপন...আজ যারা সমাজের এই

সংকট অবস্থা দেখে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এর স্বরূপ দেখে উদ্ধারের পথ বলেছেন, তাঁদের স্বভাবতই আমরা শ্রদ্ধা জানাবো।"[২]

——সংকটাপন্ন ধরিত্রীর সংগ্রামী চৈতন্যের দ্যুতি ঠিকরে বোরায় ক্লীব রাজনৈতিক দুর্দৈব ও দুঃস্থ জীবনকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার নব অভ্যুত্থানের অঙ্গীকারে। স্বাভাবিকভাবে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্মকাণ্ডের যোগ কবিদের করে তুলল 'জনগণের কবি'। সরল সাবলীল সাধারণ ভাষা ব্যবহারে সংগ্রামী আহ্বান ধ্বনিত হল তাঁর কবিতায়। সমকালীন ইতিহাসে স্বদেশ ও বিশ্বের দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ বাস্তবে মানবিক উত্তরণের শক্তিগুলির পক্ষ নিতে, তাঁর কোনো সংকোচ নেই। বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মেচ্ছার সহযোগে, মার্কসবাদী রাজনৈতিক চেতনার কবি হিসাব বাংলা কবিতায় যেন ক্রান্তির সূচনা করলেন। আত্মরতির বাংলা কবিতার মাঝখানে এই অনতি ইন্টেলেকচুয়াল সারল্য, আর বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যঙ্গে ও বিশ্বাসে ভরা কবিতাগুলি যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা।"[৩]

"কৃষক মজুর তোমার শরণ—
জানি আজ নেই অন্য গতি;
যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ,
সেই পথে নাও আমাদের টেনে।"

কমিউনিস্ট পার্টির লেখক-কর্মী হিসাবেই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই খেটে খাওয়া মানুষের, মজুরের সংগঠনের কাজকর্মের নানান বিমূর্ত মানবতার ধারণা বদলে মূর্ত রক্ত মাংসের মানুষজনের ভূগোলে ভরে উঠল তাঁর কবিতার কথা-শরীর। এভাবেই লেখার জগত আর কাজের জগত, তার মধ্যে আসা যাওয়ার ভেতর দিয়ে আমরা দুটোকেই সজীব রাখতে পারি।"[৪]

মার্কসবাদী ভাবনার মূল প্রত্যয়গুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে এর সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে জাগ্রত ইতিবাচকতাকে নিজ বিশ্বাস ও সৃষ্টির জগতের প্রেরণা হিসাবে সদাজাগ্রত রেখেছেন। কখনই তিনি ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতির যুগ পরিবর্তন, মত পরিবর্তন, ঘটনাবর্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাসি খবরের কাগজের মতো মূল্যহীন বিষয়কে কবিতায় আশ্রয় করেননি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার দিগবলয়ে রাজনৈতিক দলমতের কষ্টি পাথরে বিশ্বকে বিচারের প্রবণতা অতিক্রম করে তিনি নিখাত পরিপূর্ণ মানবতাকে আত্মস্থ করেছেন। তবে জটিল সময় গ্রন্থির ভিতর দিয়ে মার্কসবাদী দর্শনই তাঁকে এক বলয়িত মানবিক দর্শনের উপলব্ধি ঘটায়। এই নিজস্ব স্বরটিকে সুভাষ মুখাপাধ্যায় চিনে নিতে পেরেছিলেন বলেই মৌলিকতায় ও নিজস্বতায় তত্ত্ব অতিক্রমী নিখাদ মনুষ্যতের বাণীবাহক কবি হয়ে উঠেছিলেন নিজের কালেও কালোত্তীর্ণ সত্তা।

বিশেষ মতবাদ বা তত্ত্বকথার উপর ছকে বাঁধা পাঁচ পঁচিশের মাপা বুলি নয়, কবির

মানবতার বিশ্বাস চিরকাল তার কবিতার পথ নির্দেশ করেছে—

"ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙ্গা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোর।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
—একটুও যার ভাঙা নয়।"

মার্কসবাদী সমাজ দর্শনে আস্থাশীল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বহুকৌণিক রাজনৈতিক দর্শন অন্তিমে সর্বতোমুখী মানবতাবাদী চিরন্তন মৌল বিশ্বাসে পরিবর্তিত ও স্থিতুলাভ করে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ছাত্র ফেডারেশন : ৪০ তম বর্ষ পূর্তি জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ, ৫-৬ মে ১৯৭৬ উদ্ধৃতিটি সুভাষের মৌখিক বিবৃতির অনুলেখনের অংশ।
২। সত্যশক্তি ঘোষাল ও ফল্গু কর এর কবিতার বই সমালোচনা নিবন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব, কবিতা, চৈত্র ১৩৪৭।
৩। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' অমলেন্দু বসু, চতুরঙ্গ, মাঘ ১৩৬৪।
৪। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক : লোথার সুতসের সঙ্গে কথাবার্তা, 'কবিতার বোঝাপড়া', ১৯৯৩, পৃঃ ১৬১-১৬২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান

অমিত মণ্ডল

এক কবি অতীতের পৃষ্ঠা থেকে হেঁটে আসছেন বর্তমানের পাতায়—'হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' শেষ পর্যন্ত সেই ক্লান্ত প্রাণকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। এই কবির পথ হাঁটা বাংলাদেশের নাটোরের বনলতা সেনের কাছে এসে থেমেছে। আর এক কবি হাজার বছর ধরে পথ হাঁটবেন—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথ হাঁটা শুরু করেছেন দুই বাংলায় গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তাঁর পথ হাঁটা অতীতকে, ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের পাতা থেকে ভবিষ্যতের পৃষ্ঠায়—অনাগত দিন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। এই পথ হাঁটা সাধারণ মানুষের জন্য, আমজনতার জন্য। তাঁর কাছে চরম সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে—

"সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর কিছু নাই।"

এ কবি—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। তিনি কবি হওয়ার সাধ নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেননি। তিনি কবিতা লিখতে চেয়েছেন মানুষের জন্য, মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটার জন্য—

"আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি—
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।'
(কাল মধুমাস/আমার কাজ)

বাংলা কবিতার জগতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ছিল আচমকা, ধূমকেতুর মতো। মাত্র ২১ বছর বয়সে কবিতা ভবন থেকে ২৩টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' (১৯৪০)। এই ছোটো বইটি সেদিন বাংলা কবিতার জগতে যাঁরা পঞ্চপাণ্ডব নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পাণ্ডব বুদ্ধদেব বসু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর শব্দ নির্বাচন, চলিত ভাষাকে সহজ-সরলভাবে ব্যবহার, সর্বোপরি ছন্দ কুশলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এর সঙ্গে ছিল কবিতার বিষয়বস্তু (Content) নির্বাচন।

তাই সেদিন 'কবিতা' (১৯৩০) পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যগ্রন্থ নিয়ে একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সেখানে তিনি কবিকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উল্লেখ করেছেন;—প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি, যিনি প্রেম বা প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা লিখলেন না। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দক্ষতা এতটাই যে পোড় খাওয়া ব্যক্তিদের কাছেও এই বইটা শিক্ষণীয় হিসাবে গ্রহণীয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন—সাম্যবাদ, মার্ক্সবাদ। রাজনীতি তাঁর জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। রাজনীতির জন্য তিনি জেলও খেটেছেন। আর সময়টাও তখন খুব ভালো ছিল না। ১৯৪০-৪১। একদিকে ঘূর্ণিঝড়ে (কাঁথিতে) সাধারণ মানুষ ঘর ছাড়া। অপরদিকে মানুষ—সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের করাল ছাপ অবিভক্ত বাংলাদেশের (পূর্ব-পশ্চিম) গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম সময় কবির কলমে প্রেমের বা প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা ঝরতে পারে না, পারেওনি। কলমের মুখ দিয়ে ঝরেছে—

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"—এমন সম্মিলিত আহ্বান।

এই ভয়ঙ্কর, অবক্ষয়িত সমাজকে অতিক্রম করে নবযুগ আনার জন্য পদাতিকের কবির কলম ধরা। তাই এই কাব্যগ্রন্থের বিষয় হিসাবে প্রেম, ফুল, প্রকৃতি আসেনি; এসেছে সাম্যবাদের মতো বিষয়। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্কবাদে বিশ্বাসী হলেও তাঁর কলম পার্টি অফিসের দেরাজে আটকে থাকেনি। হয়তো কিছু সময়ের জন্য ছিল, কিছু সময়ের জন্য আমরা ইস্তেহারের মতো কবিতা পেয়েছি। কিন্তু সেটা অল্প সময়ের জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে পথ হাঁটা শুরু করেছেন। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি আমাদের কাছে যতটা পরিচিত তাঁর থেকে অনেক বেশি পরিচিত কবি হিসাবে, কাছের মানুষ হিসাবে। তাঁর কবিতার মূলে রয়েছে মানবিকতা। তাই তাঁর কবিতায় একটি মতাদর্শে প্রভাব থেকেও বিশেষ পার্টির ইস্তেহার হয়ে যায়নি। আর হয়ে যায়নি বলেই তিনি কালের গর্ভে হারিয়ে যাননি এই মৃদু ও স্বল্পভাষী কবি।

২।

বনলতা সেনের কবি পথ হেঁটেছেন অতীত থেকে বর্তমানে। আর পদাতিকের কবি তিনটি কালকেই ছুঁয়ে থেকেছেন। অতীতের ঐতিহ্যকে নিয়ে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিয়েছেন। অতীতকে নিয়ে এসেছেন বর্তমানের পাতায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য। তাই আমরা দেখি, তাঁর বিভিন্ন কবিতাতে বিষয় হিসাবে এসেছে পুরাণ ও লোকসংস্কৃতি। পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা, লৌকিক দেব-দেবী, আচার-আচরণ তাঁর কবিতায় যেমন প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছেন তেমনি কবিতাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।

এই রকম বেশ কয়েকটি কবিতা নিয়ে আমরা, যে কবিতাগুলিতে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও লৌকিক উপাদান রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। যেমন; সুগত মৈত্রকে লেখা ছেলে গেছে বনে কবিতায় দেখি পুরাণের কথা। কবিতা শুরু হওয়ার আগে ভূমিকা হিসাবে

নিয়ে এসেছেন রামের বনবাসে যাওয়া ও দশরথের দুঃখ পাওয়া এবং ওই রাত্রেই তার নিরসন। এখানে পুরাণের মোড়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন একটা বিধ্বস্ত, অবক্ষয়িত সময়কে—

আমার যখন এল বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময়—
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
আমি তবু পদাতিক, হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিক দ্রিমিক—

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা।

(ছেলে গেছে বনে/ছেলে গেছে বনে)

পুরাণের মোড়কেই বর্তমানের সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন 'ঘরে না, বাইরে না' কবিতায়। এই কবিতায় মহাভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত চরিত্রেরা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন—দুর্যোধন, অর্জুন, কৃষ্ণ। মহাভারতের যুদ্ধের আগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে জ্ঞাতি ভাইদের দেখেই অর্জুন যুদ্ধ না করার কথা জানায় কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ তখন বিশ্বের লীলা খেলা তাঁর সামনে উন্মোচন করেন এবং যুদ্ধ করতে বলেন। যদিও যুদ্ধের প্রতি অনিচ্ছা দুজনেরই—

মহাভারতের অর্জুন আর একালের অর্জুনদের মধ্যে বিস্তর ফারাক। একালের অর্জুনেরা যুদ্ধন্মোত্ত। তারা হিতাহিত জ্ঞান করে না, আপন পর বিবেচনা করে না, করে না ন্যায়—অন্যায়ের বিচার। তবু তাদের কাছে কবির অনুরোধ—

"হেঁকে আজ বলুক সবাই,
মানুষ আমার ভাই।
বন্ধ করো ভাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না।"

(যারে কাগজের নৌকা/ঘরে না, বাইরে না)

বর্তমানের অর্জুনেরা হয়ে উঠুক কবির ইপ্সিত অর্জুনের মতো। যারা যুদ্ধের পরিবর্তে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে জীবনের জয়গান। সৌভাতৃত্ববোধে ভেসে যাক প্রত্যেকটি মানুষ। অর্জুনেরা বলে উঠুক—

"থামাও রথ, কেশব।
দিয়েছ আমায় তত্ত্বজ্ঞান যেসব

ফুরিয়ে গেছে
দিন তার
.....
দর্শন দিক
সমন্বয়,
সুখশান্তি,
যোগক্ষেম,
প্রেম।"

(ধর্মের কল/সখা হে)

ধর্মের কল কবিতাতেও পুরাণের ছায়ায় বর্তমানের ছবি। কবিতার ভূমিকাংশে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে জানিয়েছেন, সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন দুই বীর চরিত্র এবং ধর্মনিষ্ঠ বাসুদেবের প্রিয় পাত্র। কিন্তু তাদেরই দুর্নীতিতে যদুকুল ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা সময়টা ছিল প্রতিকূল। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বর্তমানকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি—

"সময়টা সুবিধের নয়
কিছু না ক'রে
যে পারে সেই হাতিয়ে নিচ্ছে...." (ধর্মের কল/ধর্মের কল)

এই সময়টা সুবিধের নয়। যোগ্য মানুষেরা কিছুই পাচ্ছে না, অথচ কিছু মানুষ অসাধু উপায়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করতেও তাদের বাধে না। এই জটিল অবস্থা জারি রয়েছে সমাজের মধ্যে, মানুষের সাথে মানুষের। তবে কবি আশা করেন, এই রকম অবস্থা বেশিদিন চলবে না। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আবির্ভাব হবেন তৃতীয় পাণ্ডবের। তুলে নেবেন গাণ্ডীব। অন্যায়-অবিচারের কলুষিত দিনগুলি সরিয়ে আনবেন নতুন সকালের নতুন আলো। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানেও কবির মনে জেগেছে সন্দেহ—

"উনি যে গাণ্ডীব তুলবেন, সে ক্ষ্যামাতাও তো ওঁর আর নেই।"
(ধর্মের কল/ধর্মের কল)

কেননা সময়টা যে সুবিধের নয়। হয়তো সময়ের হাতেই তৃতীয় পাণ্ডবও নিজেকে সমর্পণ করবেন। নিজের শিরদাঁড়া সোজা না রেখে ভিড়বেন ওদের দলে। কেননা সময়টা যে সুবিধার নয়। তবু কবি আশাবাদী। কখনও কখনও রামায়ণ-মহাভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত নাম ও উক্তি দিয়েও কবিতার নামকরণ করেছেন। যেমন—রাম নাম সত্য হ্যায়, সম্ভবামি ইত্যাদি।

পদাতিকের কবি যে শুধু পুরাণের মোড়কেই বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তার নিরসনের কথা বলেছেন তা নয়, প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতি-রূপকথা, উপকথা ও বৈষ্ণব পদাবলীর অলিতে-গলিতেও পথ হেঁটেছেন। পুরাণ প্রসঙ্গের মতোই লৌকিক দেব-দেবীর

প্রসঙ্গ টেনে এনে বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 'ধর্মের কল' কবিতার দ্বিতীয় অংশে আমরা লৌকিক দেবী বনবিবির প্রসঙ্গ পাই। এই কবিতার প্রথম অংশে দেখেছিলাম, সময়টা এতোটাই খারাপ যে তৃতীয় পাণ্ডব সম্পর্কেও সন্দিহান জেগেছে, যে তৃতীয় পাণ্ডব ধর্মযুদ্ধে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য গাণ্ডীব তুলে নিয়েছিলেন। এখানে দেখি সেই একই প্রসঙ্গ। সুন্দরবনে যারা জঙ্গলের মধ্যে মধু, কাঠ আনার জন্য প্রবেশ করে, তারা বনে যাওয়ার আগে বনবিবিকে পুজো দিয়ে তবে যায়। তাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন আপদ-বিপদ থেকে বনবিবি তাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু আজকের দিনে বনবিবিও রক্ষা করতে পারছেন না—

"যে বাউলের মধু আনতে গিয়েছিল
তারা ফেরেনি
বনবিবিকে পুজো-দেওয়া তাদের ঘটপট
এখনও ছড়িয়ে রয়েছে।" (ধর্মের কল/ধর্মের কল)

তাই কবি অতি সতর্কভাবে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। যে বাঘরূপী ছদ্মবেশী শয়তান পিছন থেকে আঘাত হানতে না পারে। কেননা সময়টা যে সুবিধার নয়। আবার লৌকিক প্রসঙ্গ অন্যভাবে এসেছে যত দূরেই যাই কবিতায়। এখানে শেকেড়র সঙ্গে কবির নাড়ীর টান অনুভব করি আমরা। গ্রাম বাংলার প্রতিটি পরিবার যেমন লৌকিক আচার-আচরণ নিয়ে বেঁচে আছে তেমনি কবিও। লৌকিক আচার—আচরণ যেমন গ্রাম বাংলার একটা আলাদা সত্তা (Identity) তৈরি করে তেমনি এই সব আচার-আচরণ কবির মধ্যেও সেই সত্তা (Identity) তৈরি করেছে। তাই তিনি যেখানেই যান, সেই টান অনুভব করেন—

"আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকানো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।"

(যত দূরেই যাই/যত দূরেই যাই)

ঠাকুমার ঝুলি' কবিতায় দেখি কবির সমকালীন সময়ের করুণ অবস্থা। সুয়োরাণী -দুয়োরানীর গল্পের মধ্য দিয়ে সেই অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা নেই, নেই পারস্পারিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ। অন্যায়-অবিচারের কোন বিচার নেই। ধর্মরাজ আজ মনের দুঃখে অরণ্যে নির্বাসিত—

"দণ্ডকে যায় ধর্মরাজ
কলের ভুলি
এই গল্প ভর্তি করে
ঠাকুমার ঝুলি।"

(একটু পা চালিয়ে ভাই/ঠাকুমার ঝুলি)

বত্রিশ সিংহাসন কবিতাতেও রূপকথার কাহিনির মধ্য দিয়েও আমরা পেয়ে যায় অন্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। কবিতাতে দেখি, বত্রিশ সিংহাসনের বত্রিশ পুতুল ভোজরাজকে বত্রিশ বছর সিংহাসনে বসতে দেয়নি। বত্রিশ পুতুলের একটাই গোঁ—

"বসুক এসে
রাখালের পো।" (জল সইতে/বত্রিশ সিংহাসন)

এখানেই সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বা যারা আজ অবহেলিত, বঞ্চিত এবং বিপুল কর্মকাণ্ড থেকে যারা শত হস্ত দূরে তাদেরকে তুলে আনতে হবে, দিতে হবে জায়গা। কবিতায় রূপকথার মোড়কে সাম্যবাদ, অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

কখনও কখনও ঢুঁ মেরেছেন বৈষ্ণব মহাজন—পদকর্তাও তাদের লেখা বৈষ্ণবপদের কাছেও। 'আরে ছো' কবিতায় দেখি, চণ্ডীদাসের পথ তুলে ধরেছেন—

"কেটা এক চণ্ডীদাস বলে
.....
শুনহ, মানুষ সত্য
সবার উপরে।
তুমি তাই বিশ্বাস করেছ।" (বাঘ ডেকেছিল/আরে ছো)

'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এ বিশ্বাস তো কবিরও। তিনিও জানেন এটাই চরম সত্য এবং মানুষের একমাত্র কাম্য। চণ্ডীদাসের এই কথা আজকের মানুষ হেলায় জ্ঞান করছে। তারা রক্ত নিয়ে হোলি খেলে, কথায় কথায় লাশ ফেলে। রাস্তায় দাঁড়ালেই দেখা যায়—

"দাঁড়াও, এখুনি পড়বে
এ রাস্তায় আরও একটা লাশ
ফেটে পড়বে জয়গর্ব
উন্মত্ত উল্লাস।" (বাঘ ডেকেছিল/আরে ছো)

চণ্ডীদাসের বাণী আজ চরম প্রহসনে পরিণত। আজকের মানুষ ধর্মের নাম দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ ব্যবসা চালাচ্ছে। রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ। হরিদাস, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের মহান বাণী আজ হিংসার খেলায়, মৃত্যুর খেলায় লুটোচ্ছে। এই সব পুরুষদের ছায়াও আজকের মানুষ এড়িয়ে চলে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ কথায় কথায় লাশ ফেলে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আজ লাশ ফেলার প্রতিযোগিতা চলে। এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি প্রবলভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন এদের প্রতি।

আগেই উল্লেখ করেছি এক বিধ্বস্ত, অবক্ষয়িত সময়ের মধ্য দিয়ে পদাতিকের কবির বেড়ে ওঠা, পথ হাঁটা ও কবিতা লেখা। কবি সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে প্রতিটি মানুষই সমান। কিন্তু যখন তিনি দেখছেন চারপাশের মানুষের করুণ অবস্থা তখন তাদের দুঃখে দুঃখী, তাদের ব্যথায় ব্যথিত না হয়ে পারেননি। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন তাদের সঙ্গে, লড়াই করেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আর এই অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদের হাতিয়ার করে

তুলেছেন কবিতা। এই সূত্রেই কবিতায় কখনও কখনও পুরাণ-লোকপ্রসঙ্গের ব্যবহার এবং তার মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ ফেটে পড়েছে। তাই প্রেম ফুলের প্রতি না না ভাব, পরিবর্তে কবিতায় দেখা দিয়েছে—'পিরামিডে থাক পিরীত কফিন—ঢাকা,/ অহল্যা হোক পিচ্ছিল হাতছানি,' অথবা কখনও এসেছে 'বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—/মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।' (পদাতিক) বুঝতে পারি, পুরাণ, রূপকথা, উপকথা, বৈষ্ণব পদাবলী এবং লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বা নানা মিথ তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে অন্য লক্ষ্য সাধনের জন্য—বর্তমান সমস্যা তুলে ধরা ও তার সমাধানের জন্য, একইসঙ্গে মানুষের মধ্যে বিবেকবোধকে জাগিয়ে তোলা। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় যখনই এই প্রসঙ্গগুলো এসেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি দুই সময়ের তুলনা, বর্তমান সময়ের নানা সমস্যা মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা দৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা রয়েছে। তিনি শহুরে বা নাগরিক কবি হলেও পুরাণ বা লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কখনই ভুলে যাননি। এই ঐতিহ্যই তাঁর শেকড়। আর এই শেকড়ের টান তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। তার প্রমাণ আমাদের আগের উল্লিখিত 'যত দূরেই যাই' কবিতাটি। আসলে তিনি শহুরে বা নাগরিক কবি হতে পারেন, কিন্তু সমস্যা বা অবক্ষয়টা শুধু শহর বা নগর কেন্দ্রিক নয়, এই সময়ের সর্বগ্রাসী প্রভাব অবিভক্ত বাংলাদেশের সর্বত্র। শুধু বাংলাদেশে কেন, সারাদেশে অবক্ষয়িত বা একটা বিকৃত সময় তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সময়ের এই কালো মেঘ বাংলাদেশের আকাশ থেকে সরাতেই হবে, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই তাঁর কবিতা লেখা ও কবিতার জগতে পা রাখা। তিনি ও তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের কবিতা তাঁর কবিতায় অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যুক্ত হয় অন্য মাত্রা। আসলে সময়টা যে বিশেষ সুবিধার নয়। বসে বসে প্রেমের কবিতা লেখা—প্রেমের কবিতা আওড়ানোর সময় নয়, আলস্যে হাই তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়ার সময় নয়। এ সময় দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, এ সময় মানুষের সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচার, বন্ধন থেকে মুক্ত করার সময়। ভবিষ্যতের দিকে পথ হাঁটলেও কবি অতীতকে ভুলে জাননি, ভুলে জাননি তাঁর ঐতিহ্যকে, ভুলে জাননি তাঁর শেকড়কে। তাই আমাদের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য—পৌরাণিক, লৌকিক উপাদান—রূপকথা, উপকথা, বৈষ্ণব পদও, বৈষ্ণব পদাবলীর অলিগলিতে পথ হেঁটে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের অন্ধকার ছবিকে সরিয়ে রেখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের আগমন বার্তা জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ—মে ১৯৫৪, ভারবি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৪

২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ১৯৭৩, দে'জ

পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৫
৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬
৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০
৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৯
৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮০
৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭
৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৮
৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯০
১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯১
১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬০
১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩
১৩। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৪২
১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬০
১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। ঘোষ, শঙ্খ, ভট্টাচার্য সৌরীন, দেব, অমিয়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, বিশ্বাস, প্রণব (সম্পা।), সুভাষ মুখোপাধ্যায়—কথা ও কবিতা, প্রথম প্রকাশ-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২। দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ-মে ১৯৫৪, ভারবি, কলকাতা।

৩। ফুয়াদ, আফিফ (সম্পা.), দিবা রাত্রির কাব্য, কথা সাহিত্য কথাসাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

৪। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, প্রথম প্রকাশ-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০, ভারবি, কলকাতা।

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল ১৯৭৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। সরকার, অধ্যাপক অর্ধেন্দু, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য জগৎ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

নাগরিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাতুল গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব ঠিক কখন থেকে শুরু হয়েছে এই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলেন রবীন্দ্র-প্রভার উত্তরণ থেকেই আধুনিকতা, আবার অনেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সীমাকে আধুনিকতার সূত্রপাত হিসাবে মানতে চান। অন্যদিকে স্বাধীনতার সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার আঙিনায় প্রবেশ করেছেন বলে অনেকে মনে করে থাকেন। আসলে এই তিনটি মতই সঠিক। এদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি তাকাই তাহলে তিনের দশকের দ্বিতীয়ার্থ থেকে কবি জীবনানন্দের ('ঝরাপালক', ১৯২৭) হাত ধরে আধুনিক কবিতার পথ চলা শুরু হয়েছিল বলাই যায়। ইতোমধ্যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ লগ্নে য়ুরোপীয় চিন্তা ও সৃষ্টির পাখায় ভর করে। কিন্তু তার জমি তৈরী ছিল না, তাই কল্লোলের হিল্লোল ব্যর্থ হলো। আসলে বাংলা তথা ভারতবাসী তখনও স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে, ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ আবার অন্যদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সৌন্দর্য, মানবতা ও কল্যাণের মন্ত্রে বিশ্বাসী। য়ুরোপের মতো শিল্পবিপ্লবের সমৃদ্ধিজাত উপলব্ধি থেকে ভারতবাসী অনেক-অনেক দূরে অবস্থিত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই কল্লোল গোষ্ঠীর স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া যখন এই ভারতবর্ষে তথা বাংলাকে আচ্ছন্ন করলো, নৈরাশ্য, হতাশায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হলো, তখনই আধুনিকতার বলিষ্ঠ ধ্বজা নিয়ে বাংলা কাব্যাকাশে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির সৃষ্টি পেল নাগরিক সমৃদ্ধি। নগর থেকে নাগরিক। আধুনিকতার একটি অন্যতম প্রধান ফল বা সম্পদ নগর তথা নাগরিকতা। নাগরিকতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান। যেমন—নৈরাশ্য, হতাশা, অন্তর্দন্দ্ব, ব্যর্থ প্রেম ইত্যাদি। আসলে স্বাধীনতা উত্তরকাল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোর অমানিশা যেভাবে সমগ্র দেশ-কাল-সমাজ-মানুষের অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতে পরিবর্তন সাধন করেছিল নাগরিক মানসিকতা তার অন্যতম ফসল। এই পথেই জীবনানন্দ থেকে শুরু করে একে-একে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের সৃষ্টির পসরা দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে উন্নত করেছেন। এই কবিদের ভিড়ে যিনি আপন মনের খেয়ালে খুব সাবলীলভাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে বাংলা কবিতার শরীরে ময়ূরপঙ্খী পালক দিয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি 'পদাতিক' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম নদিয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে। বাবা-ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা-যামিনীবালা দেবী। পড়াশুনো তাঁর কলকাতায়। কলকাতা ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিট্যুশন থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন আশুতোষ কলেজে। সেই সময় থেকেই ছাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন

এবং ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'পদাতিক' এবং ১৯৪২ সালে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হিবে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কবি সুভাষকে সাধারণত আমরা চল্লিশের কবি হিসাবেই জানি। যদিও তাঁর ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। আসলে কবিতা একটি চলমান মাধ্যম, প্রবাহিত স্রোত, সচল চর্চার নজির। তাই কোনো একটি মাত্র দশকে কবি এবং তাঁর সৃষ্টিকে আমরা বেঁধে রাখতে পারি না। তবে সময়ের বিচারে মোটের উপর একটা দশক আমরা চিহ্নিত করতে পারি মাত্র। এছাড়াও কোনো কবি এবং তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করতে গেলে অবশ্যই তাঁর সমকালীন এবং পূর্বকালীন প্রেক্ষিতের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতেই হবে। সেদিক দিয়ে চল্লিশের শুরুটা খুব সুখপ্রদ নয়, বরঞ্চ ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা তখনও আসেনি, বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর তার বীভৎস থাবা বসিয়েছে সমাজের তথা মানুষের জীবনে-মননে। এই দুঃস্থ ও মর্মান্তিক সময়ক্রম থেকে সেদিনের সচেতন কবিরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। বলা যায়, সেদিনের সময়-সংঘাতের চাপ চল্লিশের কবিদের প্রাথমিক কবিতাভাবনায় ছায়া ফেলতে শুরু করেছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। সহনশীলতার অভাব, যুদ্ধপরবর্তী অসংলগ্ন পরিস্থিতি, দাঙ্গা-বিক্ষোভ, অনাহার সবকিছুর চাপে নাগরিক বিশৃঙ্খলতা, হতাশা, নৈরাশ্য বারবার উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়।

আমরা এখন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কবিতার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর নাগরিক মনোভাবের দিকে আলোকপাত করতে সচেষ্ট হব। কৈশোর-যৌবনকালের সন্ধিলগ্নে মার্কসীয় সাম্যবাদের স্বপ্নের পাখায় ভর করে তিনি তাঁর কবিতা লেখা শুরু করেছেন। এমনই একটি কবিতা—

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
————————————
শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা।
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো-পরো যুদ্ধের সজ্জা।
(মে-দিনের কবিতা)

—এখানে কবি নৈরাশ্যপীড়িত সিন্ধুর মধ্যে ডুব দিয়েও সেখান থেকে উত্তরণের বিশ্বাস নিয়ে কলম ধরেছেন বলেই মনে হয়। সেখানে নাগরিক নৈরাশ্য গিলে খেতে পারেনি কবির আত্মবিশ্বাসকে। তাই সেই বিশ্বাসকে সঙ্গী করেই নাগরিক কবি নগরের সকল মানুষেকে নিয়ে এগোতে চেয়েছেন—

কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ—
জানি, আর নেই অন্য গতি;
যে-পথে আসবে লাল-প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

আবার বয়ংসন্ধিলগ্নের অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে তাঁর 'বিরোধ' কবিতায়—

সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হলো কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ।

—এখানে বাচ্য ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে কবি নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে বাঁধতে চেয়েছেন। এই তো সেই নাগরিক মনেরই প্রকাশ সেখানে আশ্রয়ের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয় অহর্নিশ। কিন্তু এখানেই কবি সুভাষ থেমে যাননি, তার থেকে আরেকটু এগিয়ে এসে জানলায় নীল আকাশ টাঙিয়ে দিয়ে, মনের পক্ষিরাজকে তিনি করেছেন অসীমাভিসারী—

মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।
(বিরোধ)

আসলে সুভাষ তৎকালীন যুগ-যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও নাগরিক হতাশাকে সঙ্গে নিয়েও সেখান থেকে সফল হওয়ার আশা বুকে নিয়ে কবিতার ঘর বেঁধেছেন। এই সুদূরের আহ্বান আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতাতেও শুনতে পাই—

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেয়াল তাই ফেটে চৌচির,
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদর হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।

আসলে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডল থেকে সরে এসে তিরিশের কবিরা যখন লিখছেন, তার পরবর্তীতে চল্লিশের দশকের কবিদের কাব্যভাষা যদি দেখি তাহলে দেখবো যে নতুন ভঙ্গি নিয়ে বাংলা কাব্য অঙ্গনে কবিরা আবির্ভূত হয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে কখনোই তিরিশের কবিদের মতো য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি। কবি সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুট' (১৯৪১-৪৬)। এখানে একটি কবিতায় আমরা দেখি তৎকালীন কঠিন রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে ভয়ে পালিয়ে যাওয়াকে উপেক্ষা করে নতুনের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়েছেন কবি—

বুঝেঝি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে—
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,

আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা।
বিদায়! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ!
বিদায়! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ!

(কাব্যজিজ্ঞাসা)

এখানে স্বাপ্নিক হলেন সৈনিক। পালানো নয়, বরং রুখে দাঁড়াতে হবে এটিই কবি কণ্ঠের দৃপ্ত ঘোষণা—

পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই।
.....
চাপা বিদ্যুতে খেলে দুষমন বজ্রমুষল;
অভুক্তদের মৃদদেহ; চোরগুদামে ফসল—
ঝঞ্ঝায় মাথা উঁচু রাখি; জানি যাত্রা কুশল।
হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার
আত্মদানের; স্বপ্ন একটি—পৃথিবী গড়ার।

(দীক্ষিতের গান)

নাগরিক হতাশাকে উপেক্ষা করে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে মশগুল কবি। তাই সকল ভীরুতাকে তুচ্ছ কে করি এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। আসলে এই সময়ের সমাজ ও রাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কবিকে বিশেষভাবে প্রবাবিত করেছে। যেমন—হিটলারের নাৎসী-ফাসিস্ত বাহিনী সোভিয়েত আক্রমণ করার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সাম্যবাদী মানুষের কাছে জনযুদ্ধরূপে উঠে এলো, ভারতের মাটিতে সেই আবহেই সংঘটিত হলো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, এরই এক বছর পর বাংলার বুকে এলো মর্মান্তিক তেতাল্লিশের মন্বন্তর, আবার পঁয়তাল্লিশেই হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে গিয়েছিল। এই সময়েই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার কবিতাকে বাহন করে নাগরিক হতাশার জালকে ছিন্ন করে এক নতুন স্বপ্নের রঙে রঙীন করে তুলতে চেয়েছেন পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীকে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের পর দীর্ঘকাল কবি সুভাষের কণ্ঠ শোনা যায়নি। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট দ্বিধাবিভক্ত ভারত পেয়ে গিয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা, যা হয়ত কবিকে কোথাও ব্যথিত করেছিল। এরপর ১৯৪৮-এ তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিকোণ' খুবই ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হলো। যেখানে জন্মভূমি ভারতের সীমা পেরিয়ে কবির দৃষ্টি যেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে-দেশে জনগণের ঘুম ভাঙাতেই নিবদ্ধ ছিল। এরপর কবি আরও তিন বছর নিস্তব্ধ। ১৯৫১ থেকে তিনি আবার কাব্য লিখতে শুরু করলেন এবং ১৯৫৮তে প্রকাশিত হলো চতুর্থ

কাব্যগ্রন্থ 'ফুল ফুটুক'। এখানে নাগরিক কবি সুভাষ নবরূপে নিজেকে মেলে ধরলেন। নগর জীবনের হতাশা-নিরাশা কাটিয়ে কবি শ্লেষ-ব্যঙ্গের হাতিয়ার ত্যাগ করে সুকুমার শিল্পীর রূপ পরিগ্রহ করলেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"এই কাব্যগুচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটল না,
কবি হিসাবে তাঁর নবজন্ম হল। প্রথম যৌবনে বক্রোক্তিই ছিল যাঁর
কাব্যজীবিত, বত্রিশ বছর পেরিয়ে তিনি হলেন রূপকল্প রচনায়
মঞ্জুভাষী শিল্পী—সুমিত সংকেত-ভাষণে অনন্যপরতন্ত্র রূপকার।"

('আমার কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, কলকাতা, পৃ ঃ ২৭০)

কবি এখানে অনেক বেশি দৃঢ়প্রত্যয়ী, তাই তিনি লিখেছেন—

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়।
————————————
দেখ-দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—
হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
পড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট-ছোট দুটো মুঠোয় দিয়ে বাঁধে
সাধ-অহ্লাদ আমাদের। (শুধু ভাঙা নয়)

যে কবি একদিন বলেছিলেন 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' তাঁর লেখনীতেই এই স্বপ্নচারিতা সত্যিই বিশেষ তাৎপর্যবহ। তবে কবি সুভাষ কিন্তু চিরকালই আশাবাদী, তাই যতই ঝঞ্ঝা আসুক না কেন, যতই হতাশা গ্রাস করুক মনকে তবুও নাগরিক আবহের মধ্যে তিনি আশার জাল বুনেছেন। তিনি পুষ্পবিলাসের কথা না বলে পুষ্পবিকাশের কথাই আজন্ম বলেছেন বলেই মনে হয়। আসলে পরিবেশ-পরিস্থিতি যতই তাঁকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চাক না কেন তিনি তাঁর সেই আশার আলোর ভূমির সাথে মননের শিকড়ে আবদ্ধ। তিনি শুধু দিনযাপনের গ্লানিতে বদ্ধ থাকতে চান না। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়—

ততক্ষণ
আমিই বা বসে থাকি কেন?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময়। ('সন্ধ্যামণি')

অন্যদিকে কবির মতে, গ্রীষ্ম, বর্ষার পাশাপাশি আমাদের জীবনে বসন্ত একান্ত কাম্য। তিনি আরও চান যে এই বসন্ত সকলের জীবনে বারংবার ফিরে আসুক। এই বাসনা নিয়েই কবি নাগরিক হতাশা কাটিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার জন্য বসন্ত প্রত্যাশায় লিখেছেন—

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ

কচি-কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

পাষাণাকৃতি রাজধানী নগরের বুকে বসন্ত-আবির্ভাবের এই রূপকাশ্রিত বর্ণনা অনবদ্য। বস্তুত 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত'—এই কবিতার মাধ্যমে কবি সুভাষের নাগরিক সত্তার বিকাশ পরিপূর্ণতা পেয়েছে। আবার তাঁর আরও একটি কবিতায় শহুরে গলির এক কালো বর্ণের কুৎসিত মেয়ে ভাবনার সঙ্গে কবি নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে লিখেছেন—

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিন গুলি রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

এরপর মেয়েটা ভাবছিল গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে একটা-দুটো পয়সা পেলে যে হরবোলা ছেলেটা কোকিলের ডাক ডাকতে-ডাকতে চলে যেত, তারই কথা। ঠিক সেই সময়ের চোখের মাথা খেয়ে উড়ে এসে বসল এক লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি। এই মুহূর্তে মেয়েটা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। কবি এরপর বলেছেন—

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনো হাসছে।

প্রেম ও করুণার যুগপৎ মিলনে এই কবিতা এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। নগর জীবনের চাওয়া-পাওয়া এখানে প্রেম ও করুণার রূপকে ধরা দিয়েছে বলেই মনে হয়। রূপকল্প রচনায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে কতটা দক্ষ তারই পরিচায়ক এই কবিতাটি।

মানুষের প্রতি ভালোবাসাই কবিকে এগোনোর প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'যত দূরেই যাই' প্রকাশ পেয়েছে। এখানে একটি কবিতায় আমরা দেখি কবি কতটা জীবন রসিক। জীবনের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম এখানে প্রকাশিত হয়েছে—

তারপর কখন
কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না।
চেয়ে দেখি
দূরে বসে সেই আমার বিষাদ
আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে
আমার সপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে।
হাসতে হাসতে আমি তাকে

দূরন্ত শিশুর মত
কোলে তুলে নিই।

যেন নগর জীবনের বিষাদকে কবি এখানে কোলে তুলে নিয়ে খেলার মধ্য দিয়ে হারিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনী শক্তিই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। চোখে মানবপ্রেমের আলো নিয়ে কবি নাগরিক মানুষের ট্রাজিক জীবনের করুণ রূপটি দেখেছেন।—

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে-সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল-পরকাল গেল।

অথচ
আর-একটু নিচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়—

লোকটা জানলই না। (লোকটা জানলই না)

এরকমই আরেকটি কবিতায় কবি নগরের এক বীভৎস বাস্তবকে তৎকালীন যুগ-পরিবেশের নিরিখে তুলে ধরেছেন—

তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।

ছেলে এল না। (কেন এল না)

বাবার না ফেরা নিয়ে চিন্তিত ছেলের ঘরের বাইরে যাওয়া এবং শেষে বাবা ফিরলেও ছেলের না ফেরার এই আগুনমাখা সময়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ট্রাজিক পরিণতিকেই কবি এখানে তুলে ধরেছেন। আমরা যদি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিসর্গ চেতনার দিকে তাকাই তবে সেখানেও দেখি তাঁর নাগরিক সত্তার ছায়া। এরকমই একটি কবিতা—

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মতো
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল
সূর্য।

তারপর অনেকক্ষণ পরে
সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল
সন্ধ্যা। (দিনান্তে)

এখানে নিসর্গ প্রকৃতির স্বরূপে তৎকলীন নগর জীবনের বাস্তব চিত্রটিকে কবি তুলে ধরেছেন, যেখানে জীবনানন্দের কল্পনাবিলাস নেই, নেই মাধুর্য। অতি রূঢ় নগর চিত্রকেই তুলে ধরেছেন তিনি। এ যেন কবির স্বতন্ত্র মায়ার জগৎ। এই মায়ার জগতেই কবি নিজের এক মানসী প্রতিমা নির্মাণ করেছেন, যাকে তিনি ঐ মানুষের ভিড়েই খুঁজে পেয়েছেন বা খুঁজতে চান। তাই তিনি বলেছেন—

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে এক স্বপ্ন।
কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গশিখরে উঠে
আমি দু'হাতে ছুঁয়েছিলাম আকাশ।
কেন যেন ডেকেছে আমায়। কে?
মিছিলের সেই মুখ। (লাল টুকটুকে দিন)

এই মুখই কবিকে বারংবার উজ্জীবিত করে তুলেছে। নগর জীবনের সকল ক্লেদকে ঝেড়ে ফেলে কবি সেই মুখকেই সন্ধ্যান করে ফিরেছেন—

আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।
অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিতে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মতো
জেগে উঠে আমাকে জাগায়। (মিছিলের মুখ)

কবির ষষ্ঠ কাব্যসংকলন 'কাল মধুমাস'। এখানে কবি শুধুমাত্র নিজের জীবনে নয়, সমগ্র পৃথিবীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে বসন্তকে আহ্বান করেছেন। কবি তাঁর ভাষায় সমস্ত অলংকার খুলে ফেলে বাস্তব নাগরিক কায়া দান করে কাব্যমূর্তি নির্মাণ করেছেন।—

ইলেকট্রিক পাম্পে ঝিঁঝি-লাগা ফ্ল্যাটবাড়িটা।
যেন মহাশূন্যে ঝুলছে।
দেয়ালে

ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়;
সমস্ত ভার হারিয়ে ফেলে আমি যেন ভাসছি।
(কুকুর হুঁর মাছি ফুলের-গাছ)

কিংবা

আল্‌সেয় বসে
মুখে কুটো নিয়ে একটা বুড়ো শালিখ
ঘাড়ের রোঁয়া বের করে
চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছে
ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে দেখ,
ল্যাম্পপোস্টে
দেখ, ফাঁসি যাচ্ছে

এইভাবে দেখা যায় এই কবিতাগুলিতে কবি অ-শিল্পিত ভাষায় সুন্দরভাবে নগর জীবনের রূঢ় বাস্তবকে তুলে ধরেছেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পরতে পরতে নগর জীবনের চিহ্নগুলি ধরা দিয়েছে। নানা শব্দের মধ্য দিয়ে অনেকসময় তা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—ভাতের হাঁড়ি, রেশনের থলে, বেলা দশটার ট্রাম, অসহায় করুণ চোখে তাকিয়ে-থাকা রাস্তাটা, কয়েদির ডোরাকাটা পোশাকে এক-টুকরো রোদ, বুড়োধারি গাছটা, একটানা দীর্ঘ তারের চড় টেনে ঝড়ো সুর বাজিয়ে-চলা ট্রামটা ইত্যাদি। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা লেখার প্রেরণা তথা মনের কথা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যায় যে, কবি সুভাষের মূল প্রেরণা মানুষ এবং প্রকৃতি। তবে সেই প্রকৃতির অনেকটা জুড়ে আছে নগর প্রকৃতি। মনের জগতের আন্দোলনের তাগিদেই তাঁর কবিতা রচনা শুরু। সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে অন্যের মনের নিকটে গিয়ে নিজেকে এবং তার সাথে-সাথে অন্যকে বদলানোই মুখ্য কাজ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আত্মগত প্রবণতা থেকেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পথ চলা শুরু। ইতিহাস বা সমাজের বিবর্তন-প্রক্রিয়া থেকে, সমাজের বৃহত্তর শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখতে পারেননি তিনি। তাই নগর জীবনের হতাশা-নৈরাশ্য-দ্বন্দ্ব-বিচ্ছিন্নতা-ট্রাজেডি সকল কিছুর থেকে উত্তরণের পথ তৈরী করতেই ব্যগ্র কবি সুভাষ। পরিশেষে তাই বলা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার ইতিহাসে নাগরিক হয়ে নগর জীবনের সকল জটিলতা-ব্যর্থতার উর্ধ্বে উঠে আপন মহিমায় বিরাজমান ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনি যে স্বপ্নের পৃথিবী গড়ার কথা বলেছেন আজীবন সেই পৃথিবীর স্বপ্ন নিয়েই আমরা চলব। আর যতদিন চলব ততদিন এবং তারও পরে তিনি শুধু বাংলা কাব্যাকাশে না, সমগ্র বাঙালীর মানসলোকে তাঁর সৃষ্টির আলোক নিয়ে বর্তমান থাকবেন।

তথ্যসূত্র :

১। কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, কলকাতা, পৃ: ২৭০

গ্রন্থপঞ্জী :

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২। পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য জগৎ, অধ্যাপক অর্ধেন্দু সরকার, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

৩। আমার কালের কয়েকজন কবি', জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, কলকাতা।

৪। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, নবমন প্রকাশন, কলকাতা।

৫। টানাপোড়েনের মাঝখানে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য, সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

৭। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা।

৮। লোকাভরণ আধুনিক কবিতার শৈলী, ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

৯। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড. অশোক কুমার মিশ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১০। আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশেষণ, ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্র-পত্রিকা :

১। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৪১৩, সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত।

২। কবি সম্মেলন, শারদীয় ১৪১৫, শ্যামলকান্তি দাস সম্পাদিত।

৩। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ২০১৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লোকজ উপাদান

গুরুপ্রসাদ দাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লোক উপাদান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে লোকজ উপাদান বা লোক-ঐতিহ্য বলতে কী বোঝায় তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, বিশেষ একই ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিবেশে যখন অনেক মানুষ সংহত হয় তখন সেই সংহত জনগোষ্ঠীকে বলা হয় Folk বা লোক। আর এই সংহত জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাদের জীবনচর্চার সামগ্রিক রূপ হল Lore, যা মূলত লোকপরম্পরায় ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাহিত হয়। তাই বলা যায়, সংহত কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চা ও মানসচর্চার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি উপাদান বা উপকরণকেই লোকজ উপাদান বলা যায়।

অধিকাংশ বাঙালি কবিই তাঁদের কাব্যে কমবেশি লোকজ উপাদান ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ব্যতিক্রম নন। বরং বলা যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় লোকজ উপাদানের উপস্থিতি একটু বেশি নজরে পড়ে। অবস্তুনির্ভর লোকউপাদান অর্থাৎ প্রবাদ, ছড়া, লোকজ-বিশ্বাস-সংস্কারের অনুসঙ্গ যেমন কবি তাঁর বহু কবিতায় ব্যবহার করেছেন, তেমনি নানাবিধ বস্তুগত ও প্রয়োগমূলক লোক-উপাদানও নানা সময়ে তার কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য সৃজন করেছে।

এবার আসা যাক, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত কিছু অবস্তুনির্ভর লোকজ উপাদানের প্রসঙ্গে। প্রথমে প্রবাদ প্রসঙ্গ, 'সাত রাজার ধন এক মানিক' প্রবাদটির অর্থ হ'ল অতিশয় প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু। 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতাটিতে এই প্রবাদটির হুবহু ব্যবহার করেছেন কবি ঃ

> "ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালোবাসা
> পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে—
> দেখো, আফ্রিকার কোলে
> সাত রাজার ধন এক মানিক স্বাধীনতা।

—দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে যে স্বাধীনতা আফ্রিকার কালো মানুষগুলো অর্জন করল তা যে তাদের কাছে অতি দুর্লভ ও মূল্যবান সামগ্রী, তা যে 'সাত রাজার ধন এক মানিকের' থেকে কোন অংশে কম দুষ্প্রাপ্য নয়। আলোচ্য কবিতাটিতে সেই দুষ্প্রাপ্যতার বঞ্জনাটি প্রকাশ করতেই কবি আশ্রয় নিয়েছেন এই প্রবাদটির।

এই কবিতাটিতেই রয়েছে 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না' এই প্রবাদটিও। এই প্রবাদটির অর্থ হল শধু নরম হলে কেউ বশীভূত হবে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কড়াও হতে হয়, তবেই লোকে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই কবি লক্ষ্য করেছেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ অভাব ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, আর সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে

কুক্ষিগত। কবি চান এই সম্পদ সকলের মধ্যে বন্টিত হোক। তাই তিনি লেখেন—

"গদিতে ওঠবস করাচ্ছে
টাকার থলি
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে
হাতে হাতে ঝনঝন করে ফিরুক।
বুঝলে মুখুজ্যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।
আড় হয়ে লাগতে হবে।"

দেশের সম্পদের বন্টন সকলের মধ্যে করতে হলে মুষ্টিমেয় মানুষের হাত থেকে তা কেড়ে নিতে হবে, আর এ কাজটি খুব সহজ নয়, শুধু মুখের কথায় বা সভা-সমিতি থেকে দু'একটা বক্তৃতা করে এ অসাধ্য সাধন করা যাবে না। এজন্য দরকার বৃহত্তর কোনো আন্দোলনের, দরকার বিপ্লবের। প্রয়োজন জনগণের চেতনার জাগরণের। জনমানসে সেই চৈতন্যের জাগরণ ঘটানোর প্রসঙ্গেই এই কবিতায় আলোচ্য প্রবাদটির অবতারণা করেছেন কবি।

কারো অত্যন্ত অহংকার হলে বলা হয় মাটিতে পা পড়েছে না। কবি এই প্রবাদটিকে ব্যবহার করেছেন অনন্য ব্যঞ্জনায়, 'সুখটান' কবিতায়—

"বাঁচার গর্বে
মাটিতে তার পা পড়ছিল না বলে
গান গাইতে গাইতে
আমরা তাকে সপাটে তুলে দিয়ে এলাম
আগুনের দোরগোড়ায়.....।।"

'তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে' এই প্রবাদটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল, যার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় কাল গত হয়েছে, বর্তমান শেষকাল অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত। এই প্রবাদটির ব্যবহার কবি করেছেন তাঁর 'অগত্যা' কবিতার প্রথম পংক্তিতেই—

"তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বুড়ো
সব পাতা ঝরে গেলে শীতে
ফুঁ দিয়ে স্মৃতিতে
একা সে আঁটকুড়ো
বসে বসে সারাক্ষণ ফোলায় ফাপায়
রঙিন বুদ্বুদ.....।"

'তিন কাল গিয়ে এক কলে ঠেকা' ওই বৃদ্ধটি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও এখনো তার স্মৃতিতে ভাসমান অতীতের নানান ঘটনার কোলাজ। স্মৃতির তরণীতে ভর করে তিনি তখন পৌঁছে যান তার অতীতের বর্ণময় দিনগুলিতে। এইভাবেই একজন বৃদ্ধদের স্মৃতিকাতরতা, অতীতের প্রতি প্রগাঢ় টান এই কবিতাটিতে যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি আর একটু বয়স

হলে এই স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে মানুষটি যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সে কথাটিও ইঙ্গিতে বলা হয়েছে।

'একবার বিদায় দে, মা' কবিতাটিতে কবি ব্যবহার করেছেন আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রবাদ 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো'। আমরা জানি কারো যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করে তার বাড়িটিকে মাঠে পরিণত করাকে বলে ভিটয়ে ঘুঘু চরানো। অপারেশন বর্গার ফলে একদা আমাদের রাজ্যের কিছু ভূমিহীন কৃষক সামান্য কিছু করে জমি পেয়েছিল, কিন্তু সে জমির উপরেও নিজেদের কর্তৃত্বে কায়েম করতে চেয়েছিল কিছু সুবিধাবাদী মানুষ। তাদের আগ্রাসী দৃষ্টি পড়েছিল সর্বস্বান্ত মানুষগুলোর সামান্য একটু ভূমির উপর। যারা এই মানুষগুলোর সুরে সুরে মেলাবে না তাদের যে যথাসর্বস্ব আত্মস্মাত করা হবে, এই কবিতাটিতে রয়েছে যেন তারই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—

"বর্গাচাষীর মুখের হাসি
মিলিয়ে যায়
বিঘে দুই ভুঁই ভাগ হতে ভাগ হতে
দুই বিঘেতে
এসে ঠেকেছে প্রায়।

যে না বলবে হাঁ-জী
সে দুশমন পাজি
দল বেঁধে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাও
ধান পাকলে
ক্ষেতে হও সব চড়াও....।

একদল লোভী, অর্থলোলুপ ও অত্যাচারী মানুষের স্বরূপ এইভাবেই আলোচ্য প্রবাদটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কবি।

বাউন্ডুলে অর্থে আমরা 'বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো' প্রবাদটির উল্লেখ করি। এই প্রবাদটি কবি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'মোট বারো' কবিতায় ঃ

"তোমার মনে আছে প্রণব
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে একতলার সেই অন্ধকার স্যাঁত সেঁতে ওয়ার্ড
যার এককোণে তুমি আর অরুণ স্থিতিপ্রাজ্ঞ দুই নবীন আর প্রবীণ
আর তার ঠিক পাশেই কম্বল ফেলেছিল
সকলের মুখনাড়া-খাওয়া বেয়ারা হতচ্ছাড়া
বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো বারোটা দলছাড়া ছেলে.....।"

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এ কবিতার কথক দেখেছিলেন, বারোজন তরুণ বন্দীকে। সেই বারোজন ছেলেই ছিল অত্যন্ত উশৃঙ্খল, তারা লক-আপের মধ্যেই বেসুরো গলায় গাইত 'হিল্ল সিনেমার বেলেন্দি গান', কম খাবারে তাদের পেট ভরত না বলে তারা

প্রতিদিনই জেলে ঝামেলা করত। কিন্তু যখন এই ছেলেগুলোকেই জেলে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হল তখন দেখা গেল এরা অন্যদের বেশি দিয়ে নিজেরাই কম খেল; কবিতার কথক ওদের সঙ্গে যেচে আলাপ করতে গিয়েছিলেন বলে ওদের আর খুশির অন্ত ছিল না। এ কবিতার কথক ও তার সঙ্গীরা যেদিন জেল থেকে ছাড়া পেলেন সেদিন দেখলেন, এই বারোজন ছেলে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে স্বদেশী গান। এইভাবেই এই কবিতায় বারোজন বাউণ্ডুলে ছেলের কীর্তিলাপের প্রসঙ্গ অবতারণার জন্যই কবি আশ্রয় নিয়েছেন এই প্রবাদটির।

'অন্ধকার' কবিতাটিতে রয়েছে 'নাকের জলে চোখের জলে' এই প্রবাদটি।

"……নাকের জলে চোখের জলে হয়ে
মা রাঁধতেন কাঠের জ্বালে
তার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।"

আমরা জানি, খুব কষ্ট পাওয়া বা অত্যন্ত দুর্ভোগে পড়া অর্থে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। ছেলেবেলায় কবি দেখেছিলেন তার মা কী কষ্ট করে তাদের জন্য রান্না করতেন। কাঠের জ্বালে রাঁধতে কষ্ট হত বলে মা কিন্তু কোনরকমে দায়সারা করে রান্নার কাজটি সম্পন্ন করতেন না। আর সে জন্যই তার মায়ের সে রান্নার স্বাদ হত অপূর্ব, যা এখনো কবি বিস্মৃত হতে পারেন নি। মায়ের প্রতি কবির ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা এইভাবেই এই কবিতার কথাশরীরে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

'সম্ভবামি' কবিতায় 'সাত মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না' প্রবাদটি কবি ব্যবহার করেছেন পরিবর্তিত রূপে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পালিত হয়েছে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে। উন্মাদনার, আয়োজনের, আবেগের কোন খামতি ছিল না বরং আয়োজনের আতিশয্যে উৎসব হয়েছে বর্ণাঢ্য। কিন্তু সে উৎসবে প্রাণ ছিল কী না তা কারো নজরে পড়ে নি। তাই কবি লেখেন ঃ

"…..ভালোয় ভালোয় আগুপিছু
উৎরেছে সব কিছু,
বিধিমতে যথাকালে যা কিছু করার ছিল
হয়েছে সমাধা,
সাতমণ তেল পুড়েছে, নেচেওছে রাধা।"

—'সাতমণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না' প্রবাদটি কবি ব্যবহার করেছেন 'সাতমন তেল পুড়েছে, নেচেওছে রাধা'। কুশলী কবি প্রবাদের নেতিবাচকতাকে প্রত্যাহার করে ইতিবাচক বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেডস্বাধীনতার উৎসব পালনে কোন কিছুরই খামতি ছিল না বোঝানোর জন্য। ফলত প্রবাদের দ্যোতনা এখানে ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে।

এই ধরনের বহু প্রবাদ ও বাগধারার সাবলীল, অনায়াস ও দ্যোতনাময় ব্যবহারে ভাস্বর হয়ে রয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পংক্তিগুলি। কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

কুটো ভেঙে দুখান না করা (ধর্মের কল)
ঠ্যালার নাম বাবাজি (রাম নাম সত্ যায়)

রাবণের চিতা (একবার বিদায় দে, মা)
পরের ধনে পোদ্দারি (আলালের দুলাল)
চোখের মাথা খাওয়া (আপ-ডাউন)
পাজির পা ঝাড়া (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)
ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া (আশ্চর্য্য কলম) ইত্যাদি।

প্রচলিত কিছু লৌকিক ছড়ার অংশবিশেষ কবি মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাঁর বেশ কিছু কবিতায়। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে' এই প্রচলিত লোক ছড়াটির দ্বিতীয় পংক্তিটি কবি হুবহু ব্যবহার করেছেন 'আলালের দুলাল' কবিতায়।

"বুলবলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে
পায়ে শিকল দিয়ে কোকিল
মরছে কেশে কেশে…..।'

আমাদের দেশের তথাকথিত নেতারা ভোটের দৌলতে, জনগণকে বোকা বানিয়ে, গদিতে বসে নিজের জন্য টাকা, বাড়ি, গাড়ি সবই করেছেন, অথচ যাদের ভোটে জিতে তারা নেতা-মন্ত্রী তাদের দিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই। 'পরের ধনে পোদ্দারি' করে যার কপর্দকও ছিল না, সেও বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। অথচ কৃষকের সোনার ধান বন্যা বা খরায় নষ্ট হলে সেদিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই। তাই কৃষকের সোনার ফসল নষ্ট হওয়ার অনুসঙ্গকে লৌকিক ছড়ার 'বুলবলিতে ধান খেয়েছে/খাজনা দেব কিসে' পংক্তিটির শিল্পম্যত ব্যবহার করেছেন কবি।

'এখন কে যায়?' কবিতায় কবি 'ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি আমার বাড়ী যেয়ো' এই ছড়াটির 'ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি' শব্দাবলীকে গ্রহণ করে লিখলেন—

'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিরা
বুকের বাঁ দরজায় যতই
ঠকঠক করুক
এখন মজার খেলাঘর ছেড়ে
দূর। এখন কে যায়?'

—কবির এখন বয়স হয়েছে, এখন মাঝে মাঝে বুকের বাঁদিকে তিনি একটা ব্যথা অনুভব করেন বটে, তাঁর মনে হয় মৃত্যু রূপ 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি'রা যেন তার জীবনের দরজায় টোকা দিচ্ছে। কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কবি এখনই বিদায় নিতে চান না। এই মর্তপৃরীতে, এই বেঁচে থাকার তীব্র আকুতিই এই কবিতাটিকে এক অসাধারণ শিল্পকর্মে উন্নীত করেছে, এর পাশাপাশি মৃত্যুর রূপকে 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন সত্যিই অভিনব মাত্রা সঞ্চার করেছে কবিতাটিতে। সুতরাং একটি লৌকিক ছড়ার কিছু অংশের অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্যে এই কবিতাটিতে সঞ্চার হয়েছে শিল্পের এক অনন্য মাত্রা।

লৌকিক ছড়ায় আমরা দেখি, খোকা মাছ ধরতে গিয়েছিল 'ক্ষীরনদীর কূলে', 'যা রে কাগজের নৌকা' কবিতায় কবি এই 'ক্ষীরনদীর কূলে' শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন :

"বদর, বদর ব'লে ও ভাই
নোঙর নিই তুলে
হাওয়ায় হেলে দুলে
ক্ষীরনদীর কূলে নয়
কলুটোলার বাগে.....।"

—কবি যে কাগজের নৌকা বর্ষার কলকাতায় ভাসিয়েছেন তা অবশ্যই 'ক্ষীরনদীর কূলে' পৌঁছায় নি, জলবন্দী নগর কলকাতার কৃত্রিমতার পাঁকে পড়ে কলুটোলা হয়ে সে নৌকা ঠনঠনে কালিবাড়ির মোড় পর্যন্তই পৌঁছাতে পেরেছে। এইভাবেই লৌকিক ছড়ার বিশেষ কিছু শব্দবন্ধ কবিতার শরীরে জড়িয়ে দিয়ে কবি যে তাঁর কবিতাগুলিকে অনুভূতির এক অন্য স্তরে নিয়ে গেছেন তা বলাই বাহুল্য।

প্রবাদ, ছড়ার মতো লোকজ বিশ্বাস-সংস্কারও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে এসেছে বিচিত্র আঙ্গিকে। ভাগ্যগণনা, কুষ্ঠি ইত্যাদিতে লোকসমাজের গভীর বিশ্বাস। লোকসমাজের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করি 'কাল মধুমাস' কবিতায়— 'দেখনু, আমার একটা কুষ্ঠির দরকার/ভবিষ্যৎটা একটু ভালো করে/ জেনে নিতে চাই।"

লোকসমাজ বিশ্বাস করে জন্মবারে চুল, নখ ইত্যাদি কাটতে নেই, তাদের এই বিশ্বাসের ছবিটিও অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য কবিতাটিতে—

'বার বধু।
ভুলি নি, কারণ—
মা বলতেন : বুধবার নখ কাটা
আমার বারণ।'

লোকসমাজে চোখ নাচাকে কেন্দ্র করে নানান বিশ্বাস-সংস্কার প্রচলিত আছে। তারা মনে করে পুরুষের ডান চোখ ও নারীর বাঁ চোখ নাচা শুভ। লোকসমাজের এই বিশ্বাসটিরও প্রতিফলন ঘটেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এখন কে যায়?' কবিতায়। 'কাল আমার ডানদিক দিয়ে/একদল মড়া নিয়ে গিয়েছে/ আজ ডান চোখ নাচছে/কিছু একটা ভালো না হয়ে যায় না।'

সংহত সমাজের মানুষেরা বিশ্বাস করে অম্বুবাচীতে মা বসুন্ধরা ঋতুমতী হন, তাই এ সময়ে নাকি বৃষ্টি হয়ই, লোক সাধারণের এই বিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটেছে কবির 'যা রে কাগজের নৌকো' কবিতায় : অম্বুবাচী গেলে বাঁচি/হচ্ছে বৃষ্টি ছাড়ছে না...।'—লোকসমাজে ছড়িয়ে থাকা এমন অনেক বিশ্বাস-সংস্কারকে কবি দক্ষতার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন তার কবিতার পংক্তিমালায়।

বহু লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের ছবিও অঙ্কিত হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। মেলা লোকসমাজের কাছে অতীব জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। 'যা রে কাগজের নৌকো' কবিতাটিতে রথের মেলার উল্লেখ রয়েছে—'যেতে হবে রথের মেলায়।/ যাবি তুই?/ সঙ্গে

গেলে তোকে দেব রথের পার্বনি।' এই কবিতার অন্যত্রও রয়েছে রথের মেলার কথা—'বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি/ যেতে হবে রথের মেলায়।' 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' কবিতায়ও এইরকম একটি রথের মেলার প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তোমাকে বলাই হয় নি/এবার রথের মেলায় /কী কী কিনব।'

লোকদেবী বনবিবির কথাও আছে তাঁর 'ধর্মের কল' কবিতায় :

"যে বাউলেরা মধু আনতে গিয়েছিল
তারা ফেরে নি
বনবিবিকে পুজো দেওয়া তাদের ঘটপট
এখনও ছড়িয়ে রয়েছে।"

—এরকমই লোক উৎসব চড়কের উল্লেখ আছে 'কাল মধুমাস' কবিতায় : 'চড়কের আগে আসত সং'।

নানা ধরনের অবস্তুনির্ভর লোক-উপাদানের সম্ভারেও সমৃদ্ধ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

লোকযান : লোকযান হিসাবে পালকি (কাল মধুমাস), নৌকা (চিৎ) প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

লোকপ্রযুক্তি : ঢেঁকি, হাতুড়ি (স্বাগত), লাঙল, কাস্তে (অগ্নিকোণ) ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন কবিতায়।

লোকাস্ত্র : লোক অস্ত্র তীর-ধনুকের উল্লেখ আছে 'প্রস্তাব' কবিতায়।

লোকশিল্পকলা : আলপনার উল্লেখ আছে 'যত দূরেই যাই' কবিতায়।

লোকক্রীড়া : কড়িখেলা (ছাপ), দাবা (ফড়েদের প্রতি)-র উল্লেখও পাই।

এইভাবেই নানাবিধ দেশজ উপাদানের সাবলীল ও শিল্পসম্মত ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত এই সব লোক উপাদানগুলিকে কখনোই কবিতার বহিরঙ্গ উপাদান বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অযাচিত বস্তুভার বলে মনে হয় না। বরং কবির প্রয়োগ দক্ষতায় মণ্ডিত হয়ে এই লোক-উপাদানগুলি এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে তাঁর কবিতামালায়। আর এজন্যই কাব্য প্রকরণে লোকজ উপাদানের প্রয়োগে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (গ্রন্থ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (২০০৪), পৃ, ৬৯
২। আধুনিক কবিতার চালচিত্র—সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যলোক, কলকাতা(১৯৯৬)
৩। বাংলা কবিতা : অনেক আকাশ—তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা (২০০৩)
৪। আধুনিক কবিতার ইতিহাস (সম্পাদিত)—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং (২০১১)
৫। কবিতার নানা কথা—অমল পাল, পরম্পরা, কলকাতা (২০১২)

সুভাষের কবিতা : শৈলীর বিশেষত্বে

সমরেশ ভৌমিক

সব কবির কবিতা সকল পাঠকের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয় না। কোন পাঠক কবিতার ভাষার যাদুতে মুগ্ধ হন। কেউ বা বিভিন্ন ছন্দের হিল্লোলে উপলব্ধির নিত্য নতুন স্বাদ খোঁজে কবিতার দিগন্তে। অলংকরণ ও কবিকে একে অপরের থেকে আলাদা আলাদা চিহ্ন ও মাত্রায় বিশেষিত করে। আমরা রবি কবিকে চিনি যেভাবে, সেভাবে জীবনানন্দকে নয়। সমসাময়িক কবি হলেও সুকান্ত, দীনেশ দাস, অরুণ মিত্র কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয় বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গির নিরিখে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যের বিষয় ও মাত্রা অনেক রকম হলেও কবিতার রচনা কৌশলে এমন কিছু জিনিষ থাকে যার ব্যবহারকে সনাক্ত করার কিছু উপায় প্রাচীন ভারতীয় অলংকারিক কিংবা পাশ্চাত্য স্টাইলিস্টিকস্ বা শৈলী বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। এই বিষয়ের আলোকে আমরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু কবিতার দিকে ফিরে তাকাতে পারি।

শৈলীর প্রাথমিক উপাদান : নির্বাচন প্রক্রিয়া :

কবিতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান নির্বাচন। কবি তাঁর মনোজগতে বিম্বিত অসংখ্য ভাবরাজীকে উপস্থাপনের পূর্বে খেয়াল করেন তাঁর কবিতার পাঠককে? শিশুদের বোধগম্য ও উপলব্ধির জন্য কবিতা যে শব্দ ও ভাবকে গ্রহণ করবে পরিণত মনস্ক পাঠকের জন্যে সেই একই কৌশল যথার্থ নয়। তাই কবিতার প্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়া শিরোনাম কিংবা বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য বিশেষ শব্দ; কখনো একই শব্দের সমার্থক শব্দ লঘু গুরু ভাবে ব্যবহার করা হয় অতিসতর্কতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের অনন্ত মধুর আবেদনকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে বলেন—

"মোর বসন্তে লেগেছে যে সুর
বেণুবন ছায়া হয়েছে মধুর
থাকনা এমন গন্ধ বিধুর
মিলন কুঞ্জ সাজানো।"

এখানে 'বেণু বন' শব্দ দুটি তৎসম রূপে ব্যবহৃত। কবিতার নান্দনিক সৌন্দর্য প্রকাশে এর বিকল্প শব্দ হিসাবে অতৎসম 'বাঁশবন' ব্যবহার করলে কবিতার ভাব হয়তো ঠিক থাকতো কিন্তু বিঘ্নিত হত শ্রুতি মাধুর্য। একইভাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচী যখন 'কাজলা দিদি' কবিতায় ছোট শিশুর প্রিয় দিদিকে একালে হারানোর ব্যথাকে প্রশ্নের আকারে ফুটিয়ে তোলেন তখন বলেন

"বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই।"

এখানে ছোট শিশুটির মুখে যদি পূর্বের কবিতার মতো 'বেণুবন' শব্দ ব্যবহৃত হত 'বাঁশবনের' পরিবর্তে তাহলে তা কবিতার ভাবসঙ্গতি বিনষ্ট করতো বলেই মনে হয়। তাই কবিতা রচনার প্রথম শর্তই হল নির্বাচন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'পদাতিক' (১৯৩৮-১৯৪০) এবং তিনি নিজেও পদাতিক কবি উপাধিতে ভূষিত। 'পদাতিক' শব্দটির বাংলা অর্থ পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করার নিমিত্ত সৈন্য। কবির পটভূমি ও পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি নির্দিষ্ট আদর্শ ও পন্থায় তাঁর কাব্যজীবন নির্মাণ করেছেন। আধুনিক সমালোচকের কথায় "এ যুগের এক জটিল কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যুগ চেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন তাঁর কবিতার অণুতে-রেণুতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিরিশের শেষদিকে, চল্লিশের শুরুতে যখন রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির প্রশংসাধন্য রাশিয়া জয়ী কমিউনিজম এদেশে নবীন আগন্তুক তখন শিক্ষিত উদার প্রাণ যুবক সুভাষ মানব, প্রেমের সঞ্জীবন মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন।"[১]

মূলত অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা এলেও তখন সাধারণ মানুষের যুদ্ধ শেষ হয়নি। দুর্ভিক্ষ, কালো বাজারী, জমিদারী শোষণে সাধারণ মানুষ যখন পথ হারিয়ে জীবনের কানা গলিতে পরিভ্রমণরত, ঠিক তখনই কবি বামপন্থার আদর্শে নিজেকে কাব্যভুবনে পদাতিক সৈন্যের আদর্শে স্থাপন করে যুদ্ধ জয়ের সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন। তাই প্রথম কাব্যের নামকরণে সৈন্য বাহিনীর অনেক বিভাগ থাকলেও তিনি সাধারণ সৈনিকের ভূমিকা নিয়ে জীবনের ক্লেশ বন্ধুর পথ হেঁটে কাব্যের নাম করেছেন 'পদাতিক'। পদাতিক সৈন্যের সামনে যেমন জীবন-মৃত্যুর ভেদরেখা তুচ্ছ, তেমনি পদাতিক কবিও বুঝেছেন—

"বুঝেছি ব্যর্থ পৃথিবীর পাড় বোনা;
স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো।
তামাসা তো শেষ; পাড়ের কড়িও গোনা—
কঙ্কাল খানা কালের স্কন্ধে টানো।"

'পদাতিক' কাব্যের প্রথম কবিতা 'মে-দিনের কবিতা' 'May-day' ১লা মে সারা পৃথিবীতে শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হয়। কিন্তু সভ্যতার কারিগর শ্রমিক শ্রেণি তাদের মর্যাদা কবে কোথায় পেয়েছে? তাই কবি তাদের শক্তি ও সাহস যোগাতে ইং মাসের নম ও শব্দকে কবিতার শিরোনাম হিসাবে সরাসরি ব্যবহার করেছেন—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল-মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

শিরোনাম হিসাবে বিকল্প শব্দ যেমন শ্রমিক দিবসের গান বা অন্য কিছু ব্যবহার করলে পাঠকের মনে দিনটির তাৎপর্য উপলব্ধি করানো শক্ত হত। একদিকে জীবনের ক্লান্তি, হতাশা

অন্যদিকে জীবনকে ভালোবাসার মন্ত্র শোনাতে কবি কবিতায় কিছু বিদেশী শব্দকে ও অনায়াসে নির্বাচন করেন—যেমন 'চিমনি', 'সাইরেন' প্রভৃতি—

"চিমনীর মুখে শোন সাইরেন—শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে;
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

পরবর্তী 'চিরকুট' কাব্যে (১৯৪১-৪৬) কবি হতদরিদ্র সাধারণ প্রজার হয়ে সামান্য প্রতিবেদন রচনা করেছেন, যার মধ্যে আছে দারিদ্রের করুণতম অধ্যায় সেই সঙ্গে প্রতিবাদের কঠোর ভাষা—

"পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।"

এখানে 'চিরকুট' শব্দটি নির্বাচন করে ক্ষুদ্র ক্ষমতায় প্রতিবেদন ধর্মী প্রতিবাদ করেছেন। সাধারণত কবিরা শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈকল্পিক নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অসংখ্য কবিতার বিষয় ও বিন্যাসের নিরিখে কবিতার নামাঙ্কন থেকে বিষয়ের ক্ষেত্রেও শব্দ নির্বাচনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

কবিতা রচনা করার সময় কবিরা দেখেন কোন্ শব্দ বা কোন বাক্য কার পাশে বসালে সর্বাধিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে। এই প্রতিক্রয়ার শব্দ বা বাক্য নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া তাকে আন্বয়িক নির্বাচন বলে। বাক্য সংযোজনার রীতির উপর নির্ভর করে আন্তরিক নির্বাচন দুভাবে নির্দ্ধারিত হয়। একটিকে বলে আদর্শগঠন (Norm) অন্যটি—হল বিচ্যুতি বা বিপ্রতীপতা (Deviation)।

কবিরা কখনো কখনো কবিতায় বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাষার মৌখিক ব্যবহারের ভাষা ক্রমটিকে ব্যবহার করেন যাতে কবিতার বিষয় ও ভাব সাধারণ থেকে সর্বজনের কাছে বোধগম্য হয়। সুভাষের কবিতায় এই রীতির সাবলীল ব্যবহার বেশ আকর্ষণীয়। 'পদাতিক' কবিতায় তৃতীয় স্তবকটি আদর্শ গঠনে অতুলনীয়—

"হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পার?
বিশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি,
অতল হ্রদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংসুক হাওয়া দেহে আঁকে চক্‌খড়ি।"

কেবল অন্তিম চরণটি ছাড়া সর্বত্র মৌখিক ভাষারাতির আদর্শ গঠনগত ব্যবহার আবেদনের নিরিখে অনুপম।

'চিরকুট' কাব্যের 'দীক্ষিতের গান' কবিতায় প্রথম স্তবকটি কবি আদর্শগঠনে না গাঁথলেও

দ্বিতীয় স্তবকের ভাষারীতি বামপন্থী ইস্তাহারের প্রকাশ ও প্রতিবাদে ঋজু। ভাষার গঠনও নির্মেদ—

"গা থেকে পাঁকের গলিত গন্ধ ধুয়ে মুছে দাও
স্বপ্ন জড়িত জীবনের দ্বিধা চাবুকে ছোটাও
হাঁটু ছিঁড়ে যাক্ দুপায়ে রক্ত কদম ফোটাও।"

'অগ্নিকোণ' কাব্যের নাম কবিতা 'অগ্নিকোণে' অধিকাংশ স্তবকবিচ্যুত গঠনে নির্মাণ করলেও কবি কবিতার অন্তিমে এসে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে শাণিত রূপ দিতে মৌখিক গদ্যভাষা রীতির আদর্শ গঠনকেই হাতিয়ার করেন।

"লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে দু-টুকরো করে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।"

সভ্যতার কোণে কোণে জমাট বাঁধা অন্ধকারকে দূর করতে অগ্নিকোণের মানুষ কী করে আলোকোজ্বল সূর্যকে ছিঁড়ে আনবে মৌখিক গদ্য রীতিতে তা জানিয়ে দেন।

কবিতার ভাষা নির্মাণে ও সৌকর্য বিধানে কিংবা পাঠকের মনে আচমকা ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ করে কবিতার দিকে ঘুরে তাকানোর জন্যে যে পদ্ধতিটি সব থেকে বেশি ব্যবহার করেন সেটি হল বাক্যের বিচ্যুত গঠন বা বিপ্রতীপতা (Deviation)।

বাংলা ভাষার সুবিধা এই যে, এটির অন্যান্য ভাষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষমতা অধিক, তাই কবিতায় নানা ভাবকে প্রমুখিত করতে কবিরা এই রীতির অধিক ব্যবহার করেন।

'পদাতিক' কাব্যের 'বধূ' কবিতায় এক গ্রাম্য মেয়ের শহরের কুলবধূ হয়ে আসা ও নাগরিক পরিবেশের নিষ্ঠুর অসহায়তার মাঝে নিজের অবস্থান জানতে ফেলে আসা গ্রাম স্মৃতি সত্তায় ডুব দিয়ে মণিরত্ন খোঁজার দৃশ্যকে কবি অসাধারণ ভাষারূপ দিয়েছেন। কবিতাটির কোথাও কোথাও কবি বাংলা বাক্য রীতির অদর্শ গঠনকে ব্যবহার করলেও অধিকাংশ জায়গা জুড়ে কিন্তু বিচ্যুত রীতির উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতাটির বাক্য বিন্যাস কৌশলগুলি দেখা যেতে পারে।

কবিতাটির প্রথম স্তবকের প্রথম চরণটি বিচ্যুত গঠনে নির্মিত—

বিচ্যুত গঠন

১। গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল

২। ২য় চরণ—

'পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে'

৩। তৃতীয় বাক্যটিও বিচ্যুত গঠন নির্ভর 'দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া'

আদর্শ গঠন

১। বেলা যে গলির মোড়ে পড়ে এল।

২। আদর্শ গঠন হলে বাক্যটি হত ফেরিওলার ডাকে পুরানো সুর বাজে বা শোনা যায়। কিন্তু কবি এখানে কৌশলে ক্রিয়াপদকে উহ্য রেখে পাঠকের নিজস্ব ভাবনার জগৎকে উসকে দিতে চেয়েছেন।

৩। এটির আদর্শগঠন রূপ হত— বেতার দূরে কোন্ মায়া বিছায় কিন্তু তাই করলে এটি কবিতাটির ছন্দগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করে ভাব প্রকাশের অন্তরায় হত।

২য় স্তবকেও ভাষারীতির ব্যবহার কোথাও দীর্ঘ বা হ্রস্বরূপে বিচ্যুত গঠন নির্ভর যেমন—

বিচ্যুত গঠন

১। কাছেই পথে জলের কলে সখা কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে।

আদর্শ গঠন

১। বাক্যটি এই গঠনে হত সখা আমি কাছেই পথে জলের কলে কলসি কাঁখে মৃদু তালে চলছি।

২। ২য় বাক্য কিছুটা আদর্শ গঠন মেনে নির্মিত—

বিচ্যুত গঠন

কিন্তু ৩য় বাক্যে কবি আদর্শ গঠন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কবিতার বাক্য বিন্যাসে পাঠককে ঘুরে তাকাতে বাধ্য করেন—

'পড়ল মনে, খাসা জীবন সেখা'

আদর্শ গঠন

'হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা'

৩। বাক্যটি হত

সেথা খাসা জীবন মনে পড়ল

কবিতার পরবর্তী স্তবকগুলি বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রে কবিকে আদর্শগঠন বিচ্যুতির প্রক্রিয়া বজায় রাখতে দেখা যায়।

কবিতার শৈলীও সমন্তরালবাদ (Parallalism)

কবিতার শৈলীগত আলোচনায় দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সমান্তরালতাবাদ বা (Parallaism)। পাঠকের মনের মধ্যে কবিতার অন্তহীন এক বোধ সৃষ্টির জন্যে কবি একটি বিশেষ বাক্যকে চালক (Operator) ও তার অধীন একাধিক বাক্যকে 'চল' বা (parallal Constraint) হিসাবে ব্যবহার করেন। আধুনিক সমালোচকের কথায়—

"সমান্তরাল বা Parallesim কে পুনরুক্তির অন্তর্গত করে আলোচনা করলেও আসলে কিন্তু বিষয়টির দ্বারা কেবলমাত্র পুনরুক্তিকে বোঝা হয় না। বিষয়টিকে বোঝানোর জন্যে শৈলীবিজ্ঞানে P.C.OB. Theory র কথা গত শতকের আশির দশকে প্রথম বলেছিলেন Koopman এবং Sportiele.

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতায় রাজনৈতিক আদর্শ কিংবা কবির নিজস্ব দর্শনের

সোচ্চার প্রকাশ থাকায়, পাঠকের মনের মধ্যে অন্তহীন কোন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায় বেশ প্রকট ছিল। পদাতিক কাব্যের প্রথম কবিতা মে দিনের কবিতা প্রথম স্তবকেই কবি বলেন—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠ ফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

স্তবকটির শুরুতে অবস্থিত 'প্রিয়' শব্দটির হল চালক (Operator)। পরবর্তী এক একটি বাক্য হল 'চল' (Parallaism constraint) এবং প্রত্যেকটি বাক্য কোন না কোনভাবে চালক 'প্রিয়'র সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক—

।। এক।। 'প্রিয়—ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'

।। দুই।। "প্রিয়—ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।

।। তিন।। প্রিয় —চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য।

।। চার।। প্রিয়—কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

এখানে 'প্রিয়' শব্দটি সবগুলি বাক্যের শুরুতে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে। এবং বাক্যগুলিকে চালনা করছে। এখানে প্রিয় মানুষ বা সভ্যতার সুজন যেই হোক না কেন সে যে আজ সামগ্রিক ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে সে কথা কবি তার পাঠকের হৃদয়ের অন্তঃপুরে স্থাপন করতে চান। তাই 'প্রিয়' শব্দটিকে একবার চালক হিসাবে ব্যবহার করে সভ্যতার সংকটধর্মী অপরাপর বাক্যগুলিকে 'চল' হিসাবে নির্মাণ করেছেন।

পরবর্তী স্তবকগুলিতে প্রতিটি সুন্দর পরিস্থিতির সঙ্গে নানা অসুন্দর মেল বন্ধনে। শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্নায় কবি যখন প্রতি নিঃশ্বাসে লজ্জায় শব্দ শুনতে পান, তখনই গর্জে ওঠেন ও রাস্তা খুঁজে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন এভাবে—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা।"

কবিতার শেষ স্তবকটি নির্মাণেও কবি পাঠকের মনের অন্তঃপুরে পৌঁছে যাওয়ার জন্য প্রথম স্তবকের মত সমান্তরালতাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। বাক্যবিন্যাসগুলিকে ভাঙলে এর মধ্যেকার অদৃশ্য বন্ধনগুলিকে পাওয়া যাবে। এখানে 'প্রিয়' শব্দটি আবার চালকের ভূমিকা নিয়েছে। পরবর্তী বাক্যগুলি সমান্তরালতাবাদের নিয়মে 'চল' কাজ করেছে যেমন—

।। এক।। প্রিয়—(চালক বা operator)

(প্রিয়)—ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

(প্রিয়)—এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা।

(প্রিয়)—দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য

(প্রিয়)—চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।"

কবিতার প্রথম স্তবকে সমান্তরালতাবাদের মধ্য দিয়ে কবি প্রিয়কে জানিয়েছিলেন পৃথিবীতে আজ কোন শুভচেতনা নেই সামগ্রিক ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা সবাই। সমগ্র কবিতায় সেই নেতি ও ইতির সন্ধান ও নানা দ্বান্দ্বিকতা বোধে ঠোক্কর খেতে খেতে অন্তিম স্তবকে এসে সামান্য হলেও আশার আলোর ক্ষীণ রেখা খুঁজে পেয়েছেন এবং সমান্তরালতাবাদের মধ্য দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন—প্রিয় যতই আজ ফুল খেলবার দিন না থাকুক, ধ্বংসের বার্তা আসুক, বা দুর্যোগে পথ দুর্বোধ্য হোকনা কেন যৌবন আত্মা—সবকিছুকে উপেক্ষা করে সত্যের পথ খুঁজে নেবে।

'অগ্নিকোণ' কাব্যের 'অগ্নিকোণ' কবিতায় সমান্তরালতাবাদ পাদ্ধতিটিকে নির্মাণ করেছেন একটু অন্যভাবে। প্রতিহিংসার পাখার যখন সবকিছু ঝটপট করে মরছে তখন অগ্নিকোণের মানুষ তার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড ঋজু করে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এখানে কবিতাটি এরকম

"বনে জঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।
কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ধনুকের মতো বাঁকা পিঠগুলো
টান করে ঘুরে দাঁড়ায়—
পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে
রবারের বনে
মশলার দ্বীপে
সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে
উপত্যকায়
বদ্বীপে, নীলকান্ত মণির
ঝিকিমিকি দেশে
শ্যামে, কম্বোজে
অনামী পাহাড়ে
মেকং নদীর বানডাকা জলে
ঘুম ভেঙে ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।

এখানে অগ্নিকোণের মানুষ ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো টান করে ঘুরে দাঁড়ায় এটি চালক বা operator কিন্তু কোথায়? এর উত্তর আছে দীর্ঘচলগুলির মধ্যে—

যেমন—টান করে ঘুরে দাঁড়ায় কোথায়?

এগুলি হল—

।। এক।। 'পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে'
।। দুই ।। 'রবারের বনে'
।। তিন।। 'মশলার দ্বীপে'

।। চার।। 'সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে উপত্যকার বদ্বীপে'
।। পাঁচ।। 'নীলকান্ত মণির ঝিকিমিকি দেশে শ্যামে, কম্বোজে'
।। ছয়।। 'অনামী পাহাড়ে'
।। সাত।। 'মেকং নদীর বানডাকা জলে'

এগুলি প্রত্যেকটি একএকটি চল এবং সভ্যতার চালিকা শক্তি রূপী—সাধারণ মানুষগুলি কোথায় কীভাবে সভ্যতার জাঁতা কলে পিষ্ট হচ্ছে সমান্তরালতাপদের অন্তহীন বার্তায় তা পাঠকের মনে পৌঁছে দিয়েছেন।

'ফুল ফুটুক' (১৯৫১-১৯৫৭) কাব্যগ্রন্থের 'সুন্দর' কবিতাটিতে কবি আদ্যন্ত সমান্তরালতাবাদের রীতিতে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। পূর্বে দেখেছি 'চালক' বাক্যকে একবার ব্যবহার করে 'চল'গুলিকে তার অনুগামী করা হয়। কিন্তু এখানে কবি একটি চালক বাক্যকে প্রতিটি স্তবকের শেষে ব্যবহার করে চলগুলিকে তার আগে স্থাপন করেছেন।

"যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একাএকা উড়ছিল তখনও নয়
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল
তখনও
কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে
তুমি যখন হাসলে
তখনও নয়।'

এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। তখনও নয়' বাক্যটি চালক বা (operator) কিন্তু কবি একবার ব্যবহার না করে তিনবার ব্যবহার করেছেন তিনটি বিশেষ বাক্যকে সংযুক্ত করার জন্য। যেমন—সমান্তরালতাবাদের রীতিতে স্তবকটি এভাবে ও হতে পারত—

চালক বাক্য—"তখনও নয়—

PC-1 চল —১ "যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায়
একা একা উড়ছিল।'
PC-2 চল —২। "বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল।"
PC-3 চল —৩। "কী একটা আকাশ উদ্ভাসিত করে তুমি
যখন হাসলে।"

এখানে প্রতিটি 'চল' বাক্যকে কবি বাক্যবিন্যাসের আদর্শ বা অধোগঠনের রীতিতে তৈরী করেছেন।

কবিতার অন্তিম স্তবকে এসে কবি তাঁর প্রিয় বিষয় বা প্রিয়তমাকে কখন সুন্দর লাগলো সে কথা বলতে গিয়েও সমান্তরালতাবাদের শৈলী প্রকরণকে ব্যবহার করে পাঠকের মনের মধ্যে এক গভীর বোধ সঞ্চারিত করেছেন—এখানে চালক বাক্যটি হল—

চালক (OP) বাক্য : তখনই/আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে

চল (PC_1) : 'যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফোঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল"।

চল (PC_2) : 'যখন তোমাকে আর দেখা গেল না'

এভাবে কবি তাঁর বহুকাব্যের অসংখ্য কবিতায়—শৈলীর এই বিশেষ রীতিকে ব্যবহার করে কোথাও গণজীবনের ইস্তাহার, কোথাও সভ্যতার সংকটের মুখোমুখী মানবীয় বোধের অন্তহীন ক্ষয়কে মূল্যায়ন করেছেন।

সুভাষের কবিতা : প্রমুখনের শৈলীতে :

ভাষা শৈলীর এক বিশেষ রীতি হল প্রমুখন (FORE GROUNDING)। শৈলী বিশেষজ্ঞ অচিন্ত্য বিশ্বাসের মতে—"দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষায় বা কাজের ভাষায় এই যে সরাসরি অর্থের কাছে পৌঁছে যাওয়া, শৈলী বিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়াটিকে 'Automatization' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঠিক এর বিপরীত পদ্ধতি হল প্রমুখন বা Fore grounding'.

সুভাষের কবিতায় কেবল বাক্যকে তার আদর্শগঠন থেকে বিচ্যুত করেই নয় ব্যঞ্জনামূলক বাক্য, কোথাও বা ব্যঞ্জনামূলক শব্দ ব্যবহার করে কবিতাকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। যেমন—'পদাতিক' কাব্যের ' মে দিনের কবিতা'য়—কবি বলেন—

"চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ'।

এখানে কবি 'সাইরেন-শঙ্খ' এই কেবল নিরঙ্গ রূপক অলংকারে 'সাইরেন-শঙ্খ' শব্দবন্ধটিকে ব্যঞ্জিত করেছেন আধুনিক সভ্যতার শ্রমিক ও কলকারখানার প্রতীকে। শঙ্খ যেমন পৌরাণিক কাল থেকে সভ্যতার অন্ধকার দিনগুলিকে সরিয়ে নতুন দিনের আহ্বান করে তেমনি কলকারখানার সাইরেনের শব্দও যেন বঞ্চিত শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর রক্তে দোলা জাগিয়ে শতমরণের মাঝখানেও জীবনকে ভালোবাসার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে।

'চিরকুট' কাব্যের 'স্বাগত' কবিতার সূচনা হয় এক বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে—'গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—' এই বাক্য পাঠকের কানে প্রবেশ করা মাত্র চমকে তিনি কবিতার দিকে ফিরে তাকানোর আকর্ষণ বোধ করেন। কারণ 'গ্রাম' এই জড় অবস্থান কখনোই শহরে চলে যেতে পারেনা। তবে কবির উদ্দেশ্য তা নয় তিনি বাক্যের এই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে প্রমুখনের ধারায় বুঝিয়ে দেন দুর্ভিক্ষ নামক ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষগুলি সাতপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে খাদ্য আর বাঁচার জন্যে ইট, কাঠ, পাথরের হৃদয়হীন শহুরে পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়েছে।

'ফুল ফুটুক' কাব্যের 'আমি আসছি' কবিতায় শুভ দিন কিংবা প্রিয় মানুষের ভালোবাসায় ধরা দিতে কবি অসংখ্য বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে এগিয়ে চলেন স্বপ্নের দিকে। কিন্তু যখন বলে

ফেলেন —

'আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি'

তখনই প্রমুখনের মধ্য দিয়ে পাঠক বুঝতে পারে এই আপাত অন্ধকার আসলে সভ্যতার বুকে নেমে আসা কালো দিনের প্রতীক। এভাবে কবি তাঁর অসংখ্য কবিতার হেঁটে চলেছেন বাক্যকে প্রমুখিত করতে করতে।

চিত্রকল্পের ব্যবহার : শব্দ ও বাক্যের মধ্য দিয়ে কল্পনার বিমূর্ত জগতে ছোট ছোট ছবির টুকরো সৃজন-ই চিত্রকল্প। সুভাষের কবিতা মূলত রাজনৈতিক দর্শনে পরিপুষ্ট হওয়ায় চিত্রকল্পগুলি আপাত স্নিগ্ধ প্রকৃতি চিত্র অপেক্ষা জীবনের রুক্ষতার প্রতীকে ধরা পড়েছে বেশি। 'কাল মধুমাস' কাব্যের একটি বিশেষ কবিতা 'এদিকে', যেখানে কবি কুমোর টুলির সাধারণ প্রতিমা শিল্পীর প্রতিমা নির্মাণের কাজ, মূল্যহীনতা ও তজ্জনিত হতাশা থেকে পতিতা পল্লিতে আগমন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে জীবন্ত প্রতিমা নির্মাণের রসদ সংগ্রহ, এই সমগ্র বিষয়টিকে কবি এক অসাধারণ চিত্রকল্পে ছবির মতো করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের 'বুড়ি ছুঁয়েছিল' কবিতায় কবি আধুনিক রাজনীতি সর্বস্ব, ভোটের দেওয়াল চিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের স্বপ্নকে উৎখাত করা ও মানুষের সাহায্য নিয়ে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টাকে চমৎকার অলংকরণে, চিত্রের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়—

"যে দেওয়ালে বুড়ি দিত একদিন ঘুঁটে
ভদ্রলোকের বেটারা সেখানে জুটে
তাতে নানা রং ফলিয়ে গিয়েছে লিখে
বুড়ি জানে নাকো কারা কোন্ দল কী কে
.....
.....
বুড়িভাবে, হাতে নিয়ে গোবরের ঝুড়ি
আজাদির হল ক'বছর? দুই-কুড়ি।
এক দেয়ালেই পিঠোপিঠি থেকে দুয়ে
বুড়িকে সরায়, থাকে তবু বুড়ি ছুঁয়ে।"

কবিতার ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রেও কবি ভাবের তারতম্য অনুযায়ী ছন্দকে কোথাও করেছেন, দ্রুতগামী, (দলবৃত্তরীতি), কোথাও ধীর (মিশ্রবৃত্ত রীতি) আবার কোথাও বিলম্বিত (কলাবৃত্ত রীতি)। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গদ্যছন্দের ভাবগত উপস্থাপন কবিতার কলেবর নির্মাণে কবিকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। যেমন 'ফুল ফুটুক' কাব্যের 'পারাপার' কবিতাটি কেবল আকারে ছোট নয়, কবিতার পর্ববিন্যাস ও ভাব অনুযায়ী দলবৃত্ত রীতির ছোট ছোট পর্ববিন্যাস

ও ভাব অনুযায়ী দলবৃত্ত রীতির ছোট ছোট পর্ব সমবায়ে গঠিত—

⊥ □ □□ □ □

"আমরা যেন / বাংলা দেশের ৪ + ৪

□ □□ □□

চোখের দুটি। তারা। ৪ + ২

□□ □ □ □□

মাঝখানে নাক / উঁচিয়ে আছে —(মাত্রা সংকোচন রীতিতে ৪ মাত্রার পর্ব)

□ □ □□□

থাকুক গে পাহারা। ৪ + ২

'পুপে' নামক কবিতায়ও কবি ছন্দের ক্ষেত্রে একই রীতি ব্যবহার করেছেন—

□□ □□□ □□

মেয়ে আমার / পুপে ৪ + ২

□□□ □ □□

যখনই যায় / ছাতে ৪ + ২

□ □□ □□

ছোট্ট ছোট্ট / হাতে ৪ + ২

□ □ □ □ □

প্রকাণ্ড নীল / আকাশটা চায় ৪ + ৪

□ □□ □ □□

না দিলে নেয় / লুফে ৪ + ২

এই একই কাব্যের 'আরও একটা দিন 'কবিতায় ব্যবহার করেছেন অক্ষরবৃত্ত মুক্তক রীতির ছন্দ—

□□□ □□ □□□□

দুপায়ে রাস্তার কাদা / ঘুটে ঘুটে ৮ + ৪

□□□□ □□□ ||□□ □|| □□□

ধরে ধরে পার হয়ে / নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা ৮ + ১০

↓↓ □□ □□

এই মাত্র চলে গেল ৮

□□ □ ↓↓

আরো একটা দিন। ৬

কবি এখানে মুক্তক রীতিতে প্রতিচরনের পর্বসমতাকে ভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কোথাও কোথাও কবিতার চরণ অতি সংক্ষিপ্ত হলেও কলাবৃত্ত রীতির একটি মাত্র

পর্বকে ব্যবহার করে পর্বকে করেছেন নির্মেদ। যেমন—'ছেলে গেছে বনে' কাব্যের 'দ্রুতি' কবিতাটি—

□↓↓ ↓↓

গভীর রাত—৫

□□ □□

তীব্র গতি —৫

□□ □

খড়ের গাড়ি—৫

□↓↓ ↓↓

গরুর চোখ—৫

□ || □□

গাছের গুঁড়ি—৫

□↓↓ ↓↓

খড়ির দাগ

তবে কবির অধিকাংশ কবিতা আধুনিক গদ্যছন্দের আপাত অন্ত্যমিল বিবর্জিত ভাবযতির শারীরিক কাঠামোয় তরঙ্গায়িত।

কবিতার অলংকরণ শৈলীতে কবি শব্দ ও অর্থালংকার ব্যবহার করেছেন বটে। তবে সেগুলিতে আধুনিক জীবন সমস্যা বা তার উপকরণগুলি কোথাও উপমিত হয়েছে, কোথাও সংশয়, কোথাও অভেদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'বধু' কবিতায়—কবি যখন গ্রামের ছবিকে প্রমুখিত করতে বলেন—

'সারাদুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুপারে ফেলে ছায়া,'

এখানে 'গভীর বনে'র মধ্যে সংশয়কে প্রতীয়মান করে কবি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার চমৎকার ব্যবহার করেন।

তাই কবিতায় কবি যখন বলেন—

'পাষাণকায়া হায়রে রাজধানী'

তখন তো লুপ্তোপামার ব্যবহারে ও আধুনিক উপমায় উপমিত হয়ে হাল ফ্যাসানের উপমায় পরিণত হয়। 'তেজারতির মতন কিছু পুঁজি' বাক্যেরও আধুনিক বিষয়কে লুপ্তোপামায় উপমিত করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতাগুলি খুটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় আপাত সহজে সরল কবিতাগুলি কী অসাধারণ শৈলী সজ্জায় ভাবনার বিচিত্র জগৎকে প্রবাহিত করেছে ভাবান্তরের বস্তুলোকে।

তথ্যসূত্র

১। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড. অশোককুমার মিশ্র এস, ব্যানার্জী এণ্ড কোঃ; ২৮শে মে ১৯৯১। পৃষ্ঠা—২৩৮

২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা; পদাতিক; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ১২৩ তম সং, পৃ-২০

৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা; পদাতিক;১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; ১২৩ তম সং, পৃ.-২০

৪। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা; পদাতিক;১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; ১২৩ তম সং, পৃ.-২০

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা; পদাতিক;১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট; ১২৩ তম সং, পৃ.-৩৩

৬। কবিতার শৈলী তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কল-৯ পৃ-২১।

৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'মে দিনের কবিতা' ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ১২৩ তম সং পৃ-২১৫।

৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'মে দিনের কবিতা' ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ১২৩ তম সং পৃ-২১৫

৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের; শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'সুন্দর' পৃ-৪৩।

১০। কবিতার শৈলী তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ১২৩ তম সং পৃ-২৪।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শৈলী

পীযূষ কান্তি অধিকারী

সাহিত্যে স্রষ্টা মূলতঃ নিজেকেই প্রকাশ করেন বিভিন্ন চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাষায়। আর এই প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ব্যক্ত হয় বিষয়ে, শব্দ, বাক্য, ভাব ভাষা, সৌন্দর্যরূপায়ন প্রভৃতি প্রয়োগের মাধ্যমে, যা স্রষ্টাকে অন্যান্য কবি লেখকের মধ্য থেকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়, বুঝে নিতে সাহায্য করে। বিচিত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরশে ধন্য সাহিত্যে বিচিত্র প্রকরণগত গুণাবলীকে বলে শৈলী। আমাদের হৃদয়ের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পর কবিতায় সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ শৈলী কীভাবে কতটা ঘুরেফিরে এসেছে তা অন্বেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর এক জটিল কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। যুগচেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন তাঁর কবিতার অনু-পরমাণুতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ত্রিশের দশকের আত্মমগ্ন কবিদের ভাবের স্রোতে গা না ভাসিয়ে, তাঁদের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে চল্লিশের সমাজ-মনস্ক অগ্রজ কবি সুভাষ তাঁর কাব্যঘাতে কম্পন তুললেন বাঙালি পাঠকের হৃদয়-ভূমিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র সুভাষ রাজনৈতিক কারণে পরীক্ষা দিতে না পারলেও তিনি লেখালেখি শুরু করেন পরীক্ষা দিতে না পারলেও তিনি লেখালেখি শুরু করেন ছাত্র জীবনেই। গদ্য রচনা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির পথচলা শুরু হলেও তাঁর সচচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি, পদাতিক কবি। তাঁর প্রথম কাব্য 'পদাতিক' (১৯৩৮-৪০)। ১৯৪০ সালে 'কবিতাভবন' থেকে ২৩টি কবিতা সংকলিত ৩২ পাতার কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশকালে কিশোর কবি তরুণ কবিতে পরিণত হলেন। আমরা পেলাম জাতির উদ্দেশ্য পদাতিক কবির অমর ঘোষণা ঃ

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।"

কিংবা,

"প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর ধনুক।"

—এই দৃঢ় সংকল্পের পর কবি একে একে লিখলেন 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট', 'যত দূরে যাই', 'কাল মধুমাস', 'এই ভাই', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'জল সইতে', 'চইচই-চইচই', 'বাঘ ডেকেছিল', 'যা রে কাগজের নৌকা', 'ধর্মের কল, ফুল ফুটুক', একবার বিদায় দে মা', 'ছড়ানো ঘুঁটি (২০০১)। তাঁর চারটি ছড়ার বই- 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো', 'সাত সকালের ছড়া', 'বকবকম', 'হরে কর কমবা'। তাঁর অনূদিত 'নাজিম হিমকতের

কবিতা', 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ', 'হাফিজের কবিতা', 'চর্যাপদ', 'অমরু শতক', 'গাথা সপ্তশতী' কাব্যগুলি বেশ জনপ্রিয়।

যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কবি সুভাষ কবিতা দিয়ে মানুষের হাত গুলোকে কাজে লাগিয়ে ধারণাকে মনের মতো করে বদলে দিতে চান তাঁর কাছে কবিতার বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বিষয়কে নির্বাচন করতে গিয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে কবিতার প্রাণ শৈলীর প্রসঙ্গ। কবি সুভাষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বীজ নিহিত আছে তাঁর বিচিত্র কবিতার শৈলীর মধ্যে। তাঁর কাব্য-কবিতায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের যে স্পষ্ট ছাপ তিনি রেখেছেন তা হল :

১। কবিতার নাম নির্বাচনে : ছেই, আরে ছো, সখা হে, এস হে, বুড়ি ছুঁয়ে, আরে ছা, ড্যাং ড্যাং ক'রে, যা হট্, হেঁ-হেঁ আলির ছড়া, ল্যাং, রসুই, তো, চিৎ প্রভৃতিও যে কোনো কবিতার নাম হতে পারে তা জীবনের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করলেন। শুধু তাই নয় এসব কবিতাগুলি পাঠকের মনোলোকে দারুণভাবে স্থান করে নিয়েছে।

২। বিষয়ের বর্ণনা ভঙ্গিতেও সুভাষের কবিতা অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র তাঁর অধিকাংশ কবিতার অতি সাধারণ বিষয়ও শুধু বর্ণনার গুণে বাংলা সাহিত্যে চিরকালের সম্পদ হয়ে উঠেছে। 'ফুল ফুটুক' (১৯৫১-৫৭) কাবের 'সুন্দর' কবিতায় তিনি নারীর মধ্যেকার যে সৌন্দর্যের আরাধনা তা পাঠককে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। এখানে কবির 'সুন্দরের সাধনা' প্রচলিত ধ্যান-ধারণা নয়। কোনো এক নারীকে সামনে রেখে তার প্রকৃত সৌন্দর্যের দিকটি কবি উদ্ঘাটন করেছেন 'সুন্দর' কবিতায়। জীবনবাদী; বস্তুবাদী কবি সুভাষ দমকা হাওয়ায় উড়ন্ত আঁচলের মধ্যে সুন্দর খুঁজে পাননি; বিকেলের পড়ন্ত রোদে নারীর মুখের বিন্দু বিন্দু ঘাম যখন 'মুক্তোর মতো' জ্বলতে থাকে তখনও সেই উজ্জ্বল নারীতে সুন্দর খুঁজে পাননি; নারীর ভুবন ভুলানো হাসিও কবিকে মুগ্ধ করতে পারেনি, নারীর তিনটি চিরন্তন মোহময়ী আবেদনকে তিনি সচেতন উপলব্ধির দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রতি ক্ষেত্রে 'তখন নয়' ধ্রুবপদটিকে ব্যবহার করে। কবি চোখের মনোহারিতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর কাছে সুন্দর হবার জন্য প্রসাধনের দরকার হয়না। তাইতো মেয়েটি যখন লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কথা প্রচার করে তাদের সুন্দরভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, দিতে চায় বঞ্চিত সর্বহারাদের বাঁচার রসদের সন্ধান—সামিল হয় অধিকার আদায়ের অবিচল সংগ্রামে তখনই মানবতাবাদী কবির চোখে মেয়েটি হয়ে ওঠে প্রকৃত সুন্দর। কবির ভাষায়:

"যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
তখন তোমাকে আর দেখা গেল না—
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখালো তোমাকে।"

৩। শব্দ প্রীতি ও শব্দসৌন্দর্যের প্রতি দুর্নিবার টান : বিষয়ে বার বার অভিনবত্ব এনে কবি সুভাষ তাঁর কবিতাকে আরো বেশী বেশী প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা চোখে দেখেছেন, যা কানে শুনেছেন—সেসব দিয়েই গড়েছেন কবিতা।

তাই তাঁর কবিতার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে মিটিং-মিছিল, বস্তি-গ্রাম, শহর-বাজার, খেত-খামার, কারখানা, আপিস-ময়দান থেকে; কখনো চাষি-মজুরের মুখের ভাষা থেকে, ব্রত-পাঁচালি থেকে, প্রতিদিনের খবরের কাগজ থেকে, মুখে মুখে চলতি শব্দ থেকে। তাঁর কবিতায় অভিজাত তৎসম শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

ক) 'চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক' (বর্ষশেষ')
খ) 'বিধিবহির্ভূত দুটি/চিরঞ্জীব/জন্মের মহিমা' ('সাধ')
গ) 'ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে' ('রোমান্টিক')
ঘ) 'বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাত' ('আদর্শ') ইত্যাদি।

তবে এধরণের তৎসম শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় বেশী নয়। তাঁর কবিতার পর কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন তদ্ভব ও দেশি শব্দের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন থেকে উঠে আসা হিন্দী ছাড়াও ইংরেজি, আরবি-ফারসি, রুশ, জার্মান, ফরাসি, বার্সিলানো, রেস্তোরাঁ, বলশেভিক, কমরেড, বাল্‌ব, দিশ্, ট্যাঙ্ক, স্ট্রাইক, টিন, ল্যাম্পপোস্ট, মেড-ইন-লণ্ডন, ট্রেন, ক্লীনার, নমাজ, সওয়ার প্রভৃতি অজস্র শব্দ প্রয়োগে' কবির শৈলী প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণজাগরণের সূত্রে তাঁর কবিতায় হো-চি মিন, ক্রুশ্চেভ, মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্টালিন, রেগন প্রমুখ বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগণের নাম যেমন এসেছে, তেমনি বারবার ঘুরেফিরে এসেছে বিভিন্ন স্থানের নাম। যেমন—

ক) 'দিল্লী থেকে ছাড়লাম ডাক" ('ছি-মন্তর')
খ) 'শুধু তো কম্বোজে নয়" ('গুরুভাই')
গ) "আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে গিয়ে ভিয়েতনামকে ভাই বলছি" ('ভাল লাগছে না')
ঘ) 'লেলিনগ্রাম থেকে চলেছি স্কোফ" ('দেখো শুনে')
ঙ) "ক্রেমলিনের লাল তারার চোখে চোখ রাখা" ('ভুবন ডাঙার বাউল এক')
চ) "স্টালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর" ('স্টালিনগ্রাড') ইত্যাদি।

আবার তাঁর কবিতায় বিশেষণ প্রয়োগ বেশ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। 'খাসা জীবন' ('বধূ') 'উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে' ('নির্বাচনিক'), করুণ চ্যাপ্টা ('পদাতিক'), 'অহিংস ছাগে' ('চলচ্চিত্র'), সাজোয়ান ছোকরাদের' ('ছাই') প্রভৃতি তিরের ফলার মতো বিশেষণ যেমন তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমনি রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়নকে ভাষা দিতে ব্যবহার করেছেন—'উপবাসী অপমৃত্যু' ('মুখবন্ধ'), 'প্রভুত্বের মদমত্ত বুট' ('আহ্বান'), 'লোলচর্ম লোভ' ('কান্ড দেখ') প্রভৃতি বিশেষণ। লক্ষ্যণীয় তাঁর কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি নানাভাবে বিশেষত হয়েছে—'ছোয়াড়ে অন্ধকার' ('সন্ধ্যামণি'), 'জোয়ানমদ্দ অন্ধকার' ('সন্ধ্যামণি'), 'আকাশ ভাঙা অন্ধকার' ('এমন'), 'অন্ধকার কী ঘুরঘুটি রে দাদা' ('টানা-ভগতের প্রার্থনা')। তাঁর

বিশেষণে শুধু নিরাশাঘন অন্ধকারই নয়, অসীম প্রত্যয়ও ভাষারূপ পেয়েছে—

ক) 'চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস" ('মুখবন্ধ')

খ) "হিরণ্যগর্ভ দিন লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে" ('এখন ভাবনা')

গ) "আনতে চলেছি/লাল টুকটুকে দিন" ('লাল টুকটুকে দিন')

এছাড়া 'সরস ঘুষ', 'বন্দুক সরকার', 'আঁশটে সন্দেহ', 'গোয়েন্দা হাওয়া', নিরক্ষর হাওয়া', 'নাস্তিক চড়াই' প্রভৃতি বিশেষণ তাঁর কবিতায় হামেশাই চোখে পড়ে।

৪। সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শৈলী প্রয়োগের অন্য একটি আলোকিত দিক হ'ল প্রচলিত ক্রিয়া বিশেষণের প্রয়োগ। 'মুচড়ে দিচ্ছে', 'শান দিচ্ছে', 'লটকে দিয়ে', 'চাড় লাগে', 'খোদাই হয়' প্রভৃতির মতো অসংখ্য ক্রিয়া বিশেষণে তাঁর কবিতা পেয়েছে দীপ্তি, দ্রুতি ও প্রাখর্য। অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়াপদের ব্যাবহারেও সুভাষ সিদ্ধহস্ত। যেমন—

ক) "সঙ্গীন উদ্যত করছো কে? সরাও" ("আমি আসছি"),

খ) "চলো না কবি মিছিলে মিশি—"" ('কাব্য জিজ্ঞাসা'),

গ) "আনো দিন হাতুড়ির/আনো দিন কাস্তের" ('আজকের গান')

ঘ) "বঁয়ে চলো ভাই/বাঁয়ে" ('বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে),

ঙ) "আগুণের আঁচ নিভে আসছে তাকে খুঁচিয়ে গনগণে করে তোলো" ('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ') প্রভৃতি।

৫। মিছিলের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়েও শৈলী প্রকাশ পেয়েছে। ঝটপট, পিটপিট, রীরী, কচি কচি, টগবগ, গাঁকগাঁক, চনচনে, গুড়গুড় টিপে টিপে, গিজ গিজ প্রভৃতির বহুল ব্যবহার তাঁর কবিতায় দারুণভাবে চোখে পড়ে।

৬। প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারেও কবি সুভাষ খুবই আন্তরিক ছিলেন। তাঁর একটি কাব্যের নাম প্রচলিত প্রবাদ 'ধর্মের কল'। আবার 'এক মাঘে শীত যায় না', 'কথার ঝুড়ি', 'সাত রাজার ধন', 'দেয়ালের লিখন', 'ঘোড়ার চাল' প্রভৃতি কবিতার নাম প্রবাদ কেন্দ্রিক। সুতরাং এমন প্রবাদ প্রেমী কবি তাঁর কবিতার চরণে আকছার প্রবাদ ব্যবহার করবেন—এটাইতো স্বাভাবিক। তাঁর 'চোখের পাতা খেয়ে' কবিতায় তিনি রাজনৈতিক হতাশাকে ব্যক্ত করতে ব্যবহার করেছেন 'স্বপ্ন নাকে খৎ দিচ্ছে'; 'আমাদের হাতে' কবিতায় বিপক্ষের গোয়েবল্‌স কূটনীতির প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে "ওদের কালো চশমা/দিনকে রাত করে।" আবার 'ঝড় আসছে' কবিতায় একদিকে বিদেশী শোষক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে দেশীয় বুর্জোয়া রাজনীতিকে সামনে রেখে কবি ব্যবহার করছেন—

"ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর/ যে মারে সেই বাঁচে"। এইরূপে 'আঠারো ঘা লাল বাঘা ছুঁলে', 'যায় না শীত এক মাঘে', 'সব শেয়ালের এক রা', 'স্যাকরার টুকঠাক, কামারের এক ঘা' প্রভৃতি ব্যবহার কর কবি কবিতার স্টাইলকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৭। অন্যদিকে প্রতীক ধর্মী ধর্মের শব্দের বহুল ব্যবহার চরম দুর্দিনের কবি সুভাষের কবিতার একটি মহৎ গুণ। প্রতীক কবির অন্তর্নিহিত ভাবনার এক ঘনীভূত নির্যাস, যা শব্দের

ব্যঞ্জনাকে সুগভীর স্তরে পৌঁছে দেয়। বাস্তবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতীক ধর্মী শব্দ প্রয়োগ দারুণভাবে চোখে পড়ে। তাঁর কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি একই প্রতীক যেমন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তেমনি 'মিছিলের মুখ'-এর মতো প্রতীকী কবিতা অনুবর্তিত হয়েছে 'মিছিলের মুখ', 'লাল টুকটুকে দিন', 'জয়মণি স্থির হও' কবিতার মধ্যে। একমাত্র 'দমন রাজার' ধ্বংসের মধ্যে লুকিয়ে আছে 'নতুন পৃথিবীর' ভালোবাসা। আর এই 'ভালোবাসাকে জাগ্রত করতে পারে সম্মিলিত জনতার 'মিছিলের মুখ'। আবার একই প্রতীক 'ট্রাম' বিভিন্ন কবিতায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে—

ক) "রাত্রি শেষ ট্রাম
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গুমটিতে ফেরে"('বাঘবন্দী')

খ) "অন্ধকারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে
সকালের প্রথম ট্রাম
এক্ষুনি যাবে।" ('সকালের ভাবনা')

গ) "মাথার ওপর একটানা দীর্ঘতারে
চড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।" ('এই পথ')

ঘ) "হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘমান তারে" ('পলাতক')

এইসব কবিতা ছাড়াও অন্যান্য কবিতায়ও ট্রাম নাগরিক জীবনের প্রতীক হিসেবে ঘুরে ফিরে এসেছে, যা সুভাষের কবিতার শৈলীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ট্রাম-এ কখনো নাগরিক জীবনের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ["যাচ্ছে ট্রাম.....দুর্ভিক্ষই মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ' ('কাল মধুমাস')], কখনো ক্রূরতা ["ট্রামগুলো....একটানা হিস্ হিস্ শব্দ" ('ফলশ্রুতি')], কখনো ধিক্কার ["একটা ট্রাম....একটানা ছি ছি শব্দ' ('খোলা দরজার ফ্রেমে')] ঝরে পড়েছে।

আবার তাঁর কবিতায় ঘড়ি ও ঘড়ির কাঁটা, ফুল প্রভৃতি শব্দের প্রতীকী ব্যবহার শৈলীর দিকটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ত্রিকালদর্শী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও জগৎ নিয়ে ভাবনা ধরা পড়েছে ঘড়ি ও ঘড়ির কাঁটার প্রতীকে—

ক) "ঘড়ির কাঁটায় হাত দিস নে,
সময় গোনা গাঁথা" ('জলছবি')

খ) "ঘড়ির কাঁটায় ঘুরে যাচ্ছে রোজ" (চোখের পাতা খেয়ে')

গ) "ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট সরছে" ("রোমান্টিক')

ঘ) দজ্জাল ঘড়িটা... ('তোমাকে বলিনি')

ঙ) "ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময়;....." ('কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের গাছ')

চ) "দেয়াল ঘড়িটা অবাধ্য/টিক-টিক টিক-টিক" ('হায়েনার হাসি')

ছ) 'সময়ে গলায় এখনও আজ হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা ('সন্ধ্যামণি')

আবার সুভাষের কবিতায় 'লক্ষ্মীর পো', 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' কখনো সচ্ছল জীবনের প্রতীক

হিসেবে, নীরস জীবনের প্রতীক হিসেবে কাঠখোট্টা গাছ, সন্ন্যাস জীবনের প্রতীক হিসেবে জটাধারী গাছ ব্যবহৃত হয়েছে। চাঁদ রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসের বার্তা বয়ে এসেছে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কবি সুভাষ চাঁদ সম্পর্কে সকল রোমান্টিক চিন্তা-চেতনাকে ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দিতেই যেন তিনি উচ্চারণ করলেন—

ক) 'বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী"

খ) 'চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি"

গ) 'ফাল্গুনী কবিরা
অর্ধেক চাঁদের মতো কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।'

খ) 'বিদায়! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ!" প্রভৃতি।

এছাড়া কবি-জীবনের ভাবনার পরিবর্তন প্রতীক ধর্মী শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। যে ফুল একসময় বুর্জোয়া বিলাসিতার প্রতিরূপ হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে 'পদাতিক', 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণে'—এর মধ্যে, 'ফুল ফুটুক' থেকে সেই 'ফুল সংগ্রাম, আশা জীবনের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে—

ক) "ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জ'মে জ'মে পাহাড় হয়,
ফুল জমতে জমতে পাথর।" ('পাথরের ফুল')

খ) "ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।" ('পাথরের ফুল')

গ) "ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।" ('ফুল ফুটুক না ফুটুক)

ঘ) "আমি লড়ছি লাল গোলাপের জন্য" ("লাল গোলাপের জন্য")

ঙ) "শান বাঁধানো পাথরে
আগুনের ফুল তুলে
আমরা আসছি" ('আগুনের ফুল')

চ) "উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময়" ('সন্ধ্যামণি')

ছ) "ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয় গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধরে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।" ('শুধু ভাঙা নয়') প্রভৃতি।

৮। সৃজন পদ্ধতি ঃ

মিছিলের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের অতি পরিচিত, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে স্বল্প প্রত্যক্ষ বর্ণনার দ্বারা কবিতায় তিনি শব্দ-শক্তিকে উজ্জীবিত করে তার অন্তর্নিহিত ভাবকে ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'ফুল ফুটুক' কাব্যের 'আরো একটা দিন' কবিতায় স্বল্প পরিসরে ধ্বংস ও সৃষ্টির গোপন সম্পর্কের কথা বাণীরূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে কবিতায় তিনি কালবৈশাখীর বীভৎস সন্ধ্যার কথা যেমন স্মরণ করেছেন তেমনি আলো-অন্ধকারে সৃষ্ট কাল্পনিক জলচ্ছবি আগামী দিনের আশার ব্যঞ্জনাকে জাগ্রত করেছে—

"মাথার ওপরে টিন
শব্দ ক'রে
মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।
সজ্‌নে গাছে ডাল ধ'রে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা
জলায় এবার ভাল ধান হবে—
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ-বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।।"

এছাড়াও 'কালমধুমাস', 'পারঘাটের ছবি', 'এখন ভাবনা', 'একটু পা চালিয়ে, ভাই', 'এই আশ্বিনে', 'আরও গভীরে' প্রভৃতি শব্দ-ছবি প্রাণ পেয়ে ফুটে উঠেছে কবির বক্তব্য বিষয়। 'এখন ভাবনা' কবিতায় ছাত্র আন্দোলনের ছবি—

"পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র;
দেয়ালে গুলির দাগ,
ভাঙা স্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।
যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন।"

সংগীতময়তা সুভাষের কবিতার আর এক বড় গুণ। কবিতায় সুরারোপ তাঁর সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র দীপ্তি এনে দিয়েছে। 'হিংসে', 'এক কাঠি দু কাঠি', 'ছুটির গান' প্রভৃতি কবিতায় সংগীতময়তাই এনেছে বারবার মধ্যমিল, অন্ত্যমিলের ঔজ্জ্বল্য। তাঁর 'ছাপ' কবিতার কিছুটা অংশ তুলে ধরা হল :

"কেউ দেয় নি কো উলু
কেউ বাজায় নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছুডাক।

পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলে নি হার;
মাটিতে রঙীন আশা
পেতেছিল সংসার....।"

আবার তাঁর কাব্যসম্ভারের সিংহভাগ কবিতা গড়ে উঠেছে ছোট ছোট কাহিনি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সুর ও কাহিনিযুক্ত কবিতাকে আশ্রয় করে মানুষের কাছে সহজে পৌঁছানো যায়। তাঁর 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'অগ্নিগর্ভ', 'বাসি মুখে', 'আরও একটা দিন', 'যেতে যেতে', 'পায়ে পায়ে', 'রাস্তার লোক', 'কেন এল না' 'কে বা কারা', 'পাতাল রেল', 'শেষ বাজি', 'ছেলে ধরা' প্রভৃতি অসংখ্য কাহিনি কেন্দ্রিক কবিতা। আবার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তিনি লিখেছেন 'যেতে যেতে', 'এক যে ছিল' প্রভৃতি রূপকথাধর্মী কবিতাও। তাঁর 'খেলা দেখে যান' কবিতার বাজিকরের চিত্রটি এক কথায় অভিনব ও অনবদ্য ঃ

'ঢোলক বাজে
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ভর সন্ধেবেলা।
হাজার ঢেউয়ের
হাততালিতে
জমে উঠেছে খেলা।"

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটা বড় স্টাইল হ'ল গদ্য ও পদ্যের মধ্যে বিরোধ কমিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, যা আধুনিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ। তাঁর অনেক কবিতা গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে রূপ পেয়েছে। যেমন—

"ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে।
ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।
পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে—
দ্যাখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মানিক
স্বাধীনতা।' ('মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ')

বাঙালির প্রাণের কবি সুভাষের কবিতায় গাদ্যিক ক্রিয়া, অব্যয়, সেইসঙ্গে সুচিন্তিত অন্ত্যমিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, গদ্য-পদ্যের ঐক্য সাধনের জন্য তিনি ছড়ার ধ্বনিমাধুর্যের সাথে বাক্‌ছন্দের মিলন ঘটিয়েছেন অনেক কবিতায়। যেমন—

"মন্ত্রী বলল, দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি

ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালো মানুষের ছা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পারুল বোন রইল কাছে" ('ঠাকুমার ঝুলি')

তাঁর বেশ কিছু কবিতায় তারিফ করার মতো আরো একটা বড় শৈলী হল প্রতিটি স্তবক ভেঙে ভেঙে সিঁড়ির এক একটা ধাপের মতো সাজানো। যেমন—

"ও ছবি
ও গান
ও টান
যাচ্ছি" ('যাচ্ছি')

কিংবা,

"এপারে ঘর।
ওপারে ঘর।
মধ্যে কঠিন দেয়াল।
ভোজের পাত
পেতে রেখেছে
ধুরন্ধর শেয়াল।" ('ভুলে যাব না')

বাঙালি-হৃদয়ের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আরো একটি সুন্দর স্টাইল অর্থাৎ শৈলী হল নাট্য আঙ্গিক, অর্থাৎ সংলাপধর্মী ভাষা প্রয়োগ। এজাতীয় অসাধারণ কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার করতে সাধারণ পাঠককেও খুব মেহনতের প্রয়োজন হয় না। যেমন—

"আমি বলতে লাগলাম—
তারপর সেই রাজকন্যা
আঙুলে আঙুল জড়ানো।'
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম :

"তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।"
শুনে সে বলল :
"এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ করে বসে আছি।"

আমরা লক্ষ্য করি 'পদাতিক', 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ'-এ সুভাষ শ্লোগানধর্মী কবিতা সৃষ্টিতে দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এছাড়া গল্প বলার ঢঙে তিনি যেসকল কবিতা লিখেছেন তাহল—'মেজাজ', 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ', 'ছাপ', 'কেন এল না' প্রভৃতি। যেমন—

"বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—
বউ বলছে : 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে ঃ 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।' ('মেজাজ')

৯) ছড়াকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এক বেশ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে যে কয়জন প্রতিভাধর কবি ছড়া লিখে সকল বয়সী পাঠকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিতে সমর্থ হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি সুভাষ। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তাঁর প্রতিটি ছড়া। প্রচলিত শব্দ, মুখে মুখে ফেরা বাক্যবন্ধ, ফুল-ফল, পশু-পাখি, শস্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, কীট-পতঙ্গ, নদী-পাহাড়, শহর-বন্দর প্রভৃতি জগৎ ও জীবনের সব জায়গা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে তিনি বিচিত্র ছড়ার ডালি সাজিয়েছেন। কবির নাতি মিউকে নিয়ে লেখা ছড়া এক কথায় অনবদ্য। বিচিত্র ফুলের সমারোহে উজ্জ্বল এজাতীয় ছড়া পাঠ করে পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হতে বাধ্য। এখানে গোলাপ-জুঁই-সন্ধ্যা মালতীর মতো সভ্রান্ত জাতের ফুল থেকে শুরু করে খেটু-আকন্দের মতো অখ্যাত ফুল পরম সমাদরে স্থান পেয়েছে। আর এর ফলে বিচিত্র সৌরভে ম' ম' করে উঠেছে তাঁর ছড়ার বাগান। তাঁর বিচিত্র ছড়ায় কৌতুকপ্রিয় মজাদার কবি সুভাষকে পাঠক হামেশায় আবিষ্কার করে। যেমন 'ল্যাং' কবিতায় ঃ

"ডানকানটা বিগ্‌ড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে-কাছে—
'আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে

বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি।
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।
***** *****
'ফুল্‌কি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।"

আবার কন্যা পুপেকে নিয়ে ছড়ায়-ছড়ায় তিনি মজা যেমন করেছেন তেমনি স্নেহধারার মধ্যে কখনো কখনো দার্শনিক উপলব্ধির ছোট-বড় ঢেউ উঠেছে, যাকে সুভাক্ষী স্টাইল বলা যেতে পারে :

"আমি যতই হই না কেন
আল্‌সে,
বাপের ঘরে থাকবে নাকো
জানি চিরকাল সে।
সিঁদুর পরতে গিয়ে যখন
খুলবে রূপোর কৌটো;
হঠাৎ মনে হতেও পারে
কী যেন তার ছিল।" ('পুপে')

১০। ছন্দ প্রয়োগে :

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছন্দের গোপন কথা ভারী সুন্দর ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের চলাফেরা বেশ সাবলীল, নিখুঁত। তাইতো সুভাষের কবিতা পাঠে পাঠক ক্লান্তিবোধ করেন না। বাংলা কাব্যছন্দের যে তিনটি ধারা (ক) তানপ্রধান (খ) ধ্বপ্রিধান ও (গ) শ্বাসাঘাত প্রধান-এর প্রত্যেকটির সুন্দর প্রয়োগ তাঁর কবিতায় বর্তমান। শুধু তাই নয়, ছন্দ সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে তাঁর কবিতায় নিজস্ব ছন্দশৈলীতে, ছন্দ নিয়ে তাঁর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাতে। তিনি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কবিতা লিখেছেন দলবৃত্ত বা শ্বাসঘাত প্রধান ছন্দে।

ক) পুপে যখন /বড় হবে/
তখন অন্য/বায়না
৪ + ৪ + ৪ + ২
মেলায় কিনে/দিতে হবে/
চিরুনি আর/আয়না। ('পুপে)
৪ + ৪ + ৪ + ২

খ) "একটি ছিল/আগে
৪ + ২
সেটিকে পেয়ে/বাগে
৫ + ২
খেয়ে নিলে/হালম গো মালিক
৪ + ৫
খেয়ে নিলে/হালম।" ('বাঘ/হেঁ-হেঁ আলির ছড়া')
৪ + ২

গ) "রয়েছে সাধ/ভালবাসার
৪ + ৪
সাহস নেই/কাছে আসার
৩ + ৪
কে জানে ব্যাধ/পেতেছে ফাঁদ
৪ + ৪
ছড়ানো কোন্/দানায়" ('যেখানে ব্যাধ')
৪ + ২

কবির সবচেয়ে ভালোবাসা এই দলবৃত্ত/শ্বাসঘাত প্রধান ছন্দে। তাই ভালোবাসার অমোঘ টানে ছন্দের স্বাভাবিক শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেওয়ায় মূলপর্ব ৪ মাত্রার পরিবর্তে ৩, কখনো ৫ মাত্রায় হলেও মাত্রা বর্ণনা শ্রুতিনির্ভর হওয়া দেখতে ৩/৫ মাত্রার পর্ব এক্ষেত্রে ৪ মাত্রারই স্বস্তি এনে দিয়েছে।

কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগেও কবি দারুণ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। যেমন—

ক) সাত মাত্রার পর্ব—
"বিকেলে ময়দানে/জোর সভা
চলেছে লোকজন/দল বেঁধে
সূর্য পশ্চিমে/প্রায় ডোমা
বেকার হাওয়া আহা/গায় বেঁধে" ('রাস্তা')

খ) ছয় মাত্রার পর্ব
এক. "আকাশের চাঁদ/দেয় বুঝি হাত ছানি?" (সকলের গান')
দুই. "গলিত ধাতুরা/জমাট কখন/বাঁধবে?" ('রোমান্টিক')

গ) পাঁচ মাত্রার পর্ব
"গলির মোড়ে/বেলা যে প'ড়ে/এল" ('বধূ')
৫ + ৫ + ২

ঘ) চার মাত্রার পর্ব—
"তিল তিল/মরণেও/জীবন অ সংখ্য" (মে-দিনের কবিতা')
৪ + ৪ + ৪ + ৩

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম হলেও তিনি এই ছন্দে এক নব স্বাচ্ছন্দ এনেছেন। তাঁর 'পণ্ডশ্রম : আলাপ' কবিতার কিছু অংশ—
অনেকদিন খিদিরপুর/ডকের অঞ্চলে
৮ + ৬
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায়/গরু খোঁজা করে"
৮ + ৬

কবিতায় গদ্য ছন্দের প্রয়োগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অতুলনীয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে গদ্য স্পন্দন, বিশেষ করে বাগ্‌ধারা, গাদ্যিক ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিপুণ হাতে ব্যবহার করায় তাঁর গদ্য ছন্দ প্রাণবন্ত ও স্পন্দময় হয়েছে। যেমন 'সুন্দর' কবিতায়—

এক, "যখন তোমার আঁচল/দম্‌কা হাওয়ায় একা একা/উড়ছিল
৯ + ১০ + ৩
তখনও নয়।
৫ + ০
বিকেলের পড়ন্ত রোদে/বিন্দু বিন্দু ঘাম
৯ + ৬
তোমার মুখে যখন/মুক্তোর মত জ্বলছিল
৮ + ৮
তখনও নয়"
৫ + ০

দুই, "ফুলকে দিয়ে ৪ + ০
মানুষ বড় বেশি/মিথ্যে বলায় বলেই
৭ + ৮
ফুলের ওপর/কোনোদিনই/আমার টান নেই।"
৬ + ৪ + ৬

এছাড়াও তাঁর কবিতায় অন্ত্যমিল হামেশাই চোখে পড়ে। অন্ত্যমিল তাঁর কবিতায় এনে দিয়েছে বাড়তি উত্তাপ, সজীবতা। মধ্যমিল সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। যেমন—

এক, "জাগুক আগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হু হু
মগজে প্রভূত দম্ভ, তবুতো
আহা উহু।" ('কাব্য জিজ্ঞাসা')

দুই, "দু চরণে বোনা যাব কি যাব না" ('কাছে দূরে')

তাঁর কবিতায় আরো কিছু অভিনব মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

"কী করে : শিকড়ে
শুনছি না : দক্ষিণা
মূর্তিসব : উৎসব
ইত্যাদি।

১১। অলংকার সৃষ্টিতে :

ছন্দের মতো অলংকার সৃষ্টিতেও কবি সুভাষ তাঁর কাব্যে যে যাদু দেখিয়েছেন তা বড় বিস্ময়ের! বিচিত্র অলংকারে সুসজ্জিত তাঁর কাব্য-কবিতা। যেমন—

ক) 'তোর রয়েছে সড়কি
আমাদের ভয় ডর কি?' ('বোনটি') অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার,

 'ছেঁড়া জুতোটায় ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে' ('রোমান্টিক') বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার,

 'ছেঁড়া জুতোটায় ফিতেটা বাঁধতে বাধতে
বেঁধে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে;' ('রোমান্টিক') শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার,

খ) 'লক্ষ্মী এলেন/রণ-পায়ে। ('লোকটা জানলই না') শ্লেষ অলংকার,

 'কাটে ফোড়ন আপনি মোড়ল/এক ভুঁইফোড় সোয়ামী' ('একটু পা চালিয়ে, ভাই') শ্লেষ অলংকার।

গ) 'বই যা ভারি, বইতে পারে একমাত্র গাধাই—' ('যা ইট্') যমক অলংকার,

ঘ) আগ্নেয়গিরি পাঠালে যে এই রাত্রি, /গলিত ধাতুরা জমাট কখন বাঁধবে?
('রোমান্টিক'), বক্রোক্তি অলংকার

 'আমার কাছে লঙ্কার গুঁড়ো/তোর রয়েছে সড়কি/আমাদের ভয় ডর কি?'
('বোনটি')বক্রোক্তি অলংকার,

ঙ) 'বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল' ('সুন্দর') উপমা, পূর্ণোপমা অলংকার,

 'বুড়োর মতো কাশতে কাশতে চলে গেল/একটা মালগাড়ি" (সন্ধ্যা) উপমা অলংকার,

চ) 'ব্যাং দেয় লাফ/স্মৃতির উঠোনে' ('বাঘ ডেকেছিল') রূপক অলংকার,

 'সংসার সমুদ্রে হালে পাইনাকো পানি' (আর্য) রূপক অলংকার,

 'উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকেছিল' ('সুন্দর') রূপক অলংকার,

ছ) 'মুখখানি যেন ভোরের শেফালী' ('কাছে দূরে') উৎপ্রেক্ষা অলংকার,

 'আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা' ('পারাপার') উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

জ) "ভোটপর্ব চুকে গেলে, চেয়েছেন যা যা
দেব সব। মাটি থেকে নিতে হবে খুঁটে" ('অর্থাৎ') ব্যাজস্তুতি অলংকার,

 "সাবাস বল্লবভাই! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক" ('দলভুক্ত') ব্যাজস্তুতি অলংকার

ঝ) "ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়" ('এদিকে') সমাসোক্তি অলংকার,

 "দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি' ('আমি আসছি') সমাসোক্তি অলংকার,

 'ঘৃণার হাতে মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা" ('মুখুজের সঙ্গে আলাপ') সমাসোক্তি অলংকার,

 'ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরছে," ('রোমান্টিক' সমাসোক্তি অলংকার, ইত্যাদি।

এছাড়া আরো বহু অলংকারে সমৃদ্ধ সুভাষের কবিতা, যা তাঁর শৈলীভাণ্ডারকে পূর্ণতা দিয়েছে।

১২। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে :

সত্যের পূজারী কবিগণ শব্দ দিয়ে জগৎ ও জীবনের চিত্র আঁকেন। আর এই চিত্ররূপ যখন কবির বাস্তব অভিজ্ঞতায় গভীর, সংহত ও ব্যঞ্জনাময় শিল্পকলাকে ব্যক্ত করে তখনই তাকে বলে চিত্রকল্প। চিত্র, প্রতীক, অলংকার প্রভৃতি সাহিত্যের মহৎ গুণগুলি আলাদাভাবে না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্রয় পায় চিত্রকল্পে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পদাতিক কবি, সময়ের ভাষ্যকর কবি। পথে চলতে চলতে দুচোখ ভরে তিনি সমাজের যেখানে যেখানে ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসংগতি-নির্যাতন দেখেছেন সেখানেই তাঁর নির্ভীক কলম গর্জে উঠেছে, কবিতাও প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছে। তাঁর জীবন-যন্ত্রণা ক্ষোভ সংহত চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে। সুভাষের কবিতায় যে পরিমাণে চিত্রকল্প রয়েছে তা গবেষণার বিষয়। এখানে সামান্য কয়েকটি তলে ধরা গেল—

ক) "কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
তুমি যখন হাসলে" ('সুন্দর')

খ) "মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র" ('সুন্দর')

গ) "বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনদিনই জানব না।" ('পোড়া শহরে')

ঘ) "বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলা বৃষ্টি ঝড়ে" ('বর্ষশেষ')

ঙ) "ঘোমটা সরিয়ে দেখে ভালোবাসা

জীবনের মুখ" ('কাণ্ড দেখ),

চ) "লালফিতের ফাঁসির দড়িতে
এখন সব কিছুই
জিভ বার করে ঝুলছে।" ('ছড়ানো ঘুঁটি')

ছ) "কারো বাপের সাধ্যি নেই
লাথি মেরে
আমাকে এই পৃথিবী থেকে হটায়।
আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম।
যতক্ষণ বরাবরের মত
মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার
একটা ভাল ব্যবস্থা না হচ্ছে
ততক্ষণ
মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও অমি বাঁচব।" ('এখন যাব না') প্রভৃতি।

শেষ কথা

শৈলী যদি হয় এমন এক নব নব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ধর্ম—যা শুধু সমকালীন কেন, চিরকালীন কবিদের মধ্যে কোনো কবি-শিল্পীকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় পৌঁছে দেয়, তাহলে দুর্দিনের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পরতে পরতে শৈলীর সেই নব নব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যধর্ম ধরা পড়েছে কতির শরীরে, সেই সঙ্গে নাম নির্বাচনে, নির্ভীক শব্দ চয়নে, সহজ-সরল জনমুখী বাক্যগঠনে, বিশেষণ ও শব্দ সৌন্দর্যের প্রতি দুর্নিবার টানে, ক্রিয়া বিশেষণের যথাযথ প্রয়োগে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ-প্রবাদ প্রবচন-প্রতীক ধর্মী শব্দের বহুল ব্যবহারে, কবিতা ও ছড়ার গঠন বৈশিষ্ট্যে, হাস্যরস ও কৌতুকরস সৃষ্টির নিপুণ দক্ষতায়, ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগ বৈচিত্রে, চিত্রকল্প সৃষ্টির অভিনবত্বে, বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের নৈপুন্য প্রভৃতির মাধ্যমে। তাঁর কবিতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বস্তুনিষ্ঠতা, রোমান্টিকতার বিরোধিতা; প্রেমহীনতা, অসহায়তা, ব্যঙ্গ প্রবণতা, বিদ্রোহ প্রভৃতি। তবে সুভাষ আশাহীন কবি নন, জীবনকে ভালোবেসেই তিনি শুরুতে ঘোষণা করলেন—"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য", আর পথ চলতে চলতে নৈরাশ্য থেকে আশার কক্ষপথে ঢুকে পদাতিক কবি বলে ওঠেন: "হিরণ্যগর্ভ দিন/হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে" ('এখন ভাবনা')। এখানেই পদাতিক কবির পথ চলার আনন্দ। এ আনন্দও এক মহাশৈলী, কাব্য শৈলী।

তথ্যসূত্র :

১। কবিতা সংগ্রহ (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড) —সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং
২। আধুনিক বাংলা কবিতার রূপ রেখা (১৯০১-২০০০)—অশোক কুমার মিশ্র ('দে'জ পাবলিশিং),
৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির—ড. জয়গোপাল মণ্ডল ('দে'জ পাবলিশিং)
৪। শৈলীবিজ্ঞান—ড. অপূর্বকুমার রায়,
৫। গদ্যরীতি পদ্যরীতি—ড. পবিত্র সরকার।

পদাতিক কবি সুভাষ : মননে-চিন্তনে

ড. মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

"তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়'। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনো আদর্শেই বিচার করি না, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়।"

('পদাতিক' কাব্য পাঠে কবি সুভাষ সম্পর্কে কবি বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য', 'কালের পুতুল')

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি প্রেম বা প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা লিখে কাব্যরচনা শুরু না করে দেশ, সমাজ ও মানুষের মূল্যবোধ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তিনি মানবাত্মার কবি, মানবপ্রেমের কবি, যৌবনমুখী কবি, জনতার কবি, জাতির কবি, মানবতার কবি। তিনি প্রকৃত পক্ষে মানবপ্রেমি ও জীবনপ্রেমি কবি বলেই মানুষকে সংঘবদ্ধতার দ্বারা শৃঙ্খল মোচনের কথা বলেছেন—

"ক্ষমা নেই—
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা
ত্রয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
ক্ষমা নেই—
এ আশ্বিন স্মৃতিভারাতুর।
কাঁধে কাঁধে সান্নিধ্যে দাঁড়াও
হাতে হাতে বস্ত্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও—
শঙ্খলের কলঙ্কমোচন।"

—আঘাত-বেদনা যন্ত্রণবিদ্ধ হলেও সংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি আশাবাদী। মানুষের অন্তরগত জীবনীশক্তিকে জাগিয়ে তুলে নবসূর্যোদয় দেখতে চেয়েছেন তিনি। 'ঘোষণা' কবিতায় তাই তিনি অকপটে বলেছেন—

"গঙ্গারজোয়ারে এসে লাগে
ভল্কার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।"

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য-কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এক বলিষ্ঠ কবিব্যক্তিত্ব।। তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী কবি নন, আবার রবীন্দ্রানুসারী কবিও নন। রবীন্দ্রকে স্বীকার ও স্বীকরণে তিনি এক স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিক্ষা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা। এক বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসে কাব্য-কবিতা রচনা করলেও আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে ও প্রকরণের মহিমায় তা শ্লোগান সর্বস্ব না হয়ে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁর কবিতায় সমগ্র মনুষ্য সমাজ্যের মুক্তির কথা বলেছেন। আর তিনি জেনেছিলেন সাম্য ও সংহতি ছাড়া তা সম্ভব নয়।

কবি সুভাষ খ্যাতি ও কবি বিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন 'পদাতিক' কাব্য রচনায়। 'পদাতিক' (১৯৪০) তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির কবিতাগুলি ১৯৩৮-৪০-এর সময়পর্বে রচনা। এই কাব্যের কবিতাগুলি প্রতি পদে পদে চমক লাগায়। এর রচনারীতি ও কলাকৌশলও অভিনব। নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনাই এই কাব্যের মূল লক্ষ্য। ভারত তথা বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী শোষণ-অত্যাচার-লাঞ্ছনার চিত্র এখানে অঙ্কিত। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ এখানে প্রকাশিত। কবি এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'মে দিনের কবিতা'তেই ঘোষণা করেছেন যুগীয় অরাজকতাময় পটভূমিতে হবে অত্যাচার—অনাচার-শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতি দূর করতে—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীলমদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।"

—স্পষ্টত এখানে কমিউনিজম মানসিকতার প্রকাশ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীতে সংহত ও সমবেত ঐক্যের কথা বিঘোষিত হয়েছে। এই বিশ্বাস কবিকে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। তাই তিনি বলেছেন—

"শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা।
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।" ('মে দিনের কবিতা')।

—বাংলা কবিতায় এইভাবে নজরুলের পরে বিদ্রোহী কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কবি সুভাষের কবিতায়।

এই কাব্যের কবিতাতেই কবি 'কমরেড' কে উদ্দেশ্য করে নবযুগের আহ্বান কামনা করেছেন।—

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"

—এখানে 'কমরেড', 'লাল উল্কি' প্রভৃতি স্পষ্টতই কবির কমিউনিজম মানসিকতারই প্রকাশ ঘটায়। 'কমরেড' সম্বোধনে কবি-মনের আত্মীয়ভাব প্রকটিত, 'নবযুগ' কথাটির মাধ্যমে কবির মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ সৃষ্টি ও আশাবাদী মানসিকতার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। 'জনযুদ্ধের গান' কবিতায় কবি আমাদের আত্মিক শক্তিকে প্রশংসিত করে মানসিক ইচ্ছেকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—

"আমরা নইতো ভীরুর জাত
দেবো নাকো হতে দেশ বেহাত,
আজকে না যদি হানি আঘাত
দুষবে ভারী সমাজ।"

—তাই কবি বিপন্ন দেশকে বাঁচাতে হয়ে ওঠেন দধীচি। বৃত্রাসুরকে বধ করতে দধাচি মুনির আত্মত্যাগের মতো কবিও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিপন্ন দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর—

"তবু তাই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার।"

কবির বিশ্বাস দেশের সমাপ্ত অত্যাচারিত-শোষিত-নিষ্পেষিত-বঞ্চিত মানুষ সমবেত ঐক্যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী হয়ে সৎগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুললে অবশ্যই আসবে 'কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও স্বস্তি—

"লাখো লাখো হাত এক হলে বলো
পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে
লাল ঝান্ডাকে?"

কবির কাছে সমকালীন বর্তমান খুবই তপ্ত ও রুক্ষ বলেই প্রেমের স্বপ্নের নীলিমার চেয়ে দেশের মানুষের মুক্তিকামনাই কাম্য হয়ে উঠেছে বেশি—

"আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি?
ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—

আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী!
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।"

তবে প্রেমকে তিনি অস্বীকার করেননি কখনো; বরং প্রেমের প্রত্যাশীও। তাই তিনি বলেছেন—

"অস্ত্র মেলেনি এতদিন, তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিল তীর ধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলব, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়!'
চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান।" ('প্রস্তাব')

—এই শোষোক্ত উক্তিটি অবশ্যই প্রেমের দিকেই দৃষ্টি ফেরানোকেই ইঙ্গিত করে।

তবে কবি সুভাষের কবিতায় প্রথমাবধি দ্বিধাহীনচিত্তে স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কৃষক-শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর মানুষের বৈপ্লবিক শক্তির বন্দনা। এই কথা ও মানসিকতাই তাঁর কবিব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

কবি সুভাষের জীবনবোধের বলিষ্ঠতা ও নির্দ্বন্দ্ব মনোভাব ছিল বলেই এমন কথা সোচ্চারে বলতে পেরেছেন। নির্দ্বিধায় তিনি রোমান্টিক কাব্যদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মধ্যে কোনো দোলাচল-চিত্তবৃত্তি ছিল না। তাঁর 'পদাতিক'-এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে জীবনের জটিল স্বরূপ বুদ্ধির আলোকে উপলব্ধি করা। এই কাব্যে কবিতাগুলি সরল ভাষায় চড়া গলায় কবিতা। কবিত্বশক্তিও বেশ পরিণত।

কবি সুভাষের কাছে, রাজনীতি এসেছে জীবনের তাগিতে। আর তাকে কবিতা করে তুলেছেন শিল্পীমনের মাধুরী দিয়ে। তিনি কোনোরকমের প্রতিকূলকতায় বিচলিত হননি। তাই নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিল্পীর কর্তব্যবোধে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

'আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ।"

মহৎ স্বদেশপ্রীতিই তাঁর জীবন ও কাব্যের মূল বিশেষত্ব। দেশপ্রেমের গভীরতার জন্যই তিনি দেশ ও জাতির মুক্তির কামনা করেছেন আজীবন। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য তিনি গর্ব অনুবভ করেন—

"এ দেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে

হিমাচল,
কন্যাকুমারিকা।"

মানবদরদী জীবনপ্রেমি কবি সুভাষ আদর্শের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মানুষের সমর্থনে লালঝাণ্ডা নিয়ে লড়েছেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেছেন ঐ রাজনৈতিক দলের আদর্শচ্যুতি, মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন, তখন তাঁর বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে এবং তৎক্ষণাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও তিনি প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি; এমনকি শেষে পার্টির সংস্রব থেকে সরে আসতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর স্পষ্টোক্তি—

"আমার হাতে তো কুষ্ঠ হয়নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো করে রাখব!" ('দুয়ো')।

তাই দ্বিতীয়বারের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেছেন—

"তুলছি চাঁদা
বলছি, দাদা
মুক্ত কণ্ঠে—
সামলে চাম্‌ড়া
আছি আমরা
যুক্তফ্রন্টে।
করছি রফা
বত্রিশ দফা
কারণ উহ্য।
কথার ঝুড়ি
যাঁর নেই জুড়ি—
তিনিই পূজ্য।" ('কথার ঝুড়ি' 'একটু পা চালিয়ে ভাই')।

—পার্টি যে কোন্ পথে এবং কিভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তা তিনি বলছে দ্বিধা করেননি।

সবচেয়ে বড়ো কথা কবি সুভাষ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে পার্টি ত্যাগ করেননি। পার্টির আদর্শগত ত্রুটি, এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ দেখে তিনি মানবকল্যারের পক্ষাবলম্বন করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ঘোরতর প্রতিবাদও করেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও পার্টির শীর্ষনেতৃত্বকে আদর্শের পথে ফেরাতে পারেননি বলেই তিনি পার্টি ত্যাগ করেছিলেন এবং পার্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যঙ্গ-শ্লেষে বিদ্ধ করে সংশোধনেও কম চেষ্টা করেননি। পার্টির চেয়ে উর্দ্ধে ছিল তাঁর কবিমন, মানপ্রেম, জীবনপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশমুক্তি এবার দু' একটি কবিতার বিশ্লেষণে সুভাষ-প্রতিভাকে তুলে ধরা যাক।

কবি সুভাষ যে রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন না এবং রবীন্দ্রনাসুরীও ছিলেন না, বরং রবীন্দ্র-স্বীকরণে ও আত্মীকরণে রবীন্দ্রনাথকে মহৎ ও মহান করে তুলে নিজস্ব প্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে "পদাতিক' কারে বধূ কবিতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতা অবলম্বনে 'বধূ' কবিতা লিখলেও স্বতন্ত্র স্বাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও এক গ্রামের মেয়ের শহুরের বধূ হয়ে আসার মর্মন্তুদ মানসিক চিত্র এঁকেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের বধূটি শহরে পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছে, গ্রামের প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি সহজাত অকৃত্রিম ধান তুলতে পারছেনা, অহস্য হয়ে উঠছে; সেখানে কবি সুভাষ দেখিয়েছেন বধূটি ধীরে ধীরে শহুরে পরিবেশ মেনে নিয়ে জীবনকে বরণ করে নিয়েছে। এখানেই কবি সুভাষের কৃতিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য।

কবি দেখিয়েছেন শহরে বধূ হয়ে আসা গ্রামের মেয়েটির মনের গোপন তলে স্মৃতি হয়ে আছে নিভৃত পল্লী-প্রকৃতি। তার সারাদিনের অবসর বলতে কলসী কাঁখে শহরের গলিপথে জলের ফলে জল ভরতে যাওয়া। শুধু সেই সময়টুকুই তার একান্ত নিভৃত অবসর। পড়ন্ত বেলায় গলির পথে ফেরিওয়ালার ক্লান্ত সুর, রেডিওর করুণ রাগের আলাপ, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সে মানিয়ে নিয়েছে। তবুও চলতে চলতে হঠাৎ তার হৃদয়ে জেগে ওঠে গ্রামের অনাবিল জীবন, খাসা স্মৃতি। তবে সে বুঝেছে গ্রামের দিঘীর কালো জল, বনের নিবিড় ঘন ছায়া, দিঘীতে ছিপ ফেলে কাৎলা মাছ ধরার মহানন্দ প্রভৃতি মাধুর্য শহরের মানুষের কাছে আশা করা বৃথা।

কবি দেখিয়েছেন শহরের বাড়িগুলি মস্ত বড় বড়। এই ইট পাথরের বাড়ির ভিতরকার মানুষগুলিও যেন পাষাণকায়া-নির্মম ও হৃদয়হীন, এখানে বিনা মাশুলে কিছুই হয় না—সবকিছুই তেজারতির মূল্যেই বিবেচিত। এখানে চাঁদের সৌন্দর্য মূল্যহীন। পেশোয়ারী দারোয়ানের শ্যেনদৃষ্টি প্রভৃতি নীরবে অবরুদ্ধ হয়ে যাকে বধূটির নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা। প্রিয়তমা স্বামী কাছে থাকলে হয়তো তার এই যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হতো।

কিন্তু তার স্বামী সারাদিন থাকে বাইরে; বহু লোকজন তার দিকে উঁকি মারে। একান্ত নিঃসঙ্গতা অনুভব করে সে। আর তখনই গ্রামের প্রকৃতি তাকে করে তোলে স্মৃতিভারাতুর। তার মনে হয়—

"সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
লোকের কোলে মরণ যেন ভালা।"

তার মনে হয়েচে মরণই যেন তাকে লোকনিন্দা ও শহুরে কষাইখানার দুর্বহ-দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেনি। প্রতিকূল পরিবেশকেও মেনে ও মানিয়ে নিয়ে সে শহরের তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতায় আত্মহত্যার চিন্তার মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু কবি সুভাষ তা করেননি। তাঁর এ কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বধূটির কলসি কাঁধে ফের শহরের রাস্তার কল থেকে জল

আসতে যাওয়ার মাধ্যমে। এখানেই কবি সুভাষের 'বধূ' কবিতার এক স্বতন্ত্র ও অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

কবি সুভাষ এখানে কবিতার শুরুতেই এক নাগরিক জীবনের চিত্র এঁকে পল্লিজীবনের প্রকৃতির সৌন্দর্য-অনুভূতিকে নাগরিক জীবনের কঠিন বাস্তবে সঙ্গে ধ্বস্ত হতে দেখিয়েছেন। কবি এখানে খণ্ড খণ্ড শহুরে চিত্রে পল্লিবাংলার বাস্তবচিত্র ও জীবনচিত্র এঁকেছেন। কবি সুভাষ দেখাতে চেয়েছেন যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক নাগরায়ণ, আধুনিক যুগের নাগরিক বধূ কখনোই রবীন্দ্রনাথের বধূর মতো শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাবে না। নগরায়ণকেই মেনে নিয়ে সে জীবনকে গড়ে তুলতে চাইবে। 'বধূ' কবিতার মধ্যে তিনি তা-ই দেখাতে চেয়েছেন।

এইভাবে রবীন্দ্র-বিষয় ও ভাবনাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে কবি সুভাষের সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র। এখানে সুভাষের কালের সময়, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার না করে রবীন্দ্র-ভাব ও বিষয়কে স্বীকরণে ও আত্মীকরণে এবং স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে কবি সুভাষ যে স্বাতন্ত্র্য এই কবিতাটিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিরপদাতিক কবি সুভাষ

রিজওয়ানা নাসিরা

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য কবিতার জগতে এক জটিল ও কনিষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। যুগ চেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন তাঁর কবিতার অণুতে রেণুতে প্রতিধ্বনিত। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের শেষ দিকে, চল্লিশের শুরুতে যখন রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির প্রশংসাধন্য রাশিয়াজয়ী কমিউনিজম এদেশে নবীন আগন্তুক, তখন শিক্ষিত উদারপ্রাণ যুবক সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানবপ্রেমের সঞ্জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সুকান্ত, দীনেশ দাস, অরুণ মিত্র, সুভাষ একই পথের পথিক হলেও জনমনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন কবি সুকান্ত আর সুভাষ।

১৯১৯ খ্রীঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। তিরিশের-চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশ, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ১৯৭৭ এ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট রাজের প্রতিষ্ঠা, অথচ সুভাষের স্বপ্নস্বর্গ রচিত না হওয়া প্রভৃতি তাঁর কাব্য কবিতার পটভূমি। তাঁর অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিখা তাঁর কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের বৃত্ত থেকে অন্য এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। তাঁর বোধগত আন্তরিকতা ও প্রকাশগত কৌশল তাঁকে বাংলা কবিতার জগতে চিরস্থায়ী আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তিনি এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলেও গভীর আন্তরিকতার ঐশ্বর্যেই তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলি শ্লোগান সর্বস্বতায় পর্যবসিত না হয়ে কবিতার সার্থক ও রসোত্তীর্ণ মূর্তিতে পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে। তিনিই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম কবি যিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ঃ—

"তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী, তাঁর মুক্তি কামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতা নির্বাচিত মনীষী সম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই জন্য, সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।" (কালের পুতুল)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা হাজার জনের দিকে মেলে দেওয়া ভালবাসারই তীব্র সংগ্রামময় কাব্য, তিনি তাঁর হৃদয়কে মেলে ধরেছিলেন বৃহত্তর মানব সমাজের দিকে, যেখানে নিয়ত দুঃখ সংঘর্ষের বেদনায় জন্ম নিচ্ছে আগামীকালের ইতিহাস। তাঁর কবিতার সমস্ত মাধুর্য যেন নিহিত আছে তাঁর অভিজ্ঞতার আহরণ ও প্রকাশ-বেদনার আন্তরিকতায়। তিনি মনে করতেন—মানবতা ও দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি পৃথক

Vol. IV Issue-VIII / ISSN : 2394-4889

নয়। তাই আকাশের চাঁদ তাঁকে হাতছানি দিতে পারে নি; কারণ, "ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া"। তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন, ভেবেছেন কৃষক-শ্রমিকের কথা। তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহসী মতাদর্শ পথ চলার প্রেরণা দিয়েছে তাঁকে।

সমকালীন নৈরাশ্য-হতাশা তাঁর কবিতায় আছে, আছে স্বপ্নভঙ্গের বিষাদগাথা। তবে তাঁর কবিতার মূল সুর আশাবাদ। গভীর দুঃখ, অসহ লাঞ্ছনা, অপরিসীম নৈরাশ্যের ভাঙন ধরা উপকূলে দাঁড়িয়েও তিনি আশা করেছেন এ নদীতে আসবে প্রশান্তির জোয়ার, আনন্দের জ্যোৎস্না চুম্বন করে যাবে এর স্থির জলরাশি, প্রাণশক্তির অফুরাণ প্রাচুর্য তাঁর পারিপার্শে জ্বালিয়ে দেবে নির্বাণহীন যৌবনশিখা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বহু কাব্য রচনা করেছেন—'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকূট' (১৯৫০), 'যত দূরে যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে', 'যা রে কাগজের নৌকা', 'হাফিজের কবিতা', 'দিন আসবে', 'নাজিম হিকমতের কবিতা', 'রোদ উঠেছে চলো যাই' (১৯৮১), চইচই চইচই (১৯৮৩) ইত্যাদি। 'যত দূরেই যাই' কাব্য গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরষ্কার পান। 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৩৯-এ সুভাষের প্রথম কবিতা 'আলাপ' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। এখানে তিনি আত্মপরিহাসে শ্রমিকদের পাড়ায় কাব্য খোঁজাকে কটাক্ষ করেছেন।

সুভাষের প্রথম কাব্য 'পদাতিক' (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৪০) তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। এই কাব্যেই তিনি পেয়েছেন খ্যাতি ও কবির স্বীকৃতি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বে এই কাব্যে তিনি এনেছেন নতুনত্বের চমক। শ্লোগানকে যে শ্লোক করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন এই কাব্যে। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—

"....এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালী কবির হাতেও কবিতা তার শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।"

("কবিতা" পত্রিকা, পৌষ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)।

"কালের পুতুল" গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু 'পদাতিক' ও 'পদাতিক—কবি' সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন— "....তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনো আদর্শই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়।

".... তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিল।

দ্বিতীয়, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই আসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষনীয় বস্তু আছে ব'লে মনে করি।..." ("কালের পুতুল")

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত জীবনপ্রেমিক মানবাত্মার প্রতিভু বলেই 'পদাতিক' কাব্যে 'কলের গান' কবিতায় নির্দ্বিধায় উচ্চকণ্ঠে বলেছেন—

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"

—কবি এখানে 'নবযুগ' কথাটির মাধ্যমে আশাবাদী জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি জীবনপ্রেমিক ও মানবপ্রেমী ছিলেন বলেই যেখানে অন্যায় অত্যাচার, মানবাত্মার শৃঙ্খলিত রূপ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি হু-হুংকারে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। 'পদাতিক', অগ্নিকোণ' ও 'চিরকুট' কাব্যে তাঁর জোরালো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন মূলতঃ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই। এই কাব্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চেতনার যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েও তীব্র শ্লেষ-বিদ্রুপ ও বক্রোক্তিতে অবক্ষয়িত সমাজকে তুলে ধরেছেন।

'পদাতিক' কাব্যে প্রথম কবিতাতেই রয়েছে উদ্ধত বন্ধনহীন যৌবনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। 'মে দিনের কবিতা'য় মানুষকে তিনি সচেতন করার জন্য বলেছেন—"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।" বলেছেন—ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ তার বৃথা ক্রন্দনে কালক্ষেপ করা উচিত নয়—

"শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"

'চাঁদ' সম্পর্কে সমস্ত রোমাণ্টিক চেতনাকে ভেঙে দিতেই যেন তিনি উচ্চারণ করেছেন—"বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী"

কিংবা—"চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি,"

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি প্রার্থনাই কবির একমাত্র লক্ষ্য।

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিরকূট'-এ ১৯৪১-'৪৬-এর সমকালীন পৃথিবী আর নিজের দেশের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা, আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর পদ্ধতি পটভূমি এই কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কবির অভিজ্ঞতা অনেক সুস্থির, বিশ্বাসের দীপ্তিতে কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো বিদ্রুপে-ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ, কখনো বা আবেগে-ব্যথায় বিধুর। তাই তাঁর এগিয়ে চলার গান বিপ্লবের সম্ভাবনায় সংহত। শ্লেষে, বিদ্রেপে ও উদ্দীপনায় তাঁর কবিতার দীপ্তি উজ্জ্বল-শানিত। এই কাব্যের নাম কবিতা 'চিরকূট'-এ মন্বন্তরের উত্তপ্ত চিত্র বলিষ্ঠ ভাষায় ফুটে উঠেছে—

"পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখনু
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।"

'চিরকূট' কাব্যেই কবি সংগ্রামী মূর্তি ধারণ করেছেন। এই কাব্যে তিনি 'একটি পৃথিবী গড়ার' স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই কাব্যে তাঁর দ্বন্দ্ববিরোধের রূপটি আরও স্পষ্ট হয়েছে। এই কাব্যের সব কবিতাই কাব্যোত্তীর্ণ না হলেও কবির প্রকরণ-কলা অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকতায় পৌঁছেছে।

'অগ্নিকোণ'-এ কবি সুভাষের রাজনৈতিক চেতনার চূড়ান্ত উত্তরণ ঘটেছে। এই কাব্যটি মাত্র ছয়টি কবিতার সংকলন। এই কাব্যের প্রথম কবিতা নাম-কবিতা 'অগ্নিকোণ'-এ কবি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণ অভ্যুত্থানকে কাব্যরূপ প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। এই কাব্যের 'মিছিলের মুখ' কবিতার কবির প্রেমভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তবে এই দেহিক আকর্ষণ-সঞ্জাত নয়, এ প্রেম মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেম। এই প্রেম উদ্দীপনা সঞ্চারী, নবনব কর্মে প্রেরণাদাত্রী। এই কাব্যের 'জবাব চাই' কবিতায় শোষকের কাছে কবির প্রশ্ন—

" দুশো বছরে রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা!"

'ময়দানে চলো' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।"—এখানে 'দুশোবছর' বলতে কবি ব্রিটিশ শাসনকালকে এবং 'পশুরাজ' বলতে ব্রিটিশ সিংহরাজের আসনকেই বুঝিয়েছেন।

'ফুল ফুটুক' কাব্যে এসে সমাজবাদী কবি ব্যক্তিগত প্রেমের দাবীকে সর্বজনীনতা দিয়েছেন। অশান্তি—অত্যাচারের দুঃস্বপ্নকে সরিয়ে কবি আনতে চেয়েছেন 'দূরন্ত দুর্নিবার শান্তি।' এই কাব্যে তিনি হয়েই উঠেছেন এক গভীর প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি। 'ফুল ফুটুক' নামকরণের মধ্যেই কবির দিক পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট। এই কাব্যের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতা 'কালো কুচ্ছিত' মেয়েটি বিখ্যাত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে।

'ফুল ফুটুক'-এর কবিতাগুলি ১৯৫১-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। কবিতাগুলি জীবনানুরাগের উচ্চারণে প্রদীপ্ত। জীবনকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কবি এখানে। রাজনৈতিক প্রচার তথা শ্লোগানধর্মিতা থেকে সুভাষ বিবর্তিত হয়েছিলেন এক উদার মানবিকতা এবং কবিতার শিল্প-প্রকরণের প্রতি সযত্ন আসক্তিতে।

'যত দূরে যাই' কাব্যে কবি সুভাষ যথার্থ কাব্য শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি গদ্যকবিতার ঢঙে রচিত হলেও কাব্যগুণের কোনো অভাব ঘটেনি। কবিতাগুলি অনেকটা কাহিনীধর্মী—রূপকথা বা ছোটগল্পের আঙ্গিকে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তা একাব্য সুষস্পষ্টভাবেই কবির বাঁক বদলের বাক্য। উপমা ও চিত্রকল্প

নির্মাণে কবি এখানে সার্থকতার পরিচয় রেখেছেন। এই সংকলনটি সমাজবোধের সচেতনতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে নৈরাশ্যবোধের কোনো প্রশ্রয় নেই। এই কাব্যে তাঁর শিল্প-প্রকরণে বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'কাল মধুমাস', 'এই ভাই', 'ছেলে গেছে বনে' ইত্যাদি কাব্যে কবি মনোজগতের ক্রমিক উন্মোচন ঘটেছে। এখানে জাতকে তিনি দেখেছেন সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টির মননশীল আলোকে। 'কাল মধুমাস'-এ কবি অনলংকৃত ভাষায় তাঁর কাব্যশক্তি প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ভাষাও প্রয়োগ করেছেন। এর নাম-কবিতায় কবি মুক্তবদ্ধ মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে তাঁর আত্মজীবনীর বাহন করেছেন। দীর্ঘদিন পরে তাঁর এই পদ্যছন্দে প্রত্যাবর্তন তাঁর কাব্যলোকে নতুন রীতি সূচনা করেছে। নাম-কবিতা 'কাল মধুমাস' জীবনানুগ ও ঋজুভাষণে অনবদ্য।

'এস ভাই' গ্রন্থে দেখা যায় কবির অসাধারণ আত্মসমালোচনা

"আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি।" ('ভাল লাগছে না')।

'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যে কবি নিজের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন।

কুলী, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক সবার কথাই সুভাষের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে অনিবার্য পার্টি লাইন রক্ষার তাগিদে। কিন্তু শহুরে মানুষ সুভাষ কৃষক এবং শ্রমিকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন নিজ হৃদয়ের তাগিদে। তাই শ্রমিকের সঙ্গে ময়দানে গিয়ে ধর্মঘটের সামিল হতে পারেন; উদাত্তকণ্ঠে অনায়াসে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলতে পারেন–

'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে।"
—সুভাষের কবিতার এখানেই সিদ্ধি, এখানেই সমৃদ্ধি।

আধুনিকতার চোরাবালি থেকে প্রগতিশীলতার দিকে বাংলা কবিতার যাত্রা পথে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ কবিব্যক্তিত্ব। কেননা, তাঁর কাছে, রাজনীতি এসেছে জীবনের তাগিদে, কবিতায় মার্কসীয় দর্শনের উপস্থিতিও জীবনকে মেনে নিয়ে। তাই অন্য কবিরা যখন অবক্ষয় আর ভাঙনের ছবি আঁকতে ব্যস্ত, তখন তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যুদ্ধের সজ্জা পরবার আবেদন জানালেন, আধুনিক বাংলা কবিতার শক্তিশালী ধারার যে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ এ বিষয়ে সংশয় নেই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ভাষা নবীন শক্তিতে রূপায়িত, তাঁর সাংকেতিক ব্যবহার অনেক প্রদীপ্ত, নাটকীয় প্রয়োগকথা অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদী। তাঁর কবিতা তাঁর ফসল, তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, যেতে যেতে তাঁর দেখা হয় পায়ে ঘুঙুর বাঁধা নদীর সঙ্গে যার উড়ু উড়ু ঢেউয়ে কবি আর এক দিগন্ত প্রত্যাশী। কবি ভেবেছেন সাধারণ মানুষের কথা, কৃষক শ্রমিক মজুরের কথা তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহসী মতাদর্শ পথ চলার প্রেরণা দান করেছিল তাঁকে। তাঁর সাহিত্যিক মতাদর্শ সম্বন্ধে তিনি নিজেই যে কথা বলেছেন তা উল্লেখ করে সমাপ্তিরেখা টানা গেল।

"সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে—যা কিছু সংঘাত সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা—খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে ১৯১৯ খ্রীঃ। তাঁর শৈশবকাল কেটেছে উত্তর কলকাতায়। পরে তিন-চার বছর বয়সে বাবার কর্মস্থল রাজশাহি জেলায় নওগাঁতে দশ-এগারো বছর পর্যন্ত কাটে। তাঁর কবিতার ভূমি ও ভাষা নির্মাণে এই নওগাঁর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কলকাতার ভাষাও তাঁর যথার্থ আয়ত্ত ছিল। তাঁর মা যামিনী দেবী ছিলেন কৃষ্ণনগরের সুমিষ্ঠ ভাষাভঙ্গির অধিকারিণী। তাই তাঁর লেখার মধ্যে কখনো আবার কৃষ্ণনগরীয় ভাষা বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতার প্রাণরস এসেছে নওগাঁর বিচিত্র বিমিশ্র জীবনযাত্রায় উপলব্ধ ভাষা থেকে।

কবি সুভাষ প্রথমাবধি মুখ্যত সমকালীন জীবনের কবি, সমাজবোধের কবি, মানবতাবাদী কবি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে তিনি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার আলোক ভাষায় ধরে রেখেছেন। তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, মানুষের সহযাত্রী। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভয়ে-পরাজয়ের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী। সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর কাব্যভাষা। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে একসময় সরে এলেও তাঁর প্রগতিশীল মনের গতি একটুও মন্থর হয়নি। সার্বভৌম হিতৈষণা ও মানবিকতাবোধের চরমে উত্তরিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি শুধু 'পদাতিক' কবি নন, চির পদাতিক কবি—শুধু এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আবিষ্কারের কাজ শুরু হোক

মলয় দাশগুপ্ত

পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে গাল-গলা আচ্ছন্ন করে চোখে জল এসে যায়। সে বাষ্প সরাতে সরাতে যতই বয়সের দোষ দিই না কেন, মনের আড়ালে আর একটা মন কিন্তু বলে চলে অন্য কথা।

পড়ছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কমরেড কথা কও'। চোখে জল আসার ব্যাপারটা ঘটে এ জায়গায়—'সেদিন যখন ও কাজে বেরোবে, তখন কী মনে করে পানের বোঁটায় বেশ খানিকটা চুন নেয়। তারপর ঘর বন্ধ করে দরজার গায়ে সেই চুন দিয়ে তিনটে দাড়ি কাটে।

একমাত্র মাধবের মা ছাড়া আর কারও সাধ্যি নেই ওই তিনটে দাঁড়ির মর্মোদ্ধার করে।

আর পারত ভাইসাহেব,
তিন শহিদের জন্যে তিনটে দাঁড়ি।
একটা মাধবের বাবার জন্যে।
একটা মাধবের জন্যে।
শেষেরটা কার?
ভাই সাহেবের।

একেই বলে বোকার মরণ। ভাইসাহেব আবার শহিদ হল কবে? কেউ তো বলেনি।'

অবাধ্য অশ্রু নয়, অশ্রুর অন্বয় পাঠককে অকস্মাৎ অন্য এক অনুরূপ ঘটনার স্মৃতিতে নিয়ে যায় :

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক মিছিল লেখা হয়েছে। কালান্তর পত্রিকার দপ্তরে, দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরে রাত দুপুরেই গল্পটি পাঠ করা হয়। এমন ঠিক মনে পড়ছে না দীপেন্দ্রনাথ নিজেই পাঠ করেছিলেন না অন্য কেউ। সম্ভবত দীপেন্দ্রনাথ নিজেই। শ্রোতারা সকলেই কালান্তর পত্রিকার লেখক কর্মী, নিবেদিত কমিউনিস্ট সদস্য। গল্প পড়া হচ্ছে, একের পর এক বিস্ময়কর সত্য উন্মোচিত হতে হতে জীবনের এক অমোঘ জিজ্ঞাসার দিকে এগোচ্ছে। আমরা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেছিলাম, কেঁদে ফেলে বিব্রত। সে গল্পে কোন্ কোন্ জায়গা চোখের পানি শুকোতে দেয়নি তা আর আজ বলা সম্ভব নয়, হয়তো এই অংশটি, হয়তো না, কিন্তু চোখ যে ভিজেছিল তাতে সন্দেহ নেই : '...পারুল একে একে তার সম্পত্তি বার করতে লাগল। মায়ের কড়ির ঝাঁপি, বাবার ছেঁড়া শাল, শাড়ির গোটানো পাড়, বাচ্চাদের কানকাটা টুপি, সাদা হয়ে আসা গোটা কতক তামাক পাতা, বিবর্ণ আর ভাঁজের জায়গাগুলোয় ট্রেসিং পেপার লাগানো 'পিপলস এজ' পত্রিকার একটি সংখ্যা যাতে

তরুণ বয়সে বিনয়ভূষণের ছবি বেরিয়েছিল, ওই সময়েই প্রকাশিত বিনয়ভূষণের একমাত্র কবিতাপুস্তিকা যার উৎসর্গপত্রে পারুলের নাম ছাপা আছে, পার্টির নানা সময়ের ছাপা কয়েকটি ইশতেহার—লেখকের নাম না থাকলেও আসলে যা বিনয়ভূষণের রচনা, প্রথম পরিচয়ের পর পারুলকে লেখা বিনয়ভূষণের কতগুলো চিঠি—প্রায় যক্ষ্মিণীর মতো পারুল যা পুলিশের থাবা থেকে রক্ষা করেছে, একটা লাল ঝাণ্ডা....

মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর হয়ে গেল। বিনয়ভূষণ বললেন, 'জানিসই তো হাজার বিপদের মধ্যে তোদের মা কী কষ্টে, খেয়ে না খেয়ে, তোদের মানুষ করেছে। কত সময় এটা ওঠা চেয়েছিল। দিতে পারিনি, খুব একটা চাইওনি দিতে। শুধু অপেক্ষা করেছি, এমন একটা দিনের জন্য। এই পতাকা, মনে রাখিস—কমরেড অজয়কে আমার উপহার।'

বিনয়ভূষণ পারুলের মুখে সেই হাসি দেখলেন যা শতাব্দীতে একবার চোখে পড়ে। বললেন, 'হ্যাঁ, অপেক্ষা রইল আরও একটা দিনের জন্য। যদি সেদিন না থাকি, তা হলে বিজুকে আমার উপহার দেবে পারুল, বিকল্পে অজু।'

মনের আড়ালে যে মনটা সক্রিয় হয়ে ঠিক তিরিশ বছর আগে পরের দুই উপন্যাস পাঠককে' চোখে জলের একাকারে মিলিয়ে দিল সেই মনকে প্রশ্ন করে যা জেনেছি তা এ রকম : একই সময়ের রাজনৈতিক জীবনকে নায়ক করে লেখা সমধর্মী দুই লেখিকার রচনা তাঁদের কাঁদাবেই যাঁরা এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গ্রহণ করেছে। আর মহাকাব্যের চারণ এই লেখকরাও এই একই অন্তরের প্রেরণায় নিজেদের 'কমিটমেন্ট'-কে কাগজে-কলমে ধরে রেখে গিয়েছেন। একে সময়ের দলিল বলো তো দলিল, পার্টি আর আন্দোলনকে ভালবাসা বলো তো ভালবাসা, লেখকের দায়বদ্ধতা বলো তো দায়বদ্ধতা।

এবং গোপাল হালদারের 'একদা, অন্যদিন আর একদিন'-এর পাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'হাংরাস','কে কোথায় যায়', 'কমরেড কথা কও' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোক মিছিল', 'বিবাহ বার্ষিকী'-কে রাখলে বাংলা সাহিত্যে যে এক বিশেষ মহার্ঘ বৃত্তের সূচনা হয়, এ কথা কে অস্বীকার করবে?

ব্যক্তিগত বাষ্পোচ্ছ্বাসকে সরিয়ে এবার অন্য কিছু কথায় আসা যাক। যাঁরা তাঁকে পছন্দ করেন এবং যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা আছে যে, সাধারণের মুখের কথায় কাব্যচর্চা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা ঘুচিয়ে জনগণের সহজবোধ্য হয়েছে। পাঠক কবিতা পাঠের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। তখন একে প্রশস্তিবাক্য বা প্রশংসা বলে মনে হলেও কাব্য পাঠের ক্ষেত্রে অগভীর মনোযোগ এবং অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির মিশেল ছাড়া কিছুই বলা যায় না। প্রথম কথা, কবিতার ভালো বা মন্দত্ব, দুর্বোধ্যতা বা সুবোধ্যতার ওপর নির্ভর করে না। কবিতা হয় ভালো, নয় মন্দ হয়। হয় কবিতা হয় নতুবা হয় না। এবং এই কথাটি তো ধ্রুব সত্য যে কবিতা নাম দিয়ে যা কিছু লেখা হয় তার সবই কবিতা নয়, 'কেহ কবি' কথাটিই

সত্য। এই কথার আলোকে আমরা যখন বলি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তখন আর তাঁর ভাষা ও বাক্‌রীতির ব্যবহারের সর্বজনগামিতা কোনও 'পয়েন্ট' হতে পারে না। বরং কবির কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে এই ভ্রান্ত পল্লবগ্রাহী ধারণা মানুষকে বিভ্রান্তই করে। এবং এরই সুযোগে কবিতা বিষয়ে অজ্ঞ কিছু কিছু মানুষ এমন একটা ভাব দেখাতে সাহস পান যে ইচ্ছে হলে ওরকম কবিতা যে কেউ, এমনকী তিনিও লিখতে পারেন। ভাগ্যি ভালো যে এঁদের ইচ্ছেতে ঘাটতি থাকে, নইলে মৃত্যুর পরেও এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়তে হতো কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে।

বাংলা কাব্যে অন্য কাব্যরীতির, অননুকরণীয় কাব্য-শরীর নির্মিতির ক্ষমতা যাঁর হাতের মুঠোয় ছিল, কবিতা রচনায় উৎকর্ষত শীর্ষে উঠে গিয়েও যে কোনও পাঠকের কাঁধে হাত রেখে যিনি কথা বলতে পারতেন তাঁকে, তাঁর কবিতাকে বোঝার জন্য যে মেধাবী চর্চার প্রয়োজন তা শুরু হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় যে দুই কবিকে পাশাপাশি রেখে অনেকেই 'জয়েন্ট ফার্স্ট প্রাইজ' দেবার কথা ভাবেন তাঁদের একজন জীবনানন্দ দাশকে দিয়ে প্রকৃত চর্চা তাঁর মৃত্যুর পরেই শুরু হয়। জীবনানন্দের জীবিত কালে বরং তাঁকে না বুঝতে পারা মানুষের সংখ্যাই অধিক ছিল। অনেক কুয়াশা সরিয়েই তাঁকে কাব্যভাষা ব্যবহার নিয়ে অসহিষ্ণু কবি পাঠক যখন আলগা কথা বলতে দ্বিধা করেন না, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চর্চার নিবিড়তায় কোনও না কোনও জায়গায় ফাঁক থেকে গিয়েছে।

এই ফাঁক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা পাঠ সম্পর্কে আরও আরও বেশি। অথচ মনস্ক পাঠক দেখবেন, পদাতিক এর প্রথম কবিতাটি থেকে আজ পর্যন্ত তিনি যা কিছু লিখেছেন তার একটি শব্দ বা বাক্যও অসচেতনভাবে লেখা নয়। প্রতিটি শব্দ প্রয়োগের আগে যে সলতে পাকানোর ব্যাপারটা থাকে, না থাকলে কবিতা কবিতা হয় না, গদ্য হয়না গদ্য সে বিষয়টি যেন পাঠকের চোখ না এড়ায়। আর সেই চোখ এড়ানোটা যখন পাঠকের অভ্যাসে পরিণত হয় তখন্য তিনি 'ভাট' বকতে শুরু করেন। রবীন্দ্র পরবর্তী অপর সেরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা নিয়েও এই বকা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সমাজে কঙ্কে পাওয়া লোকেরা যখন এসব বলেন বা লেখেন তখন বিপদটা আরও বড় হয়েই আসে।

প্রসঙ্গত বলি, মেরুকরণের লাইনে যাঁরা ঢুকে পড়েছেন তাঁদের দলে আমি নই। আসলে মেরু-বোধেরও তো এলেম থাকা চাই। সে এলেম সকলের থাকে না স্বীকার করে নিয়েই পুনরায় ভাষা বিষয়কে কিছু চমৎকারিত্বের উল্লেখ করতে চাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু কবিতার পংক্তি উল্লেখ করে। পদাতিক-এর দ্বিতীয় কবিতাটির একটি পংক্তি, কতবার কত পাঠকের কণ্ঠে স্থান পেয়েছে, 'চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ', সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন এই 'শঙ্খ' শব্দটি বসান 'সাইরেন'-এর পাশে তখন আপাতসহজ, আপাত নিরলঙ্কার পংক্তির মধ্যে যে বিপুল কাব্যকৃতি সম্পাদিত হয় তা কি পাঠককে শিহরিত করে না? শঙ্খ তো কেবল একটি ধ্বনি-যন্ত্রই নয়, গ্রামে গাঁথা বাংলাদেশের চিরায়ত ইতিহাসের বাহক।

আমাদের সমাজ, আমাদের লোকচার, আমাদের নৃ-গোষ্ঠীর জন্ম জন্মান্তরের মঙ্গলময় অনুভবকে ছড়িয়ে দেয় শ্রমিক জীবনের আধুনিক নিত্য নৈমিত্তিকতার মধ্যে। একটি আপাতসরল পংক্তি তখনই হয়ে পড়ে তরুণ কবিকে চিনিয়ে দেবার প্রতিনিধি। সার্থক প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যা পাঠককে গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়।

এ তো একটি পংক্তি তুলে আনা। সুভাষের সারা জীবনের গদ্য-পদ্যের উন্নতি আরও কত কত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার হিসেব কে করবে? হিসেব করার লোকরা তৈরি হোক, এই অবসরে আরও দু-একটি মণি-মাণিক্য খোঁজার চেষ্টা করা যাক। খুঁজতে খুঁজতে 'যা রে কাগজের নৌকা' কবিতায়, পদাতিক যেমন প্রথম গ্রন্থ, যারে কাগজের নৌকো-কে কার্যত শেষ কাব্যগ্রন্থ বলা যেতে পারে। গ্রন্থের নাম কবিতায় : 'মনে পড়ে না, মনে পড়ে না/ মনে পড়ে না কিছু; যতই কেন ছুটে বেড়াই/হারানো সব দিনের পিছু পিছু/ যখন আমি জন্ম নেব বলে/ জল ভাঙছি, জল ভাঙছি/জল ভাঙছি, জল/মা নিদারুণ ব্যথায়/ক্লিষ্ট....'—'জল ভাঙছি, জল ভাঙছি/জল ভাঙছি, জল' ভেঙ্গে ভেঙ্গে বসানো এই কাব্যবন্ধটি পাঠক মনে যে বিপুল শিহরণ আনে তার সীমা কি মাপা যায়? আমাদের আটপৌরে শব্দ 'জল ভাঙ্গা'—কে কবি কাব্যের ধ্বনিময়তায় এমন নিগূঢ় রূপ দিয়েছেন যে মানব জন্মের পূর্ণ পক্রিয়াটি তার রহস্য ঘেরা মাতৃজঠরের অন্তর্লীনতা সহ উঠে এসেছে। জাতকের জন্ম যে নিশ্চিত যক দ্বান্দ্বিক অভিযাত্রা, তাকে কবি ওই লৌকিক বাক্য যুগলের পৌনঃপুনিকতায় কী সুন্দর যে ফুটিয়েছেন এবং মাতৃগর্ভের জটিল সন্তরণ মাকে যে 'ক্লেশ দেয়'—এই উচ্চারণ প্রত্যেক মানুষের মানবিক মমতায় মাখানো। এই যে আটপৌরে চির চেনার শব্দকে আশ্চর্য উজ্জ্বল কাব্যের অনুভবে স্থাপন করা, তা কি খুব সহজ কাজ? ক'জন পারে বা পেরেছে এ কাজ করতে। বাংলা সাহিত্যে একজনই, তাঁর নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কিম্বা বহু পঠিত 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় : 'ঠিক সেই সময়/চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল/ আ মরণ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি।' 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সমগ্রের প্রায় মধ্য প্রহরের লেখা। উল্লেখিত পংক্তিগুলিতে 'চোখের মাথা খেয়ে' 'আ-মরণ' এবং 'পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি।' এই সবগুলি শব্দই খুব ভেবে চিন্তে বসানো। এখানেও একেবারে ভূমিলগ্ন মানুষের রাগ, অভিমান, বিরক্তি ও আক্ষেপের ভাষণ পর পর বসিয়ে কাব্য-প্রতিমা গড়া হয়েছে। শব্দগুলি প্রয়োগ ও ব্যবহারিক অর্থ সহজও সকলেরই জানা। কিন্তু এর দূরপ্রসারী কাব্যিক ব্যঞ্জনার কথা জানতে গেলে অনুভবের অতলে সন্তরণ ছাড়া গতি নেই। অথবা 'দড়ি পাকানো সেই গাছ'-এর হাসির কারণ অনুসন্ধানেও দিবস রজনী অতিবাহিত করতেই হয়। আর তা করতে গিয়ে অনায়াসে বুঝতে পারি 'বসন্ত'র অনিবারণীয় ছোঁয়ায় না ফোটা কুসুমটি ওই 'আইবুড়ো মেয়ে'র বেদনা কবিকে স্পর্শ করে, পাঠকে সঞ্চারিত হয় তা এবং সেই সঞ্চরণেই থেমে না থেকে মমতাময় পিতার মতো 'কালো মেয়ের' বেদনা উপশমের পথ ও অনুসন্ধানে ব্রতী হন তিনি।

এভাবেই সহজ-সরল আধারে গভীরতার প্রকাশ। এভাবেই শব্দগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে কবিতার মিছিল। পথ ও মিছিল যিনি ভালবাসতেন, এ বাংলা ও বাংলার গ্রাম-নগরে ছড়িয়ে থাকা কৃষক-শ্রমিক নির্বৃত্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে 'এই ভাই' বলে একটু আগুন চাইতে বাঁধত না যাঁর তিনি সারা জীবনে বন্ধুর পথ হেঁটেছেন, তাই বৈচিত্র্যে ভূষিত তাঁর কবিতা। সে কবিতায় গড়ন যেমন এক নয়, বাচন যেমন পরিবর্তিত, ভাষা ও ভাষ্যে যেমন বিভিন্নতা তেমনই প্রতিনিয়ত খেটে পাওয়া লৌকিক মানুষকে ঘিরে কবিতার মহোৎসব রচনার প্রয়াস। তাই সেখানে, 'ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনা,/ক্রুশচভের গলায়' এর মতো সোজা-সাপটা প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। ধ্বনিত হয়, 'হঠাৎ আওয়াজ/মাটিতে পা,/ হাত আকাশে, মিছিল/দৃষ্টি বদল,/হাতে বেঁধেছ/হাত। করেছ ঋণী/ভুলে যাইনি/ভুলে যাব না।/ জীবনে কোনো দিনই'-র মতো স্মৃতিমেদুর শপথ এবং এর পাশে যদি বসাই, 'আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে/দুলে দুলে সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে নাচছে।' তখন একটা আদল তৈরি হয়।

কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে, তাঁর বিস্তৃত ব্যাপক সাহিত্য জীবনকে এই আদলেই সীমিত রাখার অর্থ তো এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব, এক ধরনের স্বার্থপর ভাবনাই। বরং বিচিত্রতার সন্ধানে যেতে চেষ্টা করাই ভালা, সেই সন্ধানে গেলে একটা মানুষের জীবনের চুরাশি বছরের ইতিহাস ধরা পড়ে।

এই ইতিহাস গারো পাহাড়ের হাজং জীবনের কথা জানায়, বজবজে ব্যাঞ্জনহেড়িয়ায় সোলেমান আর বাবর আলির জীবনের ওঠা-পড়াকে তুলে এনে কাব্যের অলঙ্কার তৈরি করে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'উলিডুলি' কাপড়' পরা মানুষের জীবনের ইতিহাসের দর্পণ হয়। মানুষ, মানুষ আর মানুষ—রাস্তাকেই একমাত্র রাস্তা ভেবে তিনি আসলে চলমান সভ্যতার কর্মযোগেরই দোসর। রবীন্দ্রনাথের মানব প্রেমের উত্তরাধিকার কী করে যে তাঁকে নিতে হয় তা বোধহয় তিনিও ঠাহর করেননি। মানুষকে ভালবাসতে : 'ও গরু মহিষ/ও ধানের শিষ/ জানালা দুয়োর/ও সাঁঝ, ও ভোর/যাচ্ছি', 'ও আঁকা, ও লেখা/ও গরু মহিষ/ও ধানের শিষজানালা দুয়োর/ও সাঁঝ, ও ভোর/যাচ্ছি', 'ও আঁকা, ও লেখা/ ও কুহু/ ও কেকা/যাচ্ছি' 'ও কাঁথা// ও বই, ও খাতা/যাচ্ছি।' বলতে বলতে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বাংলারই মমত্বে মিশিয়ে দেন নিজেকে। তখন বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়া। 'পাখির চোখের' দিকে লক্ষ্য স্থির রেখেই পারিপার্শ্বকে আপন করা। এই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করার কাজ চলুক।

উৎস : সপ্তাহ, ২৫ জুলাই-৮ আগষ্ট, ২০০৩

(লেখক : বর্ষীয়ান সাংবাদিক)

'চে গেভারার ডায়রি'র সন্ধানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুব্রত দাস

' চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলের কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে
সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার...'

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় /' চে গুয়েভারার প্রতি')

সাতের দশকের উত্তাল দিনগুলিতে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা মানুষের কাছে চে গুয়েভারা ছিলেন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চে গুয়েভারার প্রতি' কবিতায় চে গুয়েভারাকে কেন্দ্র করে এই আবেগের তীব্র সংরাগ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত সত্তরের দিনগুলির রক্তাক্ত অভিঘাতে বাঙালি জনমানস স্পষ্টতই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। নকশালবাড়ির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা অসংখ্য তরুণ-তরুণীর জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিছু সংখ্যক মানুষ। আবার সশস্ত্র সংগ্রামের হিংসা, রক্তপাত, অন্তর্ঘাত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অজস্র প্রাণের অপচয় দেখে অনেকে বিরক্ত হয়েছেন, শিউরে উঠেছেন, বিরোধিতা করেছেন। সত্তরের এই রক্তাক্ত আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যোগ ও সক্রিয়তা একদিকে যেমন সমর্থিত হয়েছে, তেমনি সমালোচনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে এসময়। এই আগুন ঝরানো দিনের উত্তাপে সমকালীন বাংলা সাহিত্য নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছে। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের সহানুভূতি যেমন লক্ষ্য করা গেছে, তেমনি এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন অনেকে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দ্বিতীয় সরণিতে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস হয়তো এক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল। কিন্তু মনে মনে তিনি কি বিপ্লবের শরিক নন? নইলে লাতিন আমেরিকার চে গুয়েভারার দিনলিপি অনুবাদে কেনইবা তিনি প্রবৃত্ত হবেন?

অবশ্য মতাদর্শগত বিরোধ থাকলেও যে বিপ্লবের প্রতি 'দরদ' থাকতে কোনো বাধা নেই, সুভাষ মুখোপাধ্যায় চে গুয়েভারার ডায়েরি অনুবাদ করতে গিয়ে একেবারে শুরুতেই সে কথা পাঠককে নিবেদন করলেন। তিনি লেনিন-এর মন্তব্য উল্লেখ করে জানালেন :

'চে কি রোমান্টিক ছিলেন? হ্যাঁ। তবে বিপ্লবী রোমান্টিক। লেনিন বলেছিলেন : 'এ কথা না বললেও চলে যে, রোমান্টিকতা ছাড়া আমরা চলতেই পারি না। রোমান্টিকতায় ঘাটতি পড়ার চেয়ে বরং একটু বেশি

থাকা ভালো। যাঁরা বিপ্লবী রোমান্টিক তাঁদের সম্পর্কে সব সময়ই আমরা দরদ বোধ করি, এমন কি তাঁদের সঙ্গে যখন আমাদের মতে মেলে না তখনও।'

অর্থাৎ বিপ্লবের সঙ্গে রোমান্টিকতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কোনোও বিপ্লবে একারণেই ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় তরুণ ও কিশোর ছেলে-মেয়েদের। কেননা সাংসারিক হিসেব-নিকেশ তখনও পর্যন্ত তাদের রোমান্টিকতার উপর বাস্তবতার কঠিন প্রাচীর তুলে দেয়নি। চে গুয়েভারার ডায়েরি অনুবাদ করার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবের প্রতি এমনই রোমান্স অনুভব করেছিলেন নিশ্চয়। নইলে সারা বিশ্বে প্রায় নিষিদ্ধ এক মানুষের ভয়ঙ্কর দিনযাপনের দিনলিপি পাঠকের সামনে তুলে ধরার তীব্র তাগিদ তিনি অনুভব করতেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে।

১৯৬৭ সালে ৯ অক্টোবর বলিভিয়ান সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার মাত্র বছর খানেকের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চে গুয়েভারার ডায়েরি অনুবাদ শুরু করেন। 'ধ্বনি' পত্রিকার ১৯৬৮ সালে ধারাবাহিকভাবে 'চে গেভারার ডায়েরি'র অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। কেননা লেখক স্বয়ং জানাচ্ছেন—

বই হিসেবে ডায়রি বার হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৮ সালে 'ধ্বনি' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে আমি অনুবাদ শুরু করি। কাজটা খুব সহজ হয় নি। ডায়রিতে অনেক কথাই বলা হয়েছে সাঁটে। তাছাড়া খণ্ডিত জায়গাও আছে। আদি পুরোটা অনুবাদ করলেও কপিরাইটের ভয়ে সম্পাদক বাদ দিয়ে দিয়ে ছাপিয়েছিলেন। ভয়টা ছিল অমূলক। কেননা ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে কিউবার সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই ডায়রি পূর্ণ আকারে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যে কেউ ছাপাতে পারবে। খবরটা তখন আমাদের অজানা ছিল। কিন্তু 'ধ্বনি'-তে অংশ ছাপা হওয়ার ফলে এবং পাণ্ডুলিপির হদিশ করতে না পারায় বর্জিত সমস্ত অংশই এ বইয়ের জন্যে পরে আমাকে আবার নতুন করে তর্জমা করতে হয়েছে।'

শুধুমাত্র কপিরাইট-এর কারণে নয়, ১৯৬৮ সালে উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রে বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় লেখা (চে গুয়েভারার ডায়েরিতো বটেই) বাংলায় ক্রমশ নিষিদ্ধ বস্তুতে পর্যবসিত হয়েছে। এমন অবস্থায় যে গুয়েভারার ডায়েরির অনুবাদ একটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ রূপে বিবেচিত হবে। (কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবনবোধ 'ভয়' শব্দটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।) বিশেষত চে গুয়েভারা সমগ্র বিশ্বের গোরিলা বিপ্লবীদের প্রতিবাদী মুখ হয়ে উঠেছেন ততদিনে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯—৮ জুলাই ২০০৩) থেকে প্রায় বছর দশেকের ছোট চে গুয়েভারা (১৪ জুন ১৯২৮—৯ অক্টোবর ১৯৬৭) তাঁর জীবনকালেই আন্তর্জাতিক এক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে ডাক্তারি পড়ার

সময় একটি সাইকেলে করে আর্জেন্টিনার উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চল (প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার) পরিভ্রমণ করেন। পরের বছর বন্ধু গ্রানাদোর সঙ্গে মোটর সাইকেলে ঘুরে দেখলেন লাতিন আমেরিকার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল। তাঁর 'মোটর সাইকেল ডায়েরি'র পাতায় এই ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। এই ভূ-পর্যটন তাঁর লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নিতে সহায়ক হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেন পরাধীনতার বন্দীত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের মুক্তির অন্য আর কোনো উপায় নেই। বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার জেরে তাঁকে ছাড়তে হয়েছে গুয়েতেমালা। মেক্সিকোতে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে পরিচয়। অচিরেই হয়ে উঠলেন কিউবার স্বাধীনতা যুদ্ধের গেরিলা সৈনিক। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার সংগ্রাম জয়যুক্ত হওয়ার পরে নতুন বিপ্লবী সরকার তাঁকে প্রথমে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর নিযুক্ত করে, পরে মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন এবং কিউবার রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘ চার বছর। এই আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জীবনে তিনি অনায়াসে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে পারতেন। বিশেষত স্ত্রী ও সন্তানবতী সংসারজীবন তাঁকে এক নিরাপদ ও নিশ্চিত জীবনে স্থিতু করতে পারতো। কিন্তু ১৯৬৫ সালে গুয়েভারা নতুন করে নিজেকে বিপ্লবের শরিক করতে উদ্যত হলেন। প্রথমে আফ্রিকার কঙ্গো এবং পরে লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। ১৯৬৬ সালে ছদ্মবেশে তিনি বলিভিয়ায় ঢুকলেন। উদ্দেশ্য বলিভিয়ার এক শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী তৈরী করে বলিভিয়াকে মুক্ত করা। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি গোপন সংগ্রাম চালালেন। তাঁর ডায়েরি এই সময়েই লেখা। বলিভিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে ৮ অক্টোবর ১৯৬৭ সালে তিনি আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। পরের দিন গুলি করে হত্যা করা হয় তাঁকে।

একটি বিপ্লবী গোরিলা সংগঠন তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে চে গুয়েভারা বলিভিয়ায় এসেছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেও তিনি নিয়মিত দিনলিপি লিখে গেছেন। ইতিপূর্বে গুয়েতেমালা ও কিউবাতে গোরিলাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন প্রতিটি মুহূর্তের কার্যবিবরণী এবং দলের ও পারিপার্শ্বের সমস্ত লোকদের সম্পর্কে তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে এই দিনলিপি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে। ডায়েরি লেখা শুরুর প্রথম দিন থেকে (৭ নভেম্বর ১৯৬৬) শেষ দিন পর্যন্ত (৭ অক্টোবর ১৯৬৭, মৃত্যুর দু'দিন আগে) চে গুয়েভারা তাঁদের গতিবিধি ও পরিপার্শ্বের নিঁখুত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে গোরিলা বিপ্লবীদের সাংগঠনিক পরিকল্পনা, অমানুষিক পরিশ্রম ও অনিশ্চিত জীবনের কথা। পাশাপাশি রাষ্ট্র, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নিরন্তর লুকোচুরি খেলতে হয়েছে তাঁদের। লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিক বিবরণও চে-র ডায়েরিতে বিশ্বস্ত ভাবে ধরা পড়েছে।

চে গুয়েভারার ডায়েরি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কাছে আতঙ্ক উদ্রেককারী, কেননা এই ডায়েরি গোরিলাযোদ্ধাদের একটি ম্যানুয়াল রূপে বিবেচিত হতে পারে। জঙ্গলে- পাহাড়ে-পাথরের গুহায় লুকিয়ে থেকে সংগ্রামের গোপন মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য খুঁটিনাটি

বিবরণ রয়েছে এখানে। জল ও জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে জীবন ও সংগ্রামের রসদ সংরক্ষণ পরার পদ্ধতি এখানে বিবৃত হয়েছে. পাশাপাশি গোরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শ ও মানসিক গঠনের বিষয়ে চে-র অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এখানে। তিনি জানুয়ারি ১৯৬৭ সালে ডায়েরিতে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

> 'ক্লাসের পর, গেরিলা যোদ্ধার প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং অধিকতর শৃঙ্খলার আবশ্যকতা— এই বিষয়টি আমি তুলে ধরলাম। বুঝিয়ে বললাম, সব ফেলে ছেড়ে আমাদের ব্রত হল এমন একটা বজ্রকঠিন প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলা লোকের কাছে যা দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে এবং প্রসঙ্গত এও বললাম যে, ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনের কথা মনে রেখে পড়াশুনো করাটা। কেন খুব জরুরী।'

গোরিলাযুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত বিপন্নতার মেঘে ঢাকা। এক্ষেত্রে মানসিকভাবে লড়াই ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া একান্তভাবে জরুরি। ৭ মার্চ ১৯৬৭ সালে ডায়েরিতে এমন সংকটের মুহূর্তে তাঁর দলের অবস্থার কথা ফুটে উঠেছে—

> 'চার মাস হল। দলের লোকজনেরা ক্রমেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। কারণ, তারা দেখছে রসদ ফুরিয়ে আসছে অথচ পথ কিছুতেই ফুরোতে চাইছে না। আজ আমরা নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে ৪ কিংবা ৫ কিলোমিটার এগিয়েছি এবং শেষকালে একটা আশাপ্রদ রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। রসদ ৩$^{১}/_{২}$ টি পাখি এবং অবশিষ্ট তালশাঁস, কাল থেকে শুধু টিনের খাবার। প্রত্যেক তিনজনের জন্যে একটি ক'রে টিনে ২ দিনে হবে; তারপর দুধ এবং সেই সঙ্গে নটে-গাছটিও মুড়োবে। এখান থেকে নাকাহুয়াসু ২ কিংবা ২$^{১}/_{২}$ দিনের পথ।'

সামরিক বাহিনী ও পুলিশের পাশাপাশি চে গুয়েভারার বাহিনীকে লড়াই করতে হয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে। কখনও তাঁদের সামনে ভয়ঙ্কর দুরন্ত নদী, আবার কখনও উত্তুঙ্গ পাহাড় তাঁদের সামনে বাধার প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

> 'চারপাশ খুঁটিয়ে দেখে নেবার জন্যে মার্কস্, মিগোয়েল আর আলেয়ান্দ্রোকে নিয়ে আমরা ন্যাড়া পাহাড়ে গেলাম। মনে হল, এখান থেকে পাম্পা দেল্ তিগের শুরু। ১,৫০০ মিটার উঁচুতে পরের পর পাহাড়; মাথায় সব এক; একটাতেও গাছপালা নেই। বাঁ দিকের পাহাড়ের মাথাটা নাকচ করতে হবে, কারণ খিলানের মত হয়ে নাকাহুয়াসুর দিকে সেটা নেমে গেছে। এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট লাগল পাহাড় বেয়ে নেমে ক্যাম্পে পৌঁছুতে।'

গোরিলাযুদ্ধের পদ্ধতি ও পরিকল্পনার ধারাবাহিক বিবরণ তিনি লিখে রেখেছেন। বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে ছোট ছোট সৈন্যদলকে বিভ্রান্ত করে তাদের ফাঁদে ফেলে কার্যসিদ্ধি করার জন্য নানান পরিকল্পনার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। এমন

আক্রমণ পদ্ধতির কারণ অল্প সংখ্যক শত্রু সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার সহজ। তাদের পরাজিত করে অস্ত্র উদ্ধার করা তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ডায়েরির একটি পাতায় তিনি এই প্রসঙ্গে জানালেন—

> 'কোকো ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনীর একাংশ আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। এখন অবধি চূড়ান্ত ফলাফল হল—৬০ মিলিমিটারের ৩টি মর্টার, ১৬টি মাউজার, ২টি বি-জেড, ৩টি ইউ এস্. আই. এস, ১ টি থ্রি-নট, ২টি রেডিও, বুট ইত্যাদি, ৭ জন মৃত, ১৪জন অক্ষতদেহে বন্দী আর ৪ জন আহত, কিন্তু আমরা কোনো খাবারদাবার দখল করতে পারি নি।'

চে গুয়েভারার ডায়েরির অনুবাদ করতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন বিপ্লবীদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল। বিপ্লবী দলের অধিনায়কত্ব করার জন্য এক শ্রেণির মানুষ উদগ্র। তাঁদের কুটিল মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা আন্দোলনের পথ কঠিন করে তোলে। তাছাড়া লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্জিত তাত্ত্বিক নেতৃত্বের প্রতিও চে গুয়েভারার তীব্র বিরুপতা দেখেছেন তিনি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-র (সিপিআই) সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় ক্রমশ আস্থা হারিয়েছেন দলের কার্যকলাপের উপর। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত তাঁর 'ভূতের বেগার' (কার্ল মার্কসের 'Wage, Labour and Capital' নামে একটি ছোট পুস্তিকা অবলম্বনে এই বইটি লেখা) বইয়ের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —'আমাদের দেশে মার্কস-পড়া পণ্ডিতের অভাব নেই। দুঃখের বিষয়ে, তাঁরা বিদ্যের জাহাজ হয়ে বসে আছেন,—কম লেখা-পড়া-জানা মানুষের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌঁছে দেবার তেমন চাড় তাঁদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।' দলের যাবতীয় বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধেও চে গুয়েভারাকে লড়াই করতে হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও নেমে এসেছে দলের তীব্র সমালোচনার খড়্গ।

আপাতভাবে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ মনে হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং চে গুয়েভারার মধ্যে জীবনবোধের বেশ মিল লক্ষ্য করা যাবে। নিশ্চিত ও নিরাপদ জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে চে গুয়েভারা মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মৃত্যুর সমুদ্রে। একরোখা ও অকুতভয় এই মানুষটি অদম্য জীবনী শক্তিতে হয়ে উঠেছেন হাজার হাজার মানুষের মনের প্রতিবাদী মুখ। অন্যদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই মানুষের উপর শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অঙ্গিকার নিয়েই বাংলা কবিতায় তাঁর পদার্পণ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা তাঁর গদ্য ও অনুবাদের সিংহভাগ জুড়ে অবস্থান করছে। নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ কিংবা রোজেন বার্গের পত্রগুচ্ছের অনুবাদে সাধারণ মানুষের স্বাধীকার রক্ষার প্রবল তাগিদ অনুভব করেছেন

তিনি। মানুষের জন্য নিজের জীবনের যাবতীয় সুখের সম্ভাবনা উপেক্ষা করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নাম লিখিয়েছেন। বিশেষত স্বাধীনতা-সংলগ্ন ভারতে কিমউনিস্ট পার্টির সদস্যদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। আড়াই বছর কারাবাসের পর মুক্ত হয়ে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদে ১৯৫২ সালে বজবজে চটকলের শ্রমিক-বজুরদের সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এর আগেও খিদিরপুর ডক অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য কাজ করেছেন তিনি। চে গুয়েভারাও সাধারণ মানুষের জন্য নিজের নিরাপদ জীবনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে পার্টির একাংশের যোগাযোগহীনতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ব্যথিত করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্রব থেকে তিনি নিজেকে বিযুক্ত করেছেন, কিন্তু তাঁর কলমের প্রতিবাদ স্তিমিত হয় নি এতটুকু। চে গুয়েভারার মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এক লাল টুকটুকে দিনের স্বপ্ন দেখেন, তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন—

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।

উল্লেখ পঞ্জি :

১) 'চে গুয়েভারার প্রতি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্য বদ্ধ অভিমান, কবিতা সমগ্র-১ কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৮৮৫, পৃষ্ঠা : ২২০-২২১

২) চে গেভারার ডায়রি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, জয়দীপ পাবলিকেশনস, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা : কথামুখ

৩) ঐ, পৃষ্ঠা : অনুবাদকের কথা

৪) ঐ, পৃষ্ঠা : ২৯

৫) ঐ, পৃষ্ঠা : ৬৫

৬) ঐ, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ভূতের বেগার, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ২৭৫

৮) লাল টুকটুকে দিন, ফুলফুটুক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ-১, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৫৭ পৃষ্ঠা : ৯৮

'রিপোর্টাজের আধারে গল্পশিল্প : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মৌসুমী সাহা

'পদাতিক'- এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম বস্তুভারহীন ভাবের মুক্তি ঘটেছিল গদ্য দিয়ে। ছেলেবেলায় ইস্কুল-এর ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল কথিকা ধরনের। তবুও পরিচিত-পরিজনের অনুরোধে একান্ত অনুভবকে সংবেদনীয় করতে শুরু করলেন কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে—'অনেক কষ্টে আদাজল খেয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম। বারবার লিখি বারবার কাটি। সেগুলো হয়তো কবিতাও বলা যায় না। আর এইভাবেই কবিতা লেখার নেশা ধরে যায়। পরে আবার গদ্য লেখা শুরু করি....কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ কাগজ লেখার সময়।' রাজনৈতিক দলের সাথে নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠার পর যখন 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, তখন অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যা 'আমার বাংলা'র এই রিপোর্টজ গদ্যের জন্ম দিয়েছে। বাংলার পথে-ঘাটে-মাঠে অগণিত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে আর সৃষ্টিশীল চেতনাকে দেশকাল গণ্ডীর অতীত অভিনবত্ব দান করেছেন। বরাবরই তার মধ্যে শিল্পী-স্বভাব সুপ্ত ছিল তবুও বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার উদ্দীপনার প্রকাশ 'আমার বাংলা'য়, '..... লেখাগুলো সে যদি প্রায় জোর করে আমাকে দিয়ে না লিখিয়ে নিত, 'আমার বাংলা' কোনদিনই লেখা হত কিনা সন্দেহ'।....

কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক হিসেবে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কাহিনী সংগৃহীত হয়ে অবয়ব পেয়েছে 'আমার বাংলা' গদ্য গ্রন্থ। সোমনাথ লাহিড়ীর উৎসাহে ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তাড়নায় লেখা কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর পত্রিকা 'রংমশাল'-এ। এক দুর্জয় নেশায় ছুটে বেড়িয়েছেন বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পরগণায়-ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায়, খনিতে, পাহাড়তলিতে-সমতলে। বঞ্চিত, অসহায় মানুষের জীবন মন্থন করে তাঁর সংবেদশীল প্রবণতা বাংলার বিচিত্র বর্ণের মানুষ সম্পর্কে যে রূপরেখা গড়ে তুলছে। তার জীবন্ত দলিল 'আমার বাংলা' ছাড়াও পাঁচটি গ্রন্থ ঃ 'যখন যেখানে' (১৯৬০), ডাকবাংলার ডায়েরি (১৯৬৫), 'নারদের ডায়েরি' (১৯৬৯), 'ক্ষমা নেই' ৯১৯৭২), 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১)।

'আমার বাংলা' থিম্-এর বিচারে ট্রাজেডিকরুণ। 'যখন যেখানে' জেল থেকে ফিরে লেখা। পূর্ববঙ্গের যশোর-খুলনা অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্বের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী 'ক্ষমা নেই'। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে 'ডাকবাংলার ডায়েরি'তে, যার অনুবর্তন ঘটেছে 'নারদের ডায়েরি' ও 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' তে।

সুদীর্ঘ কয়েকটি বছর জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ মানুষের কাহিনী আহরণের উদ্দীপনা ও জীবনব্যবস্থায় নিত্যনূতন তথ্য আবিষ্কারের কৌতূহলসমৃদ্ধ বিচিত্রস্বাদী হৃদয়ানুভবমুখর

কাব্যগাথা 'আমার বাংলা'। দেশের মানুষের সঙ্গে নতুন করে আত্মীয়তার নিবিড় সূত্রে বাঁধা পড়ার দুর্লভ প্রয়াস উৎসারিত 'আমার বাংলা' পর্যায়ে। পশ্চিম থেকে পূবে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বাংলার মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই বৈজ্ঞানিকতা-প্রখর বাস্তব আগ্রহ তাঁর বিবেককে আমূল আলোড়িত করেছিল, 'সে সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর সুভাষের অজ্ঞাতবাস, নগর সাহিত্যের মুখর কোলাহল থেকে আত্মনির্বাসন'।

গারো পাহাড়ের নীচে

আবছায়া রূপকাবরণে ঘেরা 'আমার বাংলা'র প্রথম কথিকা 'গারো পাহাড়ের নীচে'।

পূর্ববাংলার ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের কোলে যাদের বাস, ঠিক চৈত্র মাসের সময়টাতেই তাদের ফসল ফলানোর সময় যদিও তাদের হাল নেই—বলদ নেই—ফসলের জমি নেই। পাহাড়ের ওপর শুধু গাছ আর পাথর। তবুও তারা ফসল ফলায়। শুকনো ঝোপে আগুন ধরিয়ে কিংবা জঙ্গলে যখন আগুন লেগে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে—মাথা চাড়া দেয় ধান। তামাক আরো কত কী!

এই গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগণা আর সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী—'পাহাড়ী নদী সোমেশ্বরী—সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে গেছে।' পাহাড়ের নীচে থাকে নানাধরনের জাত, হাজং—গারো-কোচ-কানাই-ডালু-মার্গান। এদের মধ্যে গারোদের ভাষা আলাদা। তবে পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংদের সংখ্যাই বেশী। পাহাড়ী গারোরা তাদের নাম দিয়েছে হাজং—অর্থাৎ 'চাষের পোকা'। কিন্তু মাঠ থেকে এরা যা ফসল তোলে, তার সবটাই এদের থাকে না। জমিদারকে খাজনা দিতে গিয়ে চাষীরা ফকির হয়ে যায়।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল—যাকে বলা হত 'হাতী-বেগার'। জমিদারের নেশা ছিল হাতী ধরার, প্রত্যেক গাঁ থেকে জমিদারের ডাকে প্রজারা আসত হাতী ধরার কাজে অংশগ্রহণ করতে, 'যারা হাতী বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হত'।....ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টারে নেতৃত্বে বিদ্রোহী প্রজাদল অবসান ঘটিয়েছিল এই প্রথার—যার গল্প শোনা যায় চৈতননগরে, বা হিঙুরকোণার খড়া মোড়ল ও আমুতো মোড়লের বংশধরের মুখে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো। যেটা লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন—'বাংলাদেশ থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি—তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে। অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।'

সব কথার শেষে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, রিপোর্টার সুভাষ তাঁর রচনার ধারণাকে ভাবালুতার চিরাগত সৃজনভূমি থেকে এনে বুদ্ধির আলোকপ্রখর কলালোকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মেধার তীক্ষ্ণতম প্রতিফলনে বিচ্ছুরিত হয়েছে মননশীলতার দ্যুতি, এখানেই তাঁর অনন্যতা।

'ছাতির বদলে হাতী'

'রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রতিবেদন 'ছাতির বদলে হাতী'। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে ব্যক্তিগত গভীর অনুভূতি অনায়াস ভঙ্গীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তেজারতী-বন্ধকী কারবারের আখড়া হালুমাট বন্দর, যেখানে মহাজনদের ব্যবস্থা রমরমিয়ে চলত। একবার গারো পাহাড়ের নীচের এক গাঁ থেকে সত্তদায় এসেছিল এক গারো চাষী, যার নাম চেংমান। গ্রাম থেকে সওদা করতে এসে মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি যখন থামার কোনো লক্ষণ নেই। তখন মনমোহন মহাজন তার দোকানের ঝাঁপির নীচে আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। আর সেই ডালু চাষীর ফিরে যাওয়ার সময় কলকাতা থেকে খরিদ করে আনা একটি আনকোরা ছাতি তার মাথায় ধরে বলেছিল—'যা যা ছাতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা।'.....

চেংমান তো ছাতির কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু হাটবারে যখন মনমোহন মহাজন তাকে ধরে চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতির দাম বাবদ সুদসমেত হাজার খানেক টাকা চেয়ে বসল, 'তা প্রায় একটা হাতীর দাম'।

শুধু তাই নয়, ডালুদের গাঁ কুমারগাড়িব নিবেদন সরকার যখন তার মুদিখানার জন্য দু-দশ বছর বাকিতে মশলাপাতি কিনেছিল তখন মহাজন কুটিশ্বর সাহা দেনার দায়ে তার ছেষট্টি বিঘা জমি কেড়ে নিয়েছিল।

শুধু মনমোহন বা কুটিশ্বর-ই নয়, জোতদার-তালুকদারদের দ্বারাও ডালুদের মত 'অন্ধ বোকার জাত'রাও নির্যাতিত হোত।

একদিকে ইংরেজ-নামক রাজশাসনের রোষকষায়িত নেত্র, অন্যদিকে মহাজনদের দাপটের মাঝে পড়ে নওয়া পাড়া, দুম্‌নাকুড়া, ঘোষপাড়া, ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালুচাষীরা শেষপর্যন্ত সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। তারা শেষপর্যন্ত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলতে পেরেছিল 'জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলব না'। ধান তারা তেলেনি বা পুলিশ-কাছারি কিছুতেই হার মানেনি। শেষে হার মেনেছে জমিদারই।

ছবি আঁকায় দক্ষ সুভাষ ডালুদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি দুঃখের চিত্র আঁকতে গিয়ে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই জানিয়েছেন, 'যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন যোগায় ইচ্ছে করে। জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাদের হাতে দিই মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না'?

কবির গভীর অনুভব মানুষের হৃৎপিণ্ডের আড়ালে চাপা পড়া দুঃখের অনুভূতিমালায় আচ্ছন্ন। ডালু কিংবা হাতং চাষীদের সমস্যা। ও অত্যাচার—অবিচার-হাহাকার-এর পাশাপাশি তাদের প্রতিবাদী মনোভঙ্গী এবং গভীর অনুভবের এই তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্টটিতে একটি অন্যধরনের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এইভাবেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অসীম অনুসন্ধিৎসায় ভূগোল ও ইতিহাসের বৃত্তের পটে খুঁজে বেড়াতেন দুঃখী মানুষের বিপন্ন জীবনের ইতিবৃত্ত।

'দীপঙ্করের দেশে'

পরবর্তী প্রেক্ষাপট 'দীপঙ্করের দেশে'। কবি গিয়েছিলেন ঢাকার বিক্রমপুর পরগণায়, যাকে বলা হয় মুন্সীগঞ্জ মহকুমা, স্বনাম ধন্য দীপঙ্করের জন্মভূমি, যার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিল দূর নেপাল থেকে সুদূরে শ্যাম-সুমাত্রা। এইসব পুরো সেদিনের প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বহুদিনের বিস্তৃত শিলারাশি।

রিপোর্টারের গন্তব্যস্থল ছিল মেদিনীমণ্ডল। চারদিকে গ্রামগুলো সব খাঁ-খাঁ করছে। আকালের বছরে শেষ হয়ে গেছে সব। বিপিন কর্মকার তার ঘরের সবকিছু জলের দরে বিক্রি করেও তার ডাগর ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে নি। গাঁয়ের অর্ধেক লোক দেশত্যাগী হয়েছে, সব গাঁয়েই একই দশা। আবার দু-চারজন এই দুর্ভিক্ষের মরশুমেও রাতারাতি নিজেদের ভোল ফিরিয়েছে। যেমন আমতলার মৈজুদ্দিব্যাপারী, টঙ্গিবাড়ী বাজারে যার ভূষি-র দোকান। ভাতের অভাবে গাঁয়ের লোক বিঘা বিঘা জমি বেচেছে। তার কাছে। ফলে 'মৈজুদ্দির টিনের চালা ভেঙে পাকা দালানকোঠা উঠেছে।' এইভাবেই আকালের বছরে মহাজনেরা মানুষ মেরে যা লাভ করেছে তা কহতব্য নয়।

এর মধেই রানীনগর গ্রামের এতিমখানার আব্দুর রহমান, সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের মানুষ। রহমান মাস্টার নামেই তিনি বেশী পরিচিতি। দুর্ভিক্ষে মা-বাপ মরা ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সৃষ্টি ছাড়া সংসার-আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম সবাইকে নিয়ে এতিমখানার ছোট্ট ঘরে যেন দুঃখের কাহিনীর কোলাজ রচনা করেছেন প্রতিবেদক। পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যা তাঁকে বিচলিত করেছে। দারিদ্রের হাহাকারের পাশাপাশি ধনীর বিলাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি তার দায়বদ্ধতার নজিরই সৃষ্টি করে।

নিজের জীবনের ব্যক্তিগত অনুভবই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট রচনার মূল উপাদান। অনায়াস ভঙ্গীতে জীবনকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে গভীর অভিজ্ঞতার ছায়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রগার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ'

সাতকাহনিয়া, সাগরপুতুল, সাগিরা, কোটাল ঘোষ, আয় মাদর্শিনী, বনবাহিনী ইত্যাদি এলাকার গ্রামীণ জীবননির্ভর পরিবেশ থেকে সমাহৃত অভিজ্ঞতার উপকরণ রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিস্ময়রাগে রঞ্জিত করেছে।

'বন্যার দেশ বর্ধমান, যেখানে রিপোর্টার প্রথম বন্যার ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এর বছর তিনেক আগে 'ক্ষেপে ছিল অজয় নদ। দামোদর'। সঙ্গে ছিল সহকর্মী সুনীল জানা। পশ্চিমে সাতকাহনিয়া খেকে পুবে সাগিরা পর্যন্ত একটানা চল্লিশ মাইল অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ। এ যেন অজয় অঞ্চলের ভাগ্যরেখা, 'যেখানে চিড় খাবে সেখানেই সর্বনাশ। অজয়ের দুই তীরের মানুষ ভয়ে কাঠ, তবুও তারা অদৃষ্টলিপির লিখন খণ্ডন করার জন্য উন্মুখ। আকাশে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা বাঁধ বাঁধার চেষ্টা করেছে—চার মানুষ সমান উঁচু বাঁধ। এভাবেই বস্তুজগৎ মিলিয়ে গেছে উপলব্ধির জগৎে, রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র জীবন যুদ্ধের ছবি।

'শাল-মহুয়ার ছায়ায়'

বাংলাকে কেন্দ্র করেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজের পরিক্রমা। মেদিনীপুর শহরের উপর দিয়েই পাকা সড়ক গেছে পূব থেকে পশ্চিম-বাঁকুড়া আর রাণীগঞ্জ থেকে কটক আর বালাশোরের দিকে। এই রাস্তারই এপার ও ওপারে দুখানা হয়ে আছে মেদিনীপুর জেলা রিপোর্টারের জবানবন্দী অনুযায়ী 'ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই করাল মূর্তি দেখেছিলাম তিন বছর আগে। তমলুক মহকুমায়'।

শহুরে কবি গ্রাম-গঞ্জের জীবন প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে চষে বেড়িয়েছেন মাঠ-জমি-বিশাল অরণ্য। কেশপুর থেকে শালবনি-ই শুধু নয়, পারুলিয়া, শীষা, পারলোকে পার হয়ে বনের ভেতর দিয়ে রাঙামাটির রাস্তা। তেঁতুমুড়ির বন পেরিয়ে মহিষডুবির বন, মাঝখানে ছোট ছোট জনবিরল গ্রাম—ওপর সাতশোল, মধ্য সাতশোল। বনের মধ্যে সরু-সরু ঝরণার নদী ইত্যাদি।

আবার ঠিক দুবছর পরের মেদিনীপুরকে যখন প্রত্যক্ষ করলেন তখন যেন এখানকার জ্বলে যাওয়া মাঠে আকালের আভাস। অভাবে-অভাবে মানুষের যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শাল-মহুয়ার বন উজাড় হয়ে মেদিনীপুর যেন মরে যাচ্ছে। তাম্রলিপ্ত শ্মশান আর নগর চন্দ্রকোণা অরণ্য। খালের দু-ধারে নরকঙ্কালের মিছিলে কবে জীবন জেগে উঠবে বা এই অভিশপ্ত জীবন থেকে বিকলাঙ্গ সমাজ কিভাবে মুক্ত হবে তা কবি জানেন না। তবে পরম যন্ত্রণার তিনি অনুভব করেছেন, মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বমুখর বিচিত্র জীবনের রূপ।

'পাতালপুরীর রাজ্যে'

নিছক প্রতিবেদন তৈরী করার কারণেই লেখা নয়, সমস্তকিছুই প্রতিবিম্বিত হয়েছে রিপোর্টারের মানসদর্পণে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ মানুষের জীবনের অদ্বিতীয় মরমীসাথী। পাতালপুরীর খনিমজুরেরাও তার বক্তব্যের বিষয় হয়েছে। মানুষের হৃদয়াবেগকে নিয়ে নব নব মূর্তি রচনা করে চলেছেন। বরাকর অঞ্চলের খনির শ্রমিকেরা অত্যাচারিত ছিল একসময়, মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করেছে। অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু তারা শেষপর্যন্ত দুর্লভ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পেরেছে—'খনির অন্ধকারেও আলোর খবর পৌঁচেছে' অর্থাৎ অত্যাচারীদের শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে তাদের জীবননচতনাকে পরিণতি দিতে পেরেছে।

কলের কলকাতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র কবি নন, একজন স্পষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী আটপৌরে মানুষও। রিপোর্টাজের মাধ্যমে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব ধর্ম। প্রথাগত রিপোর্টাজের সাবেকী গণ্ডী অতিক্রম করে নিজস্ব ফ্রেমে সহজ, সরল বাংলাভাষার ভাবনির্যাসে প্রকাশ করেছেন আবেগী মানুষের পরাধীন জীবনর দুঃখদুর্মর কাহিনী, বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা 'কলের কলকাতা' বলিষ্টতম রিপোর্টাজ। এখানে সুভাষের ব্যক্তিগত কবিমানস ভোক্তা নয়, দ্রষ্টা, যেমন—'দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত যে-মানুষগুলো

সকাল বেলায় রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে গেল, বিকেলে দেখি তাদের দম গেছে ফুরিয়ে কালিঝুলি মেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে টলতে টলতে ফেরে।' কিংবা, 'এমন যে নীরস শানবাঁধানো কলকাতা, তাকে কেমন করে একদিন ভালবেসে ফেললাম—সে কথা আমার নিজেরই জানা নেই'। 'আটপৌরে কলকাতার বিপন্ন সময়ের চিত্র পাই এখানে।

এইসময় সারা কলকাতা যেন খেপে উঠেছে। মুহূর্মুহু আওয়াজ ওঠে 'বন্দেমাতরম্'। সেসময় ফুটপাতে বিক্রী হোত—ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাসের ছবি। ধীরে ধীরে চেহারা বদলে যাচ্ছে কলকাতার। জমিজায়গা হারিয়ে শহরে আছড়ে পড়ছে গাঁয়ের মানুষ—কাজের জন্যে অথবা দুমুঠো ভাতের জন্যে। এরপর কালাপানি পেরিয়ে হঠাৎ খবর এল আন্দামানের বন্দীরা অনশনে। ফুঁসে ওঠা জনতার ঢেউ ছিনিয়ে নিয়ে এল বন্দীদের স্বদেশের মাটিতে। অন্ধ রাগে ফেটে পড়ল কলকাতার রাস্তা ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে। বিয়াল্লিশ সালের আগস্টের কলকাতা যেখানে 'ট্রাম পুড়ছে। এবার লাঠি নয়। গুলি চলছে রাস্তায়, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভয়ডর নেই। ইঁট হাতে নিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াচ্ছে। বলছে ইংরেজ, ভারত ছাড়ো'। এরপর ইংরেজের টনক পড়ল, তারা শেষপর্যন্ত গেল তবে কিছু কাঁটা ছড়িয়ে দেশকে বিপর্যস্ত করে। দেশভাগ হল, বয়ে গেল চালচুলোহীন উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত, দেশের মানুষ আগুনের অক্ষরে ইতিহাস লিখে গেল।

শুধুমাত্র স্মৃতিমেদুর টুকরো ছবির কেলোজ নয়, কবি সুভাষের নিজের চোখে দেখা ঘটনা এবং আবেগমুখর কলকাতার ইঁটের পাঁজরে লুকিয়ে থাকা ভালবাসার ঝরণাধারায় স্নাত হয়ে এক নতুন জীবনপোলব্ধি 'ঘুম ভেঙে কলকাতাকে বলি ঃ স্বপ্নকে সেই সুন্দর দিন চলো এগিয়ে আনি।'

'জগদ্দল পাথর'

'জগদ্দলে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তায় জ্বলে উঠলো আলো। কানে তালা ধরিয়ে কারখানায় কারখানায় বেজে উঠলো ভোঁ। হঠাৎ রাস্তা লোকে লোকারণ। হাঁ হয়ে খুলে গেল কারখানার প্রকাণ্ড গেট।"....

একটু অন্যধরণের লেখা 'জগদ্দল পাথর'। টুকরো টুকরো ছবি থেকে উঠে এসেছে ছোটোগল্পের স্কেচ।

জগদ্দলের ইউনিয়ন অফিসের নেতা সত্য দাশ, ছেলেবুড়ো সকলেরই 'মাস্টার মশাই।' অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও চটকল মজুরদের মধ্যে বেমালুম নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। অ্যালায়েন্স মিলের সুখদেও, মেঘনা মিলের বেনারসী অথবা সুলেমান মিঞা-র মতো মজুরদের আটপৌরে জীবনের কাহিনী, তাদের অভাবের সংসারে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, সংসারের জোয়াল টানার মানসিক চাপ, কারখানায় মালিকপক্ষের জুলুমবার্জি, তার সেইসঙ্গে হজম করতে হয় সর্দার আর বাবুদের চড়-লাথি'। ঘরে ঘরে তাদের একই অসুখ-অপুষ্টি, তার ওপর 'কাঁকর ভর্তি পচা রেশনের চাল। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে তারা গ্রামদেশের কথা ভাবে। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে বিকিয়ে গেছে তাদের জমি-জিরেত। পেটের ধান্দায়

যোগ দিয়েছে চটকলের চাকরিতে। সারাজীবন কাজ করেও চাকরি পাকা হয় না এদের—'অত্যাচারে অত্যাচারে 'ভোঁতা হয়ে গেছে মানুষগুলো মাঝে মাঝে তারা আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে।' ফস করে নিভে যায়।

তবুও অনাহারের জীবন আর ভালোবাসার লড়াইয়ের যারা শরিক সেই মাস্টারমশাই, এরশাদ বা ইউনিয়ন অফিসের লড়াকু নেতারা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে ডেকে তুলেছে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে। সাঁইত্রিশ সালে একবার ডুবতে বসেছিল চটকল সাহেবরা। গঙ্গার দু-পার জুড়ে তিন মাসের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চটকল। মজুরেরা এক হয়ে হাত গুটিয়ে জারী করেছিল হরতাল। আর তাই শেষ পর্যন্ত রিপোর্টারের কণ্ঠে পরোক্ষভাবে আশাবাদের সুরই ধ্বনিত হয়েছে—'বাংলার বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবে তারা অত্যাচারের সাদা জগদ্দল পাথর'।

এইসব শিকড়ছেঁড়া মানুষের প্রতি ভালবাসার জোরেই তাদের জীবনের ভাষা হয়ে উঠেছে। রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব শৈলীতে গড়ে ওঠা যেন ছোট ছোট গল্প লেখনীর ভাষা।

'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্রধরনের অভিজ্ঞতার একটি টুকরো ছবি 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা'। অজ পাড়া-গাঁ এ ঘুরতে ঘুরতে পরিচয় হয় চাটগাঁ-র কবি রমেশ শীলের সঙ্গে—'রমেশ শীলের নাম জানে না চাটগাঁয়ে এমন গাঁ নেই। রমেশ শীলের গান শুনতে শুনতে রাত যে কখন ভোর হয়ে যায়, কারো খেয়ালই থাকে না কারো কারো ভাবের ঘোরে এমন হয় যে, জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।' গ্রাম্য কবি রমেশ শীল, পূর্ববাংলার সমস্ত মুসলমানের কাছে যার আর এক নাম 'মাঝ ভাণ্ডারের মাঝি'। রিপোর্টাজকে অতিক্রম করে তৈরী হয়েছে ছোটগল্পের রেখাচিত্র।

জনৈক রমেশ শীল সম্পর্কে রিপোর্টার যা ভেবেছিলেন, তা একটুও মিলল না অর্থাৎ ভেবেছিলেন, 'কবি যখন তখন এত বড় লম্বা চুল হবে; মুখটা হবে খুব গম্ভীর, ভাবুক-ভাবুক, গায়ে যাকবে লম্বা হাত পাঞ্জাবি; আর কথা বলবে ছন্দের টানে হেঁয়ালির মতন করে। কিন্তু নিতান্তই আটপৌরে সাধারণ মানুষ তিনি—'গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। সারা গায়ে বার্ধক্যের বলিরেখা। রোদ্দুরে পোড়া তামাটে রঙ। অনেকখানি চওড়া কপাল।.....হাসলে রমেশ শীলকে ঠিক দু বছরের শিশুর মত দেখায়।'

এরপর শুরু হয়েছে রমেশ শীলের গল্প, বিশেষ করে তার কবিয়াল হওয়ার গল্প—একবার জগদ্ধাত্রী পূজোয় সদরঘাটের কবিগানের আসরে গিয়ে গান গাওয়ার সুযোগ পান অযাচিতভাবেই। 'সেই থেকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে, শুরু করে দিলেন গানের ব্যবসা। এরপর পূর্ববাংলার মাঝভাণ্ডারের পীরের কথা শুনলেন যেখানে গান দিয়ে সব উপাসনা হয়, 'চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সুরে গান হয় সেখানে। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান বছরের একটা সময় সেখানে এসে জড়ো হয়।' পীরকে দেখে মজে

গেলেন রমেশ শীল, এই অধ্যাত্মসাধনার পীরক্ষেত্রে একটানা সাতবছর গান গেয়ে কাটালেন। শুধু তাই নয়, সমাজের নানারকম অন্যায়, অবিচার আর আর নানারকম কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একাই মাথা তুলে দাঁড়ালেন তার গান নিয়ে—'অন্ধ মানুষগুলো তার গান নিয়ে চোখে দৃষ্টি পেল।'

এরপর স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসে যখন গাঁয়ে লাগল, তখন 'ক্ষুদিরামের ফাঁসি', 'পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ'—'এইসব নিয়ে তাঁর বাঁধা গান লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ঠিক করলেন, তার দলের কেউ কখনও কুরুচিপূর্ণ গান গাইবে না। মুন্সীরহাটে 'জনযুদ্ধ' কাগজ হাতে পেয়ে দেশ সম্পর্কে আরও আগ্রহী হলেন, ঠিক করলেন সারা চাটগাঁয়ে এবার গান দিয়ে মানুষ জাগাবেন। এরপর লাম্বুরহাটের ফনি বড়ুয়াকে সাগরেদ করে প্রচুর গান রচনা করলেন। অবশেষে ঠিক করলেন সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবেন। কিন্তু ধর্মের জগতের বুজরুকিটা যখন ধরা পড়ল তার চোখে তখন 'গেরুয়াতেও বৈরাগ্য এল।' আরাকান পেরিয়ে চলে গেলেন বর্মায়। সেখানেও বাঁচার কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলেন দেশে। কাজ শিখতে লাগলেন ঘড়ির দোকানে তার রাত্তিরে এগাঁ থেকে ও গাঁয়ে গান শুনে বেড়ান। এভাবেই একদিন 'নিজের মনের ভেতর থেকে গান বেরিয়ে এল।'

গল্পের শেষে নতুন ধরনের কবির লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। চাটগাঁ শহরে হিন্দু মুসলমানের একটা বড় জমায়েতে মূল গায়েন রমেশ শীল আর ফণি বড়ুয়া সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নেমেছেন ফণি বড়ুয়া আর মজুতদার সেজেছেন রমেশ শীল। এ এক নতুন ধরণের কবির লড়াই—এর মধ্যে ব্যক্তিগত গালাগালি নেই, অর্থহীন কথা-কাটাকাটি নেই—শুধু আছে দুটো আদর্শের মধ্যে ক্ষমাহীন সংগ্রাম।'

এবার, গোটা হল জুড়ে একটা জিজ্ঞাসাই গমগম করে ওঠে; 'চাটগাঁর মানুষ মরবে কি'? কিন্তু চড়া গলায় শপথের সুর বেজে ওঠে— 'না, মরবে না।'

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বজ্রের কানে তালা ধরিয়ে আওয়াজ উঠতে থাকে : 'হিন্দু মুসলিম এক হও।'

শুকনো বারুদে আগুন লাগিয়ে গান শেষ হয় কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও রিপোর্টার আর শিল্পীদের খুঁজে পান না। গল্পের রেশ কাটতে না কাটতেই এখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গাল্পিক প্রতিভা আশ্রয় করে রিপোর্টাজকে। এভাবেই সৃষ্টি হয় সত্য ও সুন্দরের যুগলবন্দী।

'মেঘের গায়ে জেলখানা'

সাংবাদিকতার দায়ভার বহন করতে গিয়ে হরেকরকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় আর তাদেরই লড়াকু জীবনের শরিক হয়েছেন রিপোর্টার। শুধুমাত্র তথ্য চয়ন নয়, তার সঙ্গে পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত সহমর্মিতার যোগে তিনি হয়ে উঠেছেন সহযোদ্ধা। তিনি তো শুধুমাত্র কবি নন, একজন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী, আর তাই মানুষের দুর্দিনে তাদের ব্যাকুলতার কথা শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। ঘরোয়া ভঙ্গিতে ওদের গল্প বলার ছলে রিপোর্ট লেখার

যে ধাঁচটা তৈরি করেছিলেন তিনি। তা সত্যিই নতুন একটা মাত্রা পেয়েছিল সেসময়—যাকে বলা হয় রিপোর্টাজ, এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

'আমার বাংলা'র ছত্রে ছত্রে সার্চলাইটের কড়া আলো ফেলতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বাংলাদেশ—'তুমি যেখানেই যাও বাংলাদেশ তোমাকে টেনে নেবে।... পদাতিক সুভাষ একদিন পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বাংলাদেশের পথে পথে। বাংলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার বাসনা থেকেই তার এই প্রয়াস।'

মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বক্সার জেলখানা সমুদ্রের পিঠের ওপরে আধ মাইল লম্বা একটা কাঠের পোল যদি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে তবে মাথা বরাবর হবে এই জেলখানা প্রায় দু'-যুগ আগে ইংরেজরা প্রথম তৈরী করেছিল তাদের পুরনো কেল্লায়— 'ভূটানের কাছ থেকে লম্বা মেয়াদে ইজারা নেওয়া এই জায়গা। আরও ঘন জঙ্গল ছিল আগে। এখনও পাহাড়ের গায়ে শোনা যায় বাঘের ডাক। এখানকার মাটিতে ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায় বিষধর সাপ।.....ঝরনার জালে থিক থিক করছে রোগের বীজাণু। কাছে-পিঠে বাজার নেই। অগ্নিমূল্য সব জিনিস। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে ওষুধ অভাবে, হাসপাতাল অভাবে অবধারিত মৃত্যু।'

নিজের দেশকে ভালবেসে যারা পথে নেমেছিল, ইংরেজসরকার তাদের সেদিন দূর দেশান্তরের এই জেলখানা তথা বনবাসে পাঠিয়েছিল। এখানে অনেকের মতই ছিলেন স্বনামধন্য শিবশঙ্কর মিত্র, 'যার জীবন বাংলার অর্ধশতাব্দীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস। শুধু তাই নয় 'আর আছে বাংলার শহর-গ্রামের অগণিত মানুষের বিশ্বস্ত বহু প্রতিনিধি।'

এরপর রিপোর্টাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও সুভাষের কণ্ঠের বহুস্তরায়িত বাণী আছড়ে পড়ে ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তিগত একক শৈল্পিক স্তরে—'বাংলার মানচিত্রে খুঁজে পেলেও সে-দেশ বাংলা নয়। ইংরেজের ঘুঘু-চরানো ভিটেয় নির্বাসিত হয়ে আছে ভবিষ্যতের অশায় উন্মুখ আমার বাংলা।'

হাত বাড়াও

বাংলাদেশ পর্যটনের সূত্রে রিপোর্টাজ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় একসময় এসে পড়েন ফরিদপুরে। গাড়ী আসতে তখনও দেরী অনেক, 'পাতলা কুয়াশায় মোড়া পঞ্চাশের আকালের এক সকালে।' একটু দূরেই মিলিটারি ছাউনির পাশে দেখতে পেলেন একটা অদ্ভূত জন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চার পায়ে—'কুয়াশার মধ্যেও জ্বল জ্বল করছে তার দুটো চোখ।....সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন এক মায়া ছিল, যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়।'.....

জানোয়ারের মত সেই অদ্ভূত জন্তুটি আসলে 'অমৃতের পুত্র মানুষ।' বারো-তেরো বছরের এক উলঙ্গ ছেলে। মাজা পড়ে গেছে, হাঁটতে পারে না, চার পায়ে চলে। বাজারের রাস্তায় 'খুঁটে খুঁটে খায় চাল আর ছোলা।' সেখান থেকে তখনই আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে এলেন সুভাষ স্টেশনে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'সেই দুটি জ্বলন্ত চোখ শান্তি চায়। বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালী ফসলে, চাষীর গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি।

কারখানায় কারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি।'.....শুধু তাই নয়, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ঘনায়মান অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত চোখ জেগে আসমুদ্রহিমাচল এই বাংলায় পাহারা দিচ্ছে আর মাটি থেকে দুটো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে।".....

পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আঁচে মানুষ এতটাই অসহায় যে তার থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু বাংলাকে যে তিনি ভীষণ ভালবাসেন। আর তাই, এই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টায় এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে ভর করে তিনি বাংলার পাঠকের কাছে আবেদন করেছেন, 'যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি', আর তাই 'তোমরাও হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করো।'

'আমার বাংলা'য় মানুষের হরেকরকম জীবনকথাকে ব্যক্তিত্বের নিজস্ব আদলে উপস্থাপন করার রীতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর একান্ত নিজস্ব। জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে, সহজ -সরল গদ্যে রিপোর্টাজ রচনা করার অনায়াস ভঙ্গি থেকে উঠে এসেছে গল্প বলার মতো চিত্র নির্মাণের দক্ষতা। ছন্নছাড়া মানুষের জীবনের ছবি আঁকতে-আঁকতে তার নিজের আঁতের কথা'ও ধরা পড়েছে। বাংলার প্রতি ভালবাসার জোরেই 'আমার বাংলা' সাংবাদিকতার নিজস্ব গণ্ডী অতিক্রম করে পাঠকের মনেও রীতিমত আলোড়ন তুলেছেন। মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে সংকটবোধের কারণেই শিল্পীর এই হৃৎস্পন্দন।

যত দিন গড়াবে, মানুষ জানবে কবি 'সুভাষের অন্য সত্ত্বাকে। তো কেবল রিপোর্টার নয়। বাংলা ছোটগল্পের রসদ ও উপাদানেভরা মানুষের আর্তি মরমী চেতনার পুষ্পিত হয়েছে, 'আমার বাংলা' পরতে পরতে— শিরায় শিরায় কবির এ রচনা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে বাংলা ও বাংলাদেশের এক নির্দিষ্ট ইতিহাসের আখ্যান। তাঁর কাব্যচিন্তার পর্যালোচনার পাশাপাশি গদ্য সংগ্রহের এই অনন্য শিল্প-সৃষ্টির মূল্যায়ন নিত্য নতুন ভাবনায় চলতেই থাকবে।

এক কমরেড অনেক জীবনের কথা : উপন্যাসের ধারায়

জয়গোপাল মণ্ডল

'একটা উপন্যাস লিখব। বিশ-বাইশ বছর ধরে একটা ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। কেমন করে লিখতে হয় না জানায় লেখবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সত্তর সালের পর অবস্থা বৈগুণ্যে ধাক্কা দিয়ে আমাকে জলে ফেলে দিল। ভেসে থাকার জন্য আমাকে হাত-পা ছুঁড়তেই হলো। কিন্তু তাতে উপন্যাস হল কিনা জানি না।'—কবি নিজে এভাবে বিনয় প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হংরাস' (১৯৭৩) এর দ্বিতীয় সংস্করণের শিরোনামহীন প্রাক্কথনে। শ্রীশচন্দ্র দাশের এই কথাটি যদি শিল্পসম্মত রসিক পাঠক গ্রহণ করেন—'গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্প কর্ম্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে।'—তাহলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) যে ঔপন্যাসিক হিসাবে সফল, একথা নিংসন্দেহে বলা যায়। মোট পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন—'হাংরাস' (১৯৭৩), 'কে কোথায় যায়' (১৯৭৬), অন্তরীপ বা হানসেনের অসুখ' (১৯৮৩) 'কাঁচাপাকা' (১৯৮৯) এবং 'কমরেড' ঃ কথা কও (১৯৯০)। কবি যখন তাঁর কথাকে কাব্যের পাশে দাঁড় করিয়েছেন উপন্যাসের শরীরে তখন তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা কানায় কানায় পূর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ ও সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে তিরিশটি বসন্ত অতিক্রান্ত। যে বসন্ত তাঁর জীবনে ও কবিতার নানা প্রেক্ষাপটে; প্রচলিত রীতির পরিপন্থী। এই অভিজ্ঞতার আকর উপন্যাসের মূল ভিত্তি। লেখক যদিও বলেছেন, 'নিজেকে উপন্যাসিক বলিনা, কারণ বানিয়ে লিখতে পারি না। আমার উপন্যাস কতখানি উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উপন্যাসের একটা সুবিধে হল, অনেক কথা বলা যায়, খুব বেশি আঁটসাট না হলেও চলে।"—কোনও ঔপন্যাসিক এভাবে স্বীকার করেননি। এখানেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় মহৎ। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়লে, অনায়াসে পাঠক মুগ্ধতা লাভ করে, এক নির্দিষ্ট গতিতে টেনে নিয়ে যায় অন্তিমে। অবশ্য যেসব পাঠক তথাকথিত প্রেমের রোমান্স গন্ধযুক্ত আখ্যান খুঁজে বেড়ান, এ উপন্যাস তাদের জন্য নয়। পাঠককে হতে হবে সমাজ সচেতন, মানবিক এবং শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী। আমার মনে হয় তাঁর 'কাঁচাপাকা' এবং 'কমরেড, কথা কও', উপন্যাস দুটি আবার যে কোনও পাঠককে আকৃষ্ট করবে। ইতিপূর্বে তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনার আলো পেলেও শেষ দুটি উপন্যাস অনালোকিত থেকেছে। আমার আলোচ্য তাই শেষ দুটি।

রণেশ দাশগুপ্তের কথা মতো "তাঁর পাঁচটি উপন্যাসই কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের শুধুমাত্র ষাট, সত্তর ও আশির দশকের ঘটনা ও কুশীলবদের প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, উপন্যাস রচয়িতা ফিরে ফিরে গিয়েছেন শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও। পরবর্তী দশকগুলি বারবার ফিরে এসেছে কমিউনিস্ট ও আন্দোলনের, বিশেষ করে পদাতিক ধরনের কেন্দ্রিয় চরিত্ররূপে।"

একজন কমিউনিস্ট হিসাবে কবি যা চাক্ষুষ করেছেন, তাকেই উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। আত্মদর্পণে যে জীবনকাহিনী বিম্বিত হয়েছে, তাকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন উপন্যাসে। ফলে তাঁর আখ্যান কখনো আত্মকথনে এসেছে, কখনো আখ্যানে নিজে হয়েছেন প্রশ্নকর্তা। প্রচলিত ধারার মতো কাহিনীর পরে কাহিনী সাজিয়ে চরিত্রের নির্মাণ বা নাটকীয় দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেননি। তাঁর উপন্যাস বুঝতে গেলে জানতে হবে কবিকে, কবির জীবনের ওঠা-পড়া এবং সমকালের ভারতবর্ষ ও বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯, ১২ই ফেব্রুয়ারী। সমগ্র বিশ্বে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্বযুদ্ধের চরম তাপে দিশেহারা জগৎ। এমনই পালাবদলের ক্ষণে পৃথিবীর আলো দেখেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে কবির বয়স তখন পনেরো, ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সত্যভামা স্কুলে পড়ছেন—শিক্ষক ধর্মঘট হয়; এই ধর্মঘটে ছাত্র হয়েও কিশোর সুভাষচন্দ্র জড়িয়ে পড়ে। পরিণামে স্কুল থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। এরপর তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউটশনে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। শিক্ষক ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় এবং 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলী ধরবসু, সহপাঠী হল গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, খেলোয়াড় নির্মল চ্যাটার্জী। যথাস্থানে এলেন কবি। প্রেরণা আর মনের তাগিদে কবি হওয়ার স্বপ্নের বীজ পোঁতা হল। যাতায়াত শুরু হল শাঁখারিপাড়ার কল্যাণসঙ্ঘ-এর পাঠাগারের সাপ্তাহিক সাহিত্যচর্চার আসরে।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার প্রভাবে ছাত্র-আন্দোলনের অভিমুখ বদলে যায়। তখন কবির বয়স কুড়ি, যৌবনের রক্তরাগে তাঁর জীবনেও এল রাজনীতির যোগ; যুক্ত হলেন লেবার পার্টির সঙ্গে এবং পরে ছাত্র ফেডারেশনে। পড়াশোনা শিকেয় ওঠার যোগাড়। কবিতা লেখার বিষয় হল রাজনীতি। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন ডক-শ্রমিকদের সান্নিধ্য নিয়ে। তখন লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র স্মৃতিকথায় লিখেছেন— "বিশ্বনাথ দুবের কাছে আমরা মার্কস, এঙ্গেঁসল, লেনিন ও স্টালিন এর মূল রচনার (অবশ্য ইংরাজীতে) পাঠ নিতাম। হাজরা রোডের বাঁশতলার বস্তিতে খুপরি চালওয়ালা ঘরে আমাদের গোপন ক্লাস হতো। দেবীপ্রসাদ, সুভাষ ও আমি এই ক্লাসের নিয়মিত পড়ুয়া ছিলাম। মার্কসবাদী সাহিত্যের ভারতীয় প্রকাশনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করে বা খিদিরপুর ডকের সাম্যবাদী শ্রমিক বা নেতাদের সাহায্যে দু-চার কপি বই গোপনভাবে সংগ্রহ করা হত।... বলশেভিক পার্টির আওতায় বিশ্বনাথ দুবের পরিচালনায় মার্কসবাদের তত্ত্ব আস্বাদ করার অধ্যায়টি ছিল আমাদের সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমে পড়ার আগে গা গরম করার ব্যায়াম। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে আমরা সে সময়কার আর একজন বিখ্যাত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর চাকে জমে যাই। বলশেভিক পার্টি ছেড়ে

আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে ঢুকি।" (দ্বিগ্বিজয়ী পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা /পৃ. ৩৭)

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কবি আই. এ পাশ করেন, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে সম্মানিক দর্শনে বি. এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. -তে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাপে সে পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয়নি। এই সময় কবি অতিব্যস্ত—ছাত্র ফেডারেশনের হয়ে কায়িক পরিশ্রম করা, কাব্যচর্চায় পদাতিকের জনপ্রিয়তা কবির একাডেমিক পথ রুদ্ধ করে। কবি স্বয়ং বলেছেন, 'আমি যখন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়েছি তার কিছু আগেই আমার প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছে 'পদাতিক'।.....ছোট কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতাম। পোস্টার লেখা, পোস্টার সাঁটা, স্ট্রীট কর্ণার করা, চাঁদা তোলা—সবই করতাম। এইসবের মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম।" (ছাত্র ফেডারেশন ঃ ৪০তম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ/৫-৬মে, ১৯৭৬)— বোঝা যায় কবি পদাতিকের অন্বিষ্ট সাধারণ মানুষ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের বক্তব্যে তিরিশ-চল্লিশ দশকের ছবিটা স্পষ্ট ধরা আছে—"১৯৩৭ থেকেই পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের দৌরাত্ম শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯ সালে। ১৯৪৫-এ পরমাণু বোমায় পলকে প্রলয় ঘটিয়ে হল তার অবসান। এই ক'বছরের মধ্যে ভারতের মাটিতে ও রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্তন হতে লাগল। ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র হলেন কংগ্রেস সভাপতি। .....১৯৪১-এ বাংলার কবিগুরু লোকান্তরিত হলেন। এক বছর পরে শুরু হল গান্ধীজির শেষ আন্দোলন 'ভারতছাড়ো'।"—এরপর এল ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগের নেপথ্যে কারণস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বড় হয়ে দেখা দিল। খণ্ডিত স্বাধীনতা এল। কবি রাজনৈতিক কাজকর্মের সাথে সাথে কবিতা লিখেই চললেন—অগ্নিকোণ (১৯৪৮), চিরকূট (১৯৫০)। এই সময় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে জেলও খাটলেন। পত্রিকা (পরিচয়) সম্পাদনার কাজেও আন্তরিক ছিলেন। শুরু হল পার্টির মধ্যে বিভাজনের সূত্রপাত—চীনপন্থী ও রুশপন্থীদের দলাদলির মাধ্যমে ১৯৬৪ তে পার্টি ভেঙে দু'টুকরো হল। তারপর বামপন্থীদের ক্ষমতাদখল ও তাদের শাসক হয়ে ওঠা—এই দীর্ঘ পর্ব ধরা পড়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাসে। 'কাঁচাপাকা' উপন্যাসে যেন কবিকে খুঁজে পাই'। কীভাবে এক কিশোর ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠেছে, তারই অনুপুঙ্খ রূপায়ন। এবং 'কমরেড, কথ কও' উপন্যাসে দেখব পার্টি বিভাজনের পরিণাম—দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে লাঠির ঘায়ে এক প্রবীন কমরেড আহত-মুক হয়ে গেলেন; তাঁর কাছে প্রশ্ন নিয়ে লেখক নিজেই যেন হাজির।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ এর যুগান্তর পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৯-এর জানুয়ারী। মোট এগারটি অধ্যায়ে লেখা। 'প্রচ্ছদ লেখা 'অংশে উল্লেখ করা হয়েছে—"এর কাহিনী লেখকের স্বকল্পিত, নাকি বস্তুতই এক বাউণ্ডুলে

যুবকের স্ববর্ণিত আত্মজীবনী—তার মীমাংসা সত্যি যেন দুরূহ। কেননা অপ্রতিরোধ্য কৌতুহলকর কাহিনী হয়েও এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জীবন্ত এই রচনা যে, বারবার মুছে যায় বাস্তব কল্পনার সীমারেখা।" (গদ্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড/ পৃ:৫০৪)।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কালীঘাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। নাম কচি। ঘন্টা নাড়ানো পুরুতের বংশ। কালীঘাট মন্দিরে পূজার বরাত ঠাকুরদার ভাগ্যে জুটেছিল একদিন। বুদ্ধিমান ঠাকুরদা সেটা বেচে দিয়ে কালীঘাটের গলিতে মাথা গোঁজার এক আশ্রয় নিয়েছিলেন, টোল চালাতেন। আর বাবা ছিলেন আলিপুর কোর্টের উকিল। ছুটির সময় সপরিবার চলে যেতেন। 'ঝাঝা-শিমূলতলা'য়। 'তখন যাকে বলা হত সন্ন্যাস রোগ', তাতেই মারা যায় বাবা। উড়ে এসে জুড়ে বসে 'কোথাকার কে এক মামা'। সমগ্র উপন্যাসটি এই কচির আত্মকথনে 'সুভাষদা'কে লেখা। ছাপানোর জন্য এবং তার বংশধর ছেলে যাতে ভবিষ্যতে পড়ে সেজন্য সুভাষদাকে পাঠিয়েছে, তখন সে একেবারে কাঁচা নাবালক থেকে একেবারে পাকা।

কচি নাবালক বয়স থেকে পায়ের তলায় সরষে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কেননা পিতৃহীন হওয়ার স্বাধীনতায় সে পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেছিল। কচির কথায় তার বয়সের পরিচয় ফুটে ওঠে—"যে বয়সে বেশির ভাগ ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে, আমার তখন সেই বয়েস। ন্যাড়া হতে হয়েছে দু'বার। পৈতে হওয়ার সময় এবং বাবা মারা যাওয়ার পর।' একদিন মামা তার মা'র কাছে বলে, বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে।"—সেই রাত্তিরেই কচির মনে ভবঘুরে হওয়ার সাধ জন্মে, মাকে একটা চিঠি লিখে বেরিয়ে পড়ে—

'আদরের মা,

আমার জন্যে ভেবো না। আশীর্বাদ করো, তোমার কচি যেন পাকা হয়ে ফিরতে পারে। জানি তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু বেশিদিন নয়।'

—উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চিঠির মধ্যে দিয়ে জীবনযুদ্ধের লড়াই-এর ইঙ্গিত স্পষ্ট। জীবন-অভিজ্ঞতায় কচি সমৃদ্ধ হবে। সে পথে বেরিয়েছে—প্রথমে কলকাতার বর্ণনা—

"সে সময়ে ভোরের কলকাতায় হোসপাইপে রাস্তা ধোয়া হত। খাটালে খাটালে দুধ দোয়াবার চিড়িক চিড়িক শব্দ। লাঙট পরে ঘাড়মোটা মাঠে ছোটাছুটি করে ঘোড়াগুলো নিজেদের চাঙ্গা করছে। ভুঁড়িওয়ালা লোকেদের পেছনে ফেলে একদল ছোকরা দৌড় প্র্যাকটিস করছে।

ল্যাভলেনের পাশে নরম ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে গলফ্‌স্টিক হাতে সাহেবসুবোর দল।"—না কচি ঘুরতে নয়, সে বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। হাওড়া স্টেশনে ঢুকে একটা ট্রেন মোগলসরাই যাবে বলে উঠে পড়ে। আচমকা ঘুম ভাঙতেই দেখে জশিডি স্টেশন। এই রাস্তা দিয়ে অনেকবার সে বাবার সাথে ঝাঝা-শিমূলতলায় এসেছে। মনে পড়ে গেল

এখানে কালীঘাটের পাণ্ডাবংশের লোক হিসাবে বাবার পরিচিতি আছে। নেমে পড়ে ঝাঝা। এই প্রসঙ্গে তার কথায় ফুঠে ওঠে অদ্ভুত এক তথ্য—'সান্ত্বনা ছিল এই যে এটা বিহার রাজ্য। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠতেই হবে। এরাজ্যে কাউকে যেন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই।' এমন অকপটভাবে কেউ বলতে পারে? যদি বিহারীরা শোনে, জাতিদাঙ্গা লেগে যেতে পারে। কিন্তু কবির সত্য সত্যই। তার জন্য পিছু হটতে বা ভয় পেতে জানেন না।

ঝাঝাতে এসে বন্ধু রাম অবতারের কাছে কোয়ার্টারে ওঠে। রাম লোকোতে কাজ করে। কাল্লু বলে একটা ছেলের সাগরেদ হয়ে কয়লা চোরাই-এ লেগে গেল কচি। একদিন রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ছেড়ে দেয় কাজ। তারপর দেওঘর থেকে চাল এনে বিনা টিকিটে ঝাঝায় বিক্রি করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে রাম অবতারের ঋণ শোধ করল। জশিডি স্টেশনে চালসুদ্ধ একদিন আবার ধরা পড়ে। সেখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়ে। কচির কথায় সে সময়ের কথা ফুটে উঠেছে—'যুদ্ধ চলছিল বলে সে-সময়ে সব কিছুরই কন্ট্রোল। সাহুজি বলে এক মারোয়াড়ি বানিয়া তখন কন্ট্রোলে চিনি দিত। লোকটা ছিল হাড়-হারামজাদা। 'স্টক শেষ' নোটিশ দিয়ে বেশির ভাগটাই ব্ল্যাক করত।" —বোঝা যায় এ উপন্যাসে কচির বয়স যখন চোদ্দ কি পনেরোর আশপাশে, তখন যুদ্ধ চলছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন কবির বয়সও ছিল এর কাছাকাছি। কচির 'পকেটে পনেরো টাকা', পাটনার একটা টিকিট কেটে কচি আবার ট্রেনে করে পাটনা। না পাটনা ভালো লাগেনি, চলে গেল বেনারস। ঘুরে ঘুরে বেনারসে কোনো কাজ না পেয়ে চলে গেল এলাহাবাদ। এই প্রথম কচি একটা বেকারি কারখানায় কাজ নেয়— 'সিতারা বেকারি'। একদিন জ্বর হলে মাল সাপ্লাই দিতে গিয়ে পড়ে যায়। নষ্ট হয় কিছু। মালিক বিশ্বাস করেনি। এভাবে দেখল এলাহাবাদ ও বেনারস। বেনারস সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিলনা। —'কাশী আমার একদম ভাল লাগেনি।...রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই। রিক্সা, পকেটমার, ফেরিওয়ালা, গুণ্ডা-মস্তান আর ধর্মের ষাড়।' এলাহাবাদ থেকে জানল—"সিতারা বেকারির মালিকের মত এমন অর্থপিশাচ লোক আমি দুটো দেখিনি, বেরিয়ে ট্রেন ধরে একেবারে 'লালকেল্লা'।

—'চড়া পড়ে যাওয়া, এই নদীটাই তাহলে যমুনা। দিল্লী দেখব, আমার কত দিনের স্বপ্ন। পেটে খিদে, বাড়ির কথা—সমস্তই এক দণ্ডে ভুলে গেলাম।'

পথে পরিচয় মকবুল খানের সাথে। কাজ জুটে গেল তার রেস্টুরেন্টে—এঁটো গ্লাস ধোয়া আর বাবুর্চিখানা থেকে মাল নিয়ে দোকানে পৌঁছে দেওয়া।' কচির মুখে ইংরেজি শুনে মকবুল তাকে বিশ্বস্ত কর্মীর জায়গায় বসায়। বয়-এর কাজ থেকে একেবারে গদিতে বসায়। রোজকার আয় 'ফেলে ছেড়ে' 'সাড়ে তিনশো টাকা'।

—'হিন্দুর ছেলে ততদিনে পুরোপুরি মুসলমান বনে গিয়েছি। পরেনে শালোয়ার, আচকানের ওপর হাতকাটা ফতুয়া, মাথায় কিস্তি টুপি, চোখে সুর্মা, কানে গোজা আতর। একেবারে পুরোদস্তুর এক আবু হোসেন।'

ফুর্তিবাজ মকবুলের ছিল মদ-আর বাইজির নেশা। একদিন সেই সূত্রে পরিচয় হল, বাইজি আনজুর সাথে। হয়তো এই নেশার টানে মশগুল হতে পারত কচি, কিন্তু তার মধ্যে মানুষ হওয়ার একটা চেতনা বারে বারে তাড়া করে, ভাই-বোন-মার জন্য তাকে পাকা হতে হবে। মাতৃস্বরূপা আনজুর কথামতো বেরিয়ে পড়ে ট্রেনে, বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু মোঘলসরাই পৌঁছে দেখে তার টিকিটসহ পুঁটলি চুরি গেছে। বিনা টিকিট-এর যাত্রী হিসাবে ধরা পড়ে, যায় জেলে— জেল থেকে কচি পেল এক অন্য অভিজ্ঞতা—'যারা জেলখানার বাস্তুঘুঘু তারা দিব্যি থালা বাজিয়ে গাইছে হাসছে। কিংবা নানারকম রসের কথা বলছে।'

'সকাল সাড়ে পাঁচটায় ডেকে দেয়। গোড়ায় ব্যারাকে ধরে, তারপর সব ব্যারাক নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে দু'দফায় গুনতি। তারপর ঢং। চিবোও প্রাতরাশ ছোলাসেদ্ধ। আবার ঢং। চলো ফুর্তিসে কাজে।.....খাওয়ার পর সবাই শোয় না। কোথাও বসে গানের আসর, কোথাও চলে রাজা-উজির মারা আড্ডা।....এসব ব্যাপারে কয়েদি সেপাই ভাই-ভাই। : মদ-জুয়োর ঠেক! কী নেই শ্রীঘরে।"—এখানেই পরিচয় হয় এক ভদ্র চেহারার টাকওয়ালা—সাংঘাতিক ইনক্লাব জিন্দাবাজী বাঙালীর সাথে। সবাই বলে 'গোঁসাইজী'। কচির কথায়— 'গোঁসাইজী আমাকে দেশ-বিদেশের নানা কথা শোনাতেন। লেনিন, কার্লমার্ক্স, মে-ডে, রুশদেশ, মাও সেতু। ওঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর ভাবতাম—ইস আমি কী কাঁচা।" কচি ছাড়া পাওয়ার আগে তাঁকে 'নৈনী জেলে' স্থানান্তরিত করেছে। 'দু'মাসের বেশি কোথাও ওঁকে রাখতে ভরসা পায় না।'

জেল থেকে বেরিয়ে বম্বে মেল ছাড়ছে দেখে উঠে পড়ে। পৌঁছে গেল কাটনি। আবার কোনো অনিশ্চিতের দিকে। কাটনি থেকে জব্বলপুর। ঝাড়ুদারের অভিনয় করে কোনো প্রকারে স্টেশান থেকে বেরিয়ে গেলেও অবসন্ন শরীর।—'রাত বাড়ছে দেখে একটা বাড়ির রোয়াকে নেতিয়ে পড়লাম।... কাঁচা ঘুমে আমার মাথায় রুলের গুঁতো মেরে কে যেন বলছে ওঠ।.... দু' একটা প্রশ্ন করতেই বেরিয়ে পড়ল, দৃশ্যত বেরোজগেরে আমি একজন ভবঘুরে। সুতরাং বিধিবদ্ধ স্থান হল জেলের চার দেওয়াল। সারা রাত থানা-হাজতে থেকে পরদিন আদালতে হাজির হয়ে পনেরোদিন পরে শুনানির হুকুমনামা নিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম জেলখানায়।" —এখান থেকে অভিজ্ঞতার ফসল তিন মাসের। জেল থেকে বেরিয়ে ঘটনাক্রমে পরিচয় হয় 'লাল্লু'র সঙ্গে।

লাল্লু থাকে এক বস্তিতে, মাছ বিক্রির ব্যবসা। 'লাল্লুর একটা মাউথ অর্গান ছিল। কী ভাল বাজাত বলার নয়।' পুলিশের তাড়নায় এখান থেকে আবার পালাতে হয়। ভবঘুরে হয়ে ভেসে ভেসে পৌঁছয় দাদার, কেটলি নিয়ে চা বিক্রেতার কাজ শুরু করে। তারপর এক আগরওয়ালজীর দোকানে কাজ—'বারো ঘন্টা শিফট ডিউটি। খেতে দেবে। মাস মাইনে পঁয়তাল্লিশ।" কিন্তু এখানেও স্থায়ী হয়নি কচি—এক বাঙালী কিশোরীকে ঘিরে শোরগোল হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দেখে সে মেয়ে অঞ্জলি নয়, নমিতা। সিনেমায় নামতে সে

এসেছে বোম্বাই। স্টেশনের গুণ্ডা-মস্তানদের হাত থেকে বাঁচিয়ে কোনও প্রকারে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু যাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে তারা তো ছাড়বে না—'অঞ্জলি—থুড়ি নমিতা চলে গেল বটে, কিন্তু স্টেশনের গুণ্ডাদের সেই যে আমি বাড়া ভাতে ছাই দিলাম, তারপর থেকেই আমি হয়ে গেলাম ওদের চিরশত্রু।"—এতদিনে কচি আবার বুঝল যে 'দুনিয়াটা বড় কঠিন জায়গা'।

এরপর মেহেরের সঙ্গে আলাপ হয়। মেহেরের সঙ্গে চলে গেল পুনা। তারপর বোম্বাই। বোম্বাইতে মেহেরের চোরাই মদের ব্যবসা। বিস্তর পয়সার হাতছানি। মেহেরও দেরাজ খুলে দিয়েছিল কচির কাছে। শিবাজী পার্কে মেহেরের ফ্ল্যাটে এসে পায় মীনা ইরানি। মীনার প্রেমে কচি হাবুডুবু। জীবনের সব অন্ধকার, আলো আঁধারি দেখে ফেললেও এটাই বাকি ছিল কচির জীবনে। মীনা উপুড় করে দিয়েছিল সব। কচি বলেছে, 'ভালোবাসা কাকে বলে এই প্রথম জানলাম। মীনা বুঝেছিল আমি আনাড়ি।....আস্তে আস্তে আমি পাকা হয়ে উঠলাম। ও তখন আমার হাতেই পুরোপুরিভাবে নিজেকে ছেড়ে দিত। ওর একটা জিনিস আমাকে শুধু অবাক করত। ওকে যখনই আমি আনন্দ দিতাম, মীনা ফুলে ফুলে উঠে কাঁদত।'—এই বিপ্রতীপ অনুভূতির সদর দরজা খুলে গেল—একদিন কচি এসে দেখে মীনা মেহেরের কাছে সর্বাঙ্গ মেলে শুধু, কচিকে দেখে সহজভাবে বেশবাস ঠিক করে নেয়। মনে মনে কচি বলে, 'মেহের ঐ রকমের। ওর মধ্যে ঘেন্না পিত্তি বলে কিছু নেই। ওর কাছে খাবার হলেই হল। তা সে এঁটো হোক, মাটিতে পড়ুক।'...আসলে ও ছিল মেহেরের রক্ষিতা।'—কচির জীবনের প্রথম প্রেম আকাশভরা অভিমানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই প্রথম কচি গোগ্রাসে নীট হুইস্কি খেয়েছে।

পুরনো 'আমি'কে রেখে কচি ফিরে যেতে চায়। ভি. টি. স্টেশনে ট্রেনে বসে জানালা দিয়ে দেখে দাদার স্টেশনের চাওয়ালা যেন সে, কিন্তু দিল্লী থেকে যখন সে ফিরছিল। তখন ওর কচিমন কেঁদে উঠেছিল মায়ের জন্য। আর বোম্বাই থেকে যখন সে ফিরতে চাইছে তখন তার মনের আকাশে স্বপ্নের ডালাপালায় ছড়িয়ে আছে মীনা ইরানী, হয়তো তারই রক্ত বহন করে চলেছে কোন সমুদ্রের দিকে। যতবার সে মায়ের কথা মনে করতে চাইছে, ততবার মীনার মুখটা ভেসে ভেসে আসছে সাদা পালকের মতো। তার নিজের কথায় ফুটে উঠেছে তার বর্ত্তমান পরিচয়—'কচি এখন আর কুয়োর ব্যাঙ নয়। কচি খোকা তো নয়ই। এমনকি শুধু কচিও নয়—একই সঙ্গে সে হিন্দু, সে মুসলমানও।...কচি বুঝেছে নাম, তার পদবী, জাতপাতের বালাই—এসব কিছু নয়। এ সমস্তই ওপরের খোসা।'.....রাম অবতার, লাল্লু, মেওয়ালাল, আনজুবাই, মেহের, মীনা—এরা সবাই হাতে হাত লাগিয়ে কচির মনের জগৎটাকে টেনে বড় করে দিয়েছে।"

কাঁচা কচি পাকা হয়ে কলকাতায় ফেরে। কিন্তু কোনো এক পরিচিতের হাত ধরে আবার চলে যায় আসানসোলের কাঁচের এক নতুন ফ্যাক্টরীতে। এখানে এসে শ্রমিক মালিকের

সম্পর্কের দ্বন্দ্বে নতুন স্বাদ পায়। সে বোঝে লড়াই ছাড়া তার আর কোনো অস্ত্র নেই। মালিক ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রকৃত শ্রমিক ইউনিয়ন করে। তার নিজের কথায় 'আমি', হোসেন আর ওঝা। কারখানায় আমরা ছিলাম তিন মুখিয়া।' পরিচয় হয় নিরসার অতুলদার সাথে। কচি বুঝল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-স্তালিন-মাও-হো-চিমিন, সব যেন অতুলদার জানা। অতুলদা ছিলেন কমিউনিস্ট কনসলিডেশানের মেম্বর'।

সহজ-সরল ভাষার লালিত্যে, ভাবনার স্বারস্বতে গঠন কৌশলে ও উপন্যাসটি সত্যি অভিনব। জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় কেমন করে এক কিশোর জীবনের সার সত্য উপলব্ধি করেছে। তারই সফল রূপায়ন, মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনে কচি কীভাবে কাঁচা থেকে পাকা হয়ে ওঠে। একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে জীবনের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তরণ লাভ করে এ উপন্যাস তারই যথার্থ উদাহরণ। যেভাবে কাহিনী, নানা ঘাতপ্রতিঘাতে কচি পাকা হয়েছে, কিংবা কবিকে পাকা করার চেষ্টা লেখক করেছেন, তার বাস্তবতা নিয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতেই পারেন। তবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক জীবনের স্বাদ এখানে পাই। তাই উপন্যাসের শুরুতেই দেখি কবি ভণিতা নিয়েছেন—এক কচির আত্মজীবনীতে লেখা নিজের নামে ছাপার অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস।

উপন্যাসের নামকরণ অতি সহজ, বিষয়ভিত্তিক এই শিরোনামে স্পষ্ট ঘোষিত হয় উপন্যাসের কাহিনীর গতিমুখ। স্বল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে এক কিশোর জীবনের পরম পরিণতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তারই সুণিপুণ নির্মাণ 'কাঁচাপাকা'। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে আমরা দেখেছি মাত্র দু'ঘন্টার অভিজ্ঞতায় সমাজ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হয়েছিল কাঙালি, আর এখানে কয়েক মাসের যাত্রাপথে এক পদাতিকের আখ্যান।

'কমরেড: কথা কও' উপন্যাসটিতেও স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট নেতা এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম সূচিত হয়েছে। এক কমরেডের বিচিত্র জীবনকাহিনীর চালচিত্রে—লেখকের সৎ-সাহসের পরিচয় ফুটে ওঠে।

'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসটি ১৯৮৯ এর 'আনন্দলোক' এর পূজা বার্ষিকীতে প্রথম এবং ১৯৯০ এর জানুয়ারীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ সপ্তাহে 'মানুষ ভুলব না বলেও—ভুলে যায়' শীর্ষক শেষের পাতায় সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী লিখেছেন, "কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনে পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন, "কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনে পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন। সুরেন ধরচৌধুরীর জীবন কথার আদলে তাঁর উপন্যাস 'কমরেড' কথা কও'। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকায় কেন একবার এই প্রশ্ন রেখেছিলাম, লেখকের কাছে। তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, বর্তমান প্রজন্ম দেখুক, আমাদের রোমান্টিক নায়ক কারা ছিলেন।"— বোঝা যায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখার প্রেক্ষিত এবং উদ্দেশ্য কী।

প্রসঙ্গত 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকের 'শেষের পাতা' থেকে জেনে নেওয়া যাক কবি

সুভাষের নায়ক 'ভাইসাহেব'-এর প্রকৃত পরিচয়—"বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য ত্রিপুরায় চক্র টাউন এক শিক্ষিত ধনী পরিবারে ১৯১০ সালে সুরেন্দ্র চন্দ্র ধর চৌধুরীর জন্ম। বাবার নাম বিপিনচন্দ্র ধর চৌধুরী। তিনি যখন কলেজের ছাত্র সেই সময়ে বিপ্লবী অনুশীলন দলের সদস্য হন। সমিতির সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার সময়ে তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হন। ১৯৩৩ সালে তাকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সদস্য হন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে তিনি ৩৭ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। ওই সময়ে আন্দামানের রাজবন্দীদের নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলে ১৯৩৮ সালে তাঁদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি পুনরায় ৩৬ দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী পার্টির নির্দেশেই শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিলেন। বারাকপুর টিটাগড় অঞ্চলে। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাননি। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্র ধর চৌধুরীর মা-বাবার জীবনাবসান হয়েছে। গ্রামে যেটুকু সম্পত্তি ছিল তা আত্মীয়স্বজনের দখলে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে গ্রামে ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার জন্য বললেও তিনি রাজী হননি। বিষয় সম্পত্তির ওপর তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই বলেই জানালেন। সেই থেকেই ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলই তাঁর কর্মক্ষেত্র। তিনি শ্রমিক পরিবার থেকে অনেককেই কমিউনিস্ট পার্টিতেও আনেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' এর যুগে। নিবেদিত প্রাণ পার্টি কর্মী হিসাবে তিনি এ লড়াইয়ে অংশীদার। ১৯৫১ সালে পার্টি গণআন্দোলন গণসংগ্রামের রাস্তায়, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী ক্রমশ হয়ে উঠলেন শ্রমিকদের আপনজন। সুরেন্দ্র থেকে সুরেন ধর কমরেড। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনায় 'ভাইসাহেব'।

১৯৬৪ সালের সি. পি. আই দলে ভাঙন। তিনি থেকে যান সি. পি. আই দলেই। পার্টি দপ্তরই তাঁর বাসস্থান। তাঁর স্নেহভাজন অনেকেই তখন সি. পি. আই (এম. এল) দলে কিংবা সি. পি. আই (এম) দলে। সুরেন ধর চৌধুরী আসল কর্মস্থান বারাকপুর টিটাগড় হলেও তাঁর কর্মস্থান বিস্তৃত হয়। তিনি হন ওই দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম নেতা ও কোষাধ্যক্ষ। পার্টির মুখপাত্র দৈনিক কালান্তর পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। রোজ সকালে তিনি বারাকপুর থেকে ট্রেনে কলকাতায়। আবার রাতে বারাকপুর থেকে ট্রেনে কলকাতায়। আবার রাতে বারাকপুর। প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের অনেককেই তিনি কালান্তরের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এঁরা হলেন বঙ্গেশ্বর রায়, মধু ব্যানার্জী, রণধীর দাশগুপ্ত, হরিপদ দে। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতি দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় নন্দী, অনিল ভঞ্জ এঁরাও তখন মুখপত্রে যুক্ত হলেন। ১৯৭০ সালের মার্চে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ধারা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী ও হিংস্র আক্রমণমুখী। সুরেন ধর চৌধুরী সেদিন একটু আগেই

ট্রেনে বারাকপুর ফিরছিলেন। ট্রেনে থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছেন পার্টি দপ্তরের দিকে। তাঁর পার্টি সি. পি. আই দলের একটি ছোট মিছিল যাচ্ছে। হঠাৎ তিনি দেখেন ওই মিছিল ঘিরে ফেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী সি. পি. আই (এম.) দলের কর্মীরা। তাদের আক্রমণ করছে। সুরেন ধর চৌধুরী দেখলেন আক্রান্ত ও আক্রমণকারী এদের সকলকেই তিনি একদা পার্টিতে এনেছিলেন। তাঁর মনে হল তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বোধ হয় এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে। বয়সে বৃদ্ধ হলেও তিনি একপ্রকার ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন। আক্রমণকারীর দল উত্তেজিত। তারা সি. পি. আই-এর একজন বড় নেতাকে সামনে পেয়েছে। তাদের সামনে সে-ই শত্রু। রডের বাড়ি পড়ল মাথায়। তিনি লুটিয়ে পড়লেন। তখন আক্রমণকারীরা পালাল। অচৈতন্য সুরেন ধর চৌধুরীকে নিয়ে যাওয়া হল বারাকপুর হাসপাতালে, সেখান থেকে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। এভাবেই কাটল কয়েকমাস। চিকিৎসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত সুরেন ধর চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারিখটি ছিল ১৯৭০ সালের ২৫ ডিসেম্বর। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে। ব্যাপক সংঘর্ষ এমনকী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই সময়ের পরিস্থিতিতে সিপিআই নের্তৃত্ব মাথা ঠাণ্ডা রেখে এলাকা শান্ত রেখে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। তখন রাজ্যপালের শাসন, সুরেন ধর চৌধুরীর মরদেহ আলাদাভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে সি পি আই কর্মীরা অবনত মস্তকে পায়ে হেঁটে বউবাজার থেকে কেওড়াতলায় গিয়েছিলেন সারিবদ্ধভাবে।"

এই সুরেন ধর চৌধুরী ছিলেন সেদিনের প্রৌঢ় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রোমান্টিক নায়ক। যিনি ভালোবেসেছিলেন শ্রমিক মানুষকে, আর প্রাণ দিলেন কিছু বিকৃতমনা কমিউনিস্টদের হাতে। 'কমরেড' কথা কও' উপন্যাসে এই বিপ্লবী নায়কের জীবনের কথাকে আখ্যায়িত করেছেন। যিনি জীবনের সিকিভাগ কাটালেন জেলখানায়, পার্টি এবং মানুষের স্বার্থে জীবনের ব্যক্তিগত চাহিদা-সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে ভাগ হয়ে পার্টি এবং তার পরিণামস্বরূপ সুরেনধর চৌধুরীর জীবনাবসান— এসবটাই চৌত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে কবির মরমী জিজ্ঞাসার কলমে। প্রতিটি অধ্যায়কে এক একটা শিরোনামে অলংকৃত করেছেন। মনে হয় এক একটা ছোট-ছোট গল্প জুড়ে এক নায়কের জীবনের ভাঙা গড়ার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। যে গিরিধারী, আলম, মাধবকে জীবনের আলো দেখিয়েছিলেন সুরেন ধর চৌধুরী, বার্ধক্যে সেই কমরেডরা ছেড়ে গিয়েছে। অথচ তারাই আবার তাদের দীক্ষাগুরুকে বলছে 'দলছুট'। এমন বিভ্রান্তিকর ও বেদনাদায়ক কাহিনীর বিস্তার এ উপন্যাস। রণেশ দাসগুপ্ত বলেছেন, 'যদিও অনেক আগেই তিনি নিজেকে তার কমিউনিস্ট সত্তা থেকে খারিজ করে

সরে দাঁড়িয়েছেন, তবু ৯৬ -এর সূচনাতেও আমরা তার সৃষ্টিকে খারিজ করে দিতে পারছিনা.....।"

সরলগদ্যে, ছোট ছোট বাক্যে—এমনকি লোককথার অপূর্ব প্রয়োগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও তার বিষয়বস্তু পাঠকের মনকে জয় করে আনায়াসে। এমন একটা টান তাঁর গদ্যে ও রোমান্টিকতায় যে পাঠকের মনে গেঁথে যায় শব্দমালা। অধ্যায় যেন নয়। ছোট ছোট অনুচ্ছেদ-সরল বিভাজন। তাঁর সংলাপে যেন উভয় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—চরিত্রের সঙ্গে লেখকের স্ব-সংলাপ প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি জেল খেটেছিলেন ১৯৪৮ এর মার্চ থেকে ১৯৫০-এর নভেম্বর। মাঝে তিন মাস মুক্তি পেয়ে ছিলেন। তাই তার উপন্যাসগুলিতে পাই জেলখানার কথা, জেল জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। তবে কোথাও লেখক রাজনীতির কথা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আখ্যানে কাহিনীর বয়ন করলেও কেন যে রাজনৈতিক তত্ত্ব বা আদর্শের গভীরতায় প্রবেশ করেননি, তা মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়, তাঁর কাছে মানুষের আবেদন আগে, রাজনীতি পরে—তা-ই এমন উদাসীনতা। উপন্যাস হিসাবে অনেকেই এগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যে না নিলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু যায় আসে না। কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিল তাঁদের সময়কার নায়কদের জীবনের কথাকে, মানবিকতার প্রতিমূর্তি রচনাতে। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সফল বলে মনে হয়। সুমিতা চক্রবর্তীর কথায়—চীনের শেষ পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং শিল্পের প্রতি বিশ্বাস—এই তিনকে একবিন্দুতে মেলাতে পেরেছে—তাতে সন্দেহ নেই কোনো।" (দিবারাত্রির কাব্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা। ২০০৪/পৃঃ ৩২০)।

গ্রন্থসূত্র :

১) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থসংগ্রহ— ২য়খণ্ড
২) আমার কালের কয়েকজন কবি—জগদীশ ভট্টাচার্য
৩) দ্বিগ্বিজয়ী পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়! কথা ও কবিতা
৪) ছাত্র-ফেডারেশন : ৪০ তম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ, ৫-৬মে, ১৯৭৬
৫) সপ্তাহ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ : একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া

সোমা ভদ্র রায়

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়, গদ্য নিয়ে কথা হয় কম। তাঁর রাজনৈতিক জীবন নিয়েও আলোচনা যথেষ্ট হয় কিন্তু উপন্যাস—এ বিষয়ে আমরা জানি কম, বলিও সে কারণে আরও কম। 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' পড়তে পড়তে কথাগুলো মনে এল। এ উপন্যাসে কবি লিখেছেন—"সন্ধ্যেবেলা যেমন সাপ বলতে সংস্কার বাধে অনেকের, বলে লতা, তেমনি এই রোগের নামও নাকি বলতে নেই। বলতে হয়, 'হ্যানসেনের অসুখ'। এক অদ্ভুত রোগ এরোগ থেকে সেরে ওঠার থেকে বড় অসুখ আর নেই। সারা পৃথিবী ফিরিয়ে নেবে মুখ। এমন কি কোনরকম হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া।" এক দুরারোগ্য ব্যাধি কবলিত মানুষের কাহিনী শুনিয়েছেন কবি, প্রকারান্তরে রোগাক্রান্ত সমাজের কথাই শুনিয়েছেন কবি। দু এ লাইন পড়া যাক—"যে ক'জনের নাক ঘসে গিয়ে দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সেই গন্নাকাটা, আঙুলখসা খোনা লোকগুলো গলা দিয়ে গোঙানোর আওয়াজ বার করে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে এমনভাবে তান্ডব নৃত্য জুড়ে দিল যে আমি তো একেবারে হতবম্ব"। এই উপন্যাসটি গভীর মমতায় লিখেছেন কবি—এ এক বিকলাঙ্গ বাতিল মানুষের গড়ে তোলা সমাজের কাহিনি।

একটি সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায় কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারি না। আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে, ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল। কথিকা ধরনের লেখা। পরিচিত মহলে তা নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।....চাক্ষুষ দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্পা। যা দেখেছি তার বেশি লিখিনি।" এমন স্বীকারোক্তি থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনের রসদ থেকেই উপন্যাস বা গল্পের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছেন। বানিয়ে লেখবার কথা ভাবেন নি। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপটও বেশ বাস্তব ও জীবন্ত।

১৯৮১ সালের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৯০-এ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। বইটি তৈরি হওয়ার ভিতরকার কিছু কথা আছে। পদাতিক কবি কোথাও স্থির থাকতে পারতেন না। অহরহ বেরিয়ে পড়েছেন—'পথে-পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা'—এমনই মনোভাব তাঁর। পথ পরিক্রমায় জমে উঠেছে নানা রসদ, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু তিনি বলেইছেন যে বানিয়ে লিখতে পারেন না, তাই বানিয়ে লিখতে হয়নি তাঁকে। রসদে টান পড়েনি কখনও। 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' গ্রন্থে লেখকের পশ্চিমবাংলার

বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে এই সব ভ্রমণকথা জন্ম-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে। নানা স্থান, নানা জনপদ, নানা মানুষজন দেখবার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার তাগিদ থেকেই এসব নিবন্ধ লেখা হতে থাকে। পরে এগুলি একসঙ্গে সংগ্রথিত হয়ে 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' গ্রন্থে স্থান পায়। এই পর্যায়ে ভ্রমণের সূত্রে তিনি গিয়েছিলেন বাঁকুড়ায়। সেখানে গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতাল ও খেজুরডাঙার আরোগ্যাবাসে তিনি গিয়েছিলেন। যেখানকার মানুষজনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে অন্য এক অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। সেই সময়েই একটা উপন্যাস লেখবার ভাবনা তাঁর মাথায় বাসা বাঁধে। অনন্য অভিজ্ঞতার শিল্পফসল এ উপন্যাস, 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' গ্রন্থের 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর' এবং 'মরাডালে ফুল' রচনাদুটিতে 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগীদের জীবন দেখেছেন লেখক, তাদের যন্ত্রণা, কষ্ট অনুভব করেছেন। নবজীবনপুরের আরোগ্যবাস যাদের সহায়তায় তৈরি হয়েছে সেই দম্পতিকেও তিনি চিনেছেন নিবিড়ভাবে। সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্ত নিজেরাও একসময় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা আরোগ্য লাভ করেন এবং কুষ্ঠরোগীদের পাশে দাঁড়াবার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁদের ছাড়া কাদেরইবা উৎসর্গ করা যেত এ উপন্যাস। যোগ্য হাতেই সমর্পণ করেছেন লেখক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ কাহিনি বিষয়ের দিক থেকেই শুধু ব্যতিক্রমী নয়, আঙ্গিকের দিক থেকে আলাদা। লেখকের কবি সত্তাকে চিনতে গিয়ে যেন উপন্যাসিক সত্তাকে অস্বীকার করেছি আমরা। কবির কলমে যে কী অনুভবী গদ্য সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ এ আখ্যানেই মিলবে। কাহিনির ধরণটিও নিঃসন্দেহে অভিনব। উত্তম পুরুষে গল্প বলেছেন লেখক। এখানে লেখক পরিচয়েই হাজির। হালকা চালে শুরু করে এ উপন্যাস। লেখকদের সে কত রকম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় সে সব বৃত্তান্ত আছে শুরুতে—

> "ডাক্তারের কপালে নাটে রুগি। লেখকের বেলায় কিন্তু পাঠক নয়, তার বদলে জোটে লেখক। ডাক্তারে যদি রুগি টানে তো লেখকে টানে লেখক। আগে বিয়েবাড়িতে হাতমোছার কাগুজে রুমালে সদ্য লেখার জন্য কবিদের ডাক পড়ত। এখনকার কবিরা সে-দায় থেকে মুক্ত। অবশ্য এর জয়ন্তী তার জয়ন্তী, নবজাতকের নামকরণ, শখের কাগজে (মুড়িমিছরির একদর সাব্যস্ত করে ঢালাও নাম দেওয়া হয়েছে 'লিটল ম্যাগাজিন') নিত্য লেখার তাড়না—এসব হুজ্জত হয়ত আরও অনেকদিন থাকবে।"

মনে হয় লেখক যেন বেশ হালকা ঢঙে গল্প বলতে বসেছেন—

> "এত ধানাই-পানাই করার দরকারই পড়ত না, যদি প্রায়ই অন্যের পাণ্ডুলিপি

নিয়ে আমাকে হয়রান হতে না হতে হত। আমাদের প্রকাশকেরাও চিজ বটে। মাইনে দিয়ে সম্পাদক না রেখে তাঁরা শুধু বাঘা বাঘা পত্রিকার সম্পাদকদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরা চান বড় জোর চেনাজানা লেখকদের সুপারিশ। বই লেগে গেলে প্রকাশকের হাত-যশ, না লাগলে লেখকের মুণ্ডুপাত।"

নানা রকম পাণ্ডুলিপির চাপে বিরক্ত ও বিধস্ত লেখক। যেগুলি এখন তাঁর পড়ে দেখতেও ইচ্ছে হয় না। তেমনভাবেই একটি পাণ্ডুলিপি বহুদিন যাবৎ পড়েছিল, খুলে দেখাও হয় নি। হঠাৎ বহুদিন বাদে বই-এর তাকের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে সেটি আবার হাতে আসে। খামের ধুলো ঝেড়ে মুখ খুলতেই হাতে আসে একটি ছোট চিঠি। সঙ্গে পাণ্ডুলিপির কলেজের তাড়া বন্ধু আর একটি খাম। চিঠিটি ইংরাজিতে লেখা। সেটি এমন—

"প্রিয় মহাশয়—আপনার ঠিকানা লেখা খামটি ট্রেনে কুড়িয়ে পাই। দরকারি কাগজপত্র থাকতে পারে ভেবে রেজেষ্ট্রি করে পাঠাচ্ছি। বৈষয়িক নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় পাঠাতে বেশ খানিকটা দেরি হল। আশা করি, অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জনা করবেন।"

এরপর পাণ্ডুলিপির খাম খুলে ফেলা গেল—এর ভেতরেও একটি চিঠি পাওয়া গেল। কিন্তু এ চিঠিতে কোন নাম ঠিকানা নেই. আগের চিঠিটির নাম ও ঠিকানা দুইই দক্ষিণ ভারতের। এটির ক্ষেত্রে কিছুই নেই দেখে লেখক মুষড়ে পড়লেন। কারণ এমন পাণ্ডুলিপি পড়তে তিনি মোটেই আগ্রহ বোধ করবেন না যার লেখকের হদিশ তাঁর কাছে নেই। তবুও শেষ পর্যন্ত সেই পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পড়লেন। ইংরাজিতে লেখা। দেখে মনে হয় বহুদিন ধরে একটু একটু করে লেখা এটি। ভাষার ঘোরপাঁচ নেই, আটপৌরে সাদামাঠা ভাষায় লেখা। পাণ্ডুলিপির লেখক লিখেছেন ইংরাজিতে, বর্তমান লেখক তাকে বাংলায় শোনালেন পাঠককূলের উদ্দেশ্যে। এই অনুবাদের কথা ছলনা হতে পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ত এমন একটি ভণিতা করে কাহিনিতে প্রবেশ করলেন—"যেন এহ বাহ্য আগে কহ আর।" মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে এ যেন গৌরচন্দ্রিকা। আর অনুবাদক হিসাবে তিনি যে কত পারদর্শী তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভারের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তাঁর অনুজ এক কবির কথায়—

"এত অনুবাদ করেছেন, ভাবা যায় না। বুদ্ধদেব বসু অনুবাদক হিসেবে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তিনি বাংলায় ইউরোপ নিয়ে এসেছেন, উজ্জয়িনী নিয়ে এসেছেন, রাশিয়া নিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের ৬০০ পৃষ্ঠা দিয়েছেন অনুবাদের জন্য। অসামান্য অনুবাদ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু কারও অনুবাদ মুখে মুখে ঘোরেনি—যেমন 'নাজিম হিকমতের কবিতা', 'জেলখানার চিঠি' কিংবা 'পাবলো নেরুদার কবিতা', 'ফয়েজের কবিতা', 'গাথাসপ্তশতী', 'চর্যাপদ', অমরুশতক.... কী অনুবাদ করেন নি। অনুবাদ না করলে একজন কবির হাত

পবিত্র হয়না সেটা বিশ্বাস করতেন সুভাষদা।"

অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের আলোচ্য নন, তবু এই উপন্যাস সূত্রে তাঁকে একটু চিনে নেওয়া গেল। উপন্যাসে নিজেকে পাণ্ডুলিপির অনুবাদক হিসাবে ব্যক্তি করা হয়ত তাঁর অন্য সত্তারই প্রকাশ। তবে যাই হোক না কেন তাতে কাহিনি বাস্তবতা আরো জোরালো হয়েছে। শুরুতেই তিনি জানিয়ে দিলেন—"লেখকের নিজের গলা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। আপনারা বাংলায় শুনবেন শুধু দোভাষীর কণ্ঠস্বর। তাকেই লেখকের কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর অনুযোগ করলে আমি নাচার।" অনুবাদের কথা বলে আসলে আমাদের মনকে তৈরি করিয়ে নিতে চান লেখক। প্রকৃত প্রস্তাবে যে জগতের কথা তিনি বিবৃত করবেন তা এই ইহ পৃথিবীর হলেও তা যেন আমাদের চেনা জগৎ থেকে আলাদা। আমরা যারা নিজেদের সুস্থ ভাবি তারাই এমন জল-অচল ভেদ করেছি। সীমারেখা টেনে দিয়েছি—তাই লেখকের এই ভূমিকা।

এ গল্পের কথক একজন প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি সব দিক থেকেই সমাজের উচুঁতলার বাসিন্দা। হঠাৎ এই সুখী জীবন তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে। কুষ্ঠরোগের আচমকা আগমন তাঁকে অবিন্যস্ত করে দিল। আর যন্ত্রণার কথা এটাই যে আরোগ্য লাভ করেও তিনি ফিরতে পারলেন না সমাজের মূল স্রোতে, তাঁর পূর্ব পরিচয়ে। এই রোগ সম্পর্কে এমন একটা ভয়-ভীতি বা বলা ভাল আতঙ্ক চালু আছে যেটা প্রায় সহজ সব কিছুকে বাধা দেয়। কুষ্ঠ রোগ ঘিরে আমাদের মধ্যে আছে এক ট্যাবু। তাই নিরঙ্কুশ নিরাময় হলেও কেউই তা বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বাস করে না বলে মেনেও নিতে পারে না। কুষ্ঠ রোগীদের তাই নিজেদের জন্য গড়ে নিতে হয় অন্য সমাজ, অন্য ঘর, অন্য সংসার—অন্যকোথা অন্য কোনখানে তারা হয়ত খুঁজে নিতে চায় বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করার পরিচয়। যেখানে কুষ্ঠরোগীরা নিজেরাই হয়ে উঠে নিজেদের পরিজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়। কথক জানিয়েছেন, কুষ্ঠরোগীদের জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি আগের জীবন, যাকে পূর্বশ্রম বলা যেতে পারে। কুষ্ঠ রোগ সনাক্ত হবার পরের জীবন—যে জীবনে সে পরিবার আত্মীয়ের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত, ব্রাত্য, তখন মনে হয় যে সব গত জন্মের কথা। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে জীবন সম্পর্কে পূর্বাশ্রম কথাটি বলা হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রে যে জীবনটা ফেলে আসে তারা সেই পূর্বাশ্রমের কথা ফেলেই আসে। ফিরে আসার ইচ্ছে থাকলেও বিষয়টা সহজ নয়। বাড়ির সকলে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে চায়। বাকিদের কাছে গোপন রাখতে চায় এই ভয়ংকর রোগের বার্তা।

গল্পের কথক নামধান উহ্য রেখেই সবটা বলেছেন। তার জীবনে রোগটার হঠাৎ উদয় হওয়ার বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন কোন নাটকীয়তা না করেই। কনফারেন্সের জন্য দিল্লির ফ্ল্যাইটে উঠেছিলেন তিনি। সহযাত্রী ভদ্রলোক লক্ষ্য করেন সিগারেটের আগুন প্রায় তাঁর হাতের আঙুল স্পর্শ করছে তাতে তার কোন হেলদোল নেই। ভদ্রলোক হাতটি নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্লেন থেকে নেমে তিনি বলেন কথককে একজন ডাক্তারের সঙ্গে

এক্ষুনি যোগাযোগ করতে। তারপরেই বিষয়টা সামনে আসে, রোগ ধরা পড়ে এবং জীবন সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইতে থাকে। গল্পে কথকের সুস্থ হয়ে ওঠার কথাও আছে—কিন্তু তিনি ফিরতে পারেন নি নিজের ফেলে আসা জীবনে। নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে এখান থেকে। এ আখ্যানে কখনও একটু এগিয়ে কখনওবা পিছিয়ে কাহিনি কথনের ভঙ্গিমাটি রাখা হয়েছে। তাতে কাহিনিতে বেশ গল্প বলার ভাবটি বজায় আছে, উপরন্তু ফ্ল্যাশব্যাকের জন্য একটা সিনেমাটিক এফেক্ট এসেছে যেন। কথকের প্রত্যক্ষ বয়ান ও অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত মিলে তৈরি হয় এক অভিনব ডিসকোর্স। এক দুরারোগ্য ব্যাধি কবলিত মানুষের আত্মকথা এ আখ্যান। লেখক নিপুণ মুন্সীয়ানায় শুনিয়েছেন সেই সমাজের কথা; সে সমাজ নিজেরাই গড়ে নিয়েছিল এই বিকলাঙ্গ বাতিল মানুষের দল। এ উপন্যাস সত্যি বাংলা সাহিত্যে অনন্য। বিষয় ও আঙ্গিক দু দিক থেকেই ব্যতিক্রমী। তাই প্রায় সমালোচক এই উপন্যাসের প্রসঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে কবি ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়ে দেন—

> "অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ব্যাজ পরিয়ে উপন্যাসিক হিসেবে চেনায় মস্ত ভুল হবে। এই উপন্যাসটি লেখার জন্য তাঁকে উচুঁদরের উপন্যাসিকই হতে হতো। তার চেয়ে বড়ো কথা, এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে বাংলা উপন্যাসের সাম্প্রতিক ধারার থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে—এমন একটি বিষয় নিয়ে যার পাতায় পাতায় নতুন অভিজ্ঞতা, ভাষায় পরিশীলিত স্বাচ্ছন্দ্য এবং আঙ্গিকেও এমন এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য, যা কোনো হঠাৎ পাওয়া ব্যাপার কিংবা চমকে দেবার চেষ্টা বলে মনে হয় না। গত দশ বছরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম বলতে হলে গোটা পনেরোর মধ্যে আমি অন্তত 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'কেও টেনে আনব। শুধু এটুকু বোঝানোর জন্য এটি আলাদা এবং সেইজন্যেই অবশ্যপাঠ্য।"

কথক এ গল্পে স্বাভাবিক সমাজ থেকে নির্বাসিত কয়েকজন বিকলাঙ্গ নারীপুরুষের কথা বলেছেন। তারা মিলিতভাবে গড়ে তুলেছে এক বিকল্প বাঁচবার পথ—তাদের তো বেঁচে থাকতে হবে। সমাজ যদি তাদের স্থান না দেয় তবে তারা এভাবেই নিজেদের গড়ে তোলা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। বাকি পৃথিবীর অস্পৃশ্য হয়েই বাঁচবে। কথক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েও ফিরতে পারেন না নিজের ঘরে। স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে তিনি কোথায় গেলেন তার স্পষ্ট দিক নির্দেশ নেই। হয়ত তার দরকারও নেই। কারণ লেখক কোনো নীতিকথা শোনাতে বা উপদেশ দিতে বসেননি। ঔপন্যাসিক আসলে শুনিয়ে দেন আমাদের পচনশীল সমাজের কথা—আপাত সুরক্ষাবর্মের আড়ালে যা ক্ষয়ে যাচ্ছে। এ কাহিনিতে নারী পুরুষের নামগুলোও অদ্ভুত। বোঝা যায় বেশ সচেতনভাবেই দেওয়া—চ্যাংমুড়ি, দুখদি, ভবী, আংটি, হাঁড়িচাচা, হরতনের টেক্কা। প্রত্যেকের জীবনেরই আলাদা গল্প আছে। কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ার আগের ও পরের। এদের নবজীবনপুরের আবাসে স্বামীজী এসেও জুটেছে, যিনি আনন্দ যজ্ঞ করে

বিবাহ ও দেন। প্রান্তিক এই মানুষদের প্রেম ভালবাসা যৌন চাওয়া তো নিভে যায় নি।

কথককে আশ্রমের সবাই ডাকে 'প্যানসাহেব'—এও বেশ অদ্ভুত নাম। আসলে 'পেনসাহেব'। কথক সাহেব ডাক্তারের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলতেন এবং প্রায়ই সকলে ঘুমিয়ে পড়লে লণ্ঠন টেনে নিয়ে কিছু লিখতেন। তাই থেকেই অমন নাম। তালবেতালিয়ার অনেক মানুষই তাঁর চেনা, কুষ্ঠ হাসপাতালে থাকাকালীন পরিচয় হয়েছিল। এখানেই প্যানসাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক হয় চ্যাংমুড়ির। চ্যাংমুড়ির একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। 'মুখটা ঠিক রিলিফ ম্যাপের মত দগদগে। ওর মুখে কোনো ভাবান্তর হলে বাইরের লোকের সাধ্যি নেই বোঝে।' চ্যাংমুড়ি আদিবাসী কন্যা। কথকের সঙ্গে ভালোবাসা বেশ গম্ভীর। কিন্তু পরিণতি ট্র্যাজিক। সন্তানসম্ভবা চ্যাংমুড়ি মারা যায়—হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি করার সময় কোন নার্স এসে ধরে নি। কুষ্ঠ রোগীকে ধরতে চায় নি। ফলে খাট থেকে পড়েই মারা যায় চ্যাংমুড়ি। তলায় একটা ছোট টুল রাখা ছিল। তার উপরেই পড়ে যায় সে। কাজেই গর্ভের সন্তান এবং মাদু নেই মারা যায়। তাই ব্যাঙ্কে একটা চোখ দান করেন কথক। মরনোত্তর দেহ দান করা হয়। কথকের নিজেরও তেমন ইচ্ছা এ কে অদ্ভুত পরিহাস। যে দেহকে ছুঁতেও চায় না সুস্থ মানুষ, মৃত্যুর পর তাকে কাজে লাগাতে গিয়ে যেন সমাজের গালেই চপেটাঘাত।

লেখক নিরাসক্তভাবে সহজ ভঙ্গিমায় বলে যান সবার কথা। হরতনের টেক্কার গল্প আবার একটু আলাদা—তিনি অসামান্য রূপসী, বনেদী বাড়ির মেয়ে, বিয়েও হয়েছিল অর্থবান পরিবারে। স্বামী প্রফেসার। তাদের দুটি সন্তান, প্রথমে তিনি ছিলেন স্বামী সোহাগিনী। কিন্তু কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ায় তাকে হাসপাতালে দিয়ে যাওয়া হয়। ভবীকে অহংকার করে তিনি বলতেন—"মরে গেলেও আমাদের মধ্যে (স্বামী-স্ত্রী) কখনও ছাড়াছাড়ি হবে না।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর কথা মিথ্যে করে দিয়ে স্বামী অন্যত্র বিবাহ করলেন। হরতনের টেক্কার এবার রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখা গেল। আদালতে মামলা করলেন স্বামীর বিরুদ্ধে। বিয়ের সমস্ত গয়নাগাটি ও মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে স্বামীকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ফল হল অন্যরকম। তিনি মরিয়া হয়ে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাদের সংসার ভাঙার খেলায় মেতে উঠলেন। কুষ্ঠরোগ যেহেতু তাঁর সৌন্দর্যের কোনো হানি ঘটাতে পারেনি সেই সুযোগের ব্যবহার করলেন তিনি। সে সংসার তাকে বহিঃস্কার করেছে সেই সংসারকে যেন ঠপযুক্ত শিক্ষা দিতেই তার এই আচরণ। আরোগ্য নিকেতনে একজন 'বড়বাবু'ও আছেন। যিনি জমিদার পরিবারের সন্তান, বিবাহ করেন কুষ্ঠরোগী ভবীকে। তাদের মহামূল্য প্রেম-কথাও এ উপন্যাসে আছে। তবে তার বিবাহের একটাই শর্ত তাদের কোনো সন্তান হতে পারবে না। সত্যি! কুষ্ঠরোগীর সন্তান। কথক এবং এ গল্পের যিনি মূল চরিত্র তিনি সুস্থ হয়েও ফিরে যাননি, রয়ে গেছেন এখানে, এদের কিছু উন্নতিকল্পে কিছু সদর্থক ভাবনার রূপায়ন চান তিনি। তার জন্য চাই সকলের মধ্যে সচেতনতা। কথক তেমনটাই করতে চান।

উপন্যাসের নামকরণ ভারি অদ্ভুত—'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'—অন্তরীপ কেন? কুষ্ঠরোগীদের যে জগৎ, যেখানে তারা বেঁচে আছে তা তো মূল সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই হয়ত লেখক তাকে অন্তরীপ বলছেন। কথক জানাচ্ছেন—"এ তো দীপ নয়, একটা অন্তরীপ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি। নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে যাতে ওদের যত ময়লা জল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।" হ্যানসেনের অসুখ—এমন নামও আশ্চর্যের। 'বা' অব্যয় যোগে জুড়ে গেছে কথাদুটি। কথক বলছেন—"হ্যানসেনের অসুখ ধ্যুৎ, রোগটা হল কুষ্ঠ। আমরা সব কুষ্ঠরোগী। সেরে গিয়েছে তো কী, আমরা যে কুষ্ঠরোগী সেই কুষ্ঠরোগীই থেকে যাব।"

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যের ক্ষেত্রে বিপুল নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। তার নিদর্শন যেন এই উপন্যাস। নামকরণের ক্ষেত্রেও যে তিনি দুঃসাহসী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি এমন একটা উপন্যাস লিখেছেন যার প্রেটাগনিস্ট একজন কুষ্ঠরোগী—এভাবেই তিনি হয়ে যান ব্যতিক্রমী। কুষ্ঠরোগীরা আগেও সাহিত্যে কখনও কখনও স্থান পেয়েছে। তবে তা প্রায় সবই নঞর্থকভাবে। যেন কোন পাপের শাস্তি হিসাবে কুষ্ঠ—এমন দেখানো হয়েছে। মনোজ মিত্রের নাটক 'গল্প হেকিমসাহেব'-এও কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত হওয়ার কাহিনী আছে। এ রোগ যে ছোঁয়াছে তাও সেখানে স্পষ্ট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ' গল্পসংগ্রহের মধ্যে একটি গল্প 'কুষ্ঠরোগীর বউ', প্রকাশের সময় ১৯৪০। সেই গল্পে মানিক একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষের জটিল মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। যতীন এই রোগের কারণে ক্রমশ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার স্ত্রী মহাশ্বেতার মানসকৃট—এগল্পে নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়েছেন মানিক। দাম্পত্য সম্পর্ক এই রোগের কারণে কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তা শিউরে উঠার মত। গল্পের শেষে মহাশ্বেতা স্বামীর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বাড়িতে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য আশ্রম খোলে, সেখানে সে ভালবেসে রাস্তা থেকে কুষ্ঠরোগীদের তুলে এনে আশ্রয় দেয়। রোগীদের প্রতি তার অপার সহমর্মিতা, আর স্বামীর প্রতি পোষণ করে ঘৃণা। জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্প লিখেছেন মানিক। সুভাষ যেন মানিকের যোগ্য উত্তরসূরী। সুভাষের কাহিনির প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা তার একটা অংশ মাত্র। উপন্যাসের প্রয়োজনেই চরিত্র সংখ্যা অনেক বেশি আর তাদের জীবনচর্যা প্রসারিত থেকে ধরা দিয়েছে। সে জীবন গাঁথা একই সঙ্গে ব্যপ্ত ও গভীর। আর যেহেতু আত্মকথনের ভঙ্গি এখানে গৃহীত তাই কুষ্ঠরোগীর দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র বিষয়টি দেখা হয়েছে। উল্টো দিক থেকে নয়। এখানেই এ উপন্যাসের বিশিষ্টতা ও সার্থকতা।

গ্রন্থঋণ :

১। তিনি ছিলেন ভারতের পাবলো নেরুদা—সুবোধ সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মে ২০১৮

২। কাহিনীর আড়ালে অন্য কাহিনী—দিব্যেন্দু পালিত, দেশ, ৫১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৭ জানুয়ারী ১৯৮৪

"কাজে কথায় সমান হ' ভাই"

রূপশ্রী কাহালী

ঘরের যে কোনও জায়গা থেকেই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটাকে দেখা যাক না কেন, মনে হবে তিনি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। মাথায় তাঁর এক ঝাঁক চুল। অথচ তিনিই একবার লিখেছিলেন 'আমি তো আর ফটোর তোলা ছবি নই, যে সারাক্ষণ হাসতেই থাকব।' কিন্তু তিনি সত্যিই এখন ছবি। তিনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ২০০৩ সালের ৮ জুলাই মেঘ, হাওয়া, রোদ, ছায়া, রবি ঠাকুর ও বাংলা ভাষা, বইখাতা, আঁকা ও লেখা সকলের কাছ থেকেই 'যাচ্ছি' বলে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৯১৮ সালে তাঁর শততম জন্মদিবস ৮৪ বছরের জীবনে তাঁর লেখা বই-এর সংখ্যা ৮০টিরও বেশি। এই লেখার মধ্যে আছে অসংখ্য কবিতা। এছাড়া রয়েছে রিপোর্টাজ, ভ্রমণ, উপন্যাস ও প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনী। ১৯৪০ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বাই 'পদাতিক' প্রকাশিত হওয়ার পরই কবি বুদ্ধদেব বসু এই তরুণতম কবিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, 'পদাতিক' গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাবেই এই তরুণতম কবিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, 'পদাতিক' গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাবেই এই তরুণতম কবি প্রমাণ করেছেন তিনি শক্তিমান। সেই থেকে তিনি পরিচিত 'পদাতিক' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় হিসেবে। এর পরে বাংলার বিদ্বজ্জনদের অনেকেই তাঁদের লেখায় স্বীকার করেছেন। প্রত্যেকেই তাঁদের লেখায় স্বীকার করেছেন 'তাঁর লেখার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। এমনকী প্রকৃতিও তাঁর কলমে এসেছে মানুষের আভরণ হিসাবে। মানুষের কথ্যভাষাকে তিনি কাব্যের ছন্দে এনে যেভাবে রূপ দিয়েছেন, তাঁর আগে এটি কেউ করেনি বলেও অনেক গবেষক মনে করেন। তাঁর লেখায় বাংলার শিল্প', লোককথা, প্রকৃতি এসেছে।' পদাতিক কবির কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সাহস আমার নেই। আমি শুধু আমার কিছু অনুভূতির কথাই এখানে উল্লেখ করেছি। আমার যখন শৈশব, তখন কলকাতার এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কার পাই। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে-কী তাঁর পরিচয় সেটি বোঝার বা জানার বয়স বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাতে পাইপ। সেটি তিনি মাঝে মাঝে টানছেন। এর পরে তাঁর কাছ থেকেই সার্টিফিকেট ও পুরস্কার নেওয়া। তিনি দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে অনেক কথা বললেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমি দেখছি বিরাট লম্বা একটি লোক। যেন বটগাছের মতো। তাঁর মাথায় বটের ঝুরি। তিনি পুরস্কার দিচ্ছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মাথার চুল দেখে আমার প্রথম বটের ঝুরির কথাই মনে হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে পড়েছি, তাঁর মাথার এই একরাশ চুলকে অনেকে অনেকভাবে মনে করেছেন। কেউ ভেবেছেন অকাশে উড়ে যাওয়া

মেঘ, কেউ ভেবেছেন গঙ্গাকে মাথায় আটকে রাখা শিবঠাকুর। আবার কেউ ভেবেছেন মাথায় রয়েছে হাওয়ায় উড়ে থাকা তুলোর পাঁজা কিন্তু আমার মনে হয়েছিল বটের ঝুরি। বাড়িতে এসে একথা বলার পর সকলে মিলে কী হাসি! এর পরে আমি যখন কিশোরী, তখন তাঁর কিছু কবিতাও আবৃত্তি করেছি। কিন্তু তাঁকে দেখিনি। এমনকী তাঁর ছবিও না।

সেবারে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব মঞ্চে আবৃত্তি করার সুযোগ। মঞ্চে আবৃত্তি করতে এসে দেখি, মঞ্চে আছেন আমার শৈশবে দেখা সেই প্রাচীন বটগাছ। আবৃত্তির পর তাঁর স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট পেলাম তাঁরই হাত থেকে। (এটি এখন আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে)। তিনি কিছু প্রশংসাও করলেন, কিন্তু আমার কিশোরীমন ভাবছে তিনি তো এর আগে আমাকে দেখেছেন। আমার রবি ঠাকুরের লেখা কবিতার সেই লাইনটিই মনে পড়ল—

নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় নিয়ে জট ছোট/ ছেলেটি মনে কী পড়ে, ও গো প্রাচীন বট'। ইতিমধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে, সেটি বোঝার বয়স আমার হয়েছে। অনেকবার দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু তাঁর চুলের দিকে তাকালে শৈশবে তাঁকে দেখে আমার ভাবনার বিষয়টি মনে হলে হাসিই পেয়েছে। বাচিকশিল্পী হিসাবে তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করেছি। তবে তাঁর লেখা 'যেতে যেতে', 'মেজাজ' 'মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ' কিংবা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' যে কতবার আবৃত্তি করেছি, সেই সংখ্যা বলে শেষ করা যায় না। এই কবিতাগুলিই আমার মনকে টানে।

তাঁর লেখা 'আমার বাংলা', 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থ থেকে গদ্য আমি অনেক জায়গাতে পাঠ করেছি। কিন্তু তাঁর অনুদিত রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছের শেষ চিঠি যেটি এথেল তাঁর সন্তানদের উদ্দেশে লিখেছিলেন সেটি পাঠ করার সময়ে এখনও আমার মন অদ্ভুতভাবে নাড়া দেয়। ইতিমধ্যে বঙ্গসংস্কৃতি উৎসবে 'সপ্তাহ' পত্রিকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ। 'সপ্তাহ' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সেটি আমি তখন জানতাম না। 'সপ্তাহ' কর্মকর্তারা তাঁদের দফতরে একদিন আমন্ত্রণ জানালেন, আমি গেলাম। সেটি ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন, ঘরোয়া অনুষ্ঠান। বিরাট ভাঙা বাড়ি, আসবাবপত্রও তেমন নেই, কিন্তু প্রচুর পত্রিকা এবং বই। সম্পাদক কিংবা কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা নেই, চেয়ার কম। তাই অনেকে বসেন যেমন মিউজিক্যাল চেয়ারে বসার মতো। তবে সকলের প্রাণখোলা হাসি আছে। ঘরে ঢুকেই দেখি প্রথম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছবি। তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু সপ্তাহ-র জীবনে হাসি মুখেই তিনি রয়েছেন। আমাকে একটি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বসতে দেওয়া হল। এক সময়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। এরপর সকলে মিলে গল্পগুজব। একজন বললেন জানেন তো আপনি যেখানে বসেছেন, ওখানেই বসে অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। আবেগে আমার সারা শরীর বিদ্যুৎ খেললো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম 'সপ্তাহ প্রতিদিনই'। এই কবিতার শেষে আছে 'বিনা নামে বিনা অর্থে'/ বিনা যশে/সে বজ্র বানিয়ে যায়/নিজের অস্থিতে/নেপথ্যে/সপ্তাহ/

প্রতিদিনই।' আমি লক্ষ করলাম শৈশবে আমার দেখা প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় সপ্তাহ-কর্মীরা কষ্ট আর ত্যাগের মধ্য নিয়েই নিজের অস্থিতে বজ্র বানাচ্ছেন—ন্যায়ের জন্য।

ছোটবেলায় আমার দেখা বটগাছের ছায়ায় বসে আমিও কখন যেন তাঁদের একজন হয়ে গেলাম। শুধু শিল্পী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'আজকের গান' কবিতায় লিখেছেন, "কাজে কথায় সমান হ' ভাই/ডাক দিয়েছে গুরুর গুরু/লম্বা চওড়া বলিস কী ছাই/কর এখনই যজ্ঞ শুরু/যেখানে হয় সবাই সমান/সকলের জন্য সকলের টান/সেখানে হাত আপনি বাড়ান/আল্লা-হরি-মারাংবুরু।" কাজে কথায় সমান হওয়ার শিক্ষা আমি আমার বাবার কাছে পাই। এখন ছোটবেলায় আমার দেখা প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় আমি যখন বসি, কাজের সমান না হলে আমার কানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পংক্তিগুলি যেন কে আমাকে বলে দেয়।

‘ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই’

সুচেতনা পাঠক

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই’—এই বইটিতে তাঁর ‘নিজের কথা’ ব্যতিক্রমীভাবে উপস্থিত করেছেন পাঠকের কাছে। এই ‘নিজের কথা’ বলতে পিতৃ-পরিচয়-সমেত গোটা মানুষটাকে যেভাবে সাধারণ মানুষ চিনত-সেই মানুষের কথা বলা হচ্ছে। নিজের কথা নানা কারণে বলার সমস্যা আছে। কারণ ব্যক্তিগত, কালগত, আবার রাজনীতিগতও হতে পারে। আরো নানা কারণ থাকতে পারে। নিজের ঢাক পিটানো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তবু বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের আত্মজীবনী রচিত হয়েছে। সমাজে ও সংস্কৃতিতে এর বহুমাত্রিক প্রভাব কাজ করে। এসব থেকে আলাদা প্রকৃতির জীবন-কথা কমলাকান্তের দপ্তর এই ধারায় উৎপল দত্তের ‘জপেনদা জপেন জা (১৯৭১-৮৪)’ -কে ফেলা যায়। এটি অবশ্য নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। এ জাতীয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ‘পঞ্চভূত’। জপেনদা-র সাথে উৎপল দত্তের চেহারার ও চরিত্রের কোনো মিল অবশ্য নেই। তবে মননশীলতা ক্ষুরধার বিশ্লেষণী শক্তির মধ্যে উৎপল দত্তের উপস্থিতি প্রবলভাবেই টের পাওয়া যায়। জপ করা তো মনের ব্যাপার। জপেনদা যা জপেন—মানে ‘জপেন দার মনে যা আছে’—এই অর্থ দ্যোতনার সাথে মিলে যায় ‘ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই’। গ্রন্থ দুটিই দুজেনের মনের কথাকে বাইরে এনেছে। মিল এখানেও জীবনী সংক্রান্ত রচনার ধারায় এগুলি কিছুটা অন্য রকমের। দুটি গ্রন্থে অতীত-সময়ের অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। এ দুটি ভিন্ন গ্রন্থ—আর দুজনেই প্রতিভাবান তাই, এই দুটি দুইভাবে যুগোত্তীর্ণ।

উত্তম পুরুষের জবানীতে তিনি গোটা গ্রন্থ ব্যাখ্যা করেছেন। কোন আড়াল রাখেন নি। এর ফলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঢোলগোবিন্দ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় একই সত্তার দুই রূপ।

রোগভোগ ও রাজনীতিপ্রসঙ্গ অনায়াসে প্রমাণ করে ঢোলগোবিন্দ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাউন্টার পার্ট।

অজ্ঞান অবস্থায় কেটে রোগভোগ কেটে গেছে কতদিন! “যেদিন প্রথম চোখের পাতা খুলেছিল, সেদিন আমি অবাক।..... কার্নিসে বসে ভাঙা গলায় কাক ডাকছে। কী আশ্চর্য, আবার সব শুনতে পাচ্ছি।” মা তাঁর কাছে অষ্টপ্রহর বসে থাকেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দেন-ঘোরের মধ্যেও তিনি টের পান।

বেড-সোর গুলো শুকিয়ে আসছে। জ্ঞান ফিরে আসায় মুশকিল হচ্ছে শুয়ে থাকতে একঘেঁয়ে লাগে। দাদা বই দিয়ে ভোলাতে চায়। কিন্তু ফল উল্টো হয়; খুশির বদলে কেঁদে ফেলে ভাই। ইংরেজী বাংলা কিছুই যে পড়তে পারেন না! অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত হারিয়ে গেছে!

অবশেষে কে যেন একটা স্লেট-পেন্সিল দিয়েছিল। তার উপরে চলল নোনা ধরা দেয়ালের কিম্ভূত কিমাকার ছবিগুলো নকল করা; আর মুছে ফেলা।

যমে-মানুষে টানাটানির পর্ব শেষ হতে বাড়ির সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। জিভের স্বাদ আর শরীরের সাড় বেড়ে যাওয়ায়, তার সাথে পাল্লা দিয়ে রোগীর বায়নাও বেড়ে যাচ্ছিল। এসময় গ্লুকোজের জল তারপর মুরগীর জুস—এই ছিল খাবার। গ্রামের বাড়ি থেকে জামাইবাবু মুরগী আনতেন। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে বিছানায় উঠে বসা, মেঝের ওপর দাঁড়ানো, হাঁটি হাঁটি পা-পা হামাগুলি ভিন্ন সবই করতে হয়েছিল।

তখন তাঁর বারো বছর বয়স। এ বয়সে নতুন করে সব শেখার পালা—কিছুই আর আয়ত্ত্বে নেই। বর্ণ পরিচয় থেকে খেলার মাঠ—সবই অজানা মনে হয়। না আছে গানের গলা না চোখের দৃষ্টি! কে বলবে লম্বা লম্বা কবিতা আবৃত্তি করেছে সে কখনো?

নামকরণ :

‘ঢোল’ একটি বাদ্যযন্ত্র। ঢাকের পরেই এর স্থান। কোনো কথাকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলার অর্থ—বিশেষভাবে লোক জানিয়ে বলা। অর্থাৎ প্রচার-ইচ্ছা যার মধ্যে প্রবলভাবে সক্রিয়—সেই মানুষটির বিশেষণ ‘ঢোল’। গোবিন্দের আগে ঢোল কথাটি বসিয়ে কবি বলতে চান আত্মপ্রচার-ইচ্ছা তাঁর একটু বেশিভাবেই আছে। ‘গোবিন্দ’ কথাটি নিশ্চয়ই ভালোভাবে আসেনি। যে গোঁয়রের পরে বসে গোঁয়ার গোবিন্দ নামে নানা অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গে নানা বিরক্তিকর তুলনায় এসেছে—তার স্মৃতি কাজ করছে। গোবিন্দ শব্দে নিজের সর্বত্র উপস্থিত থাকার বিষয়টি প্রকাশ করছে—এই রবাহূত উপস্থিতি ব্যক্তিত্বহীনতার দ্যোতক। নিজের কথা বলতে সংকোচবশেই এ ধরনের উপস্থাপনা সন্দেহ নেই।

আলোচ্য গ্রন্থটির নাম ‘ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই’ সম্ভবত এর আগে নাম ছিল ‘ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন’-বইটির শেষ কভার-পেজে—এই নামটি আছে। আর একটি কথা বইটির সর্বত্র ‘ঢোলগোবিন্দ’-এই নামটি যুক্তভাবে আছে। ব্যতিক্রম এর কভার পেজ। এখানে ‘ঢোল’ শব্দটি বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যবহৃত। তাই ধরে নেওয়া যায় কথাটি সমাসবদ্ধ পদ হিসেবেই ব্যবহৃত-ঢোলগোবিন্দ-ই হবে : ঢোল গোবিন্দ নয়।

গ্রন্থ-প্রকৃতি :

গ্রন্থ-সম্পর্কে বলেছেন “নিজেকে নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যে-আমিকে আমি চাক্ষুষ দেখতে পাই, আমার সেই আমিই হল গিয়ে ঢোলগোবিন্দ।”..“ওর মুখ দেখি প্রথম ইঁদারার জলে পরে অবশ্য অনেকবারই দেখেছি আয়নায় আর শ্মশানে। তোলা গ্রুপ ফটোতে।” (পৃ. ১৩)

এই গ্রন্থভাবনার পিছনে দুটি কথা তিনি বলেছেন ঃ ১) অর্বাচীনেরা শুনতে চায়, ২) ঢোল গোবিন্দ নিজেও বলতে চায়। এই গ্রন্থের বক্তব্য যেহেতু স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে সাজানো। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-কেন্দ্রিক। এর ভাষা ঋজু ও শাণিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক কাহিনি এখানে ভিন্ন স্বাদে উপস্থাপিত। এতে পাওয়া যায় “উপন্যাসের বিস্তার, গল্পের না-ছোড় টান।” এর মধ্যে বাচাল গোবিন্দ এই ভাবটি বর্তমান। মানুষের সমাজে নিজেকে প্রশংসা করলে সে সকল প্রকারে ছোট হয়ে যায়, নিজেকে নিন্দা করলে

বোধহয় বিনয় প্রকাশ পায়। এ বইটি পড়লে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই জন্মায়। এই বইটি না লিখলে সেদিনের অনেক কথাই আজ যা ইতিহাস, তা জানা হত না। জানা যেত না ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক উত্তরাধিকারকে আর সে-সময়ের বাংলাকে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ রাজশাহীর নওগাঁয়ে, বাংলাদেশে জন্ম। ১৯৩০ সাল থেকে মিত্র ইনস্টিট্যুশনে পড়ার সূত্রে শুরু করে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশুনা, বি এ পাশ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ "পদাতিক" (১৯৪০)। চাকরী করেন নি। রাজনীতি আর লেখা-লেখি করেই খ্যাতি ও অখ্যাতি কুড়িয়েও তিনি বিখ্যাত মানুষ; বিশ শতকের। এপার বাংলায় আমৃত্যু থেকেছেন।

বইটির শুরু হয়েছে সুভাষের অসুস্থতার সময় থেকে। তখন তাঁরা থাকতেন বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের বাসাবাড়িতে। এটা ঢোলগোবিন্দের বুদ্ধি ঃ "শুরু করো সেইখান থেকে-যখন টাইফয়েড হয়ে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছ। যখন স্মৃতিশক্তি, গানের গলা আর চোখের মাথা তুমি খেয়ে বসে আছ। ব্যস, তারপর যতই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাও, জানবে তোমার সাতখুন মাপ"।

কেঁচে গণ্ডুষ নামক প্রথম অধ্যায়ে সুভাষ তাঁর অসুস্থতার কথা বলেছেন। "কতদিন পর আমার জ্বর ছেড়েছিল মনে নেই, তবে ভাত খেয়েছিলাম বাহাত্তর দিন পর।" (পৃ.১১)

এটা ঢোলগোবিন্দের বুদ্ধি ঃ "শুরু করে সেইখান থেকে-যখন টাইফয়েড হয়ে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছ। যখন স্মৃতিশক্তি গানের গলা আর চোখের মাথা তুমি খেয়ে বসে আছ। ব্যস, তারপর যতই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাও, জানবে তোমার সাতখুন মাপ।"

সে যাই হোক "মাটি নেবে! মাটি!" শীর্ষক অংশে কলকাতার কথা রসিকতার সাথে এসেছে। কোলকাতায় তখন ট্যাক্সির চল হয়নি। স্টেশনে ছ্যাকরা গাড়িই ছিল সংখ্যায় প্রচুর। তারা নোংরা ছড়াত বড্ড বেশি। "ঘাড়াগুলোর বিন্দুমাত্র ভদ্রতাবোধ নেই। গোটা চত্বর জুড়ে ছ্যাড়র ছ্যাড়র ক'রে সমানে নোংরা ছড়াচ্ছে।" এখন যাকে বলে শশিভূষণ দে স্ট্রিট তার তখন নাম ছিল নেবুতলা। এখানে পঞ্চাশ নম্বর নেবুতলার গলিতে গিরিশ ঘোষের বাড়ি ছিল। লেবুকে নেবু এবং শ কে স বলা নিয়ে সেখানে হাসি ঠাট্টা কম হত না।

তখন রাস্তায় সং বেরোত। "রমানাথ কবিরাজ লেন হয়ে আসতে আসতে দেখি দেয়ালে একটা পোষ্টার ঃ "এবার জেলেপাড়ার সং বেরোবে না।"-এর পরে আর সং কোনোদিনই বেরোয়নি।

তখন কলকাতায় টাইমের জল চালু হয়েছে ঃ "মোনাঠাকুরের কথায় "ব্যস্ রে, সে এক কলের কলকাতা। কল টিপলে জল, কল টিপলে আলো। সে যা দ্যাখলাম কওয়া যায় না।"

কোলকাতার রাস্তা তখন ধোয়া হোত। ঘোড়ার গাড়িতে বড় লোকের মেয়েরা স্কুলে পড়তে যেত ঃ "গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্টোরিয়া ইস্কুলে ঘোড়ার গাড়ি। বিশ পা লোকচক্ষু পেরিয়ে গলির মোড়ে এসে গাড়িতে উঠবে এ পাড়ার সবেধন নীলমণি জজসাহেবের নাতনি। সারা রাস্তা খড়খড়ির জানালা ফাঁক ক'রে সে কলকাতাকে দেখবে।"

ফিরিওয়ালারা বেরোবে রাস্তায় কিম্বা শানবাঁধানো কলকাতায় মাটি বিক্রি করতে আসবে কোন অরণ্যবালা বলবে "মাটি আছে! মাটি!"

নগ্নপায়ের সুভাষকে দেখে বাঙাল বলে পাড়াগেঁয়ে বলে চ্যাংড়া ছেলেরা খেপায়! এ ছিল সেদিনের কলকাতার অভ্যস্ত বিষয়—বাঙাল-ঘটির মুখের লড়াই। বাচ্চা থেকে বুড়ো। অন্তরমহল থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত। সবাই এর অংশীদার।

গুণিজনের বড় গুণ তাঁর বিনয়। এ গ্রন্থের এই বক্তব্য এটাই মাত্র স্মরণ করায়।

এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই, তাই মাফ করার প্রসঙ্গ আসে না-আসে ঋণ-স্বীকারের প্রসঙ্গ। নানা গুণের মধ্যে এর সরস উপস্থাপন ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। এই সরসতার মূলে আমাদের এ পর্যন্ত পঠিত অংশে এই দিক গুলি স্পষ্টতই প্রকাশ পাচ্ছে।

সহজ স্বীকারোক্তি : বাধ্য হ'য়ে নিজের জন্মগত অভ্যাস বদলাতে হয় এদেশে এসে। সে কথা সহজেই স্বীকার করেছেন কোনো লুকোচুরি করেন নি। "নেহাত বাড়ির লোকে ধমক দিত, তাই মুখে পুরেও শেষ পর্যন্ত ফেলে দিতে হয়েছিল খেলুম—গেলুম। নইলে বাড়তে বাড়তে সেটা নেপ-নুচি-নেবুতে গিয়ে যে ঠেকতই, তাতে সন্দেহ নেই।" (একে দুই, পৃ. ১৩) মাতৃভাষা বদলের এই বাধ্যকতা নিয়েও কেমন সরস রশিকতা করেছেন—তা লক্ষণীয়।

সংলাপের ঢং

"মোনাঠাকুরের কথায়" ব্যস্ রে, সে এক কলের কলকাতা। কল টিপলে জল, কল টিপলে আলো। সে যা দ্যাখলাম কওয়া যায় না।"—মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনে এ হেন 'গেঁয়োভূত' কে দেখা যাচ্ছে!

কিম্বা চোখের সামনে দিয়ে চলেছে কোন অরণ্য-বালা তার সুরটাও পড়ছে কানেঃ "মধু লেবে গো? মধু?"

যথেচ্ছ চলিত শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার : "ঢোলগোবিন্দর কথা শুনে বিস্‌মিল্লা ব'লে শুরু করেছি বটে তবে এও জানি যখন আমি দ'য়ে পড়ব, তখন আর ঢোলগোবিন্দর টিকি পাওয়া যাবে না। "বিস্‌মিল্লা, দ'য়ে, টিকি-এসব শব্দ হামেশাই ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ জুমস, ফুটো-কথা, ডেঁপোমি, কেল্লার ভাব, থোঁতা মুখ ভোঁতা, উব্‌দো হয়ে, মওকা-ইত্যাদি।

গদ্যে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার : "স্মৃতি হল গিয়ে সমুদ্রের জল। এক কল্‌সি তুললেই বা কী! আর এক কল্‌সি ঢাললেই বা কী!" (কলকাতা গরম, পৃ. ২০)

সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ : "গান্ধীবাবা ডাক দিলেন ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের। বিলিতি কাপড় পোড়াতে হবে। পিকেটিং করে বন্ধ ক'রে দিতে হবে মদের দোকান। সত্যাগ্রহী দিয়ে জেল ভর্তি করো।" (কলকাতা গরম, পৃ. ২০) বইটি আকারে ছোটো এবং যাকে জীবনী বলে তা অবশ্যই নয়। কিন্তু একেবারে আন্তরিক প্রকাশে সুখপাঠ আর নির্ভার অসাধারণ উপস্থাপনা। জীবনী সংক্রান্ত আলোচনা হিসেবে এই বইটির গোত্র নির্ণয় করা যায়। তার থেকে বড় কথা এই গ্রন্থে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যাকে আমাদের সাধারণ জীবনের সীমায় সহজভাবে পাওয়া যায় তার সাথে অনেক সময় সামীপ্য অনুভব করা যায় এটাই গুরুতর লাভ।

পদাতিকের যাত্রাপথ ঃ ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন

ড. সুদীপ্ত ঘোষ

'ঢোলগোবিন্দর স্বপ্নে সব কেমন ভাসা ভাসা। সব কিছুরই একটা উরু-উরু ভাব। লেপ করতে এসে ধুনুরিরা টোয়াঙ-টোয়াঙ শব্দ তুলে যখন তুলো ধোনে, তখন যেমন পেঁজা তুলা তাদের মাথার ওপর ফুরফুর করে ওড়ে, ঢোলগোবিন্দর স্বপ্নগুলোতে তেমনি ছাড়া-ছাড়া একটু ফুরফুরে ভাব।' (ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, পৃঃ ৪৫) — স্বপ্নালু চোখে স্বপ্নের হাত ধরে ঢোলগোবিন্দরূপী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনপথে হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে যায়। জীবনেরই বৃত্ত। সেই জীবনের প্রবাহপথে কত যে মণিমুক্তো ছড়িয়ে থাকে, তার অন্ত নেই। তবে জীবনের এই পথ চলা, জীবনের চড়াই-উৎরাই জীবনের নিয়মেই ঘটে যায়। একজন দর্শক যেন কোন স্টেশনে বসে চলমান ট্রেনগুলির একে একে যাওয়া পরখ করে চলেছেন। কিংবা সেই চলমান দৃশ্যগুলি ক্রম পরম্পরায় বর্ণনা করে চলেছেন—এমনই নিরন্তর আত্মগত সে আলেখ্য। নির্মোহ পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনতো এমনই হওয়ার কথা। যে পদচারণা থেকে ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় তাঁর আত্মবোধ, আত্মদর্শন।

নদীয়ার কেষ্টনগরের (কৃষ্ণনগর) নেদেরপাড়ায় মামার বাড়িতে জন্ম হয় ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণ ক্ষিতীশ মুখুয্যে ও যামিনীবালা দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান সুভাষের। পৈতৃক বাড়ি ছিল যশোরের সুমিদ্রে গ্রামে। পিতামহ তাঁর নাম দেন গোবিন্দ। এই পরিবারে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

।। ২।।

মধ্য কলকাতার নেবুতলা লেনের বাসাবাড়ি থেকে একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা পিতা আবগারি চাকুরে ক্ষিতীশ মুখুয্যের বদলির চাকরির সুবাদে সপরিবারে শিশু সুভাষ গিয়ে ওঠেন অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর গাঁজার-গঞ্জ নওগাঁতে। শিশু সুভাষের এই প্রথম বাড়ির বাইরে সান্তাহার ষ্টেশনের সকাল দেখা "সান্তাহার জংশনে একগাদা লটবহরের মধ্যে মা-র আঁচল ধরে শীতে জবুস্থবু হয়ে কোলে বসে ছেলে ঢোলগোবিন্দ দেখেছিল তার জীবনে রাত পুইয়ে সেই প্রথম সকাল হতে। আঃ জীবনের প্রথম সকাল!" (তদেব, পৃঃ ৪৭) কলকাতায় গ্যাসের আর বিজলির আলোয় সে অন্ধকারের রূপ আগে কখনও দেখেনি। কেননা, সেই নেবুতলা লেনে রাতটাও যে দিন হয়ে থাকতো। সেই শৈশবের স্মৃতিকে সুভাষ কেমন অনুপম কাব্যিকভাবে বর্ণনা করেন। বড় সুন্দর সেই অন্ধকার থেকে আলোর স্ফূরণ — "চায়ের লিকারে একটু একটু করে দুধ ঢাললে যেমন হয়, চোখের সামনে তেমনি করে বদলে যাচ্ছিল অন্ধকারের রং। যেন এতক্ষণ কাগজে কালি পড়েছিল, ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ তা শুষে নিচ্ছে।" (তদেব, পৃঃ ৪৮)

এমনিভাবেই তাঁর জীবনে অনেকের অভিজ্ঞতাই প্রথম অভিজ্ঞতা। যা আগে কখনও ঘটেনি। ছোট সুভাষ খেলার সাথী আকবরদার পাল্টনে থেকে শৈশবের খেলার ছলে সে লড়াইতে লড়তে লড়তে পড়ে গিয়েও উঠতে গেলে বন্ধুরা তাঁকে বলে, সে খেলার নিয়মে মৃত। কাজেই আর উঠতে পারবে না। এখানে দু'টি শিক্ষা হয় সুভাষের প্রথমত, সে না জিতলেও তাঁর দল জিততে পারে। এবং তাঁর দল কিন্তু জিতেছিল। দ্বিতীয়ত, মার খেলে যে ভীষণ লাগে তা এই প্রথম দস্তুর মতো মালুম হয়। এই জন্য তাঁর আর বক্সিং শেখায় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।

জীবনে প্রথম সাঁতার শেখার অভিজ্ঞতা, আবার বলা যেতে পারে প্রথম মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে আসার অভিজ্ঞতাও হয় নওগাঁর টোলের পণ্ডিতের কাছে। 'টুলো পণ্ডিত' শিক্ষানবিশ সাঁতারু সুভাষকে তার কোমড় ধরে থাকতে বলে পুরো জলাশয়টা ঘুরিয়ে আমার প্রস্তাব দেন। সুভাষও ঘুরতে রাজী হয়ে যান। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে সে ছেড়ে দিলে সুভাষকে অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে হয়। তখনও সাঁতার ভালো না জানায়, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণকে বাঁচিয়ে এনে দেয় তাঁর উপলব্ধি — "নিজেই নিজেকে বাঁচালাম। কোনোরকমে জল খেতে-খেতে হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ভাসিয়ে। ঘাটে এসে গোড়ায় গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে রাগ পড়তে লাগল। সারা শরীরে জেগে উঠল এক অসম্ভব পুলক। আমি পেরেছি। মৃত্যুকে পেরিয়ে আসতে পেরেছি।" (তদেব, পৃঃ ১৪)

ওই ছোট্ট বয়সে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা প্রথম হয় বাবার সহকর্মীবন্ধু পাশের কোয়ার্টারে দীনেশ জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ কাকিমার দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত, অকাল মৃত্যুর ঘটনায়। বড় করুণ সে বর্ণনা — "বেলা বাড়তেই খাটে শুয়ে কাকিমা এলেন। পায়ে আলতা। সর্বাঙ্গ ফুলে ঢাকা। কাকিমা মারা গেছেন এটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। ... আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যু দেখা।" (তদেব, পৃঃ ৬৮)

শুধু বেদনার অভিজ্ঞতাই নয়, তাঁর স্মৃতির সঞ্চয়ে থাকে — মায়ের সঙ্গে সবার অগোচরে রাতের অন্ধকারে বাজি পোড়ানোর প্রথম অভিজ্ঞতা। সুভাষ স্বীকার করেছেন — "ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু সেই রাত্তিরটা জীবনে কখনও ভুলবার নয়।" (তদেব, পৃঃ ২৭) এমনইভাবে মনে পড়ে যায় — দাদার বন্ধু বীর বাহাদুরের দৌলতে প্রথম চানাচুর খাওয়ার কথাও। হোক না সে সামান্য। কিংবা, প্রথম সাইকেল চড়ার আনন্দ। যা ভাষায় বর্ণনা করতে সুভাষের পুলক উছলে পড়ে — "তখন চলার গতিবেগ এক স্বর্গীয় সুখ। খানাখন্দ মাঠঘাট পেরিয়ে শয়নে স্বপনে চালিয়ে নিয়ে যাবে দুটো দুরন্ত ঘুরন্ত চাকা। দুটো চড়নদার পায়ের নিচে ক্রমাগত পিছলে যাবে ধুলোয় ধরাশায়ী মাটি।" (তদেব, পৃঃ ১৭৬)

।। ৩।।

শৈশবের নানারকম তুচ্ছ সুখে বিভোর সুভাষ সেই শৈশব থেকেই লক্ষ্য করেন—আমাদের সমাজ-জীবন-ধর্ম-আচরণ সব কিছু। আর তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দেয়

চরম সত্য। জাতপাত এমনই আমাদের লোক-সমাজের এক বড় সমস্যা। দুষ্ট ক্ষতের মতো যা আমাদের জ্বালাতে থাকে। সেই শৈশবের হাসিখেলার দিনগুলিতেও সেসব সমস্যা তিনি নিজে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। অকপট সে সত্য কথনে তাঁর পরিবারকেও বাদ দেননি। তিনি পরখ করেছেন সেসব পরিস্থিতিকে। ধর্মপ্রাণ ঠাকুরদা বা তাঁর মাটির মানুষ বাবাও ধর্মীয় সংকীর্ণতার আঁচ বাঁচাতে পারেননি সুভাষ অকপটে লিখেছেন—"একদিকে যেমন হিঁদুয়ানির গরম, তেমনি উঁচুজাত নিচুজাত — এই জ্ঞানটা বড়দের মধ্যে ছিল তখন টনটনে। তুলসীদাস-কবিরের অতসব উদার মনের দোঁহা আওড়ালেও ঠাকুরদাকে দেখেছি এসব ব্যাপারে একটু টুসকি দিলেই কেন্নোর মতন গুটিয়ে যেতেন। বাবা অত মাটির মানুষ হয়েও এসব ব্যাপারে একটু ঠোকা লাগলেই মাটি খসে ভেতরের খড় বেরিয়ে পড়ত।" (তদেব, পৃ ঃ ১৬১)

তবে এই ধর্মীয় সংকীর্ণতার উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন — হিন্দুরা মুসলিমদের ধর্ম নিয়ে অতিরিক্ত আবেগকেই সাম্প্রদায়িকতা ভাবত। আবার বিপরীত দিক থেকেও সেটা সত্য হতে পারতো। প্রসঙ্গত কোরাণ অনুবাদক প্রতিবেশী মবিউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে এই ধরণের ভাবনায় তাঁর মূল্যায়ন — "আমার মনে হয়, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কোন রকম ধর্মীয় ভাব বাঙালি হিন্দুদের বরদাস্ত হত না। হয়তো সেই জন্যেই সাম্প্রদায়িক বলে মবিউদ্দিন সাহেবের তারা বদনাম করত। কিংবা তাঁরও হয়ত পরধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা ছিল।" (তদেব, পৃঃ ১০)

আসলে জাতপাত নিয়ে সে সময় যে মানুষ একটু বেশীই মশগুল থাকত তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান-ই নয়, একই ধর্মের বা জাতের মধ্যেও কত যে উপবিভাগ তার আর অন্ত ছিল না। তবে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতপাতে তিনি কেমন যেন গুটিয়ে যেতেন। "কেননা সব জাতে আর সব অঞ্চলেই যে তার পড়ার আর খেলার সাথী ছড়ানো।" (তদেব, পৃঃ ৭৬) স্কুলের ক্লাস ঘরে বা খেলার মাঠে যে কোন জাত-ধর্ম-বর্ণের খাদ থাকত না তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য 'মুশকিল হত কেউ কারো বাড়িতে গেলে। জীর্ণ সংস্কারের কাপড়ে সেই বৈষম্য কিছুতেই ঢাকা যেত না।' (তদেব, পৃঃ ৮৭) তিনি লক্ষ্য করেছিলেন — কেউ জল চাইলে বা কাউকে খেতে বললে, তার এঁটো ধোয়া নিয়ে বাড়ির ঠিকে করা কাজের লোকেরাও বেঁকে বসতো। এ দায়িত্বটি তাঁর মা নিজে নিয়ে নিতেন। তবে এর থেকে রেহাই পাওয়া যেত না। কারণ, "ছোয়াছুয়ির এই ব্যাপারটা ষোল আনা চাপা যেত না। যার মনে লাগার তার ঠিক লাগতো। তখন নিজেদের খুব বোকা বোকা মনে হত।" (তদেব, পৃঃ ৮৭)

কিন্তু এটাই শেষ সত্য নয়, সুভাষ জানিয়েছেন অন্যরকম স্মৃতির কথাও। যেখানে তাঁর স্মৃতির সঞ্চয়ে থাকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খতিয়ান — 'মফস্বল শহরে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে সরকারী কোয়ার্টারে বাস করার ফলে জাতের বালাইটা কখনই আমাদের

মনে তেমন চেপে বসতে পারেনি। তাছাড়া প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোতে আমাদের ছোটদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। ঈদ বকরীদ মিলাদ শরীফে আমরাও উৎসবে মেতে উঠতাম।' (তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০)

।। ৪।।

তফশিলী সমাজের মানুষ সংরক্ষণের সুবিধায় যে চাকরি-বাকরি পেয়ে সমাজকে বা পরিবারকে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নিতে, চিরাচরিত উপার্জনের পথ যে ছাড়তে চাইছে তাও তিনি লক্ষ্য করেন — তাঁদের পরিবারের বাঁধা নাপিতের আর বাড়িতে চুল কাটতে না আসতে চাওয়ায়। কেননা, "তফশিলী হওয়ায় তাঁর ছেলে তখন বি.এ. পাশ করে ডেপুটির চাকরি পেয়েছে। ছেলের মান রাখার জন্যেই তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।' (তদেব, পৃঃ ১৬১)

শুধু কি তাই, তিনি গোপন করেননি, তফশিলী সমাজের দ্রুত অগ্রগতিতে পশ্চাপদ বামুন সমাজের হতাশার কথাও — 'শিক্ষাদীক্ষা চাকরি বাকরিতে সুযোগ সুবিধে পেয়ে অবস্থাপন্ন তফশিলীদের ঘরের ছেলেরা তখন চড়চড় করে ওপরে উঠছিল। তাদের মাটির বাড়ির ভিটেয় উঠেছিল পাকা দালান। পড়ন্ত বামুনদের কী চোখ টাটানি।' (তদেব, পৃঃ ১২৬-১২৭) শুধু স্মৃতিকতা বলতে গিয়ে ঢোলগোবিন্দ সেই সময়কে, তার নির্যাসকে ধরে দিয়েছেন আমাদের কাছে। যেন ইতিহাসকে বুনে রেখেছেন তাঁর মনের অজান্তেই।

।। ৫।।

শৈশবের কত স্মৃতি ভিড় করে আসে ঢোলগোবিন্দের মনে। দিদির জন্য আলাদা এক দরদমাখা মন ছিল সুভাষের। গ্রাম-বাংলার অন্য মেয়েদের মতো দিদির পুণ্যিপুকুর ব্রত পালনও মনে আছে তাঁর, মনে আছে — গোবরজলে নিকানো মেঝেতে আতব-চালের পিটুলি গোলার আলপনা দিয়ে মাঝখানে মাটির বাঁধের পুকুর, পাতাসুদ্ধু বেলগাছের ডাল, রকমারি ফুলের সজ্জা। ব্রাহ্মণ পুরুতবিহীন চৈত্রমাসের দুপুর। দিদি বলছেন — "পুন্যিপুকুর পুষ্পমালা, কে পুজেরে দুপুরবেলা?" (তদেব, পৃঃ ৮৬) ব্রতের এই ছড়াটি সম্পূর্ণ করে শেষে অঞ্জলি দিতে দিদি যখন বলে — "পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে / মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে—" (তদেব, পৃঃ ৮৬) — এই মুহূর্তটি সুভাষের কাছে বড় কষ্টের। কেননা, 'মনটা যে কী খারাপ হয়ে যেত বলার নয়।' (তদেব, পৃঃ ৮৬) — পরিবারের ছোট ছোট দুঃখ — কষ্টকে সেই ছোট্ট বয়স থেকেই সুভাষ অনুভব করেন। তাঁর সংবেদনশীল মন এতে ভারাক্রান্ত হয়। পরিবারের তথা সমাজের অবহেলার এহেন পরিচয়, তাঁর কলম চুঁইয়ে মনের অজান্তেই আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। যেমন, তাঁর মায়ের সময়ের মেয়েদের লেখাপড়ার বাহুল্যকে তৎকালীন সমাজ গুরুত্ব দিত না — "গাঁয়ে থেকে ছেলেদের লেখা পড়া যা হওয়ার হত। ও নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাত না। মেয়েদের বেলায় ভাবনা ছিল শুধু বিয়ের।" (তদেব, পৃঃ ১২৬)

সমাজ পরিবর্তিত হলেও আজও যে এর থেকে পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারিনি অনেকে তা নারীদের বর্তমান অবস্থাতেও বুঝতে পারা যায়। তৎকালীন নারীদের সমাজ পরিচয় বা ব্যক্তি পরিচিতি গুরুত্ব পেত না আদৌ। কেননা, "সেকালে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের নিজস্ব নিজস্ব নাম গুলো আস্তে আস্তে মুছে যেত। গোড়ায় দিদি-বৌদি, তারপর অমুকের বউ, অমুকের মা এবং যত বয়স বাড়তে থাকে তত মাসি-পিসি, গিন্নীমা এবং তারও পরে দিদিমা-ঠাকুমায় গিয়ে শেষ হত। আমার মাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মার ভালো নাম যামিনী হলেও মাকে ও-নামে কাউকে কখনও ডাকতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।" (তদেব, পৃঃ ৬২)

সমাজে বার্ধক্যের প্রতি অবহেলার পরিচয়ও সেই বয়সেই সুভাষ লক্ষ্য করেন। এবং পীড়িত হন। বার্ধক্যে ঠাকুরদার প্রতি বাবার উদাসীনতা তাঁকে ভাবাত। সংসারে নিতান্ত গুরুত্বহীন হয়ে থাকতে হত দাদুকে — "নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবা যখন ঠাকুর্দার হাতে বাইরে চলে গেলেন, বাবা তাঁর চোখে খানিকটা বোধ হয় পর হয়ে গেলেন এবং তাঁর সংসারে ঠাকুর্দা হয়ে গেলেন অনেকটা পরমুখাপেক্ষী।' (তদেব, পৃঃ ৫৮)

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মায়ের প্রতি সুভাষের এক অপার দরদী মনোলোকের হদিশ পাই আমরা। ধার্মিক মায়ের সান্নিধ্য তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। বেলুড়মঠে দীক্ষিত তাঁর মায়ের ছিল সব মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। তাছাড়া সুভাষ বলেছেন — কৃষ্ণনগরের মেয়ে হওয়ায় তাঁর মার ভাষাও ছিল খুব মিষ্টি। একান্নবর্তী পরিবারকে জোড়াতালি দিয়ে ছেঁড়াফাটা সংসারকে ফোড় দিয়ে জুড়ে রাখাই শুধু নয় — প্রতিবেশী অনাত্মীয়দের প্রতিও ছিল দরদ। এমনকি জাত-ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে প্রসূতির প্রসব থেকে কলেরার আর্তজনকে সেবা ছিল তাঁর মায়ের আন্তরিক প্রবণতা। অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। তবে সবক্ষেত্রে আবার বাড়ির সায়ও থাকত না।

মাকে সুভাষ একটি ব্যাপারে খুব হিংসা করতেন। বড্ড রাগ হত তাঁর, যখন শিশু বয়সে মৃত তাঁর একটি ভাই, যার নাম শিবোদাস — তার গুণপনা, গাঁয়ের রঙের বর্ণনা দিয়ে মা তুলনা করতেন সুভাষের সঙ্গে। এই তুলনাটা তাঁকে হিংসুটে করে তুলতো। নির্লোভ বাবা, দায়িত্বশীল আবগারি কর্তার ঘুষ না নিয়ে সৎ জীবন যাপনের মতোই মায়ের মহানুভব-উদার-সেবাপরায়ণ মন তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে জীবনে।

।। ৬।।

শৈশবের সেদিনের কত কিছুই না সুভাষের স্মৃতির সরণী বেয়ে চলে আসে। সেই স্মৃতিতে ভিড় করে আসে — হোসপাইপের গলা ফাটানো ঘোলা জলে কলকাতার রাস্তা ধোয়া, আত্মপীড়নের মাধ্যমে হাপুগান, অচেনা মেয়ের 'মাট্টি লেবে গো, মাটি' বলে ডেকে যাওয়া, কলকাতায় গাজনের সঙ্ দেখা, নওগাঁর গ্রামের বাৎসরিক সমালোচনামূলক শখের যাত্রা, শহরে বেদেদের টোল, সার্কাস দেখা, ওড়িয়া পাচক মোহনের মুখের পান খাওয়া,

কলকাতার বাসা বদলে যাওয়ার সময় পরিত্যক্ত ঘরের থেকে কুড়িয়ে রাখা ফেলে দেওয়া টুকিটাকি কত শৈশবের সম্পদ, চু-কিৎকিৎ বা গাদি খেলা, ছুটির দুপুরে মারবেল আর শীতের দিনে লাট্টু খেলা, নেবুতলা লেনের সরগরম জমাটি সকাল, রানারের ডাক নিয়ে যাওয়া, বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাইয়ের কলকাতার হাপুগানের মতো অকারণ আত্মপীড়নের অভ্যাস — এমন আরও কত কিছু। তবে ভোঁ-কাট্টা হওয়া ঘুড়ির টেলিগ্রাফের তারে আটকে থাকার দৃশ্যের মায়াময় স্মৃতি এখনও তাঁর মনে টাটকা। তিনি অনুপমভাবে বর্ণনা করেছেন সে দৃশ্যের — "... তারের গায়ে হেঁটমুণ্ডে লট্‌কে আছে কাটা সৈনিকের মতো ভোঁ-কাটা-হওয়া কত যে ঘুড়ি। যতক্ষণ কাল থাকে, জোরে একটু হাওয়া দিলেই আকাশে উড়ে যেতে চায়। এদিকের ছুটে গেলে তখন ডানা-কাটা পাখির মতো ঝটপট করতে করতে কেবলই পাক খায়।" (তদেব, পৃঃ ৩১) কোথায় যেন সমাসোক্তি অলংকারের নিয়মে ভোঁ-কাট্টা ঘুড়িই হয়ে যায় পাখি। পাখির সত্তা আরোপে এমনই এ বর্ণনার জাদু।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কৈশোর কেটেছে পরাধীন ভারতের নানা ঘটনার উত্তাপ আর অভিঘাতে। যা আজকের ইতিহাস হয়ে গেছে। তিনি দেখেছেন কত অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে খণ্ডিত স্বাধীনতা এসেছে। দেশভাগের জ্বলন্ত শিকার দুই বাংলার দিশেহারা পরিবারগুলির করুণ অবস্থার কথা তিনি না বলে পারেন নি। তাঁর এক দাদার পরিণতির কথা এখানে তুলে ধরেছেন — "দেশভাগ হওয়ার পর লাখ লাখ টাকার কারবার বিষয় সম্পত্তি ফেলে দিয়ে একদিন হঠাৎ রাতারাতি আলুদাকে (কৃষ্ণেন্দুনাথ চৌধুরী) এক বস্ত্রে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসতে হয়েছিল।' (তদেব, পৃঃ ১৭৪) এ শুধু তাঁর এই দাদার নয়, সেদিনের ভুক্তভোগী অনেকেরই কথা। দেশভাগের প্রভাব তাঁর পরিবারেও এসে পড়ে। তাঁদের ওপার বাংলার বিষয় সম্পদ রাতারাতি সব বেহাত হয়ে যায় — মেজো কাকা বা অন্য কেউ উদ্যোগী না হওয়ায়। প্রকারান্তরে তাঁরা হয়ে গেলেন উদ্বাস্তু। যদিও তাঁর বাবার অমতে তাঁরা উদ্বাস্তু হিসেবে সরকারি খাতায় নামও লেখায়নি। এ প্রসঙ্গে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্ধেক জীবন'-এর এক জায়গায় অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। যদিও ওপার বাংলা থেকে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁরা বহু পূর্বেই কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন বাবার কর্মসূত্রে, তবুও দেশ বিভাগে তাঁরা রাতারাতি হয়ে যান উদ্বাস্তু। সুনীলের কথায় — "নেহাত আমার বাবা দেশভাগের আগে থেকেই কলকাতার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, আমরা থাকতাম এখানেই, সেইজন্য আমাদের ওরকম তাড়া খাওয়া উদ্বাস্তু হতে হয়নি, তবুও ওইদিন থেকে আমরা হয়ে গেলাম শিকড়হীন। আমাদের প্রতিবেশীরাও আগে আমাদের বলত বাঙাল কিংবা বাংলাদেশের লোক, এখন থেকে বলতে লাগল রিফিউজি।" (অর্ধেক জীবন, পৃঃ ৮৫)

সুভাষ লক্ষ্য করেছিলেন পরাধীন ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল ব্যায়ামাগার। এই আবহে বড় হতে হতে মনের অজান্তেই তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছিল তাদের অনুশীলনের ধ্রুবপদ — 'তামেচা-বাহেরা-শির।' শুনেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর

আজাদহিন্দ ফৌজের লালকেল্লা অভিযানের কথা, এমনকি তিনি একবার জেলে গিয়ে দূর থেকে দেখেও ছিলেন সুভাষচন্দ্রকে। বলে রাখা ভালো — তাঁর মেজোকাকা প্রভাস মুখোপাধ্যায় নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে ও সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় তাঁর নামকরণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, পরে তাই থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামে স্কুলে ভর্তি করেন। তাঁর জীবনের অনেকগুলি আক্ষেপের মধ্যে অবশ্যই নওগাঁতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বক্তৃতা করতে আসা গান্ধীজীকে না দেখতে পাওয়া ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা শুনতে, উপস্থিত না হতে পারার কষ্ট, যা থেকে গেছে আজীবন। সেইসঙ্গে সমাজ-সমালোচকের ভূমিকা নেওয়া ইংরেজের চক্ষুশূল কলকাতার চৈত্রের গাজনের সঙ্ দেখার প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাওয়ার কষ্টটাও থেকে যায়।

তাঁর 'আমার বাংলা' গ্রন্থের 'কলের কলকাতা' প্রবন্ধে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের অগ্নিময় সেইসব দিনের কথা। আসলে তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তর যেমন দেখেছিলেন তেমনি ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন, স্বদেশী, আইন অমান্য বা অসহযোগ আন্দোলনও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনে আছে নওগাঁ থেকে লবণ তৈরী করতে যাওয়া ছেলেদেরকে কাঁথিতে পুলিশি নিগ্রহের প্রতিবাদে ফেটে পড়া জনতাকে। সেইসব আন্দোলনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র — "সারা শহরে আগুন। সে আগুনে জ্বলছে বিলিতি কাপড়। পাড়ায় পাড়ায় দল বেরিয়েছে। গম্‌গম্ করছে তাদের আওয়াজ – বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলো। দুপাশের বাড়ী থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে রাশিরাশি কাপড়।" (আমার বাংলা, পৃঃ ৮৬) কিংবা, ওই রচনারই আর এক জায়গায় বর্ণনা করছেন — " সারাটা দিন নেশার মত লাগে। জল খাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো চার আনা পয়সা দিয়ে শিয়ালদার মোড় থেকে কিনে আনি খদ্দরের টুপি। সেই টুপি মাথায় দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরি। দু'ধারের বাড়ীগুলো থেকে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।" (তদেব, পৃঃ ৮৭)

শুধু সেই স্বাধীনোন্মুখ নেশার ঘোরই নয়, পরাধীনতা থেকে আশু মুক্তির কথা ভেবে, মনে মনে পুলকও অনুভব করেন সুভাষ। এমনকি নিষিদ্ধ বুলেটিনও পড়তে ভয় পান না তিনি। তাঁর নিজের কথায় — "বাড়ীতে যখন কেউ না থাকে, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উনুনের আঁচে বেআইনী বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গাঁয়ে কাটা দিয়ে ওঠে।" (তদেব, পৃঃ ৮৯)

তবে অনেক বিপ্লবীর কারাবাস বা মায়ের মুখে শোনা কৃষ্ণনগরের বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্রের মত আরও অনেকের ফাঁসির কথায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। অগ্নি যুগের এইসব বিপ্লবীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সকরুণ প্রার্থনা জানান সুভাষ। যেন মাষ্টারদার মত বিপ্লবীরা ধরা না পড়েন বা বেঁচেবর্তে থাকেন। কিন্তু সবসময় সে প্রার্থনার ফল মেলে না। তাই "সারা বাংলাকে কাঁদিয়ে ফাঁসি যায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, আরও অসংখ্য

শহীদ।" (তদেব, পৃঃ ৯৪)

জাপানী যুদ্ধের ভয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে অনেক মানুষের জীবন জীবিকা ব্যাহত হয়। জীবিকা হারান নৌকার মাঝিরাও। এরপর উদ্বাস্তু হয়ে তাদের সংকট আরও ঘনীভূত হয়। এমনকি মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেও হিমসিম খেতে হয়। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে চিনির কলেও কাজ নিতে হয় অনেক সম্পন্ন পরিজনকে। তাদেরই একজন ক্ষ্যাপাদা চিনিকলে যোগ দেয়। কিংবা তাঁদের পাড়ায় বেহুলার ভাসানে যে ছেলেটা লখিন্দর সাজতো তাকেও এখানে কাজে সামিল হতে হয়। ঢোলগোবিন্দ আত্মদর্শনে লেখে সে কথা — "ক্ষ্যাপাদা চিনিকলে মজুর হয়েছে শোনার পর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমিও বড় হয়েছি। শুধু আখ নয়, আখের মতো মজুরদেরও কলের মালিকেরা যে নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দেয় — এটা সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি।" (ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, পৃঃ ১৪৪)

এই মালিকশ্রেণীর শোষণের কথা এবং শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চিত জীবনের কথা তাঁর লেখা কার্লমার্ক্সের 'ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল' গ্রন্থের অনুবাদ 'ভূতের বেগার' -এ খুব প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীলভাবে বলেছেন। তিনি এ গ্রন্থের এক জায়গায় 'মুদ্রারাক্ষসের পালা' শিরোনামে লিখেছেন — "পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষীরসরটুকু তারা একাই চেটে পুটে খায়। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা-অত্যাচার, দৈন্য-দুর্দশা, শোষণ আর দাসত্ব চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়।" (ভূতের বেগার, পৃঃ ১০৩) অর্থাৎ যাদের হাড়ভাঙা কঠোর পরিশ্রমে সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে, তারাই কিনা থাকছে অভুক্ত। থাকছে অনাহারে, অর্ধাহারে। সুভাষ এখান থেকেই চলে যাচ্ছেন তাঁর নতুন ব্যাখ্যায়। যেখানে আপনি থেকেই রূপ নিচ্ছে শোষণের সংজ্ঞা। তাঁর কথায় — "নিজে না খেটে অন্যের খাটুনির ফল ভোগ করাই — অর্থাৎ, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার নামই শোষণ।" (তদেব, পৃঃ ৩৬)

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'ভূতের বেগারে' এহেন বক্তব্য পেশ করায় তথাকথিত কমরেডদের বিরাগভাজন হন। এমনকি, তাদের আক্রমণের শিকারও হতে হয় তাঁকে। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমূহ অবদান, সৃষ্টি সত্ত্বেও এক লহমায় তাদের কাছে হতে হয় অপমানিত, অপাক্তেয়। কবি জয় গোস্বামী সম্প্রতি 'মেঝেয় শোয়ানো রইল লাঠি' প্রবন্ধে কবি সুভাষের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেদিনের কথা স্মরণ করে বলেন —

"সারা জীবন মানুষটা যে বিভিন্ন শাখায় সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে এসেছেন, সে-কথা ভুলতে সময় লাগল না রাজনৈতিক মত ও সমর্থন বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই।" (সুভাষিত, রোববার, পৃঃ-২৫) অবশ্য চিন যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুরোনো কমিউনিষ্ট পার্টিতে থেকে যাওয়াও এই আক্রমণের অন্যতম একটি কারণ।

।। ৭।।

জীবনের পথ পরিক্রমায় কেবল নীরসভাবে জীবনের কথাই বলেননি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বলেছেন বেশ সরসভাবে। হালকা রসিকতার চকিত উদ্ভাস আমাদের নজরে পড়বে অনেকবারই। সে কোথাও কোথাও নিছকই রসিকতা, আবার কোথাও বা রসিকতার মাধ্যমে নির্মম সত্য বলার চেষ্টা। তাঁর ভাষায় সে রস বোধের পরিচয় এক নজরে —

১। "গ্রামের লোকদের ওপর কী একটা অন্যায় অবিচার করায় আমার ঠাকুর্দার মা-বাবা-ঠাকুমা নাকি লম্বা একটা বেত হাতে নিয়ে নীল কুঠির এক সাহেবকে তেড়ে গিয়েছিলেন মারতে। ... আমাদের বাড়ির লোকেরা যেরকম ভীতু প্রকৃতির তাতে আমি আর দাদা এ গল্পটাকে বরাবরই একটু সন্দেহের চোখে দেখেছি। তবে পরে ভেবে দেখেছি ঠাকুর্দার মা বা ঠাকুমা তো অন্য বংশ থেকে এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে হয়ত তাঁদের একটু বেশি তেজ থাকলেও থাকতে পারে।" (ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, পৃঃ ২১)

২। "কুষ্ঠিটা হারিয়ে আমার ভবিষ্যৎটা অন্ধকার হয়ে গেল।" (তদেব, পৃঃ ১৪)

৩। "বাবার ছিল কড়া হুকুম, দেওয়ালিতে কেউ কোনো বাজি ফোটাতে পারবে না। বাবার এই নিষেধাজ্ঞায় ঠাকুর্দারও দেখেছি সায় ছিল। ছেলেরা বাজি পোড়ালে তার খরচের ঠেলা ঠাকুর্দাকেই তো সামলাতে হত।" (তদেব, পৃঃ ২৬)

৪। "রাতে-ঘুমুতে-না-পারা-ঠিকে-ঝিদের হাত ফসকে থালাটা গেলাসটা কলতলায় শান বাঁধানো মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝনঝন আওয়াজে যখন সকালের স্তব্ধতা ভেঙে দিত, তখন তারা নিজেদের অপ্রস্তুত ভাবকে সামাল দিতে বাপের-বাড়ির-জন্যে-মনকেমন-করা বউদের সান্ত্বনা দিয়ে বলত এ বাড়িতে আজ কেউ আসতেচে গো, মা!" (তদেব, পৃঃ ৩০)

৫। "বাবা লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। (সব বাবাই লেখা পড়ায় ভালো হয়।) ইন্টারমিডিয়েটের টেস্টে বাবা নাকি হয়েছিলেন সেকেণ্ড।" (তদেব, পৃঃ ৫৬)

৬। "দিদিমা খুব সুন্দরী ছিলেন বলেই দাদামশাই কখনও দিদিমার কোল খালি রাখতে দেননি। ফলে, দিদিমাকে বিশটি সন্তানের জননী হতে হয়েছিল।" (তদেব, পৃঃ ৬৮)

৭। "সে যুগে যৌবন ছিল খুব স্বল্পায়ু। চল্লিশ পেরোলেই যে কেউ বুড়ো বলে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারত। সেই সুবাদে তখন স্নেহভরে যে-কোন নবোঢ়াকে নিরাপদে চুমো খাওয়া যেত। ... ঠাকুরদা তেমন সুযোগ বড়ো একটা হাতছাড়া করতেন না।" (তদেব, পৃঃ ৭০)

৮। "অবাক হয়েছিলাম আমাদেরই বাড়িতে নৌ কাকাকে স্লিপিং-গাউন প'রে বীরের মতো তক্তাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশের একটা লাঠি দিয়ে ঘরের ভেতর ফোঁস ফোঁস করা একটা জাত সাপ মারতে দেখে। বিলেত ফেরৎদের কী বুকের পাটা।" (তদেব, পৃঃ ৭২)

৯। "বারান্দার বাইরে যে ছেলেরা দুমদাম বল পেটাচ্ছে আর ঘরে বল চলে গেলে এক দৌড়ে কুড়িয়ে আনছে, একটা বিস্কুট দিয়ে আর গোপাল ভাড়ের দুটো গল্প বলে তাদের

অনায়াসে হাত করা যায়। ওরাই তো পাড়ার গেজেট। সকলেরই হাঁড়ির খবর রাখে। (তদেব, পৃঃ ৯১)

১০। গাঁয়ের জমিদার তারিণী দাদামশাই প্রসঙ্গে — "একে বেঁটে খাটো। গায়ের রং বেশ কালো। হাঁটুর ওপর কাপড়। অষ্ট প্রহর মুখে থেলো হুঁকো। সঙ্গে ফতুয়া থাকলেও দাদ চুলকানো জ্বালায় সে ফতুয়া গায়ে উঠতে বড় একটা দেখা যেত না।" (তদেব, পৃঃ ১৩৯)

১১। " নিকিরিরা এরপর থেকে মাঝে-মঝে জোর করে আমাদের বাড়িতে মাছ দিয়ে যেত। পয়সা দিতে গেলে দুকানে হাত দিয়ে জিভ কেটে পালাত। সেই মাছে ঠাকুরদার মন ভিজেছিল। বলত, জাতে ওরা ছোট হলেও মনগুলো ওদের বড়।" (তদেব, পৃঃ ১৪৯)

১২। "তৎকালীন নওগাঁর এস.ডি.ও. রায় সাহেবের জামাই-এর রেডিও চালানোর প্রয়াসের প্রসঙ্গে — "রায় সাহেবের জামাই পরিত্রাহি চেষ্টা করে চলেছেন যন্ত্রটাকে বাগে আনতে। এ-কানে মোচড়ে দিচ্ছেন, এটা খুলে সেটা লাগাচ্ছেন। কখনও কুঁই-কুঁই, কখনও কড়-কড়-কড়াৎ, কখনও যেন শাঁক-চুন্নির ঝগড়া। কিছুতেই আর কিছু হয়না।" (তদেব, পৃঃ ১৮৫)

এই আপাত হাস্য পরিহাসের অন্তরালে এক অন্য সত্য এসে ধরা দেয় ঢোলগোবিন্দের ভাবনায়। নওগাঁর এস.ডি.ও. রায় সাহেবের জামাই রেডিও চালাতে না পারলেও পাছে প্রভাবশালী রায় সাহেব আমন্ত্রিতদের উপর অখুশি হন তাই কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ উঠে গেলেও সবাই উঠে যেতে পারেন না। এ থেকে সুভাষের উপলব্ধি হয় — "যারা স্বাধীন পেশার লোক, যেমন উকিল আর মোক্তার, তারপর ইস্কুল মাস্টার — এরাই আগে খসে। কিন্তু সবচেয়ে দেরিতে ওঠে সোডাকলের মালিক। লোকটার এত টাকা, তবু সরকারি আমলাদের দেখলে আর জ্ঞান থাকেনা। হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে আর প্রভুভক্তের মতো ল্যাজ নাড়ে। উকিলরাও তাই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের পয়লা নম্বরের ধামাধরা। দেখাগেল, কয়েকজন ধামাধরা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী তার মধ্যে একমাত্র সোডাকলের মালিকটি বাদে, রায় সাহেবের জামাইয়ের ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে।" (তদেব, পৃঃ ১৮৬)

।। ৮।।

পদাতিকের যাত্রাপথ সবসময় মসৃণ হয়নি। কেননা, তিনি বরাবর সত্যকে অকপটে ঘোষণা করেছেন কোন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির প্রত্যাশাকে তোয়াক্কা না করেই। আকড়ে ধরে থেকেছেন সত্যকে। এ যে তাঁর বাবা-মায়ের থেকে পাওয়া। সাহিত্য জীবনের হাতে খড়ি তাঁর স্কুলের ম্যাগাজিনে। কবিতা লেখার শুরু, অবশ্য তাঁর এক সম্পর্কীয় দাদা সুশীলবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ বৌদির অনুরোধে দেশাত্মবোধক পদ্য রচনার অপটু চেষ্টা দিয়ে। যদিও তা পদ্য লেখার জন্য ভবিষ্যৎ ভাবনার পরিণতিতে সাহায্য করেছিল ভবিষ্যতের কবি সুভাষকে। তাঁর কথায় — "কাগজটা উলটে পালটে বউদি বললেন — এর মধ্যে দেশপ্রেম কোথায়

রে? তাছাড়া এ তো পদ্যও হয়নি। সেই যে দমে গেলাম, তারপর ছ-সাত বছর আর পদ্য কেন, লেখা-লিখিরই ধারপাশ মাড়াইনি।" (তদেব, পৃঃ ১৭০)

ব্রাহ্ম এই বৌদির সূত্রেই 'প্রবাসী' পত্রিকা পড়ার অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে প্রথম পাতাতেই রবীন্দ্র রচনা পড়তে থাকেন নিয়মিত। পরবর্তীতে সংযোগ গড়ে উঠেছিল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

রাজশাহীর নওগাঁতে স্থানীয় রাজবংশী উপভাষার আঞ্চলিক কথ্যভাষা উত্তরবঙ্গের বাহে ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর স্কুল শিক্ষক সেজো কাকা এই ভাষাটি ভালো রপ্ত করেছিলেন। সে ভাষার নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন বড় সুন্দরভাবে। যেমন — 'নিন্দালু-রে, রে-নিন্দালু! এইঠে আইসো। কোঠেকার অ্যালায় বড় নোকের ছোয়া হইসে, বায়রে বায়।" (তদেব, পৃঃ ১৮৩)

ট্রেনে চড়তে বা বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে সুভাষ খুব ভালোবাসতেন। শৈশব-কৈশোরে তাঁর মনে অনেক কৌতূহল লাইনের ধারে গাছপালা আর খাম্বাগুলো পিছনে দ্রুত ছুটে যাওয়ার কারণ খোঁজা বা 'রেললাইনের স্লিপারে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে সমান্তরাল দুটো রেখার ক্রমান্তয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা।" (তদেব, পৃঃ ১৫৩) এই সূত্রে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে ঠাকুরঝির মাথায় দুধভর্তি পিতলের ঘটি নিয়ে রেললাইন বরাবর চলে যাওয়া শেষ পর্যন্ত একটি স্বর্ণবিন্দুতে পরিণত হওয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

একসময় তো বাবার চাকরীর বদলির সূত্রেই তাঁকে আবার নওগাঁ ছাড়তে হয়। তখন সুভাষের বর্ণনা আমাদের বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়ার সেই অনুভূতিতে পৌঁছে দেয়। কোথায় যেন এ দুটি দৃশ্যে এক মিল এসে যায় —

'পেছনে কত কী ফেলে যাচ্ছে ঢোলগোবিন্দ। বর্ষা এল যখন বড় বড় ঢেউ ভেঙে নৌকায় ভারি ভারি পাথর নিয়ে পদ্মা পাড়ি দেবে, হে মা রক্ষেকালী, ক্ষ্যাপাদাকে তুমি দেখো। ... কাঁচপোকা, তোমরা থেকো। দিদি বাপের বাড়ি এলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দুপাশের রগে ভিজে গামছা চেপে ধরে চুলে পাতা কেটে কপালে পরবে আমারই ধরে দেওয়া কাঁচ পোকার টিপ।" (তদেব, পৃঃ ১৫১)

তবে এই নওগাঁও কালের নিয়মে পাল্টে যেতে দেখেছেন তিনি। তখন তাঁর মনটা বড় বিষন্ন হয়ে যায়। সেদিনের প্রজাপতি আর এদিনের প্রজাপতিতে কত তফাত — "এতদিন সে দেখেছে, পাতার মধ্যে গুটিসুটি মেরে থেকে হঠাৎ একদিন শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে গেছে। এখন দেখছে উলটো জিনিস। রংচঙে ভারি সুন্দর একটা প্রজাপতি যেন ডিগবাজি খেয়ে কালো কুচ্ছিত শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছে।" (তদেব, পৃঃ ১৮৯)

কেবলমাত্র নওগাঁই নয়, সুভাষ প্রত্যক্ষ করেন তাঁর নেবুতলা লেনের চারপাশটাও আর আগের মত নেই। কোথায় যেন একটা শূন্যতার বোধ তাঁকে আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে। চারপাশটাতে কত কিছু নেই। তার অনুপস্থিতি বিষাদী সুরে বাজছে। এখানেই ঢোলগোবিন্দ

তাঁর জীবনের একটি গোটা পর্বকে পূর্ণ হতে দেখছে। মহাকালের কাছে যে সে সবই সাময়িক — "খোলাবস্তি আজও আছে, কিন্তু সেইসব পেটমোটা হালুইকর, রোগা রোগা ডকের খালাসি, জলকলের মিস্ত্রি, ঘন্টা-নাড়ানো টিকিঅলা পুরুত, বিচিত্র সব জিনিস-বেচা ফেরিওয়ালা আর আলুকাবলিওয়ালা — তারা সব গেল কোথায়? (তদেব, পৃঃ ৩৯)

গ্রন্থঋণ :—

১। ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ৫ শ্রাবণ, ১৩৭০, অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা- ৭০০০০৬।

২। ভূতের বেগার - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ - মার্চ, ১৯৫৪, সাহিত্য জগৎ,কলিকাতা - ৬।

৩। আমার বাংলা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৯, ঈগল পাবলিশিং কোং লিঃ , কলিকাতা - ২০।

৪। সুভাষিত রোববার, ৭ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, সংবাদ প্রতিদিন প্রাঃ লিঃ, সম্পাদক - অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

৫। অর্ধেক জীবন - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম প্রথম সংস্করণ, ২০০২, জানুয়ারি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯।

৬। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির ঃ ড. জয়গোপাল মণ্ডল, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, বৈশাখ ১৪২৪, কলিকাতা।

৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ পদাতিক কবি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, রক্তিম কবিতা — ড. বিজয় সিংহ, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা - ৭৩, কলকাতা বইমেলা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

জয়গোপাল মণ্ডল

১৯১৯ : মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে (১২ ফেব্রুয়ারী) কবির জন্ম।

‘প্রথম যুদ্ধের ঠিক পরে।
কত সাল
সেইটাই তো জানি না।
বার বধু।
ভুলি নি, কারণ—
মা বলতেন বুধবার নখ কাটা
আমার বারণ।

আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে :
একেবারে শীতের শেষদিন
পাতা নেই গাছে
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
বলে ওঠে : মনে নেই? কাল মধুমাস।” (কালমধুমাস)

কবি মামার বাড়ি কৃষ্ণনগরে জন্মেছেন। বাবার নাম ক্ষিতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আবগারি বিভাগের দারোগা ছিলেন, বদলি চাকরী। মায়ের নাম শ্রীমতী যামিনী দেবী।

প্রকৃত নাম সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কবির শৈশব অতিবাহিত হয় অধুনা বাংলাদেশের নওঁগায়। সেই নওগাঁর ছবিও ধরা আছে তাঁর কবিতায়—

‘সেও এক ব্রিজ-ই
ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়,
নিচে চাও যদি—
হিজিবিজি হিজিবিজি
নদী নৌকো নদী নৌকো নদী।
নাম নওগাঁ;
আজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর।
বৃষ্টিপাত বেশ ক-ইঞ্চি বেশি,
নেহাত নগণ্য নয়
সেখানকার শীতের বহর।

দু’-পাশের রেনট্রিগাছে ছায়ায় ছায়ায়
দিগন্তের কোন্ অন্তরালে
জানতাম না কোথায় রাস্তা যায়—
কোন্ সে দুবলহাটি, দিঘাপতিয়াই বা কোথায়?
রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেত দূরের রাস্তায়
গলায় দুলিয়ে ঘন্টা হাতি,
দুলকি চলে কখনও বা ডট।’ (কালমধুমাস)

১৯২৭ : প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ কবি গ্রহণ করেন বাংলাদেশের নওগাঁতে। আট বছর বয়সে ভর্ত্তি হন বউবাজার মেট্রোপলিটন স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণীতে। ধীরে ধীরে কলকাতা তাঁর মনে নানা রঙ ধরায়। তিনি লিখেছেন— ‘হোস পাইপের গলা ফাটানো জলে রাস্তায় আহ্বান ডাকার শব্দ, বাঁকের চোঙ লাগানো চৌবাচ্চার কলকণ্ঠে সকালে প্রথম জল আসার আওয়াজ, গলির দরজায় ডাকাত পড়ার মতো করে সাত-সকালে ঠিকে জি-র কড়া নাড়া, কলকাতায় এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কার্ণিশে বসা কাকের গলাচেরা কা—কা।” (কলের কলকাতা/গদ্য সংগ্রাম)

১৯৩২: তিরিশের দশকের বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কবির কাকার জুটমিলের চাকরীটা চলে যায়, বাবার মাইনে কমে যায়। বাধ্য হয়েই অক্রুর লেনের বাসাবাড়ি ছেড়ে উঠে আসতে হয় দক্ষিণ কলকাতার তুলনায় কম ভাড়ার এক ছোট বাসাবাড়িতে। স্বাভাবিকভাবে বৌবাজার স্কুল ছেড়ে কবি সত্যভামা ইন্সটিটিউশনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৯৩৪: সত্যভামা স্কুলে শিক্ষক ধর্মঘট হলে কবি ছাত্র হয়েও জড়িয়ে পড়েন। স্কুল থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। কবি এরপর ঐ বছর ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশনে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। শিক্ষক হিসাবে পান কালিদাস রায় এবং কালি ও কলম’ পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে। সহপাঠী হিসাবে পেলেন সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রমানাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, নির্মল চ্যাটার্জী প্রমুখকে।

১৯৩৭: মিত্র স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এবং আই. এ পড়ার জন্য আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় সুভাষচন্দ্রের কবিতায় হাতেখড়ি। কবি ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৩জুন ১৯৯২ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘১৯৩৭/৩৮ সাল হবে, তখন আমি সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একটা কবিতা লিখেছিলাম, তার নাম ছিল ‘রবিবাবুকে’। তাতে বলেছিলাম, তোমার কবিতা আমাকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। পরে নিষ্ঠুর বাস্তব এসে সেই স্বপ্ন চূর্ণ করে

দেয়। এই বেদনা থেকে তুমি আমায় রক্ষা করো। হয় তোমার কবিতা প্রত্যাহার করে নাও, নয়তো দুনিয়াকে বদলে দাও।"

এই সময় থেকেই ভবানীপুরের 'কল্যাণ সঙ্ঘ' নামে ছোট্ট পাড়াতে গ্রন্থাগারের সাপ্তাহিক সাহিত্যচর্চার আসরেও কবি যাতায়াত শুরু করেন।

১৯৩৮: কবি সুভাস আই. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে।

১৯৩৯: কবি লেবার পার্টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন। খিদিরপুর ডকে শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টির কাজ করতে শুরু করেন। তখন লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এই সময় থেকে কবি রাজনীতির পাঠ নিতে থাকেন। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র জানিয়েছেন— "বিশ্বনাথ দুবের কাছে আমরা মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন ও স্টালিন এর মূল রচনার (অবশ্য ইংরেজীতে) পাঠ নিতাম। হাজরা রোডের বাঁশতলার বস্তিতে দুবের খুপরি চালওয়ালা ঘরে আমাদের গোপন ক্লাস হতো। দেবীপ্রসাদ, সুভাষ ও আমি এই ক্লাসের নিয়মিত পড়ুয়া ছিলাম।.....১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে আমরা সে সময়কার আর একজন বিখ্যাত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর চাকে জমে যাই। বলশেভিক পার্টি ছেড়ে আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে ঢুকি।" (দিগ্বিজয়ী পদাতিক/সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা)।

১৯৪০: কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক কর্মী ও কবিতা পাঠকদের কাছে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সে সময়ে অন্যতম অগ্রজ কবি ও প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি। কিন্তু 'উর্বশীও আর্টেমিস' বেরোবার পর থেকে সে সম্মান হ'লো বিষ্ণু দে-র ভোগ্য, যতদিন না সমর সেন দেখা দিলেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' নিয়ে। সম্প্রতি এই ঈর্ষিতব্য আসন সমর সেনেরও বেদখল হয়েছে, বাংলার তরুণতম কবি এখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

আমি বলতে চাই যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুপস্থিতির একটি সামাজিক লক্ষণ হয়তো দুর্লক্ষণ। কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছেনা, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।" (কালের পুতুল/১৯৪০)

১৯৪১: এই সময় জার্মানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করলে কবি ফ্যাসিস্ট বিরোধিতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সোভিয়েতের প্রতি সমর্থক জ্ঞাপক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে সাম্মানিক দর্শনে বি. এ. পাশ করেন।

১৯৪২: ফ্যাসিস্ট বিরোধী 'লেখক ও শিল্পী' সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে বিষ্ণু দের সঙ্গে তিনিও সম্মানিত হলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই-এর সদস্য পদ গ্রহণ করলেন। এরপর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে বছরের পর বছর বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরের অলিতে-গলিতে পার্টির নানা কাজে মগ্ন থাকলেন। পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় মাসিক পনেরো টাকার ভাতায় যোগ দেন।

১৯৪৩: বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করেন পি. সি. যোশীর প্রার্থী হিসাবে।

১৯৪৬: 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন।

১৯৪৮: উগ্রপন্থী দল হিসাবে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং বহু কমিউনিস্টকে বিনা বিচারে বন্দী করে। কবিও বন্দী হন মার্চ-এ। জেলের বন্দীদের হাঙ্গার স্ট্রাইকেও কবি সামিল হন। তাঁকে দমদম জেলে থেকে স্থানান্তরিত করা হয় ভুটানের বক্সায়। কয়েক মাস মুক্তি পেলেও আবার জেলে যেতে হয়। এই বছর প্রকাশিত হয় 'অগ্নিকোণ'।

১৯৫০: এই বছর নভেম্বরে কারাবাস থেকে মুক্তি পান। ইতিমধ্যে এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে 'চিরকুট'। জেল থেকে বেরিয়ে এক প্রকাশনা সংস্থায় মাসিক পঁচাত্তর টাকার বেতনে সাব-এডিটরের কাজে যোগ দেন।

১৯৫১: 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এই বছর ১৭ আগস্ট গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লিখেছিলেন 'আমার বাংলা'।

১৯৫২: স্বামী-স্ত্রী চলে যান বজবজের চটকলে সংগঠনের কাজে। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—"১৯৫২ সালের এক ভোরবেলায় শ্বশুর মশাইয়ের চোখের জলের মধ্য দিয়ে, 'ফিরে চল মাটির টানে' বলে এক ধড়বড়ে ট্রাকে কিছু নড়বড়ে তক্তা পোষটোস নিয়ে যখন উঠলাম গিয়ে বজবজের ব্যঞ্জনে হেঁড়িয়া গ্রামের এঁদো পুকুরের ধারে এক মুসলমানের কুঁড়ে বাড়িতে, তখন কিন্তু এসব উঁচু নিচু সুর একটা মজাদার লয়ে বাঁধা পড়েছিল। তার বোধ হয় সেই 'সুরে সুর মিলায়ে' সুভাষ আবার অনেকদিন পরে এক ঝুড়ি কবিতাও লিখে ফেলেছিল।" (ভালোবাসার কথা/ সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথাও কবিতা)। অনুবাদ করেন নাজিম হিকমতের কবিতা।

১৯৫৩: 'ভূতের বেগার' লিখেছিলেন এই সময়, আর 'কতক্ষুধা'।

১৯৫৪: 'প্রকাশিত হয়' 'ভূতের বেগার'।

১৯৫৫: বড় মেয়ে পুপে এল, ঘর আলো হল। এই সময়টা কবির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পার্টির কাজ, শ্রমিক।

১৯৫৫-৬৪: ইউনিয়নের কাজ ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে পড়াশোনা, 'পরিচয়' সম্পাদনা ও

লেখালেখি। বজবজ থেকে ফিরে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন পোর্ট অঞ্চলে। লিখলেন 'যখন যেখানে',

১৯৬২: প্রকাশিত হয় 'যত দূরেই যাই'।

১৯৬৪: ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যায়—সি. পি. আই. এম., সি. পি. আই এম.(এল) কবি থেকে যান পুরোনোতেই। পার্টির ভাগ এবং পরস্পরের দলাদলি কবিকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। লিখলেন 'ডাক বাংলার ডায়েরী' (১৯৬৫)

১৯৬৬: প্রকাশিত হয় 'কাল মধুমাস'।

১৯৬৭: বিধানসভা না ডেকে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিলে কবি ১৪৪ ধারা ভেঙে গ্রেফতার বরণ করেন। তেরোদিন কারারুদ্ধ থাকেন। এই বছর ১৫ আগস্ট 'সপ্তাহ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কবি সুভাষ এই পত্রিকার সদস্য হন, ১৯৮০ থেকে হন পত্রিকার সভাপতি। আমৃত্যু তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।

১৯৭০: প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

১৯৭১: প্রকাশিত হয় 'এই ভাই' কাব্যগ্রন্থ। এই সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা আত্মবীক্ষায় মগ্ন। তথাকথিত দল ও দল-বিভাজন ও দলের দ্বন্দ্বে মানুষের ভালো চাওয়া এক বিন্দুতে মেলাতে পারছিলেন না।

১৯৭২: 'ছেলে গেছে বনে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৭৯: 'একটু পা চালিয়ে ভাই' প্রকাশিত হয়।

১৯৮১: পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলের বিরুদ্ধে মতান্তরের জন্য পার্টির সদস্যপদ আর নবীকরণ করলেন না। প্রকাশিত হল 'জল সইতে' কাব্যগ্রন্থ।

১৯৮৩: 'চইচই চইচই' কাব্যগ্রন্থেরপ্রকাশ।

১৯৮৫: 'বাঘ ডেকেছিল' কবিতা বইটির প্রকাশ।

১৯৮৯: 'যা রে কাগজের নৌকা' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯১: 'ধর্মের কল' প্রকাশিত হয়।

২০০১: 'ছড়ানো ঘুঁটি'—তার শেষ মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। অবশ্য ২০০৯-এ কবির মৃত্যুর পর দে'জ পাবলিশিং তাঁর ডায়েরীতে লেখাজীবনের শেষ কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেছিল 'সুভাষের নতুন কবিতার বই'।

২০০৩: এই বছর ৮ জুলাই কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবনের এই বড় পরিসরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত কী লিখেছেন, তার সবটা গ্রন্থ পঞ্জীতে ধরা আছে। রাজনীতি, কবিতালেখা, গদ্যরচনায় পরীক্ষা নিরীক্ষা —সবই চলেছিলো সমান্তরাল ভাবে। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে এবং নানা পুরস্কার পাওয়া নিয়ে অনেকের নিন্দা তিনি সহ্য করেছিলেন। পাঠক

বিচার করবেন সেইসব পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিনা।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের সম্মান কম পাননি—

১৯৬৪: সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার

১৯৭৭: আন্তর্জাতিক লোটাস পুরস্কার

১৯৮০: কুঁয়ারণ আসান পুরস্কার

১৯৮১: মির্জা তুরসনজাত পুরস্কার

১৯৮৩: আনন্দ পুরস্কার

১৯৮৪: সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার

১৯৮৭: মধ্যপ্রদেশ সরকারের কবীর পুস্কর এবং মোহিতলাল ও সুকান্ত পুরস্কার, উল্টোরথ পুরস্কার

১৯৯২: আমাদের দেশের সাহিত্যের সর্বোচ্চ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

১৯৯৩: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'দেশিকোত্তম' সম্মানে সম্মানিত করে।

সবচেয়ে বড় পুরস্কার, রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্য-জগতে জীবনানন্দকে সরিয়ে রাখলে তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি, এবং জনপ্রিয় কবি। অবশ্য আজকের যুগে কেউ কেউ কবি শঙ্খ ঘোষকে তাঁরই সমকক্ষ বলে বিতর্ক তৈরি করতে পারেন। তথাপি আমার মনে হয় তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন বাংলা ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। এই পুরস্কারের মূল্য বোধ হয় অপরিমেয়।

গ্রন্থঋণ :

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ ১-৫ খণ্ড দে'জ পাবলিশিং
২। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা
৩। একবার বিদায় দে মা—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৪। ছড়ানো ঘুঁটি—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৫। আমার কালের কয়েকজন কবি—জগদীশ ভট্টাচার্য
৬। আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী
৭। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়—সুমিতা চক্রবর্তী
৮। আধুনিক কবিতার দিগবলয়—আশ্রুকুমার সিকদার
৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা—সম্পাদনা—শঙ্খ ঘোষ, সৌরিন ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস।
১০। পরিচয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা—ফ্রেব্রুয়ারী জুলাই ২০০৪
১১। পত্রপুট, ৩৩ শারদীয় ১৪০২, সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য
১২। দিবারাত্রির কাব্য—সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা জানুয়ারী ও এপ্রিল-জুন ২০০৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : গ্রন্থপঞ্জি

	সংস্করণ	প্রকাশ
১. কাব্য :		
পদাতিক	প্রথম সংস্করণ	ফেব্রুয়ারী ১৯৪০, ফাল্গুন ১৩৪৬
অগ্নিকোণ	প্রথম সংস্করণ	১৩৫৫,১৯৪৮
চিরকুট	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৫৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা	প্রথম সংস্করণ	শ্রাবণ ১৩৬৪, জুলাই, ১৯৫৭
যত দুরেই যাই	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৬৯
কাল মধুমাস	প্রথম সংস্করণ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, মে ১৯৬৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৭৭, এপ্রিল ১৯৭০
এই ভাই	প্রথম সংস্করণ	ভাত্র ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১
ছেলে গেছে বনে	প্রথম সংস্করণ	ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ ১	প্রথম সংস্করণ	অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ ২	প্রথম সংস্করণ	শ্রাবণ ১৩৮১
একটু পা চালিয়ে ভাই	প্রথম সংস্করণ	মে ১৯৭৯
জল সইতে	প্রথম সংস্করণ	মে১৯৮১
চইচই চইচই	প্রথম সংস্করণ	ফাল্গুন ১৩৮৯, মার্চ ১৯৮৩
বাঘ ডেকেছিল	প্রথম সংস্করণ	১৯৮৫
যা রে কাগজের নৌকা	প্রথম সংস্করণ	বইমেলা ১৯৮৯
ধর্মের কল	প্রথম সংস্করণ	জানুয়ারী ১৯৯১
ছড়ানো ঘুটি	প্রথম সংস্করণ	২০০১
নতুন কবিতার বই	প্রথম সংস্করণ	দে'জ, ২০০৯
২. ছড়া :		
মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো	প্রথম সংস্করণ	জানুয়ারী ১৯৮০
সাত সকালের ছড়া	প্রথম সংস্করণ	২০০০
বকবকম	প্রথম সংস্করণ	২০০১
হরে কর কমবা	প্রথম সংস্করণ	২০০৩
৩. অনুবাদ কাব্য :		
নাজিম হিকমতের কবিতা	প্রথম সংস্করণ	এপ্রিল ১৯৫২
দিন আসবে (নিকোলে ভাপ্‌ৎসারভ)	প্রথম সংস্করণ	১লা বৈশাখ ১৩৭৬
পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৮০
ওলঝাস সুলেমেনভ-এর রোগা ঈগল	প্রথম সংস্করণ	পৌষ ১৩৮১

নাজিম হিকমতের আরো কবিতা	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৮৬
পাবলো নেরুদার আরো কবিতা	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৮৭
হাফিজের কবিতা	প্রথম সংস্করণ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
চর্যাপদ	প্রথম সংস্করণ	মে ১৯৮৬
অমরুশতক	প্রথম সংস্করণ	বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৮
৪. রিপোর্টাজ ও ভ্রমণকাহিনী মূলক গদ্য :		
আমার বাংলা	প্রথম সংস্করণ	১৯৫১
যখন যেখানে	প্রথম সংস্করণ	পঁচিশে বৈশাখ ১৩৬৭
ডাক বাংলার ডায়রী	প্রথম সংস্করণ	১লা ভাদ্র ১৩৭২
নারদের ডায়রি	প্রথম সংস্করণ	বৈশাখ ১৩৭৬
যেতে যেতে দেখা	প্রথম সংস্করণ	কার্তিক ১৩৭৬
ক্ষমা নেই	প্রথম সংস্করণ	চৈত্র ১৩৭৮
ভিয়েতনামে কিছুদিন	প্রথম সংস্করণ	জানুয়ারী ১৯৭৪
আবার ডাকবাংলার ডাকে	প্রথম সংস্করণ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
টো টো কোম্পানি	প্রথম সংস্করণ	ডিসেম্বর ১৯৮৪
এখন এখানে	প্রথম সংস্করণ	সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
খোলা হাতে খোলা মনে	প্রথম সংস্করণ	বইমেলা ১৯৮৭
৫. অর্থনীতি বিষয়ক গদ্য :		
ভূতের বেগার	প্রথম সংস্করণ	মার্চ ১৯৫৪
(মার্কাস-এর 'ওয়েজ লেবার এ্যাণ্ড ক্যাপিটাল' অবলম্বনে)		
৬. ছোটদের জন্যে লেখা গদ্য ও অন্যান্য :		
বাঙ্গালীর ইতিহাস	প্রথম সংস্করণ	১৯৫২
(ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব)-এর সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ)		
অক্ষরে অক্ষরে	(আদি পর্ব)	সেপ্টেম্বর ১৯৫৪
কথার কথা	প্রথম সংস্করণ	১৯৫৫
দেশবিদেশের রূপকথা	??	??
বাংলা সাহিত্যের সেকাল ও একাল	প্রথম সংস্করণ	ডিসেম্বর ১৯৬৭
ইয়াসিনের কলকাতা	প্রথম সংস্করণ	ডিসেম্বর ১৯৭৮
৭. জীবনী :		
জগদীশচন্দ্র	প্রথম সংস্করণ	১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৮
আমাদের সবার আপন ঢোল-গোবিন্দর আত্মদর্শন	প্রথম সংস্করণ	৫ শ্রাবণ ১৩৯৪, জুলাই, ১৯৮৭

ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই ???

৮. অনুবাদ গদ্য :

কত ক্ষুধা	প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩
(ভবানী ভট্টাচার্যের 'So many Hungers' উপন্যাসের অনুবাদ)	
রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ	প্রথম সংস্করণ ১৯শে জুন ১৯৫৪
ব্যাঘ্রকেতন	প্রথম সংস্করণ শকাব্দ ১৮৮২, সন ১৩৬৭
(সুভাষচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবন : হিউটয়)	
রুশ গল্প সঞ্চয়ন	প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৬৩
ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন	প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬৮
চে গেভারার ডায়রি	প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৭
ডোরাকাটার অভিসারে	প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯
(শের জঙ্গ-এর Tryst with Tigers' এর অনুবাদ)	
আনাফ্রাঙ্কের ডায়েরী	প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৮২
তমস (ভীষ্ম সাহানী)	প্রথম সংস্করণ ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৫

৯. উপন্যাস :

হাংরাস	প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮০, এপ্রিল ১৯৭৩
কে কোথায় যায়	প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৬
অন্তরীপ বা হ্যান্‌সেনের অসুখ	প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯০
কাঁচা-পাকা	প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৯
কমরেড, কথা কও	প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯০

১০. সম্পাদিত গ্রন্থ :

একসূত্রে (ফ্যাসিস্ট বিরোধী কবিতা সংকলন)	
(গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে যৌথভাবে	প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৪৫
কেন লিখি (বাংলা দেশের বিশিষ্ট	
কথাশিল্পীদের জবানবন্দী, হিরণকুমার	
সান্যালের সঙ্গে যৌথভাবে)	প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৪৫
পাতাবাহার (ছোটদের পূজো সংকলন)	প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬২
বার্ষিক আগামী	প্রথম সংস্করণ মহালয়া ১৩৮১
ছোটদের পূজো সংকলন)	

১১. কবিতা সম্পর্কিত গদ্যগ্রন্থ :

কবিতার বোঝাপড়া	প্রথম সংস্করণ
টানাপোড়েনের মাঝখানে	প্রথম সংস্করণ

১২. সংকলন :

কবিতা সংগ্রহ ১ম	প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯২
কবিতা সংগ্রহ ২য়	প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৩
কবিতা সংগ্রহ ৩য়	প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪
কবিতা সংগ্রহ ৪র্থ	প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৫
কবিতা সংগ্রহ ৫ম	প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৫
গদ্য সংগ্রহ ১ম	প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯৪
গদ্য সংগ্রহ ২য়	প্রথম সংস্করণ ১৫ এপ্রিল ১৯৯৬

উৎস : পত্রপুট, ৩৩ সংখ্যা